সব ঝুট্ হ্যায়

বিমল মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫

প্রচ্ছদ অংকন : গৌতম রায়
মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

আলোকচিত্র
মোনা চৌধুরী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন
স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে অশোককুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত

সমর্পণ

পূজ্য শ্রীগঙ্গাশরণ সিং

শ্রীচরণেষু

সব
ঝুট
হ্যায়

আদিকথা

শেষের আগে যেমন একটা সুরু থাকে, তেমনি শেষের পরেও আর একটা জিনিস আছে যার নাম অশেষ। কিন্তু সেই অশেষের পরে ? অশেষের পরে কি আর কিছু আছে ? যদি কিছু থাকে তো তার নাম আদি। শেষ মানেই আদি। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিলীলা যদি আমরা পরিক্রমা করি, পরিক্রমা করে যদি শেষের বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছোই তো একদিন আশ্চর্য হয়ে দেখব যে আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছিয়েছি সেইটেই আদি। আমাদের জীবন-যাত্রা আদি থেকে সুরু করে আবার সেই আদিতে পৌঁছিয়েই শেষ। তাই আদি অন্তহীন অনন্তের যে আদিম কল্পনা তা মিথ্যে নয়। মানুষের জীবন তাই আদি-অন্তহীন এক অনাদি অনন্ত প্রক্রিয়া। তার সুরুও নেই শেষও নেই, তার আদিও নেই অন্তও নেই। তাই আদি-অন্তহীন সেই অনাদি অনন্ত ভগ্নাংশ নিয়ে আমি এই উপন্যাস সুরু করলাম।

তা ভগ্নাংশেরও একটা মনগড়া সুরু থাকে এবং একটা শেষও থাকে। কিন্তু এবার আমি আদি থেকেই সুরু করব। অর্থাৎ শেষ থেকে।

এবার আমার এই উপন্যাস যেখানে শেষ হবে সেটা কলকাতার একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি। অর্থাৎ একটা মাল্‌টি-স্টোরিড্‌ বিল্‌ডিং। বাড়িটার একটা নামও আছে। নাম 'ত্রিবলী পার্ক'। 'ত্রিবলী পার্কে'র চারিদিকে আরও অনেক বড় বড় বাড়ি আছে বটে কিন্তু উচ্চতায় 'ত্রিবলী'র কাছে সেগুলো সবই মাপে ছোট। 'ত্রিবলী পার্কে' ঢুকতে গেলে একটা গেট পেরোতে হবে। গেট-এ উর্দি-পরা দরোয়ান মজুত থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। চব্বিশ-ঘণ্টার দরোয়ান, চব্বিশ ঘণ্টার জল, চব্বিশ-ঘণ্টার লিফট ছাড়া চব্বিশ-ঘণ্টার লিফট-ম্যানও মজুত থাকে 'ত্রিবলী পার্কে'র ফ্ল্যাট-বাড়িতে।

আপনারা যখন এই উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে পৌঁছোবেন তখন দেখবেন কলকাতা শহরের ঘড়িতে প্রায় রাত বারো সাড়ে বারোটা বাজে। ঘড়িতে রাত সাড়ে বারোটা বাজে বলে রাস্তায় তখন বাস-ট্রাম কিছু নেই। থাকলেও তা হয়ত হাতে গোনা যাবে। একটা নতুন মডেলের ইম্‌পোর্টেড কার নিউ আলিপুরের দিক থেকে ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে ছুটে আসবে ওই 'ত্রিবলী পার্ক' লক্ষ্য করে। আলিপুর রোডটা তত চওড়া রাস্তা নয়। চওড়া রাস্তা না হলেও রাস্তাটা নির্জন। নির্জন বলে অত স্পীডে গাড়ি চালানোতে দোষ নেই। রাস্তার ট্র্যাফিক সিগন্যালগুলো তখন কেবল জ্বলছে আর নিভছে। মানে অকেজো। যারা গাড়ি চালাবে তাদের তখন আর ট্র্যাফিক সিগন্যালের নিয়ম-কানুন জানবার দরকার নেই। সিগন্যালের আলোর রং লালই থাকুক আর সবুজই থাকুক তা নিয়ে

তোমার মাথাব্যথা করবার দরকার নেই। তুমি জোরে গাড়ি চালাও, আরও জোরে। আমরা তোমাকে বাধা দেব না। আমরা যারা ট্র্যাফিক-পুলিস তারা নিয়ম না মানার জন্যে তোমার গাড়ির নম্বর নোট-বুকে টুকে নেবো না।

গাড়িটা হস্পিটাল রোড পেরিয়ে ট্রাম-রাস্তা ক্রস্ করে সোজা যেমন চলছিল তেমনিই পুবদিকে চলতে থাকবে। ট্রাম-রাস্তা পেরিয়ে যে রাস্তায় গাড়িটা গিয়ে পড়বে সেটার নাম লোয়ার সারকুলার রোড। লোয়ার সারকুলার রোডটা আসলে সেকালের পুরনো কলকাতার আদি রাস্তা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র দেশ থেকে ডাকাতরা যাতে কলকাতা শহরের মধ্যে ঢুকতে না পারে তার জন্যে ওই রাস্তা বরাবর খাদ কাটা হয়েছিল। খাদের মধ্যে সারা বছর জল জমানো থাকত। তারপর কালক্রমে ইতিহাস ভূগোল বদলে গেছে। সেই ডাকাতদের ভয়ও চলে গেছে। খাদটা বুজে গিয়ে একটা রাস্তায় পরিণত হয়েছে সেটা। একেবারে শেয়ালদা ধরে সোজা শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে গিয়ে সেটা মিশেছে। এদিককার নাম হয়েছে লোয়ার সারকুলার রোড, আর ওদিকটার নাম হয়েছে আপার। আপার সারকুলার রোড।

কিন্তু যে গাড়িটার কথা আমরা বলছি সেটা লোয়ার সারকুলার রোড ধরে বেশি দূরে যাবে না। খানিকটা দূর গিয়েই ল্যান্সডাউন রোড পড়বে ডানদিকে, সেদিকে বেঁকবে না গাড়িটা। বাঁদিকে অনেকগুলো রাস্তা পড়বে, সেদিকে বেঁকবে না। সোজা আশী মাইল স্পীডে গিয়ে চার-মাথাওয়ালা রাস্তায় পোঁছোবার আগেই ডান দিকে একটা তিরিশ ফুট চওড়া ব্লাইন্ড লেন পড়বে, গাড়িটা তার মধ্যেই ঢুকে পড়বে। পড়ে একটা বাড়ি পেরোবার পরই হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়বে একটা বাঁকের সামনে। সে গিয়ে হর্ন বাজাবে। হর্ন-এর শব্দ শুনে চব্বিশ-ঘণ্টার দরোয়ান গেট খুলে দিয়ে একবার সেলাম জানাবে। গেটটা খুলতেই গাড়িটা এমন তাড়াতাড়ি গেটের ভেতরে ঢুকবে যে মনে হবে লোকটার বোধ হয় খুব তাড়া আছে। মনে হবে বোধ হয় লোকটা এখনই কাউকে খুন করে আসছে।

কিন্তু না, লোকটা যত তাড়াতাড়ি যত ব্যস্তভাবেই গাড়ি চালিয়ে আসুক, খুন সে করেনি কাউকেই। খুন যদি কাউকে সে করেই থাকে তো একমাত্র নিজেকেই সে খুন করেছে। কিম্বা বলতে গেলে বলা যায় সে নিজেই খুন হয়েছে। তাকেই যেন কেউ খুন করেছে।

কিন্তু সত্যিই তো, শেষের কথাই বা আগে বলছি কেন?

কারণ আজকের দিনের গল্প-লেখকদের বড় মুশকিল হয়েছে। আজকের এই আত্মপ্রচার-জটিল লঘুমনস্কতার যুগে আমাদের কারোরই সময় নেই। আমরা বড় ব্যস্ত। সেই যে এককালে গল্প লেখার রীতি ছিল সে-সব নিয়মকানুন বদলে গেছে। আগে গল্প আরম্ভ করবার সময় প্রথমেই সুরু থেকে সুরু করতে হতো। বলতে হতো—এক ছিল রাজা…

কিন্তু এখন সুরু করতে হয় শেষ থেকে। এখন শেষ থেকে গল্প আরম্ভ করে আবার সেই শেষে এসেই পোঁছতে হয়। তবেই গল্প জমে, তবেই গল্পের জটিল জালে জড়িয়ে গিয়ে পাঠক খিদে ভোলে, পাঠকের কাজ পণ্ড হয়, পাঠক খানিক-

ক্ষণের জন্যে নিজেকে চিনতে পারে। আর নিজেকে চেনার মত বড় জিনিস সংসারে আর কী আছে, বলুন?

এবার তাই শেষ থেকেই সুরু করেছি। এ উপন্যাস যখন শেষ হবে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন কলকাতা শহরের মধ্যরাত্রের অন্ধকার চিরে যে-লোকটা গাড়ি চালিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে এল সে কে। কী তার নাম-ধাম-পরিচয়। তার বাবার নামই বা কী, কী তার সমস্যা, কোন্ বংশের ছেলে সে। জানতে পারবেন কী তার জীবিকা, কোন আতঙ্কের তাড়নায় সে এমন করে দৌড়চ্ছে। নিজের বাড়িতে আসার জন্যে তার কীসের এত তাড়া!

এখন এই সুরুতে শুধু এইটুকু জানা থাকাই ভালো যে তার 'ত্রিবলী পার্কে'র দশতলায় তার এ্যাপার্টমেন্টের দরজার সামনে পেতলের একটা ট্যাবলেটের ওপর তার নাম লেখা আছে 'এস রায়'।

'এস রায়' বললে অনেক কিছুই বোঝায়। শশীভূষণ রায় হতে পারে, সত্য-বন্ধু রায়ও হতে পারে, কিম্বা হতে পারে সুভাষবিন্দু রায়ও। আসল নামের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণের অনেক সুবিধেও যেমন আছে, তেমনি অসুবিধেও আছে অনেক। এই কলকাতা সহরে হয়ত লক্ষ-লক্ষ এস রায় আছে, কিন্তু আসল নাম কি তাদের এক! আমাদের এই নায়ক কিন্তু তার নামের ব্যাপারে বরাবর ছিল সৌভাগ্যবান।

স্কুলে ভর্তি হবার সময়ই নজরে পড়ে 'টাউন স্কুলে'র হেডমাস্টার ক্ষেত্রবাবুর। নতুন ছাত্র ভর্তি হবার তালিকাটা দেখতে দেখতে হেড ক্লার্ক তারিণীবাবুকে ডেকে পাঠালেন। তারিণীবাবু ঘরে আসতেই ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন—আজকে যে ছেলেটি ভর্তি হয়েছে এর নামটা কী বলুন তো? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—

তারিণীবাবু বহুকালের পুরনো লোক। সারাজীবন স্কুলের খাতায় ছাত্রদের নাম লিখে লিখে হাত পাকিয়েছেন। তাঁর আমলে অনেক হেডমাস্টার এসেছেন গেছেন, কিন্তু এক এবং অদ্বিতীয় হয়ে তিনি তখনও নিজের চেয়ারে বিরাজ করে আসছেন।

তারিণীবাবু বললেন—আজ্ঞে আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি, তাই একটু চমকে উঠেছিলুম। ওর নাম সোহম্ রায়।

ক্ষেত্রবাবু বললেন—আমিও তো তাই অবাক হয়ে গিয়েছি। আগে এমন নাম তো শুনিনি কারো, তাই। নামটা বেশ নতুন ধরনের লাগল—

তারিণীবাবু বললেন—ছেলেটির কথাবার্তাও খুব ভালো স্যার। নামটাও যেমন আবার দেখতেও তেমনি—

হেডমাস্টার মশাই ক্ষেত্রবাবু বললেন—ডাকো তো ছেলেটিকে—

সোহম্ এল হেডমাস্টার মশাইএর কাছে। ক্ষেত্রবাবুর ঘরটা বিরাট। সোহমের এখনও মনে আছে সেই ঘরটার চেহারা। বিরাট একটা টেবিল। পাশে একটা টেলিফোন। চারপাশে বই-খাতা-কাগজপত্র। সে এক বিরাট জগৎ যেন। সোহম্ যখন পরে 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জাক্সন্ লিঃ'এর ম্যানেজার হয়েছিল তখন তারও ঠিক ওই রকম একটা ঘর হয়েছিল। ঠিক ওই রকম ঘরের মধ্যে বসেই সোহম্ তার অফিসের কাজ চালাতো। 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্' কোম্পানির বোম্বাই ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার মিস্টার এস. রায়-এর সামনে তার সুপারিনটেনডেণ্টও ঠিক ওই রকম করেই এসে দাঁড়াতো, এসে দাঁড়িয়ে থাকত আর মিস্টার রায়ের হুকুম তামিল করত। ছোটবেলাকার তার সেই হেডমাস্টার মশাই-এর চেহারাটা তার প্রায়ই মনে পড়ত। হেডমাস্টার মশাই ক্ষেত্রবাবুকে যেমন সোহম্ ভয় করত ঠিক তেমনি 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানি'র বোম্বে ব্র্যাঞ্চের স্টাফরাও মিস্টার রায়কে ভয় করত। ভয় করত বটে কিন্তু ভক্তিও করতো তাকে খুব।

হঠাৎ ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী নাম তোমার?

সোহম্ বললে—শ্রীসোহম্ রায়—

ক্ষেত্রবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার এ-নাম কে রেখেছেন?

কে তার নাম রেখেছেন তাঁর সন্ধান সে কোনও দিন করেনি। তার নামের যে এমন বৈশিষ্ট্য আছে সে-কথাও তখন তার খেয়াল হয়নি। আর তা ছাড়া নাম নিয়ে যে কেউ এত মাথা ঘামায় তাও তখন সে জানতো না।

সোহম্ বললে—আমি তা জানি না স্যার—

—বাড়িতে তোমার কে কে আছেন? মানে, তোমার গার্জেন কে?

সোহম্ বললে—আমার এক পিসেমশাই আছেন বাড়িতে, আর পিসিমা।

—আর?

সোহম্ বললে—আর আমার একজন পিসতুতো দাদা আছে, আমার চেয়ে বয়েসে বড়। সে কলেজে পড়ে।

—আর বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই?

সোহম্ বললে—না, ভাই-বোন কেউ নেই। শুনেছি আমার বাবা-মা আমার জন্মের পরেই মারা গেছেন।

এর পরে ক্ষেত্রবাবু আর কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেন—যাও, ক্লাসে যাও—

যাবার আগে বলেছিলেন—বেশ মন দিয়ে লেখা-পড়া করবে। বুঝলে? লেখাপড়া করলেই জীবনে উন্নতি করতে পারবে। জানো? তোমার নাম সোহম্। ব্রহ্ম আর আত্মার মধ্যে কোনও তফাৎ নেই, এটা মনে রেখো। এত ভালো নাম কেউ পায় না। এত ভালো নাম যখন পেয়েছ তখন যেন নামের অপব্যবহার কোর না—

নিউ আলিপুর থেকে লোয়ার সারকুলার রোড—কতখানি আর দূরত্ব। বড় জোর তিন-চার ফারলং। কিন্তু সোহমের মনে হলো যেন এইটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে তার চল্লিশ বছর লাগছে। হ্যাঁ, চল্লিশটা বছরই বটে। চল্লিশ বছর ধরে সে কেবল ওপরের দিকেই উঠেছে। নিজেকে অতিক্রম করে কেবল আরো আরো ওপরেই সে উঠতে চেয়েছে। এত ওপরে উঠতে চেয়েছে যে যেখানে পৌঁছলে

মানুষ তাকে ঈর্ষা করবে, মানুষ তাকে সেলাম করবে, মানুষ তার কাছে মাথা নিচু করবে, সবাই তাকে সৌভাগ্যবান বলবে। সবাই বলবে, হ্যাঁ, বাপ-মায়ের ছেলের নাম রাখা সার্থক হয়েছে বটে!

সে যে সত্যিই ওপরে উঠেছে তার প্রমাণ তো তার ওই গাড়িটা। গাড়িটার দামই তো তার সত্তর হাজার টাকা। এখন আরো দাম বেড়েছে ওটার। আর শুধু গাড়িটাই তার প্রমাণ নয়, প্রমাণ তার চাকরি, প্রমাণ তার এ্যাপার্টমেন্ট। প্রমাণ 'টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাকসন্ ইন্ডিয়া লিমিটেডে'র অফিসে তার চেম্বারটা!

—সব ঝুট্ হ্যায়!

হঠাৎ গাড়ির এ্যাক্সিলেটারের ওপর থেকে তার পায়ের পাতাটা যেন সরে গেল। সামান্য একটা কথা। কবেকার কোন্ এক অতীত শতাব্দীর কোন্ এক পাগলা মেহের আলি হঠাৎ এতদিন পরে পুনর্জীবন পেয়ে একেবারে যেন গাড়ির সামনে এসে পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সোহম্ চিৎকার করে উঠলো—মেহেরালি সাহেব—

মেহের আলি ছিল বোম্বের শেয়ার মার্কেটের ব্রোকার। নামে ব্রোকার, কিন্তু কোনও কাজকর্ম ছিল না তার তখন। এককালে হয়ত কাজকর্ম ভালোই করত সে। এককালে হয়ত লাখ-লাখ টাকা উপায় করেছে সে ব্রোকারি করে। কিন্তু তখন মিস্টার রায়ের কাছে আসত মদ খেতে। মদ খেতে মানে টাকা চাইতে। মিস্টার রায়ের ঘরে যে-সে যখন-তখন ঢুকতে পেত না। কিন্তু মেহের আলি সাহেবের কথা ছিল আলাদা। দরোয়ান যদি বলত—সাহেব আভি কাম মে জুড়া হুয়া হ্যায়—

মেহের আলি তাকে ঠেলে জোর করে ঘরে ঢুকে পড়ত।

বলত—আরে, রেখে দাও তোমার সাহেবের কাম! হাম কোন্ হুঁ মালুম্ হ্যায়? আমি কে জান তুমি? আমি মিস্টার মেহের আলি—

বলে তাকে ঠেলে-মেলে ঝড়ের মত সোহমের ঘরে ঢুকে পড়ত। ঢুকেই একেবারে রায়ের সামনের চেয়ারে গ্যাঁট হয়ে বসে পড়ত। প্রথম-প্রথম যখন মেহের আলি সাহেব তার অফিসে আসত তখন ভালো-ভালো দামী স্যুট-টাই-জুতো পরা টিপ-টপ সাহেব সে। এবেলা পরা স্যুট ও-বেলায় পরত না। তার হাতে তখন থাকত একটি পোর্ট-ফোলিও কেস্। তার ভেতরে থাকত দামী-কোম্পানির ব্যালেন্সশীট। বড় বড় কোম্পানির ডেবিট-ক্রেডিট-এর হিসেব-নিকেশ. ডিভিডেন্ড আর ক্যাপিটেল-এর অংক ছাপা থাকত তাতে। আর মুখে থাকত একটা আধ-খাওয়া ধুমন্ত চুরোট।

সে-সব একেবারে মিস্টার রায়ের আদি-যুগের বোম্বাই-জীবনের গোড়ার

ইতিহাস। সোহম্ তখন বোম্বাই অফিসের কর্তা হয়ে সবে গেছে সেখানে।

সেই সময়ে একদিন সোহম্ মেহের আলি সাহেবকে বলেছিল—জানেন মিস্টার মেহের আলি, আপনাকে আমরা সব বাঙালীরা ছোটবেলা থেকে চিনি—

শেয়ার-মার্কেটের ব্রোকার অবাক হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে। জিজ্ঞেস করেছিল—কী করে চিনলে? আমি তো কখনও কলকাতায় যাইনি!

সোহম্ বলেছিল—তা না গেলেও আমরা আপনাকে চিনি—ছোটবেলা থেকে আপনাকে চিনি—

—কী করে?

সোহম্ বলেছিল—তুমি টেগোরের নাম শুনেছ?

—টেগোর? শেয়ার-মার্কেটের ব্রোকার?

সোহম্ হেসে উঠেছিল মেহের আলি সাহেবের কথায়। মেহের আলি সাহেব জীবনে শেয়ার-মার্কেট ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু যে আছে তা জানতে চাইতও না, জানার ইচ্ছেও তার ছিল না। শেয়ার-মার্কেটই ছিল মেহের আলি সাহেবের পৃথিবী। প্রতিদিন খবরের কাগজের শেয়ার-মার্কেটের খবর পড়তে পড়তেই তার ঘুম ভাঙত আর শেয়ার-মার্কেটের সূর্য ডোববার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘুম নামত। বাড়িতে এসে টেলিফোনের লাইনে পার্টিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই রাত্রের ডিনার খেত। কখনও আবার মাঝ-রাত্রে ট্রাঙ্ককল্ করে কলকাতার পার্টিদের সঙ্গে শেয়ারের দর ওঠা-নামার জরুরী খবর দিত নিত।

মেহের আলির ধারণা ছিল পৃথিবীর যত মানুষ সবাই শুধু শেয়ার-মার্কেট নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছে। শেয়ার-মার্কেটের পৃথিবীর বাইরে যে আবার আর একটা পৃথিবী আছে, আর সেই পৃথিবীর মানুষও যে পাপ-পুণ্য ধর্ম-অধর্ম সৎ-অসতের শেয়ার নিয়ে কারবার করছে তা তার পক্ষে কল্পনা করা শক্ত হত।

হঠাৎ মিস্টার রায়ের মুখে কোন্ এক টেগোরের কথা শুনে তাই নিজের পার্টিদের নামের তালিকাটা মনে মনে আওড়াতে লাগল।

সোহম্ বললে—না না, শেয়ার-মার্কেটের কোনও ব্রোকার-ট্রোকার নন্ ইনি। ইনি হচ্ছেন একজন ফেমাস পোয়েট, একজন বিখ্যাত নোবেল প্রাইজ পাওয়া পোয়েট। কবি। তার একটা গল্পে আছে, গল্পটার নাম 'হাঙরি স্টোন্', ক্ষুধিত পাষাণ। সেই গল্পে একটা চরিত্র আছে, তার নাম মেহের আলি—

—তাই নাকি? তার নামও মেহের আলি?

—হ্যাঁ, তার মুখে সব সময় একটাই কথা ছিল—সব ঝুট্ হ্যায়—

—সব ঝুট্ হ্যায়?

—হ্যাঁ, তার ধারণা পৃথিবীতে টাকা-পয়সা-গাড়ি-বাড়ি-ইজ্জৎ-পাপ পুণ্য-ধর্ম-অধর্ম, সব কিছুই মিথ্যে। সব কিছুই ফাঁকি, সব ঝুট্ হ্যায়—

মেহের আলি সাহেব কথাটার কী মানে বুঝেছিল কে জানে। খানিকক্ষণ যেন কথাটা ভাবলে। তারপর বললে—নেহি নেহি রায় সাহেব, শেয়ার-মার্কেট ঝুট্ নেহি হ্যায়, শেয়ার-মার্কেট কভি ঝুট্ নেহি হো স্যাক্তা হ্যায়—ইণ্ডিয়ান আয়রন কভি ঝুট্ নেহি হো স্যাক্তা হ্যায়, তোমাদের পোয়েট মিথ্যে কথা বলেছে—

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই কী যে হল, সব কিছু উল্টে-পাল্টে গেল। মেহের আলি সাহেবের গাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। মেহের আলি সাহেবের গায়ে তখন ময়লা স্যুট, ময়লা টাই, ছেঁড়া জুতো। তখনও কিন্তু মেহের আলি সাহেব আসত, এসে উল্টো কথা বলত। বলত—তোমাদের পোয়েট ঠিক বলেছে মিস্টার রায়, সব ঝুট্ হ্যায়—সব ঝুট্ হ্যায়—

তারপর মেহের আলি সাহেবের এমন অবস্থা হল যে রোজ খেতেও পায় না পেট ভরে, বাস-ভাড়া দেবার পয়সাও জুটত না তার সব দিন। ঝল্‌ঝলে কোট-প্যাণ্ট টাই, পায়ে ছেঁড়া জুতো, তাই পরেই অফিসে আসত। একমুখ দাড়িগোঁফ। তাই নিয়ে এসে হাজির হত 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন ইণ্ডিয়া লিমিটেডে'র অফিসে। সোহম্ দরোয়ানকে বারণ করে দিয়েছিল। বলে দিয়েছিল—মেহের আলি সাহেবকে যেন অফিসে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

কিন্তু 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে'র দরোয়ানের কথা মেনে চলবে এমন মানুষ মেহের আলি সাহেব নয়। সে দরোয়ানকে ঠেলে জোর করে ভেতরে ঢুকে যেত।

বলত—তুমি আমাকে আটকাবার কে হে? তুম্ কোন্ হ্যায়?

দরোয়ান তবু প্রতিবাদ করত। বলত—হুজুর, সাহাব মানা কর দিয়া, অন্দর মাত জানা—

মেহের আলি বলত—জরুর জাউঙ্গা. জরুর জাউঙ্গা ম্যায়, তুম রোখ্‌নেকা কোন্ হ্যায়?

দরোয়ান তবু বলত—সাহাব আভি কাম কর রহা হ্যায়!

মেহের আলিকে রাস্তা আটকাবে এমন দরোয়ান বোধ হয় পৃথিবীতে জন্মায়নি। মেহের আলি গায়ের জোরে ঢুকে পড়ত আর মুখে বলত—তোম্‌হারা সাহেব ভি ঝুট্ হ্যায়, তুম্ ভি ঝুট্ হ্যায়। তুমহারা টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্ ভি ঝুট্ হ্যায়, শেয়ার-মার্কেট ঝুট্ হ্যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন ভি ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়—

সোহম্ তাকে সেই অবস্থায় দেখে একটু বিরক্ত হত। ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের জরুরী ফাইল নিয়ে তখন ব্যস্ত সে। মেহের আলিকে এড়াবার জন্যে সোহম্ নিজের পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিত তার দিকে।

বলত—তুমি এখন যাও মেহের আলি সাহেব, আমার এখন কথা বলবার সময় নেই—আমি একটা জরুরী কাজে ব্যস্ত—

মেহের আলি সাহেব টাকাটা নিত বটে কিন্তু রাগে ফেটে পড়ত। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিৎকার করে বলত—তুম ঝুট্ হ্যায় মিস্টার রায়, তোম্‌হারা দফ্‌তর ঝুট্ হ্যায়, শেয়ার মার্কেট ঝুট্ হ্যায়, সব কুছ ভি ঝুট্ হ্যায়—

সোহম্ তখন অফিসের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট নরসিংহম্‌কে ডেকে পাঠাত। নরসিংহম্ এলেই সোহম্ বলত—নরসিংহম্, তুমি একটু একে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাইরে নিয়ে যাও তো, আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে—

নরসিংহম্‌ও কাজের লোক। তারও অনেক কাজ থাকত। কিন্তু অনেকদিন ধরে সে মেহের আলি সাহেবকে দেখে আসছে। তার ভাল অবস্থাও দেখেছে,

আবার এখন খারাপ অবস্থাও দেখছে। আগে মিস্টার রায়ই নিজে এই মেহের আলিকে কত খাতির করে বসিয়েছে, অফিসের কাজে তার কাছে পরামর্শ চেয়েছে। আবার আজ সেই মিস্টার রায়ই তাকে অফিস থেকে তাড়িয়েও দিচ্ছে।

নরসিংহম মেহের আলিকে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে চেম্বারের বাইরে নিয়ে যেত।

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলত—মেহের আলি সাব, মেহেরবানি করে বাইরে চলুন, রায় সাহেবের কাজ আছে, চলুন বাইরে চলুন, যা বলবেন আমার কাছে বলবেন চলুন—চলুন—

মেহের আলি অনিচ্ছে সত্ত্বেও বাইরে যেত। কিন্তু চেম্বারের ভেতর থেকে সোহমের কানে আসত মেহের আলির কথাগুলো—তুমহারা সাহাব ঝুট্ হ্যায়, তোমহারা টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাকসন্ ঝুট্ হ্যায়, তুম্ ভি ঝুট্ হ্যায়, শেয়ার-মার্কেট ঝুট্ হ্যায়, ইণ্ডিয়ান আয়রন ভি ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়—

সোহমের কানে কথাগুলো যেত আর মনে মনে তার দুঃখ হত মেহের আলির জন্যে। আহা, শেষকালে মেহের আলির কি না এই পরিণতি!

বাড়িতে গিয়ে সুমিত্রাকে নিয়ে খেতে বসে বলত—জান, আজকে সেই মেহের আলিটা আবার আমার অফিসে এসেছিল।

সুমিত্রা বলত—তা ওকে অফিসে ঢুকতে দেয়ই বা কেন তোমার দরোয়ান? দরোয়ানকে বলতে পার না ওকে যেন অফিসের ভেতরে ঢুকতে না দেয়—

সোহম্ বলত—তা তো বলেই রেখেছি। কিন্তু ও কি সেই মানুষ যে কারো কথা শুনবে! সবাই তো জানে এককালে ও কত বড়লোক ছিল! সেবার যখন আমার অসুখ হয়েছিল তখন ওই মেহের আলিই আমার জন্য কী করেছে তা কি আমি ভুলে যেতে পারি? আমি যখন তোমাকে নিয়ে বোম্বেতে আসি তখন মেহের আলি না থাকলে কি আমি আজ এখন যা হয়েছি তা হতে পারতুম? তখন আমার যত বড় বড় পার্টি তাদের সঙ্গে তো ওই মেহের আলিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সে কথা কি আমি ভুলে গিয়েছি ভেবেছ?

তা বটে! সুমিত্রাও জানতো সে-সব দিনের কথা! মানুষ সুখের দিনে দুঃখের দিনের কথা ভুলে যায়। কিন্তু যে তা মনে রাখে সে-ই তো মহৎ! সে-ই তো সত্যিকারের মানুষ!

আর শুধু কি মেহের আলি!

টাউন স্কুলের ক্ষেত্রবাবুই কি তাকে কম সাহায্য করেছেন নাকি? দুঃখের দিনে যে অযাচিতভাবে সাহায্যের অকৃপণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে দুঃখ থেকে বাঁচায় মহত্ত্বটা তো তারই, আর যে মানুষ সেই সাহায্যটা পায় তার তো কেবল সৌভাগ্য। সোহমের সেই সৌভাগ্যই হয়েছিল সারাজীবন।

কিন্তু আজ?

আজকের কথা তো এই উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে লিখবো। যখন এই উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ লিখব তখন আপনারা জানতে পারবেন সোহম্ কি শেষ পর্যন্ত সত্যিই সোহম্ হতে পেরেছিল? নিউ আলিপুর থেকে লোয়ার সার্কুলার

রোডের 'ত্রিবলী পার্ক''-এর এই চার ফারলঙ্ দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে এই যে তার চল্লিশটা বছর লাগল, এ কি সত্যিই দুর্ভোগের যাত্রা! এর সবটাই কি মিথ্যে? সত্যিই কি সব ঝুট্ হ্যায়?

মনে আছে সেদিন ক্ষেত্রবাবু তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন সোহম্‌কে। সোহম্ ভয়ে ভয়ে তাঁর সেই ঘরটার ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল।

ক্ষেত্রবাবুর হাতে সোহমের পরীক্ষার মার্কশীটখানা ধরা। বললেন—এসো, কাছে এসো—

সোহম্ আরো কাছে এগিয়ে গেল। তখন তার বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে।

ক্ষেত্রবাবু ধমক দিলেন—আরো কাছে সরে এস—

ক্ষেত্রবাবু বললেন—এই দেখ তোমার মার্কশীট! কোন্ সাবজেক্টে কত নম্বর পেয়েছ তুমি নিজের চোখেই চেয়ে দেখ। তোমার বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই বলে তোমাকে আমি ফ্রি-স্টুডেণ্ট করে দিয়েছিলাম, তুমি গরীব বলে এই সুবিধেটা করে দিয়েছিলুম, তা তার রেজাল্ট কি এই? অংকতে তুমি আটাশ পেয়েছ। তার মানে ফেল। তোমাকে আমি প্রমোশন দিই কী করে? তোমাকে ক্লাস-প্রমোশন দিলে আমার মুখরক্ষে হয় কী করে? কে তোমার নাম রেখেছিল সোহম্?

সোহমের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ক্ষেত্রবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন—আবার কাঁদছ? লজ্জা করে না তোমার কাঁদতে?

সোহম্ আর থাকতে পারলে না। কোনও রকমে বললে—স্যার, পরীক্ষার আগের দিন আমার পিসেমশাই মারা গিয়েছিলেন—

কথাটা মনে ছিল না ক্ষেত্রবাবুর। তা বটে! টাউন স্কুলের জাঁদরেল হেড-মাস্টার ক্ষেত্রবাবু। তখনকার দিনে হেড-মাস্টার মশাইকে দেখলে সবাই যেমন ভয় পেত তেমনি ভক্তিও করত। পিসেমশাই মারা যাবার দিন স্কুলে আসতে পারেনি সোহম্। দু'দিন পরে একটা দরখাস্ত নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল হেড-মাস্টার মশাইএর কাছে।

—কী হয়েছে? এ-রকম চেহারা হয়েছে কেন তোমার?

সোহম্ বলেছিল—আমার পিসেমশাই মারা গেছেন স্যার, তাই ইস্কুলে আসতে পারিনি—

কথাটা শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তার পরে একটু ভেবে বলেছিলেন—তাহলে তোমাদের চলবে কি করে? মাথার ওপর তাহলে আর কে রইল?

সোহম্ বলেছিল—আমার পিসতুতো দাদা—

—কী করেন তিনি?

—চাকরি করেন।

—কত মাইনে পান ?

—তিনশো টাকা, সবে অফিসে ঢুকেছে—

ক্ষেত্রবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। বললেন—আচ্ছা, তুমি আজকে ছুটির পর আর একবার আমার সঙ্গে দেখা কোর, ভেবে দেখি আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি—

এর পর সে হেড-মাস্টার মশাইএর ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল।

বহুদিন পরে যখন একদিন এই 'টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাকসন ইন্ডিয়া লিমিটেডে'র অফিসে তার প্রথম চাকরি হয়েছিল সেখানেও এই রকম একজন ক্ষেত্রবাবু জুটে গিয়েছিল। তাঁর নাম পি-বি-দাশবাবু। পি-বি-দাশবাবুর পাশেই বসতো সে প্রথম প্রথম। একটা ঘরের মধ্যে অনেক লোক কাজ করতো। সোহম তখন জানতো না কী তার কাজ, জানতো না কী কাজ করতে হবে। শুধু জানতো যে তার মাইনে সব মিলিয়ে দু'শো পঁচাত্তর টাকা। অঙ্কটা তার কাছে তখন অনেক। টিফিনের সময় সবাই ঘর থেকে কোথায় বেরিয়ে গেল। পি-বি-দাশবাবু বাড়ি থেকে আনা টিফিন কৌটোটা বার করলেন। ভেতরে খাবার ছিল। সামনে একজন বসে আছে আর তার সামনে বোধ হয় খেতে একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করলেন—আপনি টিফিন খাবেন না? সবাই তো টিফিন করতে গেল—

সোহম বললে—আমার ক্ষিধে পায়নি—

পি-বি দাশবাবু বিশ্বাস করলেন না কথাটা। বললেন—ক্ষিদে পায়নি, না পকেটে পয়সা নেই ?

সোহমের কেমন লজ্জা হলো। বললে—না, আমার কাছে পয়সা আছে, কিন্তু ক্ষিধে পায়নি, আমি সকালবেলা পেট ভরে ভাত খেয়ে এসেছি—

পি-বি-দাশবাবু বললেন—আপনার লজ্জা করবার দরকার নেই, ক্ষিদে পেয়ে থাকে তো বলুন, আমার বাক্সতে তিনটে পরোটা আছে, আপনাকে একখানা দিতে পারি, আর খানিকটা আলুচচ্চড়ি, খান না, লজ্জা করবেন না—

সোহমের তখন সত্যিই ক্ষিদে পেয়েছিল। কিন্তু পাছে পি-বি-দাশবাবু জোর করে তাকে খাইয়ে দেন তাই চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর বললে—আমি একটু ঘুরে আসি—

পরে যেমন দু'হাতে টাকা উপায় করেছে সে, তেমনি আবার একদিন টাকার অভাবও মর্মে মর্মে বুঝেছে। জুতো সারাবার জন্যে মুচির কাছেও চার আনা পয়সা বাকি রাখতে হয়েছে। পাছে মুচি এসে চার আনা পয়সার জন্যে তাগাদা দেয় তার ভয়ে মেস থেকে সারাদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে। সে-সব দিনের অভিজ্ঞতা বড় ভয়াবহ। অনেক দিন মেসে খায়ই নি সে। মনে আছে একদিন একটা বিরাট মিছিল চলছিল রাস্তা দিয়ে। তাদের সঙ্গেই ভিড়ে পড়েছিল সে। সবাই বলছিল 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'। সেও সকলের সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে হাতে ঘুঁষি পাকিয়ে বলেছিল—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'।

তারপর যখন সবাইকে কোয়ার্টার পাউন্ড পাঁউরুটি একটা আর আলুর দম খেতে দিয়েছিল, সেও তাই খেয়েছিল। তারপর আর সকলের মত রাস্তার টিউব-ওয়েল থেকে জল খেয়ে পেট ভরিয়েছিল।

রাস্তায় বেরিয়ে সোহম্ দেখলে দু'পাশের গলির মধ্যে ছোট-ছোট খাবারের দোকান। টার্নবুলের সব স্টাফ সেখানে গপ্ গপ্ করে নানা-রকম জিনিস খাচ্ছে। তেলেভাজার দিকেই বেশি ভিড়। তার সঙ্গে চা। কোনও দোকানটাই খালি নেই। দুপুরবেলা সমস্ত রাস্তাটা জুড়ে কেবল খাওয়ার দৃশ্য। কেউ খাচ্ছে দোকানের ভেতরে বসে, কেউ শালপাতার ঠোঙা হাতে করে। দোকানীরা সাপ্লাই করে উঠতে পারছে না এত খদ্দের। একটা সুবিধে কারো সঙ্গে তার মুখ-চেনা নেই। একটা জায়গায় কোনও দোকান-টোকান কিছু নেই। সেখানে একটা ছায়ামতন জায়গা দেখে একটা রোয়াকের ওপর সোহম্ বসে পড়লো।

হঠাৎ সেখানেই পি-বি-দাশবাবুর আবির্ভাব!

—আরে, আপনি এখানে বসে আছেন?

সোহম্ খুব লজ্জায় পড়ে গেল। বুঝতে পারলে পি-বি-দাশবাবু তাকে খুঁজতেই বেরিয়েছেন। পি-বি দাশবাবু তার হাত ধরে টানলেন। বললেন—আসুন মশাই, এদিকে আসুন, আমাকে বলবেন তো যে আপনার ক্ষিদে পেয়েছে—

বলে টানতে টানতে একটা চায়ের দোকানের ভেতরে ঢুকলেন। তারপরে দোকানীর লোককে বললেন—দাও তো ভাই দু'টো টোস্ট, আর একটা ডবল ডিমের মামলেট আর এক কাপ চা—

সোহম্ বললে—আপনি কি আমার জন্যে কিনছেন? আমি খাবো না, আমার ক্ষিদে পায়নি—

কিন্তু পি-বি দাশবাবু না-ছোড়-বান্দা। বললেন—তুমি বললেই হলো তোমার ক্ষিধে পায়নি? আমি তোমার পেছন পেছন ফলো করে আসছি। সব খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়া দেখছিলে আমি লক্ষ্য করছিলুম। নিশ্চয়ই তোমার পকেটে পয়সা নেই। তুমি পকেট দেখাও আমাকে, দেখি কত পয়সা আছে তোমার পকেটে—দেখাও, পকেট দেখাও—

সোহমের লজ্জা করতে লাগলো।

কিন্তু পি-বি দাশবাবু কিছুতেই ছাড়বেন না। বললেন—দেখাও পকেট—দেখাও—

শেষকালে পি-বি-দাশবাবু নিজেই সোহমের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। পাশের দু'টো পকেট, বুকপকেট, প্যান্টের পকেট, কোনও পকেটেই একটা পাই-পয়সা পর্যন্ত নেই।

ততক্ষণে টোস্ট অমলেট চা সব এসে গিয়েছে। সোহমের খেতে লজ্জা করতে লাগলো। কিন্তু পি বি-দাশবাবু ছাড়লেন না। বললেন—খাও খাও, খেতে আরম্ভ করো—তোমার কাছে টাকা নেই, এটা বলবে তো আমাকে—

অগত্যা সবই গিলতে হলো। সোহমের ক্ষিদে পেয়েছিল খুব। খেতেও

লাগলো। কিন্তু তার লজ্জা ধরা পড়ে যাওয়ায় তার মনে হলো সে যেন বিষ খাচ্ছে।

সোহম্ খেতে লাগলো আর পি-বি-দাশবাবু সামনে বসে তাকে খাওয়াতে লাগলেন। তার খাওয়া দেখতে লাগলেন। বললেন—টোস্ট্ আর দুটো নেবে?

সোহম্ বললে—না—

—মামলেট আর একটা?

সোহম্ বললে—আপনি আর আমায় লজ্জা দেবেন না পি-বি-দাশবাবু। এ আমি যেন ডিম খাচ্ছি না, টোস্ট্ও খাচ্ছি না, আমি বিষ গিলছি, কেন আপনি আমার জন্যে এত খরচা করতে গেলেন? আমি আপনার কে? আপনি তো আমাকে ভালো করে চেনেনও না. আজকেই তো সবে আমি আপনাদের অফিসে জয়েন করেছি, আর আপনিই বা কত মাইনে পান, আপনার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করা টাকায় আমি খাচ্ছি, এ খেতে আমার খুব খারাপ লাগছে। আপনি বিশ্বাস করুন—

পি-বি-দাশবাবু বললেন—তবে তুমি আমার মেয়ের হাতে তৈরি করা পরোটা খেলে না কেন? যদি তুমি পরোটা খেতে তাহলে আর তোমার জন্যে আমার এই গুণোগার দিতে হতো না। এ তো তোমারই দোষ। আমি তোমার মুখ দেখেই বুঝেছিলুম তোমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে, তাই তুমি অফিস থেকে বেরোবার পরই তোমার পেছন-পেছন বেরোলুম। ভাবলুম দেখি ছেলেটা কী করে, কোথায় যায়। তারপর যা ভেবেছি তাই। তুমি খাবারগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ঘোরা-ঘুরি করছো। শেষকালে দেখলুম তুমি কিচ্ছু না খেয়ে একটা বাড়ির রোয়াকের সামনে গিয়ে বসে পড়লে—

তারপর দোকানের দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললেন—চলো, চলো উঠি—টাইম হয়ে গেছে—

বলে নিজেই উঠে খাবারের দাম মিটিয়ে দিলেন। মোট খরচ পড়লো এক টাকা বারো আনা।

তারপরে সোহমের দিকে একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এইটে রাখো, এইটে রাখো তুমি। আমি তোমাকে রোজ-রোজ খাওয়াবো তা ভেবো না। এখন এই নিয়ে দু'টো দিন চালাও, তারপরে ও-মাসে মাইনে পেয়ে আমার দেনা শোধ করে দিও—ঠিক শোধ দিও কিন্তু—

সোহম্ এবার পি-বি-দাশবাবুর মুখের দিকে সোজাসুজি চাইলে। ঠিক এমনি করেই একদিন সে ক্ষেত্রবাবুর মুখের দিকেও চেয়েছিল। ঠিক এমনি কৃতজ্ঞতায় লজ্জায় দারিদ্র্যের অপমানে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। পিসেমশাইএর মৃত্যুর পর যেদিন একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিলো সে, তখন ওই ক্ষেত্রবাবু না থাকলে তো একেবারে রাস্তায় দাঁড়াতে হতো তাকে। একটা আশ্রয় নেই, পকেটে একটা পয়সা নেই যে লেখা-পড়া চালাতে পারে, পেট-এ দু'বেলা ভাত দিতে পারে। তখন ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল তার।

সোহম্ কী পড়ছে. কী করছে. কোথায় আছে সব তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

তারপর বললেন—তুমি একবার আমার বাড়িতে এসো, সকালবেলার দিকে, দেখি আমি কী করতে পারি—

সোহমের প্রথম জীবনটা এমনিই। সেই ক্ষেত্রবাবুই একটা ছাত্র পড়ানোর কাজ দিলেন, আবার সেই ক্ষেত্রবাবুই যে আবার একটা চাকরি যোগাড় করে দেবেন সে-কথা কে ভেবেছিল? তখন সকলের কাছ থেকে সাহায্য সকলের কাছ থেকে ভালবাসা পেয়ে পেয়েই সোহমের ধারণা হয়েছিল যে সে সত্যিই বোধ হয় ভাগ্যবান! কিন্তু এতদিন পরে এ তার কী হলো। এতদিন পরে সেই মেহের আলি সাহেবই বা আবার এই রাত বারোটার সময় কেন তার গাড়ির সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো? কেন সে এতদিন পরে আবার এসে উদয় হলো? কেন সে বলে উঠলো—সব ঝুট্ হ্যায়—

অথচ ক্ষেত্রবাবু তো সেদিন তা বলেননি।

বললেন—বোস, আমি তোমাকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি আমার ছাত্রের নামে, এটা নিয়ে তুমি তার সঙ্গে দেখা কোর, এই হচ্ছে তার ঠিকানা—

বলে যে-নাম আর ঠিকানাটা দিলেন সেটা এই অফিসের একজন মেজো-সাহেবের নাম। এই 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাকসন্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে'র মেজ-সাহেব।

ক্ষেত্রবাবু চিঠিখানা দিয়ে বলেছিলেন—এই চিঠিখানা এঁর হাতে দিলে তিনি তোমায় একটা চাকরি করে দিতে চেষ্টা করবেন—

কথাটা শুনে ক্ষেত্রবাবুর দিকে যেমন করে অভিভূত দৃষ্টি দিয়ে সোহম্ চেয়েছিল, পি-বি-দাশবাবুর কাছ থেকে এই চা-টোস্ট্-অমলেট খেয়ে পাঁচটা টাকা পেয়েও সে ঠিক তেমনি করে চাইলে তাঁর দিকে।

ক্ষেত্রবাবু সেদিন বলেছিলেন—আমার মুখের দিকে চেয়ে কী দেখছ? তোমার তো টাকার দরকার? নাকি দরকার নেই? ছাত্র পড়ালে তো চিরকাল এই টাকায় তোমার চলবে না! তোমাকে তো একদিন সংসার প্রতিপালন করতে হবে, তখন? তোমাকেও তো একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, তখন?

সোহমের মুখ দিয়ে এর জবাবে কোনও কথাই বেরোয়নি।

ক্ষেত্রবাবু আরো বলতে লাগলেন—টাকা তুচ্ছ জিনিস নয়, তেঁতুলগাছে তেঁতুলই ফলে, আম ফলে না, সেই রকম টাকাতেই টাকা আসে, শান্তি আসে না। তা সে যখন মানুষের অনেক টাকা হয় তখন অশান্তি আসে, তার আগে, তো নয়। তোমার তো অনেক টাকা হচ্ছেও না, তুমি এখন সামান্য মাইনের চাকরি করবে যাতে তোমার খরচ-পত্তোর নির্বিঘ্নে চলে যায়—

ক্ষেত্রবাবুর সেদিনকার সব কথা শুনে পি-বি-দাশবাবু বললেন—সংসারে ভালো লোকও আছে ভাই, সবাই এখনও চোর ডাকাত বদ্‌মাইশ হয়ে যায়নি। তাই আমি ভাবছিলুম কে তোমায় এই চাকরিটা করে দিলে। হাজার হাজার লোক চাকরির জন্যে হা-পিত্যেশ করছে আর তোমার হেডমাস্টার মশাইএর একটা চিঠিতেই কি না কাজ হয়ে গেল! তাই বলো, আমি তো তাই ভাবছিলুম জিজ্ঞেস করবো কেমন করে এ-চাকরিটা যোগাড় করলে তুমি—

কিন্তু কথাটা এখনো মনে আছে। বিশেষ করে এখন যেন আরো বেশি করে

মনে পড়তে লাগলো, এই রাত বারোটার সময়। আশী মাইল স্পীডে গাড়ি চালাতে চালাতে জীবনের চল্লিশটা বছরও যেন ঝড়ের বেগে চলে গেল। সত্যিই তো, তেঁতুলগাছে তেঁতুলই ফলে, আম তো ফলে না। টাকাতে টাকাই আসে. শান্তি তো আসে না। কিন্তু তাহলে কেন এত টাকা আসতে গেল তার হাতে? কেন এই চাকরিতে উন্নতি হলো তার? কেন মাসে দশ হাজার টাকা উপার্জনের দুর্ভাগ্য হলো তার? কেন এই এয়ার-কন্ডিশন্ড-ফ্ল্যাট, এই ইম্পোর্টেড্ কার? কেন এই সম্মান, এই চাকরি, এই ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, কেন এই সুমিত্রা? কেন সুমিত্রা তার জীবনে এল?

মেহের আলি তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিল। সে তো বলেই দিয়েছিল —'সব ঝুট্ হ্যায়'। তাহলে কেন সে তাকে অফিসে ঢুকতে দিত না? কেন তাকে অফিসে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছিল সে দরোয়ানকে?

গাড়ি চালাতে চালাতে সোহমের মনে হলো এবার মেহের আলি যেন পেছন থেকে তাকে তাড়া করেছে। আগে ছিল সামনে। সামনে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে তার পথ আটকে দিয়েছিল। তা থেকেও যখন তাকে পাশ কাটিয়ে সে এগিয়ে যেতে সুরু করেছে তখন সে পেছু নিয়েছে। পেছন থেকে তাড়া করেছে! পেছন থেকে তাড়া করছে আর চেঁচাচ্ছে—সব ঝুট্ হ্যায়—সব ঝুট্ হ্যায়—সব ঝুট্ হ্যায়—

পরের মাসের পয়লা তারিখে মাইনে হাতে পেতেই সোহম্ পি-বি-দাশবাবুর হাতে এসে কয়েকটা নোট দিলে।

পি-বি-দাশবাবু প্রথমে খানিকটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে নিজেই বুঝতে পারলেন।

সোহম্ বললে—আপনি আমার যে-উপকার করেছেন তার ঋণ শোধ করা যায় না, যখন আপনি টাকাগুলো দিয়েছিলেন তখন সত্যিই আমার হাত একেবারে খালি ছিল পি বি-দাশবাবু—

পি-বি-দাশবাবু বললেন—ঠিক আছে, তুমি টাকা দিচ্ছ, নিচ্ছি, কিন্তু সুদ? টাকার সুদ দেবে না?

সোহম্ বললে—সুদ কত দিতে হবে বলুন—

পি-বি-দাশবাবু বললেন—ফাইভ পার্সেণ্ট হিসেবে সুদ দিতে হবে, তা আমি তোমাকে আগেই বলে রাখছি—

সোহম্ বললে—আপনি হিসেব করে বলুন, ফাইভ পার্সেণ্ট হিসেবে কত দাঁড়ায়? আমি এখুনি দিয়ে দিচ্ছি—

—তাহলে তোমার মেসের দেনা কী করে শোধ করবে? সেও তো অনেকগুলো টাকা হে! হাতে পেয়েছ তো মাত্তোর দুশো পঁচাত্তর টাকা, তার মধ্যে সুদসমেত আমার দেনা শোধ করে তোমার হাতে থাকবেটা কী? তার ওপর আছে তোমার ক্ষেত্রবাবুর দেনা—

সোহম্ বললে—সুদের টাকাটা যদি আপনাকে পরের মাসে দিই তাহলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে?

—নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে। পরশুর মধ্যে শোধ করে দিলে ভালো হয়! পারবে?

সোহম্ বললে—পরশু তো রবিবার, পরশুদিন আমি কী করে আপনার দেখা পাবো? আপনি কি পরশু অফিসে আসবেন?

পি-বি-দাশবাবু বললেন—অফিসে না-ই বা এলুম, বাড়িতে তো থাকবোই, পরশুদিন তুমি আমার বাড়িতে গিয়েও তো টাকাটা দিতে পারো. আমি তোমার জন্যে বাড়িতেই না-হয় থাকবো—ইচ্ছে থাকলে সবই হয়!

—রবিবার কখন যাবো বলুন?

—সন্ধ্যেবেলা! এই ধরো সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে!

তা সেই কথাই রইল। কিন্তু বাড়ি আসার পথে মনের ভেতরটা খচ্ খচ্ করতে লাগলো। বাইরে থেকে মানুষকে দেখে যা মনে হয় ভেতরে কেউ-ই তা নয়! নিজে থেকেই পি বি দাশবাবু টাকাগুলো যখন দিতেন তখন মনে হয়েছিল কত ভালো মানুষ। অথচ ভেতরে ভেতরে টাকা সুদে খাটাবার মতলব। ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট! মাসে শতকরা পাঁচ টাকা সুদ। কাবলিওলারও অধম যে!

আজ কেন যে এইসব কথাগুলো মনে পড়ছে কে জানে! ক্ষেত্রবাবুর চিঠি নিয়ে যখন এই 'টার্নবুল' কোম্পানির মেজ সাহেবের সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিল সে, তখনও মনে হয়েছিল এত লোক থাকতে, এত অভাবী ছাত্র থাকতে তার চাকরির জন্যেই বা কেন ক্ষেত্রবাবু এই চিঠি দিতে গেলেন?

অনেকক্ষণ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার পর ভেতরে যাবার ডাক এল। বড় ভয়-ভয় করছিল সেদিন সোহমের। বোম্বাই অফিসের ভার নেবার সময়ও খুব ভয় করেছিল। অফিসে এত অফিসার থাকতে তাকেই বা কেন এত গুরুভার দেওয়া হলো! তবে কি সে সত্যিই সোহম্! তার নাম যিনিই রাখুন তিনি কি সত্যিই ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন!

মেজ-সাহেব এন-বি-সেন। পুরো নাম নীহারবিন্দু সেন। ক্ষেত্রবাবুর পুরোনো ছাত্র। এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার। সামনে যেতেই চেয়ারে বসতে বললেন। বলে ক্ষেত্রবাবুর চিঠিটা পড়তে লাগলেন আর কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন—মাস্টার-মশাই নিজে যখন আপনাকে চিঠি দিয়েছেন, এর পর আমার আর কিছু বলা চলে না। কিন্তু ভাবছি আপনার জন্যে আমি কী-ই বা করতে পারি। এমনিতে এখন কোনও ভেকেন্সি নেই। দিনকাল খুব খারাপ। তার ওপর আবার আমাদের প্রাইভেট সেক্টার। ইউনিয়নের গোলমাল আছে। যদি নিতে হয় তাহলে ভাউচার সিস্টেমে নিতে হবে—

—ভাউচার সিস্‌টেম ?

—হ্যাঁ, তার মানে রেগুলার স্টাফের খাতায় আপনার নাম থাকবে না। প্রত্যেক মাসে ভাউচারে সই করে মাইনে পাবেন। একেবারে টেম্‌পোরারি। একজন ছুটি নিচ্ছে, তার তিন মাসের লিভ্‌-ভেকেন্সিতে আপনাকে নেওয়া যায়। কিন্তু তারপরে আপনার চাকরি চলে যেতে পারে—তাতে আপনি রাজি ? মানে ন'টাকা রোজের চাকরি আপনার—

সোহম্‌ সবিনয়ে বললে—আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই-ই করবেন, আমি সবতাতেই রাজি—

মিস্টার সেন বললেন—তাহলে ঠিক আছে, আপনি আমাকে একটা দরখাস্ত দিয়ে যান, দেখি কী করতে পারি—এখানে বসেই একটা দরখাস্ত লিখে দিন—

বলে একটা সাদা কাগজ সোহমের সামনে এগিয়ে দিলেন।

সোহম্‌ বললে—একটা কলম দিতে পারেন—আমার কলম নেই—

মিস্টার সেন ড্রয়ার থেকে একটা বাড়তি কলম বার করে এগিয়ে দিলেন। তিন মাসের লিভ্‌ ভেকেন্সি। টেম্‌পোরারি চাকরি। টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাক্‌সন্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজারের নামে দরখাস্ত। বেশ সবিনয়ে নিজের যোগ্যতা আর প্রয়োজনের কথা গুছিয়ে লিখতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠলো। মিস্টার এন·বি সেন দরখাস্তখানা নিয়ে পুরোটা পড়ে দেখলেন। দু'একটা জায়গায় কলম চালালেন। তারপর বললেন—এটা এই সামনের রাস্তার ধারে টাইপিস্টরা বসে আছে, তাদের দিয়ে টাইপ করিয়ে নিয়ে নিজের নাম সই করে আমাকে দিয়ে যাবেন, যত তাড়াতাড়ি পারেন—বোধ হয় একটা কপি করতে চার আনা নেবে, যান—

সোহম্‌ বাইরে গিয়ে টাইপ করে আনতে আনতে ঘণ্টাখানেক দেরি হয়ে গেল। এক ঘণ্টা পরে যখন আবার সে সাহেবের ঘরে ঢুকতে যাবে তখন দরোয়ান রাস্তা আটকে দিলে।

—নেহি, আভি সাহেব লাঞ্চ কর রহা হ্যায়—

বলতে-না-বলতে সোহম্‌ দেখলে একটা উর্দি-পরা খানসামা তোয়ালে ঢাকা ট্রে নিয়ে সাহেবের ঘরের ভেতরে ঢুকলো। তোয়ালের তলায় কী আছে দেখা গেল না। কিন্তু মাংস, চপ, কাটলেটের সমস্ত গন্ধের সংমিশ্রণের ফলে যে-ধরনের গন্ধ হয়, সেই রকমের গন্ধটা নাকে এসে লাগলো। কলকাতার হোটেলগুলোর পেছনের রাস্তা দিয়ে হাঁটলেও ঠিক এই রকম গন্ধ পাওয়া যায়।

দরোয়ানটাকে জিজ্ঞেস করলে—সাহেবের লাঞ্চ খাওয়া কখন শেষ হবে ?

দরোয়ান বললে—আড়াই বাজে—

টাইপওয়ালাই আসলে দরখাস্তটা টাইপ করতে দেরি করিয়ে দিয়েছিল। আসলে মিস্টার সেনের দোষ নেই। তাঁর খাবার টাইমের আগে আসতে পারলে আর এমন হতো না। সোহম্‌ দেয়াল-ঘড়িটার সামনে চেয়ে বুঝতে পারলে—আড়াইটে বাজতে তখনও দেড়-ঘণ্টা বাকি। মিছিমিছি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। অফিসের বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। সেখানেও সবাই লাঞ্চ করছে। কারোর লাঞ্চ মুড়ি আর ভিজে ছোলা, কারো আলুর চপ বেগুনি,

কারো মাদ্রাজি দোসা আর সম্বরম্‌। কেউ কেউ আবার মাটির ভাঁড়ে শুধু চা আর সিগারেট। সমস্ত রাস্তাটা খাদ্যে আর খাদকে ভর্তি। আশেপাশের সমস্ত অফিস থেকে পিল্‌-পিল্‌ করে সব লোক রাস্তায় বেরিয়ে লাঞ্চ করছে। তারও বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল। কিন্তু পকেটে যে কয়েক আনা পয়সা ছিল সমস্তই টাইপ-রয়ালাকে দিতে হলো। এমন কি মেসে ফেরবার বাস-ভাড়াটাও তার কাছে নেই। পুরো রাস্তাটা তাকে পায়ে হেঁটে ফিরতে হবে।

তা সময় এমনই জিনিস যা একসময়-না-একসময় কেটে যাবেই। সমস্ত মানুষের মৃত্যুর সঠিক সময়ের বাঁধাধরা কোনও নিয়ম নেই। কিন্তু ঘড়ির কাঁটার সে-নিয়ম নেই। সে একটার সময় একটা বাজবেই, আড়াইটের সময় আড়াইটেই বাজবে। তাই যত দেরিই হোক, একটা সময়ে ঘড়িতে আড়াইটে বাজলো। সোহম্‌ তাড়াতাড়ি আবার এসে দাঁড়ালো মিস্টার সেনের চেম্বারের সামনে।

এবার আর কোনও বাধা এলো না। দরোয়ানের কাছে স্লিপ্‌ দিতেই ভেতর থেকে সাহেবের ডাক এল। সাহেব তখন লাঞ্চ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। দরখাস্তটা নিয়ে পড়ে দেখলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে, তোমার নামে ইণ্টারভিউএর চিঠি যাবে—কিন্তু চাকরিটা লিভ্‌-ভেকেন্সির, মাত্র তিন মাসের জন্যে—

সোহম্‌ বললে—তা হোক,এক দিনের জন্যে হলেও আমি নিতে রাজি স্যার—

মিস্টার সেন বললেন—আচ্ছা, আপনি যান—

সোহম্‌ নমস্কার করে চলে আসছিল। কিন্তু মিস্টার সেন বললেন—আর একটা কথা—

সে ফিরে দাঁড়ালো। মিস্টার সেন বললেন—একটা কথা আপনাকে জানানো ভালো। ইণ্টারভিউ যেদিন হবে সেদিন যেন এই ড্রেস পরে আসবেন না। এটা একটা ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ফার্ম, এখানে ধুতি শার্ট পাঞ্জাবি এ-সব চলবে না। আমাদের অফিসে অনেকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসে বটে, কিন্তু তাদের এত ছোট পোস্ট যে তাতে অফিসের কিছু আসে যায় না। তারা যে পোস্টে আছে তাতেই তারা চিরকাল পড়ে থাকবে। কিন্তু আপনি যদি এই অফিসে উন্নতি করতে চান তো আপনাকে এই ড্রেস বদলাতে হবে। প্যাণ্ট পরতে হবে, কোট, টাই সব পরতে হবে। বিশেষ করে ইণ্টারভিউএর দিন। বুঝতে পারলেন ? প্যাণ্টের পায়ের দিকে যেন ঘের হয় পনেরো ইঞ্চি, কিংবা বেল-বটস্‌। আর হেয়ার-স্টাইল বদলাতে হবে, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি রাখতে পারেন কিম্বা না-পারেন, দু'গালের ওপর লম্বা জুলফি রাখা চাই। তাতে ইণ্টারভিউএর সময় আমাদের ইম্‌প্রেশন ভালো হবে, বুঝলেন ? যে-যুগে যা স্টাইল তা তো মানতে হবে—

তারপর হঠাৎ টেবিলের ওপর টেলিফোনের রিসিভারটা বেজে উঠলো। মিস্টার সেন সেটা তুলে নিয়ে বললেন—হ্যালো—

আর ডান হাতটা দিয়ে সোহম্‌কে চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। সে-ও কৃতার্থ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

চল্লিশ বছরের জীবনের মধ্যে কুড়িটা বছর তার এই চাকরির পেছনেই ফতুর হয়ে গেল। কুড়িটা বছরই শুধু নয়, যেন কুড়িটা জন্ম তার নিঃশেষ হয়ে গেল

আজ। সেই যে মিস্টার সেন শিখিয়ে দিয়েছিলেন—ইণ্টারন্যাশন্যাল ফার্ম, যদি উন্নতি করতে চাও তো এই ধুতি-শার্ট-পাঞ্জাবি চলবে না, এই হেয়ার-স্টাইলও চলবে না। প্যাণ্ট পরতে হবে, শার্ট পরতে হবে, টাই পরতে হবে, নইলে যে-পোস্টে আছো সেই পোস্টেই চিরকাল পড়ে থাকতে হবে। কুড়ি বছর আগে মিস্টার সেন সেই যে শিখিয়ে দিয়েছিলেন সেই শেখাই এখনও চলছে। এখন সোহম্ বেল-বটস্ প্যাণ্ট পরছে, হেয়ার-স্টাইল বদলেছে, দু'পাশের গালে জুলফি রেখেছে, মিস্টার সেনের সব কথাই বর্ণে বর্ণে মেনে এসেছে সোহম্। মেনে এসেছিল বলেই তার এত উন্নতি হয়েছে জীবনে। এই থাউজাণ্ড সেভেনটি স্কোয়ার ফিট ফ্ল্যাট পেয়েছে, এই ইমপোর্টেড্ গাড়ি পেয়েছে। কিন্তু আজকে এই রাত বারোটার সময় তার মনে হচ্ছে সব কিছু পাওয়া তার কাছে এক মুহূর্তে কিছুই না-পাওয়া হয়ে গেল! তাহলে সব কিছুই যদি মিথ্যে হয় সত্যি কোনটা? যা পাওয়ার জন্যে তার এত সব সাধনা, সেই পাওয়াটাই আজ তার কাছে এমন বিড়ম্বনায় রূপান্তরিত হয়ে গেল কেন? তার এই এত সাধের গাড়ি, এত সাধের ফ্ল্যাট, এত সাধের ফার্নিচার, এত সাধের সংসার সব কিছু ধূলিসাৎ হয়ে গেল কেন? কেন বেঁচে থাকাটাই তার কাছে এখন মিথ্যে হয়ে গেল? কেন মেহের আলির কথাটাই সত্যি হলো—সব ঝুট্ হ্যায়?

মনে আছে পরের রবিবার দিনই সন্ধ্যাবেলা সোহম্ পি-বি-দাশবাবুর বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিল। ভাড়াটে বাড়ি। বউবাজারের নন্দ সরকার লেনের ঠিক বাড়ির ঠিক নম্বরটা খুঁজে নিয়ে সদর দরজার কড়া নেড়েছিল। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর ভেতর থেকে কে একজন দরজা খুলে দিলে। দরজাটা খুলতেই সোহম্ দেখলে একজন মেয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—পি-বি-দাশবাবু বাড়িতে আছেন? আমি তাঁর অফিস থেকে এসেছি—

—বাবা একটু বাজারে গেছেন, আপনাকে বসতে বলে গেছেন, আপনি ভেতরে আসুন—

বলে মেয়েটি তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে বসিয়ে দিলে। বললে—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, তিনি এখুনি আসবেন—

হায় রে মানুষের আশা। এই চল্লিশ বছরের মধ্যেই সোহম্ বুঝে নিলে যে সব বীজে এক রকমের গাছ হয় না। শুধু তাই-ই নয়। সব মাটিতেও এক বীজে এক-রকমের ফলও ধরে না। মাটির গুণের তারতম্যের জন্যে ফলের গুণেরও হের-ফের হয়। আমেরিকায় যা সত্যি রাশিয়াতেও যে তাই-ই সত্যি হচ্ছে হবে

তা কি জোর করে বলা যায় ?

প্রথম দিন খুব লজ্জা-লজ্জা করেছিল। চাকরিতে ইণ্টারভিউএর দিন নতুন কোট-প্যাণ্ট-টাই আর বড় জুলফি নিয়ে রাস্তায় বেরোতেই বড় লজ্জা করেছিল। কিন্তু মিস্টার সেন যখন বলে দিয়েছেন তখন তাই-ই তাকে করতে হয়েছিল। ইণ্টারভিউএর চিঠি আসার আগেই চুলগুলো বড়-বড় হয়ে গিয়েছিল। বহুদিন চুল আর কাটেনি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে মিস্টার সেনের চুলের স্টাইলেই চুলটা আঁচড়ে নিয়েছিল। এমন ভাবে হেয়ার-স্টাইল করতে হবে যাতে মনে হয় চুল আঁচড়াতে যেন কোনও সময়ই পায়নি সে।

ইণ্টারভিউ বোর্ডে আরও অনেক ছেলেকে ডাকা হয়েছিল, কয়েকজন মেয়ে ক্যানডিডেটও ছিল। সকলেরই ভয়, সকলেরই আশা, সকলেরই অভাব। সকলেই স্মার্ট হয়ে সেজে-গুজে এসেছিল। মোট প্রায় তিনশো প্রার্থী। সমস্ত ঘরখানার আকাশে যেন পৃথিবীর সমস্ত ভয় সমস্ত আশা আর সমস্ত অভাব মেঘের মত জমাট বেঁধে উঠেছে। কখন বর্ষণ সুরু হয়ে কোথাকার কোন্ দেশে ফসল ফলাবে কেউ আগে থেকে তা কল্পনা করতে পারবে না।

একজনের পর আর একজনের পালা। পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় বড় জোর। মাত্র তিন মাসের লিভ্-ভেকেন্সির চাকরি, তাও আবার মাত্র ন'টাকা রোজ মজুরি। তারই জন্যে কত ঘটা, কত হেনস্থা, কত আদব-কায়দা। দরোয়ান এক-একজনের নাম ডাকে আর এক-একজন করে দুরু-দুরু বুকে ভেতরে ঢোকে।

—আচ্ছা, ক্যালকাটার টোট্যাল এরিয়া কত ? কত স্কোয়ার মাইল ?

এক-একজন বোবার মত চুপ করে থাকে। কেউ-কেউ আন্দাজে যা-তা একটা অঙ্ক বলে দেয়।

—ক্যালকাটার পপুলেশন কত ?

—ইণ্ডিয়ায় মানুষের এ্যানুয়েল বার্থ-রেট কত, আর ডেথ্-রেট ?

কী-সব শক্ত শক্ত প্রশ্ন আর তার কত বিচিত্র উত্তর।

—ই সি-এম বলতে কি বোঝায় ?

—ইণ্ডিয়ায় সব চেয়ে লম্বা প্লাটফরম কোন্ স্টেশন ?

—মাউণ্ট-এভারেস্টের হাইট্ কত ?

সামান্য একটা তিন মাসের টেমপোরারি ভাউচার স্লিপের চাকরি, ন'টাকা রোজ, তারই জন্যে কত কঠিন-কঠিন প্রশ্ন। সোহম্ কিন্তু প্রায় সব ক'টা প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেললে। কিন্তু মনের মধ্যে একটা কাঁটা যেন খচ্-খচ্ করে বিঁধতে লাগলো। সেখান থেকে সোজা বেরিয়ে তখনই একেবারে ক্ষেত্রবাবুর কাছে গিয়ে হাজির। ক্ষেত্রবাবু তখনও নিজের ঘরে বসেছিলেন। সোহম্ গিয়ে দাঁড়ালো তাঁর সামনে।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর ? হলো ইণ্টারভিউ ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার—আমি প্রায় সব কোশ্চেনেরই জবাব দিতে পেরেছি। কেবল দু'টো কোশ্চেনের জবাব দিতে পারিনি—মাউণ্ট এভারেস্টের হাইট কত। ওই একটা, আর ই-সি-এম্ মানে কী ?

ক্ষেত্রবাবু বললেন—সে কী ? তোমাকে তো বলেছিলুম ইয়ার-বুকটা মুখস্থ করে নিতে। তাহলে এতদিন কী করলে তুমি ?

সোহম্ বললে—মেসে থাকি তো, তাই রাত জেগে পড়তে পারিনি ভালো করে। একটা ঘরে চারজন থাকি আমরা···

ক্ষেত্রবাবু কিছুক্ষণ নিজের মনেই ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন—দেখি আমি কী করতে পারি, নীহারকে আমি একবার টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করবো—তুমি এখন যাও—

সোহম্ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

তারপরেই ক্ষেত্রবাবু টেলিফোন করেছিলেন নীহারকে। টার্নবুল কোম্পানীর মেজ-সাহেব মিস্টার এন-বি সেনকে। জিজ্ঞেস করেছিলেন—নীহার, আমি মাস্টার মশাই বলছি। সোহমের ইন্টারভিউ কেমন হলো গো ?

মিস্টার সেন বললেন—আপনি কিছু ভাববেন না স্যার. আমি নিজে যখন আছি তখন কিছু ভাববেন না আপনি—

কিন্তু ক্ষেত্রবাবুও জানলেন না, বোর্ডের অন্য মেম্বাররাও জানলো না কী কলকাঠি টিপলেন মিস্টার সেন। শুধু জানলো সোহম্ আর জানলেন মিস্টার সেন। পৃথিবীর অন্য সমস্ত মানুষের কাছ থেকে ভেতরের সমস্ত ষড়যন্ত্রটা গোপন থাকুক। মিস্টার সেনও সোহমকে আগের দিন ডেকে বলে দিয়েছিলেন—এ-কথা যেন কেউ না জানতে পারে, দেখো—

সুতরাং সোহমের সেই সেদিনকার চাকরি হওয়ার পেছনে কী গোপন রহস্য ছিল কোম্পানীর বোর্ডের মেম্বারদের কারও কানে গেল না। শুধু সোহমের চাকরির নতুন যে 'পার্সোন্যাল ফাইল' তৈরি হলো তাতে লেখা রইল—"মোস্ট এফিসিয়্যান্ট বয়, ব্রিলিয়ান্ট ক্যান্ডিডেট। তিনশো দরখাস্তকারীর মধ্যে সোহম্-সুন্দর রায়ের মত অমন ব্রাইট বয় কেউ নেই। প্রায় সমস্ত কোশ্চেনের জবাব সঠিক ভাবে দিতে পেরেছে। অফিস ওর ফিউচার কেরীয়ার সম্বন্ধে ওয়াচ্ করবে।"

চাকরির চিঠি পেয়ে সোহম্ সেদিন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু মনে মনে একটু পাপ-বোধও কাঁটার মত বিঁধেছিল তার। তারপরে অনেক ভেবে মনে হয়েছিল এতে ক্ষতিটাই বা কী ? এ তো আর তেমন কোনও খারাপ পাপ নয়, এ তো সব জায়গাতেই হয়ে থাকে। একটু ধরাধরি করবার লোক না থাকলে কি এ-যুগে কারও চাকরি হয় ? শুধু যোগ্যতা দিয়ে কি আজকের যুগে কিছু হয় কারও ? যার বাবা নেই, মামা নেই, কাকা নেই, তাদের কিছু হয় কী করে তাহলে ? মিস্টার সেন যে তাকে আগে থেকেই কোশ্চেনগুলো বলে দিয়েছিলেন সে-খবরটা পৃথিবীর কেউ না জানলেই তো হলো। সে যখন চাকরি করবে তখন তো সবাই-ই জানবে সে তিনশো ছেলে-মেয়েকে টপ্‌কে এই চাকরিটা পেয়েছে। মিস্টার সেনের এই সাহায্যটা তো তার গায়ে লেখা থাকবে না। তারপর যদি একদিন সে চাকরিতে পাকা হয়ে যায় তখন তো সব মুছে যাবে। আর তারপর যদি কখনও সে চাকরিতে প্রমোশন পায় তখন তো সবাই তার চেয়ারের জন্যেই তাকে খাতির করবে।

অফিসের চাকরির চিঠি যেদিন হাতে এল সেদিন তার খুব আনন্দ হয়েছিল অবশ্য। কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে খুবই অপরাধী মনে হয়েছিল নিজেকে। যে-জীবন প্রবঞ্চনা দিয়ে সুরু হলো তার পরিণতি কী হবে ভেবে একটু ভয় হয়েছিল তার। তারপরেই চারপাশের জগতের সকলের উদাহরণ দেখে মনটা শান্ত হয়েছিল। মেসের সবাই খবরটা জেনে গেল। সবাই-ই বললে—তাহলে আমাদের আজকে মাংস খাওয়াতে হবে রায়বাবু, এতবড় আনন্দের দিন কি রোজ-রোজ আসে?

শৈলেশবাবু বললেন—আপনি অত ডিফিকাল্ট কোশ্চেনের উত্তর দিলেন কী করে তাই-ই আমি ভেবে পাই না মশাই, কলকাতায় এতদিন আছি অথচ কলকাতার এরিয়া কত স্কোয়ার-মাইল তাই-ই জানি না—আপনি এ-সব জানলেন কি করে? কোন্ বই পড়ে জানতে পারলেন বলুন তো?

শুধু শৈলেশবাবু নয়, সত্যেন ভাদুড়ি ভদ্রলোক এতদিন সোহম্‌কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করে এসেছিল। ভদ্রলোক অফিসে চাকরি করতো, আর সব সময় হাতে মোটা মাপের ইংরিজী বই নিয়ে থাকতো। মেসের ভেতরে সবাই যখন তাস খেলায় মত্ত তখন ঘরের এক কোণে তক্তপোশের উপর শুয়ে শুয়ে সেই সব বইএর মধ্যে ডুবে থাকতো। একটু ছোট নজরে দেখতো সকলকে। ভাবটা এই রকম যেন কী সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে সবাই মেতে আছে অথচ পৃথিবীতে জানবার বোঝবার পড়বার কত জিনিস রয়েছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। তার মনে হতো মেসের লোকগুলো সিনেমা দেখে আনন্দ পায়, মেয়েমানুষের আকর্ষণে মজা পায়, অথচ মানুষ হয়ে জন্মে কিছু যদি না-ই জানলাম না-ই শিখলাম তাহলে মানুষ হয়ে জন্মালাম কেন, এ-কথাটা কেউই তো একবারও ভাবছে না।

কিন্তু সোহম্‌বাবুর চাকরি হওয়ার চিঠিটা দেখে সত্যিই সবাই অবাক হয়ে গেল। সত্যেন ভাদুড়ি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, সোহমের চাকরির চিঠিটার কথা শুনে তড়াক করে উঠে বসলো। বললে—দেখি হে, চিঠিটা আপনার দেখি একবার—

সোহম্ তাকেও চিঠিটা দেখালো। সত্যেন ভাদুড়ি চিঠিটা মন দিয়ে পড়লে।

জিজ্ঞেস করলে—কী করে এ-চাকরি হলো আপনার বলুন তো? এ-অফিসে কি আপনার জানা-শোনা কেউ ছিল নাকি?

সোহম্ এন-বি-সেনের কথাটা বেমালুম চেপে গেল। বললে—চেনা-শোনা আমার আবার কে থাকবে? একজনের মুখে শুনেছিলাম ওখানে একটা লোক নেবে তাই একটা এ্যাপ্লিকেশন করে দিয়েছিলুম কপাল ঠুকে—

সত্যেন ভাদুড়ির যেন কথাটা বিশ্বাস হলো না। কোথাও কেউ-না কেউ একজন না থাকলে এ-যুগে যে কারো চাকরি হয়, সে-কথা সত্যেন ভাদুড়ি বিশ্বাস করতো না।

তাই আবার জিজ্ঞেস করলে—কেউ ছিল না? সত্যি বলছেন?

সোহম্ তেমনিই জোর গলায় মিথ্যে কথাটা বললে। বললে—না, সত্যিই বলছি কেউ-ই ছিল না। শুধু কপাল ঠুকে একটি দরখাস্ত দিয়ে এসেছিলাম, আর

কিছু নয়। কখনও ভাবিও নি যে আমার এ চাকরি হবে—

—কিন্তু আপনার এই লম্বা চুল, দাড়ি, জুলফির জন্যে কেউ কিছু বলোন ?

—না, তা কেন বলবে ? লম্বা চুল আর জুলফি কি খারাপ ?

—না, খারাপ নয়, কিন্তু এটা তো দেখতে খারাপ। এ সব তো হিপিদের কপি করা।

সোহম্ বললে—কিন্তু আমি তো দেখলুম বোর্ডের সব মেম্বারদেরই এই রকম চুল, এই রকম জুলফি। এইটেই তো মডার্ণ-ইজমএর লক্ষণ।

কথাটা শুনে সত্যেন ভাদুড়ি কেমন যেন একটু মুষড়ে পড়লো। তার আদর্শের সঙ্গে এই আধুনিক বাস্তবতার, এই বাস্তব সাফল্যের যেন বিরোধ বাধলো।

—তা সব কোশ্চেনগুলোর উত্তর কী করে দিলেন আপনি ?

সোহম্ বললে—বারে, আমি তো সমস্ত বই থেকেই পেয়েছি। আমি তো রোজ ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে গিয়ে বই পড়ি—

—আপনি ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে যান নাকি রোজ ?

মিথ্যে কথা যে কত অকপট ভাবে বলা যায় তা তখন থেকেই সোহম্ রপ্ত করেছিল। মিথ্যে কথাই যে বাস্তব জীবনে উন্নতি করবার একমাত্র সিঁড়ি তা তখন থেকেই সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল। বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে বাইরে সত্যের ছদ্মবেশ পরে অকপট মিথ্যে কথা বলতে পারলে চারপাশের মানুষের কাছ থেকে সাহায্য সহানুভূতি সব কিছুই পাওয়া যায়। সেদিন মেসের সমস্ত লোক যেন সেই চিঠি পাওয়ার পর থেকেই তাকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো। অথচ দু'দিন আগেও তাদের ব্যবহারে কোথায় যেন একটা তাচ্ছিল্য মেশানো অনুকম্পা ছিল।

শৈলেশবাবু বললেন—দেখুন, যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন—

সত্যেন ভাদুড়ি তাকে থামিয়ে দিলে। বললে—আপনি থামুন মশাই, আসল হচ্ছে লেখাপড়া। সোহম্‌বাবু আপনাদের মত তাস খেলে আর বাজে আড্ডা না দিয়ে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে গিয়ে নিজের মনে পড়া শোনা করেছেন তাই এই রেজাল্ট, আর আপনারা মুখে ভগবান-ভগবান করবেন আর দিন-রাত তাস খেলে আর সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করবেন। সেই জন্যেই তো আপনাদের কিছু হয় না—

তা তাই-ই হলো। সেদিন মাংস খাওয়া হলো। মাংসর দামটা সবাই মিলে চাঁদা করে দিয়ে দিলে। সোহম্ মাইনে পেয়ে সকলের সব দেনা সব পাওনা মিটিয়ে দেবে, সেই কথাই রইলো।

মাইনে পাবার দিন বাড়ি ফিরে এসেই সোহম্ সকলের দেনা মিটিয়ে দিলে। শুধু বাকি রইলো দরজির দোকানের দেনাটা আর পি-বি-দাশবাবুর দেনার সুদটা। সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে এসেই মুখ-হাত-পা ধুয়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে একেবারে সোজা ক্ষেত্রবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে।

ক্ষেত্রবাবু সেই সময়ে বাড়ি থাকেন সোহম্ তা জানতো। সেই সময়ে আরো কয়েকজন লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতো।

সোহম্‌কে প্রণাম করতে দেখেই বললেন—থাক, থাক, বাবা—কেমন আছো ?

তারপরে একটা সন্দেশের বাক্স দেখে বললেন—এটা কী ? সন্দেশ ? এ-সব আনলে কেন ? সন্দেশ কী হবে ?

সোহম্‌ বললে—আজকেই আমি মাইনে পেল্‌ম হাতে তাই আপনাকে প্রণাম করতে এল্‌ম স্যার—

ক্ষেত্রবাব্‌ বললেন—মাইনে পেলে তুমি আর আমাকে প্রণাম করতে এলে কেন ? আমি তোমার কী করেছি ?

সোহম্‌ বললে—আপনার জন্যেই তো স্যার আমার এই চাকরিটা হলো, আপনি সেদিন সেন সাহেবকে চিঠি লিখে না দিলে কি চাকরি হতো আমার ?

ক্ষেত্রবাব্‌ গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—আমি ? আমি তোমার চাকরি করে দিয়েছি ? কী বলছো তুমি ? তিনশো ক্যান্ডিডেটের মধ্যে ইন্টারভিউ দিয়ে তুমি ফার্স্ট হয়েছ, তাতে আমার কৃতিত্ব কোথায় ? তোমার অনেস্টি, তোমার অধ্যবসায়, তোমার পরিশ্রমের ফলে তুমি চাকরি পেয়েছ, আমার তো এতে কোনও বাহাদ্‌রি নেই। ও সন্দেশ তুমি নিজে খেও, আমাকে দিতে হবে না—ও আমি নিতে পারবো না—

সোহম্‌ বললে—কিন্তু স্যার, আপনি না থাকলে কি আমি আজ যা হয়েছি তাই হতে পারতুম ? যেদিন আমার পিসেমশাই মারা গেলেন সেদিন আপনি তো কয়েকটা টিউশানি যোগাড় করে দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। নইলে তো আমার পিসতুতো দাদা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিয়েছিল—সে-সব কথা আমি স্যার যত দিন বেঁচে থাকবো ততদিন মনে রাখবো—

ক্ষেত্রবাব্‌ বললেন—ঠিক আছে, আশীর্বাদ করি তুমি বড় হও, আরো বড় হও। এখন তো সবে আরম্ভ, সামনে তোমার এখন মস্ত ভবিষ্যৎ পড়ে আছে, শ্‌ধ্‌ একটা কথা মনে রেখো জীবনে কখনও অসৎ আচরণ কোর না, ভগবানে বিশ্বাস রেখো, মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে বড় হতে চেষ্টা কোর না—

সোহম্‌ বললে—কিন্তু আমার আনা এই উপহার, এ আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না—

ক্ষেত্রবাব্‌ বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি রাখো, রেখে যাও। তুমি বলছো তাই নিচ্ছি। কিন্তু আর কখনও এ-রকম এনো না—

বলে তিনি সন্দেশের প্যাকেটটা নিয়ে টেবিলের পাশে রেখে দিলেন। তারপর বললেন - দেখো বাবা, এ সংসারের নিয়ম বড় অদ্ভুত। এই যে তুমি আমাকে সন্দেশ দিলে তো, এর ট্যাক্স কিন্তু আমায় দিতে হবে—

—তার মানে ? আমি আপনাকে সন্দেশ দিল্‌ম তাতে আপনি ট্যাক্স দেবেন কিসের ?

ক্ষেত্রবাব্‌ বললেন—হ্যাঁ, আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে। আমরা যা কিছ্‌ সংসারে পাই, তার ট্যাক্স না দিলে আমাদের রেহাই নেই। সংসারের সব মান্‌ষকে সেই ট্যাক্স কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে। এইটেই মান্‌ষের সংসারের নিয়ম—

কতদিন আগেকার বলা সেই ক্ষেত্রবাব্‌র কথাগ্‌লো। তখন বোঝেনি সে।

তখন কোনও মানে খুঁজে পায়নি সে-সব কথার। ক্ষেত্রবাবুকে তখন আধ-পাগল মনে করেছিল সে। আধ-পাগলই বৈকি! একটা এক্সপোর্ট পারমিট্ দিল্লী থেকে বার করতে গেলে যে-হয়রানি যে-খোসামোদ যে-ধরাধরি করতে হয়েছে সোহম্‌কে তার ফলে বরাবর তার মাইনে বেড়েছে, তার পদোন্নতি হয়েছে। মনে মনে সে ভেবেছে সেটাই তার ন্যায্য পাওনা। কিন্তু তার বদলে যে একদিন তার জন্যে তাকে সুপার-ট্যাক্স দিতে হবে, আর সেই সুপার-ট্যাক্স কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবে তা কি সে কল্পনা করতেই পেরেছিল? আজকে এখন এই মুহূর্তে সে যা দিলে, সে যা দিয়ে আজ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল এইটেই কি সেই তার সুপার ট্যাক্স?

হঠাৎ সামনের দিক থেকে বিরাট শব্দ করতে করতে যমদূতের মত একটা লরী আসছিল। গাড়ি চালাতে চালাতেই সোহম্ চিনতে পারলে ওটা তারই কোম্পানীর। সব লরীগুলোর আওয়াজ মুখস্থ হয়ে গেছে তার। রাত্রের সমস্ত অন্ধকার যেন কাঁপছে। সমস্ত কলকাতার মাঝরাত্রের অন্ধকারকে কাঁপিয়ে লরীটা চলেছে ফ্যাক্টরি থেকে। কাছে আসতেই হেড্-লাইটের আলোয় লরীর তলার দিকে লেখা নম্বর-প্লেটটার ওপর নজর পড়লো। হ্যাঁ, তার ফ্যাক্টরির লরীই বটে। যাবে লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে একেবারে স্ট্রাণ্ড্ রোড মাড়িয়ে হাওড়ায় জি. টি. রোডের দিকে। তারপর সেখান থেকে বরাবর যাবে তার চরম গন্তব্যের দিকে।

সোহমের মনে হলো যদি সে এখনই লরীটার সামনে গিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা দেয়! ধাক্কা দিলে যা অবধারিত তাই-ই ঘটবে। স্টিয়ারিংটা সোজা তার বুকে বিঁধে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে তার গাড়ি চালানো। তখন? তখন কী হবে?

একটা সেকেণ্ড্!

সিদ্ধান্তটা নিতে তখন এক সেকেণ্ড মাত্র সময় আছে! শুধু একটা সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ! পা দিয়ে সে গাড়ির এ্যাক্সিলেটারটা চেপে ধরবে, আর স্টিয়ারিংটা শুধু আর একটু ঘুরিয়ে দেবে ডান দিকে। তার ইম্পোর্টেড কার কখনও অঙ্কে ভুল করে না। বড় নিখুঁত তার বিলিতি কল্-কব্জা, বড় নিখুঁত তার হিসেব। গাড়িটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব কিছুই মেড্-ইন্-আমেরিকা। বাঁ দিকে স্টিয়ারিং হুইল। আমেরিকার মতন তার সবই উল্টো। উল্টো তার সাজ-সরঞ্জাম, উল্টো তার চাল-চলন। কিন্তু তা হলে কী হবে, নিখুঁত তার কারিগরি।

নিখুঁত কারিগরি বলেই তো আশ্বাস যেমন, তেমনি ঠিক ভয়ও। বন্দুকে যার নিখুঁত টিপ্ সে যেমন আত্মরক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, আবার মানুষ খুন করতেও সে তেমনি সিদ্ধহস্ত। যে রাখে সে-ই তো আবার দরকার হলে মারে।

মাঝরাত্রের কলকাতা হলে কী হবে, রাস্তা জনশূন্য নয় যেন। মাঝরাত্রের ল্যাম্প পোস্টগুলোরও যেন প্রাণ আছে। সোহমের সামনে এসে যেন সবাই পথ আটকে দাঁড়ালো।

সোহম্ চিৎকার করে উঠলো—সরো সরো—তোমরা সরো—তোমলোগ হটো, হট্ যাও—

পেছন থেকে ক্ষেত্রবাবু ডেকে উঠলেন—সোহম্, শোন, শোন—

সোহম্ এবার পেছনে তাকালো। কিন্তু শুধু ক্ষেত্রবাবু নয়, মনে হলো আরও অনেকে যেন তার পেছন পেছন ছুটে আসছে। মিস্টার সেন পাইপে সিগারেট লাগিয়েছেন। মিস্টার কানেট্‌কর, মিস্টার মিশ্র, মিস্টার সিন্‌হা। সবাই। সবাই সেই মাঝরাত্রে যেন তার দিকে ছুটে আসছে!

সবাই যেন চিৎকার করে বলতে লাগলো—কী করছো রায়, করছো কী তুমি? এত সহজে মুষড়ে পড়লে চলে? এত সামান্য কারণে তুমি হতাশ হয়ে গেলে? ডোণ্ট বি চাইল্‌ডিশ্! ডোণ্ট বি ডিস্‌হার্টেণ্ড! আর একটা হুইস্কির বোতল খোল, আরো চারটে পেগ গলায় ঢালো। দেখবে আবার মুড্ আসবে। তোমার অত ভাববার কী আছে! ব্যাঙ্কে তোমার যতক্ষণ টাকা আছে, চার্চে যতক্ষণ গড্ আছে, বোতলে যতক্ষণ হুইস্কি আছে, ততক্ষণ কাকে পরোয়া? গেট অন্—গেট অন্—

সকলের সব কথা অতিক্রম করে একটা খিল খিল দমকে মাঝরাত্রের অন্ধকারের কালো পর্দাটা যেন ছিঁড়ে টুক্‌রো টুকরো হয়ে গেল! যেন সুমিত্রার গলা! সোহম্ চম্‌কে উঠলো! এই লোয়ার সার্কুলার রোডের পিচ্-ঢালা পেছল রাস্তার মধ্যখানে সুমিত্রা কী করে এল!

—কেমন জব্দ, কেমন জব্দ! হা—হা—হা—

সুমিত্রার মুখে খিল্-খিল্ হাসির টিট্‌কিরি আর হাতে তালে তালে হাত্-তালি। যেন সুমিত্রা খুব মজা পেয়েছে।

সোহম্ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—সুমিত্রা, তুমি সরো, সরে যাও—গেট্ এ্যাওয়ে—

সুমিত্রা সোহমের কথা শুনে আরো জোরে হেসে উঠলো। বললে—বা রে, আমি কেন সরে যাবো বলো তো, আমাকে সরতে বলছো কেন?

সোহম্ বলে উঠলো—কিন্তু তুমি যে চাপা পড়বে সুমিত্রা, তুমি যে মারা যাবে—

আবার সুমিত্রার হো-হো হাসি। বা রে, আমার কি চাপা পড়তে বাকি আছে নাকি সোহম্? আমি তো অনেক দিন আগেই চাপা পড়েছি। তুমি যেদিন 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সনে'র ডিরেক্টার হয়েছো সেইদিনই তো তুমি আমাকে চাপা দিয়ে দিয়েছ। আমি তো মরেই গিয়েছি। আমাকে আবার নতুন করে তুমি কী চাপা দেবে—সত্যি তুমি এমন হাসাতেও পারো—

বলে পাগলের মত উদ্দাম হাসি হাসতে লাগলো।

—এ-সব তুমি কী বলছো সুমিত্রা? আমি তোমাকে চাপা দিয়েছি?

সুমিত্রা তেমনি উদ্দাম হাসি হাসতে হাসতে বললে—তুমি চাপা দাওনি তো কি মিস্টার প্যাটেল আমাকে চাপা দিয়েছে? তুমিই তো মিস্টার প্যাটেলের সঙ্গে আমাকে মিশতে বলেছিলে! বলোনি? তুমি বলোনি যে মিস্টার প্যাটেলের সঙ্গে আমি যেন হেসে কথা বলি? বলোনি তুমি? বুকে হাত দিয়ে বলো, তুমি বলোনি? তুমি আমাকে ড্রিংক করতে শেখাওনি? বলোনি আমি ড্রিংক করলে তোমার চাকরিতে উন্নতি হবে? বলোনি আমি ড্রিংক করলে তুমি কোম্পানির

ডিরেক্টার হতে পারবে ? বলোনি ?

সোহম্ গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠল।

বললে—তা বলে তুমি তার জন্যে আমার ওপর এত বড় প্রতিশোধ নেবে ? তুমি তা বলে আমাকে নিজের হাতে এমন করে খুন করবে ?

সুমিত্রা বললে—খুন ? খুন করার কথা বলছ ?

—হ্যাঁ, এর নামই তো খুন ! একেই তো লোকে খুন করা বলে !

সুমিত্রা বলল—খুন যদি তোমাকে করতুম তাহলে তো প্রতিশোধ নেওয়া হত না আমার, তাই তো খুন করিনি—

কলকাতা শহরের মাঝরাত্রের অন্ধকারের কি কোনও নেশা আছে ? সে কি বিলিতি হুইস্কির নেশার চেয়েও কড়া নেশা ? নইলে কেন তার হাতের স্টিয়ারিং-হুইলটা মাল-বোঝাই লরীটার সামনে মুখোমুখি ধাক্কা লাগবার পথটা বেছে নিচ্ছে ! মিস্টার সেন হাত বাড়িয়ে দিলেন। নো নো রায়, নেভার ! আমি তোমাকে চাকরি দিয়েছি, আমি তোমাকে কেরীয়ার করে দিয়েছি। আমি তোমাকে 'টার্ণবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সনে'র ডিরেক্টার করে দিয়েছি। আই কাণ্ট্ এ্যালাও ইউ টু ডাই। স্টপ্, স্টপ্ দেয়ার।

সোহম্ বললে—কিন্তু আজ আপনি আমাকে বাঁচাতে এসেছেন স্যার ! কিন্তু সেদিন কেন আমাকে বাঁচাননি ? সেদিন কেন ইণ্টারভিউএর আগে আমাকে সব কোশ্চেনগুলো বলে দিয়েছিলেন ?

— আমি, আমি তোমাকে কোশ্চেন বলে দিয়েছিলাম ? ডিড্ আই ?

—হ্যাঁ স্যার, ইণ্টারভিউতে কী কী কোশ্চেন আমাকে করা হবে তার সব আপনিই তো আমাকে আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন। ক্যালকাটার টোট্যাল এরিয়া কত স্কোয়ার মাইল, ক্যালকাটার পপুলেশন কত, ইণ্ডিয়ার মানুষের এ্যানুয়্যাল বার্থরেট আর ডেথ্-রেট কত, মাউণ্ট এভারেস্টের কত হাইট, ইণ্ডিয়ার সব চেয়ে লম্বা প্লাটফরম কোন রেল স্টেশনের। এ-সব কোশ্চেন যে আমাকে করা হবে তা আপনি না বলে দিলে কি আমি জানতে পারতুম ? আপনিই তো বলে দিয়েছিলেন লম্বা জুলফি রাখতে, বলেছিলেন যে-যুগের যেটা নিয়ম তাই করতে হবে। দু'শো পঁচাত্তর টাকার টেম্পোরারি চাকরির ঘুষ দিয়ে আপনিই তো আমার সর্বনাশ করেছিলেন !

—কিন্তু, ডোণ্ট ফরগেট, 'টার্ণবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সনে'র ডিরেক্টর তুমি। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় পোস্ট আর নেই। আমি যদি সেদিন হেল্‌প না করতুম তো এ-পোস্ট কি তুমি পেতে ? এই ফ্ল্যাট পেতে ? এই ইম্‌পোর্টেড কার পেতে ? এই আরাম, এই সেলাম, এই খাতির, এই টাকা পেতে ?

সোহম্ বলে উঠল কিন্তু এই পোস্ট পেতে গিয়ে কেন আমাকে এত বড় দাম দিতে হলো ? জানেন আমি আজ ফতুর হয়ে গেছি, আমার আজ আর কিছু নেই। আমি আজ লস্ট ! টোট্যালি লস্ট ? লাইফের রেসের বাজিতে আমি আজ লাস্ট হর্স—

বলতে বলতে বলা আর শেষ হলো না। 'টার্ণবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌স'নের মাল-

বোম্বাই লরীটা একেবারে হুড়মুড় করে সোহমের গাড়ির সামনে এসে পড়ল।

ট্রাম-রাস্তার ক্রসিং-এর কাছ থেকে একটা ট্র্যাফিক-পুলিস ব্যাপারটা বোধ হয় দেখতে পেয়েছিল। কী যেন একটা সন্দেহ হলো তার। সঙ্গে সঙ্গে সে জোরে হুইশল বাজিয়ে দিয়েছে। আর সেই হুইশলের কর্কশ আওয়াজে রাস্তার দুপাশের গাছের ডালের ঘুমন্ত যত কাকরা ডানা ঝাপটা দিয়ে কা-কা করে কোরাস ডেকে উঠলো। সোহমের তখনও সামান্য জ্ঞান আছে। তার মনে হলো যেন তার চারদিকে তাকে ঘিরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। রাস্তার খোলা ফুটপাথে ঘুমিয়ে থাকা সব ভিখিরীর দল ঘুম ভেঙে উঠে তাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছে। তাদের মধ্যে থেকে হঠাৎ যেন কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো— সব ঝুট্ হ্যায়—সব ঝুট্ হ্যায়। আয়রন ঝুট্ হ্যায়, স্টীল ঝুট্ হ্যায়, কেমিক্যালস ঝুট্ হ্যায়, ফার্টিলাইজার ঝুট্ হ্যায়, টি-জুট-পেপার-রবার, সব কুছ বিলকুল ঝুট্ হ্যায়—

॥ আদি কথা সমাপ্ত ॥

শেষের কথা শেষ হলো, এবার মধ্যেখানের কথা সুরু করি। একেবারে শেষকালে গিয়ে সুরুর কথায় শেষ করব। তা এই মধ্যেখানের কথা বড় মধুর। মধুর বটে কিন্তু বিষমও কম নয়। 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাকসন্ কোম্পানী'র অফিসের সামনে পেতলের ট্যাবলেটে যে কথাগুলো লেখা আছে তা আগেও লেখা থাকতো। দিন-বদলের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের অনেক কিছু বদলালেও বাইরের চেহারায় তার আজও কোনও কিছু পরিবর্তন হয়নি। রাস্তা দিয়ে যারা আসা-যাওয়া করে তারা দেখতে পায় একটা দরোয়ান গেটের সামনে গোঁফে তা দিয়ে চুপ করে টুলের ওপর বসে থাকে। বুকে ঝোলানো গুলি-ভর্তি একটা চামড়ার বেল্ট্, আর হাতে একটা সঙ্গীন উঁচু করা রাইফেল। 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাকসনে'র কোনও দরোয়ানকে আজ পর্যন্ত সে রাইফেল চালাতে হয়নি। আগে যখন ব্রিটিশ-আমল ছিল তখনও চালাতে হয় নি, আর এখন তো স্বদেশী যুগ, এখন তো আর সে-কথাই ওঠে না।

তা চালাতে হোক আর না-হোক, রাইফেলটা কিন্তু দুখমোচনকে রোজ ঝাড়া-পোঁছা করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। শুধু তাই নয়, দুখমোচনের ইউনিফর্মটাও নিয়ম করে ধুয়ে সাবান দিয়ে কেচে সাফ-সুফ রাখা নিয়ম। নইলে চাকরি চলে যায়। আদিযুগের সেই টার্নবুল আর জ্যাকসন্ সাহেবের সময় থেকে সেই নিয়ম চলে আসছে। দুখমোচন পাঁড়ে সেই সব সাহেবদের দেখেনি। কিন্তু অফিসের কেয়ার-টেকারের খাতার পাতায় যে-সব নিয়ম-কানুন লেখা আছে সে-সব নিয়ম এই অফিসে আজ পর্যন্ত কড়ায়-গণ্ডায় পালিত হয়ে আসছে।

এই অফিস-প্রতিষ্ঠার একটা গল্প প্রচলিত আছে অফিসের কেরানী মহলে। টার্নবুল আর জ্যাকসন্ দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। দুই বন্ধুতে মিলে বহুকাল আগে একবার ইণ্ডিয়া ভ্রমণ করতে এসেছিল। যে-ক'দিন কলকাতায় ছিল সে-ক'দিন চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে থাকতো আর সকাল-বিকেল গঙ্গার ধারে হেঁটে বেড়াতো। সে-সব অনেক পুরোন দিনের কথা। তখন কলকাতার চেহারা ছিল অন্যরকম। রাস্তাতে পালকি চলতো, ঘোড়ার গাড়ি চলতো, আর চলতো পায়েহাঁটা কালীঘাটের তীর্থযাত্রীর দল। গঙ্গার ধারে ধারে গাধা-বোট আর পাল-তোলা নৌকোয় মাল বোঝাই-নামাই হতো। বোঝাই হতো নারকেল, নুন, চাল, কেরোসিন তেল, ডাল আরও অনেক কিছু। আর নৌকো থেকে নামতো তুলো, মশলা, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাচ, খয়ের এই সব। সকাল থেকেই এই যে মালপত্র ওঠানো আর নামানো সুরু হতো, তা চলতো একেবারে সন্ধ্যে পর্যন্ত।

সাহেব দুজন একদিন মাঝিমাল্লাদের জিজ্ঞেস করলে—এ-সব মাল কোথায়

যাচ্ছে ?

মাঝি-মাল্লারা নানা দেশের নাম করলে। আরেবিয়া, আফ্রিকা, জাভা, সুমাত্রা আরো কত দূরে দূরে দেশ। সাহেবরা খায়-দায়-কাঁশি বাজায় জাতের লোক। বাপের টাকায় ফুর্তি করতো আর আড্ডা দিয়ে বেড়াতো। ইংরেজদের নতুন কলোনী এই ইণ্ডিয়ায় এসেছিল স্রেফ সময় আর টাকা নষ্ট করতে। কিন্তু হয়ে গেল উল্টো। একদিন তাদের মাথায় এক বুদ্ধি গজালো। এই সব কারবারে তারা নিজেরা লেগে গেলে কেমন হয় ?

যে-কথা সেই কাজ। বাড়িতে দুজনেই বাবার কাছে লিখে দিলে তারা টাকার. অভাবে পড়েছে। যেন পত্রপাঠ তাদের নিচের ঠিকানায় আরো কিছু পাঠানো হয়। আর হাতে তখনও যা টাকা ছিল তাই দিয়েই একটা নৌকো কিনে ফেললে। কলকাতার আড়ত থেকে যা-কিছু মাল সামনে নজরে পড়লো তাই গস্ত করে নৌকোতে বোঝাই করে পাঠিয়ে দিলে আফ্রিকায়। ভারি বিশ্বাসী দুজন মাঝি পেয়েছিল কপাল-জোরে। কপাল-জোরেই বটে। নইলে মাঝ-সমুদ্রে ঝড়-বৃষ্টিতে মাল-বোঝাই নৌকো ডুবে যেতেও পারতো। তাতে তো মাল, মূলধনটাও সমূলে খোয়া যেতে পারতো। কিন্তু কী যে এবং কেন যে এমন হলো কেউ বলতে পারেনি এবং বলতে পারবেও না কোনও দিন। মাস আষ্টেক পরে মাঝি-মাল্লারা নৌকো নিয়ে সুস্থ-শরীরে ফিরে এলো। ক্যাপিটেল তো ফিরে এলোই, তার সঙ্গে ফিরে এলো পাঁচগুণ প্রফিট। তারপর সেই একটা নৌকো থেকে দুটো নৌকো হলো। দুটো থেকে তিনটে। তারপর তিনটে থেকে ক্রমে দশটা এগারোটা বারোটা যখন হয়েছে তখন মাল লেন-দেনের প্রফিটের টাকায় সাহেবেরা একখানা জাহাজ কিনে ফেললে। তখন তাদের ব্যবসা একেবারে রমারম।

'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্' কোম্পানীর সেই-ই গোড়াপত্তন।

সোহম্ যখন এ-অফিসে ঢুকেছিল তখন অফিসের পুরোন আমলের বুড়ো কর্ম-চারীদের মুখে এ-সব গল্প শুনেছিল। কিন্তু অতীতটা অতীতই। বর্তমানের মানুষের কাছে অতীতের কোন দাম নেই। এক বর্তমান ছাড়া তাদের কাছে অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ কোন কিছুরই দাম নেই। নগদ কী পাবো শুধু তাই-ই বড়ো। নগদে এত টাকা ডিয়ারনেস্-এ্যালাওয়েন্স বাড়ছে তার হিসেব বলো। সেটাই বুঝবো। কালকের কথা আমরা কালকে ভাববো।

সেই সময়ে সেই তখনকার বর্তমানে একদিন দুপুরবেলা, ঘড়িতে তখন দেড়টা কি বড় জোর দুটো, একজন লোক এসে 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্' কোম্পানীর গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। সাধারণতঃ যারা কাজে-কর্মে এ অফিসে আসে তারা সোজা ভেতরে ঢুকে যায়। কিন্তু লোকটা বোধ হয় নতুন। আগে কখনও আসেনি। দুখমোচন রাইফেল ধরে যেমন বসে থাকে সেদিনও তেমনি বসে ছিল। লোকটাকে দেখেই কেমন ফোঁস করে উঠল। কোন্ হ্যায় আপ ? কাঁহা যাইয়েগা ?

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। বললে—এ আপিসে সোহম্‌বাবু কাজ করেন ?

নামটা খটোমটো লাগলো দরোয়ানের। এমন অদ্ভুত নাম সে জীবনে

শোনেনি।

জিজ্ঞেস করলে—কেয়া নাম কহা ?

লোকটা আরও ঘাবড়ে গেল। মনে হলো সে আগে থেকেই সঙ্কুচিত হয়ে ছিল, তার ওপর দরোয়ানের এই মুখভঙ্গি দেখে আরও ঘাবড়ে গেল।

অফিসের কে একজন স্টাফ বুঝি পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকছিল, তার কানে গেল কথাটা। কানে যেতেই দাঁড়িয়ে পড়লো সেখানে। বললে—কাকে চান মশাই আপনি ?

লোকটা বললে—সোহম্‌বাবু। সোহম্‌সুন্দর রায়। আমার মামাতো ভাই হয়—

প্রথমে নাম শুনে চিনতে পারেনি। কিন্তু তাব এক মুহূর্ত পরেই জিনিসটা যেন জলের মত সোজা হয়ে গেল। বললে—ও, আপনি আমাদের সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান ?

—সাহেব ?

স্টাফ ভদ্রলোক বললে—হ্যাঁ, এস. এস্‌. রায় তো আমাদের সাহেব। আপনি এস. এস্‌ রায় না বলে সোহম্‌সুন্দর রায় বলছেন কেন ? তা ভেতরে আসুন, আসুন আমার সঙ্গে। আমি তো রায় সাহেবের আণ্ডারেই কাজ করি—

বলে লোকটাকে নিজে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে গেল। যেতে যেতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলে—রায় সাহেব আপনার কী-রকম ভাই হয় বললেন ?

—মামাতো ভাই।

—আপনার আপন মামাতো ভাই ?

লোকটা যেন কথাগুলোর জবাব দিতে কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছিল। বললে—হ্যাঁ, আমার মায়ের আপন দাদার ছেলে। আমার মামা আর মামীমা আগেই মারা গিয়েছিলেন। সোহম্‌ আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, সে আমাদের বাড়িতেই আমার মা'র কাছে বড় হয়েছে। আমরা একসঙ্গে মানুষ—

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক লোকটাকে একেবারে নিজের টেবিলের সামনে নিয়ে গিয়ে বসালে। বললে—আপনি একটু বসুন এখানে, এখন লাঞ্চ-টাইম, এখন সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না—

—লাঞ্চ-টাইম ? লাঞ্চ-টাইম মানে ?

ভদ্রলোক বললে—ওই দেখুন না, ওই পেছন দিকে চেয়ে দেখুন—

লোকটা পেছনের দিকে চেয়ে দেখলে। একজন সাদা উর্দিপরা বেয়ারা দুহাতে একটা ট্রে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রেটার ওপর একটা শাদা তোয়ালে ঢাকা। ট্রে-র ওপর কী আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই খাবার-দাবার হবে।

—দেখলেন তো ? দুটো থেকে আড়াইটে পর্যন্ত সাহেবদের খাবার খাওয়ার ছুটি। এ-সময়ে কারও সঙ্গে সাহেবরা দেখা করবে না।

লোকটা বললে—কেন, সাহেবরা কেউ বাড়ি থেকে খেয়ে আসে না ?

ভদ্রলোক বললে—রায় সাহেব যদ্দিন আমাদের মত কেরানী ছিল তদ্দিন বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে এসেছে, কিন্তু এখন অফিসার হবার পর আর খায় না, অফিস

থেকে লাফ দেয়—

ওপাশ থেকে একজন ভদ্রলোক বলে উঠলো—কে হে সুকুমার, উনি কে ? কার সঙ্গে কথা বলছো ?

সুকুমার নামে ভদ্রলোক বললে—ইনি হচ্ছেন আমাদের রায় সাহেবের পিসতুতো দাদা—

আশে-পাশের অনেকেই তখন এদিকে কান দিলে। কেউ ঠোঙায় করে মুড়ি খাচ্ছে, কেউ কৌটো থেকে রুটি-পরোটা আলু-চচ্চড়ি খাচ্ছে। বোঝা গেল বড় অসময়ে এসে গেছে সে।

—আপনার নামটা কী বললেন ?

—কাশীনাথ। কাশীনাথ দত্ত। আমরা চন্দননগরের দত্ত—

—আর রায় সাহেবরা ?

তারপরে রায় সাহেবের ছোটবেলাকার কথা উঠল। টিফিন-টাইম। যারা বাইরের রাস্তায় জলযোগ করতে গিয়েছিল তারা ততক্ষণে এসে গিয়েছে। কাশীনাথ দত্ত বেশ চটপটে চৌকোশ লোক বলে মনে হলো। রায় সাহেবের ছেলেবেলা সম্বন্ধে সব বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে লাগল। আমার বাবা আমি আমরা কেউই বুঝতে পারিনি সোহম্ এখন এত বড় হবে। লেখা-পড়াতেও ভালো ছিল না, খেলাধুলোতেও ভালো নয়। আমিই তো তখন কত বকুনি দিয়েছি ওকে। তা এখন কত মাইনে পায় সোহম্, মানে আপনাদের রায় সাহেব ?

সুকুমারবাবু বললে—তা সব মিলিয়ে হাজার পাঁচেক তো হবেই—

—ছেলেপুলে কী ?

একজন বললে—তা আপনি বলছেন আপনার নিজের মামাতো ভাই, আর আপনিই জানেন না রায় সাহেবের কত মাইনে, ক'জন ছেলে-মেয়ে ?

কাশী দত্ত বললে—আরে আপন মামাতো ভাই হলে কী হবে, দেখা-সাক্ষাৎ তো নেই। বাবা মারা যাবার পর আমি চাকরিতে বদলি হয়ে চলে গেলাম ভুপালে। আর সোহম্ তখন ম্যাট্রিকে ফেল মারলো। তারপর ও একটা মেসে গিয়ে উঠে টিউশনি করে করে চালাতো আর সেই মেসেই থাকতো। লেখা-পড়া কদ্দুর কী করেছে তাও জানি না। এতদিন পরে আমি হঠাৎ সোহমের খবর নিতে গিয়ে কে যেন বললে সে এই আপিসে চাকরি করে। তা সে যে এত বড় অফিসার হয়েছে, এত টাকা তার মাইনে হয়েছে, সে-সব তো আমি কিছুই জানতুম না। এই প্রথম আপনাদের মুখেই সব শুনছি··। তা বিয়ে করেছে তো ?

সুকুমারবাবু বললে—আপনি তো খুব আত্মীয় দেখছি মশাই। আপনি জানবেন না, জানবো আমরা ? আমরা মশাই পেটি ক্লার্ক, আমরা আমাদের কর্তার হাঁড়ির খবর জানবো কী করে ?

করালীবাবু বললে—সত্যিই রায় সাহেব আপনার আত্মীয় তো, না কি আমাদের কাছে বাজে কথা বলছেন।

কাশীবাবু লজ্জায় পড়লো। বললে—বুঝতেই তো পারছেন, ছাপোষা মানুষ, নিজের ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে সংসার চালাতেই প্রাণান্ত, বিদেশ-বিভুঁইতে

গিয়ে উদয়াস্ত চাকরি করেই সময় পেতাম না, তার ওপর দূরে থাকলে যা হয়, তাই আর কি, আজকের দিনে কারো খবর রাখা কি কারো পক্ষে সম্ভব মশাই—যা দিনকাল পড়েছে—

ততক্ষণে বেশ আলাপ জমে উঠেছে। টিফিন-টাইমের অফিস। সকলেরই গল্প-গুজবের মেজাজ। দূরে-কাছে যে যেখানে ছিল আড্ডার গন্ধ পেয়ে সবাই সুকুমার চৌধুরীর টেবিলের সামনে এসে জুটেছে। যারা বাইরে রাস্তায় টিফিন খেতে গিয়েছিল তারাও আস্তে আস্তে অফিসের ভেতরে ঢুকছে। সকলেরই প্রশ্ন—ইনি কে? এঁকে ঘিরে এত জটলা কেন? জবাব শুনে সবাই কৌতূহলী। তাই নাকি? আপনি আমাদের রায় সাহেবের পিসতুতো ভাই? তা আপনি তো আমাদের মত বেশ গেরস্থ মানুষ, আমাদের রায় সাহেব আপনার মামাতো ভাই, উনি ও-রকম কেন?

—কী রকম?

—সে মশাই আপনি যাকে জিজ্ঞেস করবেন সে-ই বলে দেবে!

কাশীবাবু বললে—কিন্তু ছোটবেলায় তো খুব ভালো ছিল, খুব মিশুক-প্রকৃতির। স্বভাব-চরিত্র তো বরাবরই ভালো ছিল তখন—কেবল যা একটু ছটফটে, তা ছাড়া আর কিছু নয়—

কথাটা শেষ হবার আগেই ওদিক থেকে দিবাকর চাপরাসী হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এল।

কী রে দিবাকর? আবার সাহেব কল্ দিয়েছে নাকি?

বলে ধুতির কোঁচা-কাছা ঠিক করে নিয়ে একটা ফাইল হাতে উঠে দাঁড়ালো। কখন যে আড্ডা মারতে মারতে ঘড়িতে বেলা আড়াইটে বেজে গিয়েছিল সেদিকে কারো খেয়াল ছিল না। চা-ওয়ালাও এসে গিয়েছিল খালি চায়ের কাপগুলো নিতে। সবাই যে যার টেবিলে গিয়ে বসে কাজে মন দিলে। টিফিন-টাইমের আড্ডাঘর যেন এক মুহূর্তে 'টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাক্‌সনে'র অফিসে পরিণত হয়ে গেল। সুধাকান্তবাবু কাশীবাবুর দিকে চেয়ে বললে এবার যান না মশাই, রায় সাহেবের ঘরে চলে যান। এখন রায় সাহেবের লাঞ্চ খাওয়া হয়ে গেছে—আপনার মামাতো ভাই হয় যখন তখন আর ভয় কী? ওই তো রায় সাহেবের চেম্বার, সামনে গিয়ে চাপরাসীর হাত দিয়ে একটা স্লিপ ভেতরে পাঠিয়ে দিন গে—

—যাবো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ যান, আপনি কারো কথা শুনবেন না। সাহেব আমাদের লোক খুব ভালো। মশাই, ভালো লোক না হলে এত কম বয়েসে চাকরিতে কারো এত উন্নতি হয়? রায় সাহেব আপিসের সমস্ত কাজ গুলে খেয়েছে, ঢুকেছিল আমাদের মতন দু'শো পঁচাত্তর টাকায়, ভাউচার-স্লিপে মাইনে নিত। তারপর বছর-বছর এক-একটা এগজামিন দিয়েছে আর পাস করে টপাটপ সকলের মাথায় গিয়ে বসেছে—এ-লোক কখনও খারাপ হতে পারে—?

কাশী দত্ত অগত্যা উঠলো। সোহমের ঘরটা আগেই চিনে নিয়েছিল। পায়ে পায়ে তার ঘরের কাছে যেতেই চাপরাসী বাধা দিলে। বললে—স্লিপ দিন,

নিজের নাম, আর কী চাই লিখে দিন—

কাশী দত্ত বললে—তোমার সাহেব আমার মামাতো ভাই, তা জানো

চাপরাসীটা বললে—তা হতে পারে বাবু, কিন্তু স্লিপ না দিলে সাহেব রেগে যাবে। সাহেব বড় বদ-মেজাজী—

কাশী দত্ত অগত্যা নিজের নাম-ধাম আর পরিচয় লিখে স্লিপটা চাপরাসীর হাতে দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিলে। বড় হীনতা লাগলো তার নিজের মনে। এতকালের পরিচয়, এককালে একই বাড়িতে মানুষ। মামাও গরীব ছিল খুব। অল্প বয়েসে যখন মামা-মামী মারা যায় তখন সোহম্ এসে তাদের বাড়িতে ওঠে। তখন এই কাশী দত্ত কতদিন তাকে মাথায় চাঁটি মেরেছে। কতদিন কত বকেছে ঝকেছে। কাশী দত্তর এখনও মনে আছে সে-সব দিনের কথা। বড্ড ভাত খেত সোহম্। অনেক ভাত খেয়েও তার পেট ভরতো না। ভাত দিতে দিতে শেষকালে হাঁড়ির ভাত ফুরিয়ে যেত।

মা বলতো—হ্যাঁ রে, পেট ভরেছে তোর ?

সোহমের লজ্জাও ছিল না। বলতো—না—

মা বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলতো—তোর জন্যে আজ এক সের চাল নিলুম তবু তোর পেট ভরলো না ? তাহলে তোকে আর ভাত খেতে হবে না, তুই ওঠ্, তোর পেটে আজ রাক্ষস ঢুকেছে—

সত্যি, তখন খাবার সময় সোহম্ যেন রাক্ষসই হয়ে যেত। কিছুতেই যেন আর পেট ভরতো না তার, আসলে বোধ হয় ভাতগুলো সোহম্ খেত না, খেত তার পেটের ভেতরের রাক্ষসটা। তারপর রান্নাঘর থেকে খালি পেট নিয়েই উঠে যেত সোহম্। উঠে কলতলায় গিয়ে হাত ধুয়ে নিয়ে ইস্কুলে চলে যেত। বাবা মাঝে মাঝে খেতে বসে মা'কে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁগো, সোহম্ খেয়েছে ? তাকে দেখছি নে যে ?

মা বলত—ওকে খাওয়াতে খাওয়াতেই তুমি ফতুর হয়ে যাবে—

বাবা বুঝতে পারতো না। জিজ্ঞেস করতো—কেন, কেন ? ও কি খুব বেশি খায় নাকি ?

মা বলতো—দাদা তো এত খেত না, ও কোথা থেকে এমন রাক্ষুসে খাওয়া খেতে শিখলে কে জানে মা !

বাবা বলতো—আহা, দু'টো ভাত খাবে তার জন্যে এত গঞ্জনা দিচ্ছ কেন ? থাক্ থাক্, রসগোল্লা পানতুয়া তো আর খাচ্ছে না, দু'টো ভাত বেশি খেলে গেরস্থর আর কী এমন ক্ষতি। ওকে পেট ভরে দুটি খেতে দিও তুমি—হাজার হোক, পর তো নয়, তোমার নিজেরই তো ভাইপো—

এই-ই সেই সোহম্, এই-ই সেই সোহম্সুন্দর রায়। কাশী দত্তর মনে আছে ছোটবেলায় এই সোহম্কে নিয়েই তখন বাড়ির লোকের কত হেনস্থা !

কিন্তু কার জীবন কখন যে কোন্ খাতে মোড় নেয় কে বলতে পারে। কাশী দত্ত আর দেরি করলে না।

কাশী দত্ত সোজা গিয়ে রায় সাহেবের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। খানিক

পরে চাপরাসী ফিরে এল স্লিপটা হাতে নিয়ে।

বললে—আভি মোলাকাত্‌ নেহি হোগা—

দেখা হবে না? তাহলে কি সোহম্‌ চিনতে পারে নি কাশী দত্তকে?

কাশী দত্ত চাপরাসীটাকে বললে—তুমি বলেছিলে তো যে আমি তার পিসতুতো দাদা?

চাপরাসীটা বললে—ম্যয় বোলা থা হুজুর, লেকিন সাব কা আভি ফুরসৎ নেহি হ্যায়—

কাশী দত্ত আবার ফিরে এল সুকুমারবাবুর কাছে। সুকুমারবাবু জিজ্ঞেস করলে—কী হলো মশাই? সাহেব দেখা করলে না?

কাশী দত্ত বললে—না—

সুকুমারবাবু বললে—তাহলে আর কী করবেন। এখন বোধ হয় সাহেব খুব ব্যস্ত। আমাদের ফ্যাক্টরিতে এখন খুব স্ট্রাইকের গণ্ডগোল হবার কথা হচ্ছে তো, তাই হয়ত সাহেবের সময় নেই। আপনি বরং অন্যদিন ট্রাই করবেন—

বলে সুকুমারবাবু নিজের কাজে মন দিলে। কাশী দত্ত আর দাঁড়ালো না সেখানে। আস্তে আস্তে আবার অফিসের সদর গেট মাড়িয়ে বাইরের কলকাতার বড় রাস্তার গোলকধাঁধায় গিয়ে মিলিয়ে গেল।

আজ এতদিন পরে যেন সেই সব মানুষগুলো আবার ভিড় করে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

চাপরাসীর পাঠানো ও রকম গণ্ডা-গণ্ডা স্লিপ কত যে তখন সোহমের কাছে আসতো তার ঠিক নেই। স্লিপের ওপর কাশী দত্তর নামটা দেখেই চিনতে পেরেছিল সে। যখনই কেউ সাফল্যের শিখরে ওঠে তখন ও-সব স্লিপ্‌ আসে। বিশেষ করে গরীব আত্মীয়দের কাছ থেকে। ওটাই স্বাভাবিক।

ওই মেহের আলিও একদিন স্লিপ্‌ পাঠিয়েই তার কাছে প্রথম এসেছিল। ওই অফিসের যখন কেরানী ছিল সে তখন পি-বি-দাশবাবুও তাকে বড় ভালোবাসত। কিন্তু আসলে ছিল স্বার্থ। মেহের আলি সাহেবের স্বার্থ ছিল তাকে দিয়ে কিছু শেয়ার কেনানো। আর পি বি-দাশবাবুর স্বার্থ ছিল তার একমাত্র মেয়েটাকে তার ঘাড়ে গছিয়ে দেওয়া।

মেহের আলি সাহেব বলতো—মিস্টার রায়, এবার শেয়ার কিনুন, আপনি অনেক টাকা ডিভিডেণ্ড পাবেন, তার সঙ্গে বোনাস-শেয়ারও পেয়ে যাবেন—টাকা পেয়ে পেয়ে একেবারে লাল হয়ে যাবেন।

পি-বি দাশবাবুও বলতেন—তুমি আমার স্বজাতি, তোমারও ভুভারতে কেউ নেই, আমারও ওই একটা মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই, তুমি যদি ওর ভারটা নাও

তো আমার বড় উপকার হয় ভাই। নেবে ভার তুমি?

কিন্তু ছোটবেলা থেকে সোহম্ লেখা-পড়া না করুক একটা সোজা জিনিস বুঝে নিয়েছিল যে পরের স্বার্থ দেখার চেয়ে নিজের স্বার্থ দেখাটাই জীবনে সব চেয়ে বড় কাজ। স্বার্থের কাছে সমস্ত কিছুই পর।

ওই কাশী দত্ত একদিন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। অপরাধটা তার কী ছিল? অপরাধটা ছিল তার বেশি ভাত খাওয়া।

কাশীদা বলেছিল—বেরো, আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা—

সোহম্ বলেছিল—বেরিয়ে কোথায় যাব আমি দাদা? আমার যে আর থাকবার কোনও জায়গা নেই—

কাশীদা বলেছিল—জায়গা আছে কি নেই সে তুই বুঝবি, আমার বোঝার দরকার নেই, তুই এখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা দিকিনি—

সোহম্ তবু শেষবারের মত মিনতি করে বলতে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু এত রাত্তিরে আমি কোথায় যাবো? কাল সকাল পর্যন্ত আমাকে একটু থাকতে দাও দাদা, তোমার পায়ে পড়ি. কাল সকালবেলাই আমি যেখানে পারি চলে যাবো—

পিসিমাও অনেক করে দাদাকে বলেছিল—আজ রাত্তিরটার মত ওকে থাকতে দে না বাবা, সত্যিই তো ও এত রাত্তিরে কোথায় যাবে?

পিসিমাকে হাত দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়ে ওই কাশীদাই বলেছিল—ওই বাঁদর টাকে তুমিই তো লাই দিয়ে দিয়ে ওর এত বাড় বাড়িয়েছো। ভাত খেতে বুঝি পয়সা খরচ হয় না? তুমিই ওকে আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটা খেয়েছ। এখন ভূতভোজন করাবার মত পয়সা আর আমার নেই—

পিসিমা বলেছিল—তা বলে একটা শেয়াল-কুকুরকেও লোকে এত রাত্তিরে বাড়ি থেকে তাড়ায় না, আর তুই কিনা নিজের আপন মামাতো ভাইকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস?

সোহম্ তখন আর থাকতে পারেনি, একেবারে মরীয়া হয়ে মাটিতে নিচু হয়ে কাশীদার পা জোড়া জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল—আমি আর অত ভাত খাবো না দাদা, খেতে চাইলেও আর তোমরা আমাকে অত ভাত দিও না। আমি না হয় উপোস করে থাকবো, আমায় বাড়িতে শুধু একটু মাথা গুঁজে থাকতে দাও। পৃথিবীতে তোমরা ছাড়া আমার আর কেউ নেই, আমি কথা দিচ্ছি আমি আর অত ভাত খাবো না—

পিসিমার মেয়েমানুষের প্রাণ। তার চোখ ফেটে বোধ করি তখন জল বেরিয়ে এসেছিল। বলেছিল—ওরে কাশী, আমার কথা শোন্, ও ছেলেমানুষ, এখনও ভাল মন্দ বোঝবার বয়েস হয়নি ওর, একবার ফেল করেছে তাতে কী হয়েছে? আবার না হয় পরীক্ষা দেবে। পরের বারে ঠিক ও পাস করবে, দেখবি! ওকে আজ বাড়ি থেকে বার করে দিসনি—

কিন্তু কাশীদার গায়ে আর মনে খুব জোর ছিল। মাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সোহম্‌কে চিরকালের মত বাড়ি থেকে সেই রাত্রেই বার করে দিয়েছিল।

সোহমের এখনও মনে আছে সে-কথা। সেই কাশীদা এতদিন পরে এসেছে

সোহমের খবর নিতে। খবর তো নিতে আসবেই। আজ তার পাঁচ হাজার টাকার চাকরি আর এয়ার-কন্‌ডিশন্‌ করা কামরা দেখে হয়ত পুরোন আত্মীয়তাটা নতুন করে ঝালিয়ে নিতে এসেছে।

সোহম্‌ স্লিপটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ দেখলে, আর মনে পড়ে গেল সেই রাতটার কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে চাপরাসীকে বললে—বোল্‌ দেও মুলাকাৎ নেহি হোগা, আভি মেরা টাইম নেহি হ্যায়—

মনে আছে ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ মিস্টার সেনের ঘর থেকে ডাক এল। সোহম্‌ সব কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি মিস্টার সেনের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মিস্টার সেন। সেই নীহারবিন্দু সেন। টাউন স্কুলের হেড মাস্টার ক্ষেত্রবাবুর প্রাক্তন ছাত্র। যিনি তাকে চাকরিটা করে দিয়েছিলেন। এখন মিস্টার সেনই 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্‌' কোম্পানির হেড। এতদিন এ কোম্পানি ইণ্ডিয়াতেই কারবার করছিল। নানা কারণে ইণ্টারন্যাশনাল বাজার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এই মিস্টার সেনই আবার প্রথম কোম্পানিকে ইণ্ডিয়ার বাইরে কাজ করবার এক্তিয়ার পাইয়ে দিয়েছে। আরব দেশগুলোতে এখন অনেক রকম ডেভেলপ্‌মেণ্ট হচ্ছে। সেখানে এতদিন শুধু মরুভূমি ছিল আর ছিল তেল। পেট্রল। তার মানে লিকুইড্‌ গোলড্‌। অর্থাৎ তরল সোনা।

কিন্তু সে তেল তো খাবার জিনিস নয় যে পেট ভরে খাবো। সে তেলের চাহিদা সারা পৃথিবীতে। সেই তেল না পেলে সারা পৃথিবীর মানুষের ভাত হজম হয় না। তাদের রাতের ঘুম আর ক্লাবের নাচ বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে সেই আরব দেশে আবার একটা নতুন মার্কেট গজিয়ে উঠেছে। আর নতুন আর একটা মার্কেট গড়ে উঠেছে মিডল্‌ ইস্টে। সেই মিডল্‌ ইস্টের বাজারটা ধরবার জন্যে মিস্টার সেন ক'বছর ধরেই উঠে পড়ে লেগেছেন। ওই ইজিপ্ট, ইস্রায়েল, টার্কি, ইরান, ইরাক আর সিরিয়ার বাজারটাও এখন তেজী হয়ে উঠেছে। যে কোনও কোম্পানি সেখানে ধুলোমুঠি ধরেছে সেটাই তাদের সোনামুঠি হয়ে উঠেছে। বহুদিন ধরেই মিস্টার সেন সেই বাজারটা হাত করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে আছেন, কিন্তু বাদ সেধেছে আর একটা মানুষ, আর একটা কোম্পানি। কোম্পানিটার নাম 'প্যাটেল ইণ্টারন্যাশন্যাল এণ্টারপ্রাইজ্‌'। সেই খবরটা পেয়েই তিনি সোহম্‌কে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সোহম্‌ ঘরে ঢুকতেই মিস্টার সেন বললেন—বসুন মিস্টার রায়—

সোহম্‌ বসলো।

মিস্টার সেন জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কোন্‌ কোন্‌ ক্লাবের মেম্বার মিস্টার রায়?

সোহম্‌ বললে—আমি তো স্যার আপনার কথায় সব ক্লাবেরই মেম্বার হয়েছি। ওই বেঙ্গল ক্লাব, ক্যালকাটা ক্লাব, পাঞ্জাব ক্লাব, সাউথ ক্লাব, সবগুলো ক্লাবেরই তো মেম্বার আমি!

—কিন্তু গ্রেট্‌ ইস্টার্ন ক্লাব?

সোহম্‌ মনে করতে চেষ্টা করলে। বললে—ওয়েট এ মিনিট স্যার, আপনি

একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার ডায়েরিটা নিয়ে আসছি –

বলে নিজের ঘরে গিয়ে ডায়েরিটা নিয়ে এল। তারপর ডায়েরিটা খুলে দেখতে লাগলে। সোহমের ডায়েরিতে সব ক্লাবগুলোর নাম লেখা আছে। প্রত্যেক ক্লাবে নিয়ম করে চাঁদা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ঠিকমত নিয়ম করে ক্লাবগুলোতে যাওয়া হয় না। মিস্টার সেন যখন সোহমকে ওয়েলফেয়ার অফিসার করেছিলেন তখনই বলে দিয়েছিলেন --সব ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাবেন আপনি, বুঝলেন? কোম্পানি তার খরচটা দেবে--

সোহম জিজ্ঞেস করেছিল -আপনি যখন বলছেন স্যার তখন নিশ্চয়ই হবো। কিন্তু কেন স্যার? আমাদের কোম্পানির তাতে কী সুবিধে হবে?

মিস্টার সেন বলেছিলেন—রেফারেন্স। শুধু রেফারেন্স, আর কিছু নয়। জীবনে উন্নতি করতে গেলে রেফারেন্সটাই হলো সব। অনেস্টি নয়, ইনটেগ্রিটি নয়, পরিশ্রম নয়, বিশ্বস্ততা নয়, আনুগত্য নয়, শুধু রেফারেন্স! রেফারেন্সই মানুষকে ছোট থেকে বড় করে তোলে। আপনার লাইফে যেমন ক্ষেত্রবাবু আপনার রেফারেন্স!

তখন সোহম নতুন ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছে। জিজ্ঞাস করলে— রেফারেন্স মানে?

মিস্টার সেন বললেন—রেফারেন্স শব্দটার ঠিক বাংলা হয় না মিস্টার রায়। ধরে নিতে পারেন আশ্রয় কিংবা অবলম্বন। ক্ষেত্রবাবু যদি না আপনাকে আমার কাছে চিঠি দিয়ে পাঠাতেন তাহলে কি এ-অফিসে আপনার চাকরি হতো? না, আমি আপনাকে ইন্টারভিউ এর আগে কোশ্চেনগুলো সব বলে দিতুম! সেটাই হলো রেফারেন্স --

ডায়েরিটা নিয়ে সোহম ঠিক পাতাটা বার করলে। ডায়েরিটাতে বেঙ্গল ক্লাবের নাম রয়েছে, ক্যালকাটা ক্লাবের নাম রয়েছে, পাঞ্জাব ক্লাবের নাম রয়েছে, সাউথ ক্লাবেরও নাম রয়েছে, কিন্তু গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের নাম নেই।

মিস্টার সেন হাত বাড়িয়ে সোহমের ডায়েরিটা নিয়ে নিজেই দেখে নিলেন, কিন্তু না, গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের নাম তাতে নেই।

—ওটা কি স্যার নতুন ক্লাব?

· হ্যাঁ, ওই ক্লাবটা কলকাতার নিউ-ক্লাসের লোকরা করেছে। ওটাতে আপনার আজই মেম্বার হওয়া চাই। কারণ 'প্যাটেল ইন্টারন্যাশনাল এনটারপ্রাইজে'র মিস্টার ভানুভাই প্যাটেল ওখানকার মেম্বার। তিনি ওই ক্লাবের রেগুলার গো-আর। তিনি মিডল-ইস্টে একটা দু হাজার কোটি টাকার নতুন অর্ডার সিকিওর করেছেন। তাঁকে হাত করতে হলে আজই আপনাকে ওখানকার মেম্বার হতে হবে। তাঁর সঙ্গে তাস খেলতে হবে, তাঁর সঙ্গে ড্রিংক করতে হবে, তাঁর সঙ্গে এমন ভাবে আলাপ জমাতে হবে যাতে তিনি ওঁর দু' হাজার কোটি টাকার মধ্যে অন্ততঃ পাঁচশো কোটি টাকার অর্ডার আমাদের কোম্পানিতে ডাইভার্ট করে দেন।

বলে ডায়েরিটা ফেরত দিতে যেতেই তার ভেতর থেকে একটা ছোট ফোটোগ্রাফ খসে পড়ে গেল টেবিলের ওপর।

সোহম্ ফোটোটা কুড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মিস্টার সেন ফোটোগ্রাফটা তুলে নিয়েছেন।

জিজ্ঞেস করলেন—হুজ্ ফোটো ইজ দিস্? এটা কার ফোটো? সি এ্যাপিয়ার্স টু বি এ ভেরি বিউটিফুল লেডী। মনে হয় খুব রূপসী মহিলা! এ কে আপনার?

সোহম্ লজ্জায় পড়েছিল। বললে—এ আমার ওয়াইফ স্যার, আমার স্ত্রী!

মিস্টার সেন বললেন—ইউ আর এ লাকি চ্যাপ রায়, ইউ হ্যাভ গট্ এ লাকি পার্টনার ইন লাইফ, আই কন্‌গ্র্যাচুলেট ইউ—ডাজ সি ড্রিংক?

সোহম্ বললে—না স্যার, আমার স্ত্রী মদ খায় না—

—কেন? ড্রিংক করা কি পাপ?

—না স্যার।

—তবে? আপনার স্ত্রীকে নিয়ে কি আপনি ক্লাবে যান?

—না।

—কেন? এমন সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছেন আর সকলকে দেখাবেন না? তাতে তো আমাদের কোম্পানির বিজনেস বাড়ে! ইউ মাস্ট্ ক্যাপিট্যালাইজ হার, ইউ মাস্ট্! তাতে আপনার কেরীয়ারের ও উন্নতি হবে। জানেন না, বিউটিফুল ওয়াইফ্ ইজ্ এ প্রফিটেবল ইন্‌ভেস্টমেন্ট্!

সোহম্ বললে—ঠিক আছে মিস্টার সেন, আপনি যা বলছেন তাই-ই করবো। আমি আজই গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাবো।

—শুধু মেম্বার হয়ে যাবেন না, ওই মিস্টার প্যাটেলকে একটা ককটেল পার্টি দেবেন, তাতে আপনার স্ত্রীকে করবেন হোস্টেস। মিডল ইস্টের সমস্ত অর্ডারটার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে পাঁচশো কোটি টাকার অর্ডার যাতে তিনি আমাদের কোম্পানিতে ডাইভার্ট করে দেন সেটাও চেষ্টা করবেন! এ-রকম চান্স জীবনে হয়ত আর আসবে না।

—ঠিক আছে স্যার!

সোহম্ ফোটোটা নিয়ে আবার নিজের চেম্বারে চলে এল। কী আশ্চর্য, সুমিত্রার ফোটোটা যে তার ডায়েরীর মধ্যে কী করে ঢুকে পড়েছিল তা তার খেয়ালই ছিল না। চেম্বারের দেওয়ালে একটা ম্যাপ টাঙানো ছিল। ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ। পৃথিবীর মানচিত্র। যে-পৃথিবীতে 'টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাক্‌সন' নামের একটা কোম্পানির রাজত্ব কায়েম রয়েছে। তারই মধ্যে একটা ভগ্নাংশ মিডল-ইস্ট। মিড্‌ল-ইস্টের চারপাশে কোথাও জনপদ, কোথাও সমুদ্র, আবার কোথাও মরুভূমি। মানুষের জীবনের মতই তা বহুরূপী। ওদিকে সাহারা মরুভূমি, আর এদিকে ব্ল্যাক—সী, আর ক্যাসপীয়ান-সাগর। আর তারপর ইন্ডিয়ান সাব্-কনটিনেন্ট্, আর তারই পাশে এজিয়ান সাগর। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মতই তার বৈচিত্র্যও যতটা, ঠিক ততটা তার বৈষম্যও।

—স্যার!

একজন ক্লার্ক ঘরে ঢুকেছে। সোহম্ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলে। আবার একটা

ফাইল নিয়ে সই করে দিলে। লেবার-ট্রাবল যাতে পাকিয়ে জটিল না হয়ে যায় তারই একটা চিঠি।

চিঠিটা সই করিয়ে নিয়ে ক্লার্কটা চলে গেল। কিন্তু যাবার আগেই মিস্টার রায় আবার ডাকলেন।

—শুনুন সুকুমারবাবু—

সুকুমারবাবু মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন।

সোহম বললে—দেখুন, যে-সে বাজে লোক আমার কাছে যখন-তখন স্লিপ পাঠায়, এটা আমি পছন্দ করি না। আপনারা কেউ একটু দেখতে পারেন না?

সুকুমারবাবু বললেন—বাজে লোক নয় স্যার, কাশী দত্ত বলে কে একজন এসেছিলেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন। বলছিলেন আপনি নাকি তাঁর মামাতো ভাই—

সোহম বললে—না না, আমার কোনও ভাই টাই নেই। আমি কারও মামাতো ভাই নই। ও-রকম কথা কেউ বললে আমার ঘরে ঢুকতে দেবেন না। আমার কেউ নেই। বুঝলেন? কথাটা মনে রাখবেন। যান—

রাস্তায় বেরিয়ে কলকাতার ভিড়ের গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে কাশী দত্তর তখন যেন দিশেহারা হয়ে যাবার মত অবস্থা হলো। এত ভিড় কলকাতায়? আসবার সময় এত ভিড় ছিল না তো! যেন পিঁপড়ে কিংবা আরশোলার মত চারদিকে কিলবিল করছে! ভূপাল থেকে এসে খবরটা শুনেই সে সোহমের এই অফিসে এসেছিল। কিন্তু সোহম তার সঙ্গে দেখা করবে না এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। ঠিক দেখা করলে না বলে যে তার মনটা খারাপ হয়ে গেল তা নয়। মনটা খারাপ হলো এই ভেবে যে সেই অপদার্থ মামাতো ভাইটা কিনা পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে এখন।

হঠাৎ চারদিকে একটা হৈ-হৈ শব্দ উঠল, আর যখন তার জ্ঞান ফিরল সে দেখলে ফুটপাতে পা হড়কে পড়ে গেছে। পড়ে গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে।

—কী হয়েছে মশাই? কী হয়েছে? পড়ে গেলেন কেন? লেগেছে নাকি?

কেউ বললে—কোথায় লাগল?

সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল তাকে ঘিরে।

একজন বললে—রাস্তা দেখে চলতে পারেন না মশাই? কলকাতায় নতুন এসেছেন নাকি?

সত্যিই, একে মেজাজটা বিগড়েই গিয়েছিল সোহমের ব্যাপারে, তার ওপর কে বুঝি কলা খেয়ে কলার খোসাটা ফুটপাতের ওপরেই ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল! যত সব বেআক্কেলে কলকাতার লোক, কলকাতার লোকগুলোই কি এই রকম হারামজাদা!

—কোথায় লাগলো মশাই? হাড়গোড় ভাঙেনি তো?

কাশী দত্ত রেগে গেল। চীৎকার করে বলে উঠলো—জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছে না আপনাদের? আপনারা কলা খেয়ে খোসাটা ফেলে রাখবেন ফুটপাতে, আবার মায়া দেখাতে এসেছেন? আবার বলতে এসেছেন আমার লেগেছে কি

না, আমার হাড়গোড় ভেঙেছে কিনা ! আপনাদের লজ্জা করে না ? আপনারা তো আচ্ছা লোক মশাই ! আপনারা সরে যান এখান থেকে, সরে যান । আমি নিজে দাঁড়িয়ে উঠতে পারবো । আপনাদের কাউকে ধরতে হবে না—বেরিয়ে যান—সরে যান আমার সামনে থেকে সরে যান—

যারা সাহায্য করতে এসেছিল তারা তো অবাক । যাকে সাহায্য করতে এসেছিল তার মুখ থেকে এ-ধরনের কথা তারা আশা করেনি !

কাশী দত্তর কাপড়জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল। হাঁটু ছড়ে গিয়ে ঝর ঝর করে রক্তও ঝরছিল। সে অতি কষ্টে কারোর সাহায্য না নিয়ে নিজেই কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালো।

একজন ভদ্রলোক কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে—খুব কষ্ট হচ্ছে ? একলা হেঁটে বাড়ি যেতে পারবেন ? একটা রিকশা ডেকে দেব ?

আর একজন এগিয়ে এসে বললে চলুন, আপনাকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিই—

কাশী দত্ত ক্ষেপে গেল। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ক্ষেপে উঠে যেন সবাইকে কামড়ে দেবে। হঠাৎ সকলকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো—রাখুন মশাই, আর অত কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না। যে-দেশে ম্যাট্রিক ফেল করে লোকে পাঁচ হাজার মাইনে পায় সে-দেশের লোককে আর চিনতে বাকি নেই আমার, সবাইকে আমার চেনা হয়ে গেছে—যান্ মশাই যান্—আপনারা কেউ মানুষ নন্ মশাই, সবাই জানোয়ার, জানোয়ার—

বলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যে-দিকে দু'চোখ যায় সেই দিকেই চলতে লাগলো।

যারা একটু আগে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল তারা এবার হতবাক। তারা কিছু বুঝতে না পেরে এ-ওর দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

কাশী দত্তর ওই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বললে—পাগল মশাই, একেবারে আস্ত পাগল, আহা, বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায়নি—আজকাল কলকাতায় পাগলের সংখ্যা এত বেড়ে যাচ্ছে, গভর্মেণ্ট কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আমরা কোন্ রাজত্বে বাস করছি !

সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস যেমন কখনও শ্লথ-গতি, কখনও তীব্র, মানুষের জীবনও ঠিক সেই রকম। মানুষের জীবনের ধর্মই এই। জীবন একটা চলমান প্রক্রিয়া। চলতে চলতে সে কখনও এক জায়গায় এসে বাঁক নেয়, আবার এক জায়গায় এসে স্রোতস্বিনী হয়ে ওঠে। তারপর আছে সমুদ্র। সমুদ্রে গিয়ে সব নদীই শেষ হয় বটে কিন্তু সেটা তার সমাপ্তি হয় না, সম্পূর্ণতা ঘটে। এই উপন্যাসও সেই রকম।

শেষের কথা তো আগেই সুরু হয়েছে. এইবার মাঝখানটা বলছি। কে যে সোহমের নাম রেখেছিল তা তার জানা না থাকলেও নিজের নামটা তার পছন্দই হয়েছিল। সোহমসুন্দর রায়। নামটা যে শুনেছে সে তাকে ভালোবেসেছে। সবাই বলেছে তার নামটা নাকি সুন্দর। শুধু তার ওই নামের জন্যেই টাউন স্কুলের হেড্‌মাস্টার মশাই ক্ষেত্রবাবুর প্রিয়পাত্র হয়েছিল সে।

তা নামের সঙ্গে কি তার চরিত্রের মিল হয়েছিল ?

কিন্তু সে-কথা পরে। আগে সেই রাত্রের কথা বলি। কাশী দত্ত প্রথম প্রথম নিজে সোহমকে নিয়ে পড়াতে বসতো। নিজের অনাথ মামাতো ভাই। যতদিন পিসেমশাই বেঁচে ছিল ততদিন বেশি কষ্ট হয়নি। পড়াশোনায় যেমনই হোক, খাওয়াটা নিয়েই যত গণ্ডগোল ছিল।

তা বেশি ভাত খাওয়াটাও কোনও রকমে সে সহ্য করে নিয়েছিল। কিন্তু সে যে এত অপদার্থ তা সে কল্পনাও করতে পারেনি। কাশী দত্ত নিজে বি-এ পাশ করে একটা ছোটখাটো অফিসে চাকরি করছিল। ভেবেছিল মামাতো ভাইটাকেও যদি কোনও রকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করিয়ে নিজের অফিসে ঢুকিয়ে দিতে পারে তাহলে আর সংসারের বোঝাটা তার একলার ঘাড়ে আর অত ভারি হয়ে বসে না। মামাতো ভাইটা অন্ততঃ তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারে।

কাশী দত্ত তার অফিসের বড়বাবুকে বলেও রেখেছিল সে-ব্যাপারে।

বড়বাবু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা কাশী, তুমি বিয়ে করছো না কেন ? তোমারও তো বিয়ের বয়েস হয়ে গেল।

কাশী দত্ত বড়বাবুর প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—বিয়ে করলে খাওয়াবো কী বড়বাবু ? একশো কুড়ি টাকা বাড়ি ভাড়া, তারপর আমার ঘাড়ে আমার বিধবা মা তো আছেই। আর আপনারা মাইনে যা দেন তাতে তো এই বাজারে বেঁচে থাকাই দুষ্কর।

বড়বাবু জিজ্ঞেস করেছিল—তা মামাতো ভাই কী করে ?

কাশী দত্ত বলেছিল—কিছুই করে না, নাম মাত্তোর ইস্কুলে পড়ে। ইস্কুলের খাতায় কোনও রকমে নামটা আছে, মাসে মাসে মাইনেটাও দিয়ে যাচ্ছি। তার পরে কী কেষ্ট-বিষ্টু হবে তা জানি না। আপনি যদি পারেন তো একটা কিছু করে দিন না ভাইটার।

—কী করে দেব ?

—আমাদের অফিসেই একটা কোন চাকরি। যে-কোনও চাকরি হলেই চলবে। তার বেশি আমি কিছু চাই না। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তদ্দিন কোনও ভাবনা ছিল না, তিনি মারা যাবার পরই মুস্কিলে পড়েছি।

—তোমার ভাই কোন ক্লাশে পড়ে ?

—এই ক্লাশ নাইন হলো।

বড়বাবু বললে—তাহলে তো মেরে এনেছ ! এবার ম্যাট্রিকটা পাশ করলেই সাহেবকে বলে এখানে লাগিয়ে দেব। কী নাম বললে তোমার মামাতো ভাইএর ?

কাশী দত্ত বললে—সোহমসুন্দর রায়।

বড়বাবু বললে—নাম শুনে তো মনে হয় একেবারে লক্কা পায়রা হে, বয়েসকালে খেলবে ভালো। কে নাম রেখেছে ?

কাশী দত্ত বললে—আমার মামা খুব পণ্ডিত লোক ছিল। শুনেছি মামা নাকি সে-যুগে তিনটে সাবজেক্টে এম-এ পাশ করেছিল। কিন্তু বাঁচেনি বেশিদিন, মামীও প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল। আর মামা শুধু লেখা-পড়াই করে গেছে, কিছু টাকা রেখে যেতে পারেনি। যা টাকা উপায় করেছিল তা চেটে-পুটে খেয়ে ফুরিয়ে দিয়েছিল, নাবালক ছেলের জন্যে কিচ্ছুই রেখে যেতে পারেনি। এখন সেই ছেলে আর কোথাও যাবার জায়গা না পেয়ে পিসির ঘাড়ে এসে পড়েছে। পিসির ঘাড়ে মানেই আমার ঘাড়ে !

সব শুনে বড়বাবু বলেছিল—আচ্ছা সব তো শুনলুম, আমার মনে রইল, আগে ম্যাট্রিকটা পাশ করুক তখন ভাউচার-স্লিপে একটা টেম্পোরারি চাকরি করে দেব'খন। রোজ সাড়ে পাঁচ টাকা হিসেবে ভাউচার স্লিপে সই করে টাকা নেবে। নইলে জানো তো, আজকাল ইউনিয়ন-ব্যাটারা জান্ খেয়ে ফেলে একেবারে !

তা এই সব পাকা বন্দোবস্ত করে রেখেছিল কাশী দত্ত, কিন্তু ম্যাট্রিক ফেল করার খবর পেয়ে মনের রাগটা আর চাপতে পারেনি। একেবারে রাত্রে অফিস থেকে ফিরে খবরটা পেয়েই বাড়ি থেকে সোহমকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। একেবারে চিরকালের মত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

পিসিমা মনে একটু কষ্ট পেয়েছিল। বলেছিল—হ্যাঁ রে, তুই যে ওকে তাড়িয়ে দিলি, ও রাত্তিরে কোথায় থাকবে ?

কাশী বলেছিল—তুমি তাহলে ওর সঙ্গে যাও, দেখে এসো গিয়ে কোথায় রাত কাটায়। আমি ওকে আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতেও পারবো না, পড়াতেও পারবো না।

আজ এতদিন পরে যখন গাড়িটা ষাট-সত্তোর-আশী কিলোমিটার বেগে ছুটে চলেছে তখন পুরোন কথাগুলো কত আস্তে আস্তে কত ধীরে ধীরে পর্দার ওপর দিয়ে ছবির মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। রাস্তায় তখন ভিড় নেই। মিনি-বাসগুলো যে-যার গ্যারাজে গিয়ে পাখা গুটিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। কোথায় যাবে কার কাছে যাবে, কোথায় গিয়ে সে রাতটুকু কাটাবে সেইটেই ছিল তার প্রাথমিক সমস্যা। অনেকগুলো বন্ধুর কথা মনে পড়ল তার। সকলের বাড়িতে তাদের মাথার ওপর বাবা মা আছে, আত্মীয়স্বজন আছে, কিন্তু এমন কারো নাম তার মনে পড়লো না যে তাকে আশ্রয় দিতে পারে সেই রাতটুকুর জন্যে। শুধু রাতটুকু, তারপর সকাল হলে আবার সে কলকাতার কোথাও না-কোথাও একটা জায়গা খুঁজে নেবে। কাছাকাছি একটা পার্ক ছিল। সেই পার্কটার কথাই তার প্রথম মনে পড়লো। বহুদিনের পার্ক। কতদিন কতবার সে পার্কে গিয়ে বাস্কেট-বল খেলেছে সে। কিন্তু অনেকদিন পরে পার্কের ভেতরে ঢুকে দেখলে পার্কের আগেকার চেহারা বদলে গিয়েছে, সেখানে ঘাস নেই, গাছ নেই, বাগান নেই। বেঞ্চিও নেই। যাও বা দু'চারটে বেঞ্চি আছে তাও আধভাঙা। কালোয়ার আর গুণ্ডারা বেঞ্চ ভেঙে কাঠ-কুঠো বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বোধহয়

উনুনে দিয়ে রান্না করেছে। কিম্বা লোহা-লক্কড়ের দোকানে মোটা দামে বেচে দিয়েছে।

কোণের দিকে আধখানা বেঞ্চ তখনও আস্ত ছিল। তার ওপর হাত-পা গুটিয়ে কোনও রকমে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। সোহম্ বেঞ্চিটার কাছে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করবার জন্যে একটুখানি নজর দিলে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ভেতর থেকে কয়েকজন মানুষের গলা শোনা গেল।

কে যেন জিজ্ঞেস করলে—কী নেবেন? মাল?

চমকে উঠল সোহম্। বাগানের গাছের ঝোপের ভেতরে যে কেউ থাকতে পারে তা সে কল্পনা করতেও পারেনি।

যারা অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল তারা এবার একটু বাইরে আংশিক প্রকাশমান হলো।

বললে—এখানে ভেজালের কারবার নেই, ক' বোতল লাগবে তাই শুধু বলে দিন।

এবার সোহম বললে—আমি বোতল চাই না, আমি এখানে শুধু শুতে এসেছিলাম, কিন্তু বেঞ্চিটা তো দেখছি আবার ভাঙা।

লোকগুলো হয়ত হতাশ হলো সোহমের কথা শুনে, অদৃশ্য কাকে উদ্দেশ করে গালাগালি দিতে দিতে বললে—শালা দেশের বারোটা বেজে গেছে, সব শালা চোর ডাকাত হলে দেশ কি করে চলে? বেঞ্চিগুলো পর্যন্ত শালারা ভেঙে নিয়ে যাবে?

সোহম আর এক মিনিটও দাঁড়ালো না সেখানে। ভূতের মুখে রাম-নামের মত শোনালো তাদের কথাগুলো। কিন্তু কোথায়ই বা যায় সে?

মনে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকানির মত প্রফুল্লর নামটা মনে পড়ে গিয়েছিল। প্রফুল্ল দে। মনে পড়ার সুবিধেটা ছিল এই যে সেখানে তার বাড়িতে গেলে রাতটার মত অন্ততঃ একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে! আর একটা মস্ত সুবিধে এই যে এক বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই তার। তাও মা থাকে ভেতরের একখানা ঘরে। আর সামনের একটা টিনের চালের ঘরে সে একলা থাকে। তার সঙ্গে ভেতর-বাড়ির কোনও সম্পর্ক নেই। আর প্রফুল্ল থাকেও একটা বস্তি-পাড়ার মধ্যে!

একেবারে দরজার সামনে গিয়ে সোহম্ টোকা মারলে—প্রফুল্ল, প্রফুল্ল—

—কে?

বলতে গেলে এক ডাকেই উঠে পড়েছে প্রফুল্ল। তারপর হ্যারিকেনটা জেলে দরজা খুলে দিয়েছে।

বললে—কী রে সোহম্, তুই? এত রাত্তিরে কী করতে?

সোহম্ বললে—আমার দাদা ভাই আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—

—কেন? কী করেছিস তুই?

—আমি ফেল করেছি, ভাই। ফেল করেছি শুনে কাশীদা আমাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। তাই তোর কাছে এলুম। একটা রাত তোর বাড়িতে আমাকে থাকতে দিতে পারিস?

প্রফুল্ল বললে—তুই ফেল করলি কেন ? আমি তো পাশ করে গেছি। তুই আমাকে আগে জানালি না কেন, তাহলে ভোলাদা'কে বলে তোকেও আমি পাশ করিয়ে দিতে পারতুম !

অবাক হয়ে গেল সোহম প্রফুল্লর কথা শুনে। বললে—ভোলাদা ? সে কে ?

সত্যিই ভোলাদা ছিল তখনকার দিনে সেই দক্ষিণ কলকাতার এক অদ্ভুত-কর্মা পুরুষ। অগতির গতি, আর্তের পরিত্রাতা পতিত-পাবন। যারা একজামিনের অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে তাদের উদ্ধার করতে ভোলাদা ছিল মুক্তহস্ত। টাকা বেশি নিত না। তিনশো টাকা করে রেট করে দিয়েছিল। প্রত্যেক এ্যান্সার-পেপারের মজুরি পিছু তিরিশ টাকা। যে যে-সাবজেক্টে উইক সে সেই বিষয়ের জন্যে তিরিশ টাকা দিলেই তাকে ভব-সাগর পার করিয়ে দেবে ভোলাদা। আগে সোহম্ জানতো না। ওই প্রফুল্লই প্রথম সন্ধান দিয়েছিল ভোলাদার।

সেই অত রাত্রে সোহম্ প্রফুল্লর কাছে গিয়ে শুধু বকুনিই খেলে। বললে এসেছিস যখন তখন থাক তুই আমার বাড়িতে। আমার তো ঘর পড়ে রয়েছে, আর এই তক্তপোষে তিনজনও শোওয়া যায়, কিন্তু তোর ফেল করতে লজ্জা করলো না ? আমি তো ভোলাদাকে তিনশো টাকা দিয়ে পাশ করে গেলাম।

সোহম্ বললে—আমি তো ভোলাদার কথা জানতুম না !

প্রফুল্ল বললে—তুই একটা আস্ত হাবাকান্ত। এযুগে যারা হাবাকান্ত, তারাই শুধু ফেল করে।

সোহম্ বললে—কিন্তু অত টাকা তো আমার নেই, আমার অত টাকা ছিলও না ! অত টাকা আমি দিতেও পারতুম না।

প্রফুল্ল বললে—তুই আমাকে অবাক করলি। টাকা তো নগদ দিতে হয় না ! কিস্তিতে দিলেও চলে। ভোলাদা তো টাকা উপায় করবার জন্য এ-ব্যবস্থা করছে না রে। শুধু পরের উপকার করবার জন্যেই এটা করছে। নইলে ভোলাদার বয়ে গেছে এ কারবার করতে। তার কি টাকার অভাব ?

সোহম্ বললে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, এখন কী করবো তাই বল আমাকে—

প্রফুল্ল বললে—এখন কাল সকালেই ভোলাদার কাছে যেতে হবে। তা খেয়েছিস তুই কিছু ?

সোহম বললে—না ভাই, কাশীদা আমাকে খেতে বসবার আগেই বাড়ি থেকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। তারপর ভেবেছিলাম পার্কে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে শুয়ে নেব। কিন্তু আশ্চর্য, যে-কটা আস্ত বেঞ্চি ছিল সব ভর্তি। একটা ভাঙা বেঞ্চিতে শুতে গেলুম, দেখি সেখানে একদল মাতাল আমাকে খদ্দের ভেবে বোতল নিয়ে বেচতে এল, আমি ভাই ভয় পেয়ে গেলুম, তখন তোর কথা মনে পড়ে গেল—

তাহলে কিছুই খাসনি তুই ? তাহলে দেখি বাড়িতে কিছু আছে কিনা, মাকে জিজ্ঞেস করে আসি।

প্রফুল্ল তাকে রেখে ভেতরে চলে গেল। প্রফুল্লর ঘর থেকে ভেতরের বাড়িতে

যেতে গেলে খানিকটা উঠোন পেরোতে হয়। অত রাত্রে প্রফুল্ল তার বিধবা মা'কে জাগিয়ে এক কাঁশি মুড়ি নিয়ে এল কোনও রকমে। তার বেশি কিছু ছিলও না বাড়িতে।

সোহম্ বললে—মুড়ি? মুড়ি বাড়িতে ছিল? মুড়ি খেতে আমার খুব ভালো লাগে ভাই।

কাঁশিতে করে মুড়ি ক'টা এক মিনিটেই শেষ করে ফেললে সোহম্।

প্রফুল্ল বললে—ওর সঙ্গে ছোলা ভাজা হলে আরো ভালো হতো, কিন্তু এত দেরিতে ছোলাভাজাই বা কোথায় পাবো!

মনে আছে পরদিন খুব সকালেই প্রফুল্ল ঘুম থেকে ডেকে দিয়েছিল সোহম্‌কে। বললে—ওঠ, ওঠ, ওঠ, এখুনি উঠে পড়, এখুনি বেরোতে হবে।

— কোথায় যাবি?

—ভোলাদার কাছে। বেশি দেরি হয়ে গেলে আবার ভোলাদা বেরিয়ে যাবে কোথায় তার ঠিকানা নেই।

সোহম্ বললে—যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন তো আর তোর ভোলাদা পাশ করিয়ে দিতে পারবে না।

প্রফুল্ল বললে - ভোলাদা সব পারবে। কত ছেলে এক্‌জামিনই দিলে না, ভোলাদা তাদেরও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট করিয়ে দিলে। তারপর সেই সার্টিফিকেট দেখিয়ে কত ছেলে এখন হাজার-হাজার টাকা মাইনের চাকরি করছে, তা জানিস?

—জাল সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে নাকি তোর ভোলাদা?

প্রফুল্ল বললে—দূর, তুই একটা গাধা, শুধু গাধা নয় ইস্টুপিড্, আজকাল তো সবই 'জাল'। খাঁটি কোন্ জিনিসটা পাবি তুই?

সোহম্ একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গেল। বললে -- তা বলে জাল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করা তো অন্যায়।

সোহমের কথা শুনে প্রফুল্ল খুব চটে গেল। বলে উঠল -- এই জন্যেই তো তুই এক্‌জামিনে ফেল করলি। আগেকার যুগের সেই সব আদর্শ নিয়ে তুই যত-দিন থাকবি ততদিন বরাবর কেবল ফেলই করে যাবি, এই তোকে বলে রাখলুম। আমি তোকে আবার বলছি এ-যুগে যারা ফেল করে তারা হাবাকান্ত। জানিস, আগেকার যুগে লোকে যা যা বিশ্বাস করত আজকাল তা সব উলটে গেছে। এই দ্যাখ্ না, আমাদের বাড়িতে ঢোকার মুখে মোড়ের মাথায় যে বড় বাড়িটা আছে ওটা কার বাড়ি জানিস? ভদ্রলোক পলিটিকস্ করত, ইউনিয়ন করত। ইউনিয়ন করলে যত টাকা আসে, চাকরি করে অত টাকা আসে কখনও?

সোহম্ বোকার মত জিজ্ঞেস করেছিল—ইউনিয়ন তো দেশ সেবা। ইউনিয়ন করলেও টাকা হয় নাকি?

প্রফুল্ল রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, তোর সঙ্গে আর কথা বলব না, একটা আকাট মুখ্যু তুই। তুই এখন ঘুমো।

ওদিকে বাড়িতে স্থান নেই, এদিকে প্রফুল্লর কাছেও বকুনি, এই অবস্থায় ঘুম

কখনও আসে ? কিন্তু জৈব দাবীকে ক'জন অস্বীকার করতে পারে ? কখন যে সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিল তার খেয়ালই ছিল না। যখন প্রফুল্লর ডাকে তার ঘুম ভাঙল তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। সোহম্‌ ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠে বসল।

উনবিংশ শতাব্দীর যে-শিক্ষা যে-আদর্শ মানুষকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করতে শিখিয়েছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের পর সে-শিক্ষা সে-আদর্শ যে কোথায় চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তা আর কেউ সন্ধান করেও দেখে না। সন্ধান করেও দেখে না সে-আদর্শের পেছনে কোনও সত্য ছিল কি না। আর সন্ধান করার দরকারই বা কী ? একটা সুইচ টিপলে যদি হঠাৎ এপ্রিল-মাসের গরমের দিনে ঘরের ভেতরে ডিসেম্বরের শীত নেমে আসে তাহলে এমন নির্বোধ কে আছে যে সে আদর্শের পরোয়া করবে ?

সোহমের মনে আছে ভোলাদাকে। অদ্ভুত করিতকর্মা লোক ওই ভোলাদা। রাইটার্স বিল্‌ডিং থেকে সুরু করে হায়ার সেকেণ্ডারি বোর্ডের অফিস পর্যন্ত সর্বত্র তার গতিবিধি। আসলে ভোলাদার আসল কাজটা যে কি তা কেউ জানত না। অথচ বাড়ি তৈরি করতে কেউ সিমেন্ট পাচ্ছে না। তো ভোলাদাকে বল, তোমার বাড়িতে টন্‌ টন্‌ সিমেণ্ট পাইয়ে দেবে। ফেল করা ছেলেকে পাশ করিয়ে দেওয়া তো ভোলাদার পক্ষে সোজা কাজ ! আর তা ছাড়াও কোথাও চাকরি পাইয়ে দেওয়াটা ভোলাদার হাতের আঙুলের ডগায়। ভোলাদা আজ যাচ্ছে যুগোশ্লোভিয়া, কাল যাচ্ছে ওয়েস্ট্‌-জার্মানী। আবার খেলার জগতেও ভোলাদার অপ্রতিহত ক্ষমতা। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল খেলা হবে, তার টিকিট চাও ? তাহলে একবার ভোলাদাকে গিয়ে ধর, পেয়ে যাবে ! আসলে ভোলাদা যে কোন্‌ পার্টির লোক তা জানা যাবে না। সব পার্টির সব লীডার ভোলাদার হাতের মুঠোয়। তুমি গভর্মেণ্ট হাউসিং স্কীমে বাড়ি চাও ? কিম্বা মস্কো যাবার ভিসা ? সব পাবে তুমি। শুধু কিছু টাকা দিতে হবে। ভোলাদা নিজের জন্যে একটা কানা-কড়িও নেবে না। তবে ভোলাদার গুরুদেবের আশ্রমের সাহায্যের জন্যে কিছু টাকা চাঁদা হিসেবে দিতে হবে।

প্রফুল্ল বললে—এ তো চাঁদা দিতে পারবে না, এখন এর কাছে কিছুই নেই। একে এর পিসতুতো ভাই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এর থাকবার জায়গা পর্যন্ত নেই। এ এখন কাল রাত্তিরে আমার বাড়িতে এসে উঠেছে —

ভোলাদা বললে—তাহলে তোর ওখানে ওকে কিছুদিনের জন্যে রেখে দে। আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি, আজকেই আমি ওয়েস্ট্‌-জার্মানী যাচ্ছি। সেখান থেকে এসে সব কিছু বন্দোবস্ত করে দেব।

প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করলে - কবে কলকাতায় ফিরবে ?

ভোলাদা বললে মাসখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব। বেশি দেরি হবে না। আমি ফিরে এসে সব ঠিক করে দেব।

প্রফুল্ল বললে—আমাকে যেমন করে পাশ করিয়ে দিয়েছ, একেও ঠিক তেমনি দিতে হবে কিন্তু!

ভোলাদা কোনও কিছুতেই কোনও দিন 'না' বলে না।

বললে হবে হবে। তোর ভোলাদা যখন কথা দিয়েছে তখন করে দেবেই। শুধু আর কটা দিন সবুর কর --

তখন আর বেশিক্ষণ কথা বলবার সময় ছিল না। ভোলাদাকে তৈরি হতে হবে। ভোলাদা কাজের লোক। অনেক ঝামেলা নিয়ে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। শুধু তো গরীব ছাত্রদের উপকার করা নয়, তার ওপর তার গুরুদেবের আশ্রম আছে। সেই আশ্রমের জন্যে সারা পৃথিবী থেকে চাঁদা তুলতে হয়। সে-আশ্রমের হাসপাতাল আছে, স্কুল আছে। সেখানকার অনেক শিষ্য আছে, তাদের ভরণ-পোষণ আছে।

মনে আছে সেই সব দিনের হতাশার কথা। প্রফুল্ল ছিল বলে অন্ততঃ মাথা গোঁজবার একটা জায়গা ছিল তার। খাওয়াটা হোক আর না-হোক, অন্ততঃ শোবার মত মাথা গোঁজবার একটা জায়গা তো হয়েছিল তার। মানুষের জীবনে খাওয়ার চেয়ে আশ্রয়টাই তো আরো বড় জিনিস।

প্রফুল্ল বললে—তুই একটা কাজ কর্ --

—কি কাজ ?

—ক্ষেত্রবাবু তো তোকে খুব ভালবাসে। তার কাছে তুই একবার যা!

সোহম বললে—তা তো ভালবাসতেন। কিন্তু ফেল করার পর তাঁর কাছে মুখ দেখাব কী করে ?

প্রফুল্ল বললে—তুই একবার সেখানে গিয়ে দেখ্ না। গিয়ে প্রথমে পা ধরে ক্ষমা চাইবি। গিয়ে সব কথা বলবি। বলবি তোর দাদা তোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাহলে দেখবি একবার গলে জল হয়ে যাবে।

আমি কী চাইবো তাঁর কাছে ?

—তুই বলবি তোর টাকা চাই। ক্ষেত্রবাবুর অনেক লোকের সঙ্গে জানা-শোনা আছে। তোকে টিউশনি যোগাড় করে দিতে পারবে। তুই তাকে সেই কথা গিয়ে বল্ না।

মনে আছে ক্ষেত্রবাবু তাকে খুব খাতির করে সামনে বসিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কেন, তুমি ফেল করলে কেন ? তোমার পড়াশোনা হয়নি ?

সোহম্ বলেছিল—না স্যার—

—কেন, তোমার পড়াশোনা হয়নি কেন ? কিছু অসুবিধে হয়েছিল ?

—হ্যাঁ স্যার। পিসেমশাই মারা যাবার পর আমার পিসতুতো দাদা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।

—কেন ? তোমার পিসতুতো দাদার রাগ ছিল কেন তোমার ওপর ? তুমি

কী চেয়েছিলে ?

সোহম্‌ বলেছিল—আমি স্যার বড্ড বেশি ভাত খেতুম।

—তা বেশি ভাত খেলে দোষ কী ?

—তা জানি না স্যার।

—তা এখন কী করবে তুমি ? এখন কোথায় আছো ?

সোহম্‌ বলেছিল—এখন আমার এক বন্ধু প্রফুল্লর বাড়িতে আছি। আজকে তাদের বাড়িতেই খেয়েছি। কিন্তু এবার কিছু টাকা উপায় না করলে আর চলবে না। আপনি যদি কিছু ছেলে পড়াবার কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন তাহলে আমার খুব উপকার হয়। নিচের ক্লাসের ছেলেদের আমি পড়াতে পারব ভাল করে। আর তার বদলে যদি থাওয়া-থাকা পাই তাহলে আমার আর কিছুরই দরকার নেই।

তা সেই-ই হলো সূত্রপাত !

মনে আছে সেদিন চার জায়গায় চিঠি লিখে দিয়েছিলেন ক্ষেত্রবাবু। চার জায়গাতেই তার ছেলে পড়ানোর চাকরি হয়েছিল। এক এক জায়গায় পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে। বাচ্চারা সবাই ক্লাশ টু-থ্রির ছাত্র। সোহম্‌কে সেখানে চাকরি দেওয়া মানে ক্ষেত্রবাবুকে সম্মান দেখানো। ক্ষেত্রবাবুর অনুরোধ এড়ানো তাদের পক্ষে শক্ত।

কিন্তু চিঠি দেবার পরে ক্ষেত্রবাবু সোহম্‌কে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা আজও তার মনে আছে। বলেছিলেন—একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে তুমি ?

—কী প্রশ্ন, বলুন স্যার।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—বল তো পৃথিবীতে সব চেয়ে আদর্শ শিক্ষক কে ?

সোহম্‌ প্রশ্নটা শুনে আকাশ-পাতাল কিছুই বুঝতে পারে নি। তার মতে স্কুলের হেড্‌মাস্টারই তো সকলের কাছে আদর্শ শিক্ষক !

অনেক ভাবার পর সোহম্‌ বলেছিল—আমি আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না স্যার।

ক্ষেত্রবাবু সত্যিই কেন জানি না সোহম্‌কে ভালবেসে ফেলেছিলেন। বললেন —এই সহজ প্রশ্নটা বুঝতে পারলে না ? আমি জিজ্ঞেস করছি কে মানুষের কাছে সব চেয়ে আদর্শ শিক্ষক ? কোন্‌ শিক্ষকের কাছে লেখা-পড়া শিখলে মানুষ জীবনে সত্যিকারের মানুষ হয় ?

কথাটা অনেকক্ষণ ভেবেছিল সে, তবু কোনও উত্তর দিতে পারেনি।

—বলতে পারলে না তো ?

বলে নিজেই জবাবটা বলে দিলেন। বললেন—তবে শুনে নাও। অতীত। অতীতই মানুষের কাছে সব চেয়ে আদর্শ শিক্ষক। অতীতের কাছ থেকে শিক্ষার পাঠ নিতে জানলে তবেই মানুষ জীবনে বড় মানুষ হতে পারে। যে অতীত জানে না সে বর্তমানও জানে না, ভবিষ্যৎও জানে না। অতীতই মানুষকে চরিত্রবান হতে শেখায়। অতীতই বহু বিখ্যাত মানুষের জীবনের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে

দেয় যে যার চরিত্র আছে সে জীবন-যুদ্ধে জিতবেই। অতীতই আমাদের শেখায় চরিত্র যার নেই তার কিছুই নেই। অতীতই বর্তমানের একমাত্র মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষের কাছে যে শিক্ষা-গ্রহণ করেছে সে কখনও ঠকেনি, সে বরাবর জিতবেই।

ক্ষেত্রবাবু কথাগুলো বলে চলেছিলেন। আর সোহম্ সেদিন একমনে তাই শুনে চলেছিল।

—আমার কথা বুঝতে পারছ কিছু ?

সোহম্ তখন ছোট। এখনকার মত টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানির ডাইরেক্টর হয়নি। তখন জানত না যীশুখ্রীষ্টের ছ'শো বছর আগে সোক্রেটিস নামে একজন মানুষ ছিল যিনি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখের সামনে দাঁড়িয়েও বলতে পেরেছিলেন যে, যে চরিত্রবান সৎ মানুষ তার ক্ষতি করতে পারে এমন মানুষ কেউ নেই। তিনিই বলে গিয়েছিলেন—"And this one thing hold fast, gentlemen of the Jury as to death, that to a good man no evil can happen, whether alive or dead." তারপর যাঁর ছবি পৃথিবীর মানুষের ঘরে ঘরে দেওয়ালে টাঙানো থাকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে কাঠের ফলকে পেরেকে গেঁথে খুন করা হয়েছিল। তার সঙ্গে আরো দু'জন চোরকেও তাঁর সঙ্গে খুন করা হয়েছিল ওই একই ভাবে। কিন্তু তাতে কী ? সেই অতীতের বড় ঘটনাটা আজকের মানুষের কাছে এই শিক্ষাই হয়ে আছে যে তার মত আদর্শ শিক্ষক আর দ্বিতীয় কেউ নেই। ওরই নাম তো অতীত !

কথাগুলো শুনতে শুনতে সোহমের চোখ দুটো বোধ হয় ছল্-ছল্ করে উঠেছিল।

ক্ষেত্রবাবু বলেছিলেন—তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন ? তুমি কাঁদছো নাকি ?

সোহম্ দুই হাত দিয়ে চোখ মুছে বলেছিল—না স্যার, কাঁদছি না।

ক্ষেত্রবাবু বলেছিলেন—না, কেঁদো না, আমি তোমার ভালোর জন্যেই কথা-গুলো বলছি। আমি তোমাকে কথাগুলো এইজন্যে বলছি যে যাতে তুমি চরিত্রবান হও। ম্যাট্রিক ফেল করলে কি পাশ করলে সেটা বড় কথা নয়, জীবনে চরিত্রবান হওয়াটাই বড় কথা। চরিত্র থাকলে তোমার সব থাকবে আর চরিত্র গেলে তোমার সব যাবে। আমার এই কথাগুলো বরাবর মনে রাখবে। এখন যাও, ওই চিঠিগুলো নিয়ে যাও। এদের কাছে গেলে তুমি ছাত্র পড়াবার চাকরি পাবে, আর সেই চাকরির টাকা পেয়ে তুমি একদিন আরো বড় পরীক্ষায় পাশ করে আরো বড় চাকরি করবে।

সেদিন ক্ষেত্রবাবু যা বলেছিলেন আজ তাই-ই তার হয়েছে। সে টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানির ডাইরেক্টর হয়েছে।

কিন্তু চরিত্র ?

কথাটা একটা বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত তার চোখের সামনে ঝুলতে লাগলো। সে জোরে জোরে গাড়িটা চালাচ্ছে আর জিজ্ঞাসার চিহ্নটাও তার

চোখের সামনে ঝুলতে ঝুলতে চলতে লাগলো। সত্যিই, সে কি চরিত্রবান হয়েছে? সে কি চরিত্রবান হতে পেরেছে?

সোহম্‌ এবার গাড়ির এ্যাকসিলেটারে আরো জোরে চাপ দিলে। গাড়িটা যেন রকেটের মত আরো জোরে ছুটে চলতে লাগলো লোয়ার সার্কুলার রোড লক্ষ্য করে। প্রশ্ন-চিহ্নটা তখনও তার চোখের সামনে ঝুলতে ঝুলতে চলতে লাগলো।

সামান্য একটা স্লিপ্‌। চাপরাসীর দিকে চেয়ে সোহম্‌ বললে—বোল্‌ দেও, মুলাকাৎ নেহি হোগা, আভি মেরা টাইম নেহি হ্যায়—

চাপরাসী হুকুমের চাকর। সে হুকুম পেয়ে সেই হুকুম তালিম করতে চলে গেল। অতীতের সমস্ত কথাগুলো তার মনে পড়তে লাগলো। দাদা হয়ত তার ওপর খুব রাগ করবে। তার আপন পিস্‌তুতো দাদা। কাশীনাথ দত্ত। কিন্তু তা করুক। যত ইচ্ছে রাগ করুক। আজ তাতে তার আর কিছু এসে যায় না। সেই দাদা সেদিন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ আর সে তাকে টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্‌ কোম্পানির অফিস থেকে তাড়াতে পারবে না। হাজার চেষ্টা করলেও পারবে না। বরং উল্টো। সোহম্‌ই কাশী দত্তকে ইচ্ছে করলে চাপরাসীকে দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারে। এত তার ক্ষমতা!

কিন্তু এত ক্ষমতা তার হলো কী করে?

সে কি তার চরিত্র?

সে-সব কথা তখন আর তার ভাববার সময় নেই। চাপরাসী এসে একগাদা ফাইল দিয়ে গেল তার টেবিলে। সেই ফাইলের মধ্যেই তার সমস্ত সত্তা ডুবে গেল।

অফিসের ছুটি হলেই সোহমের কাজ শেষ হয় না। তাকে কাজ ছেড়ে উঠতে দেয় না তার অফিস। দুশো পঁচাত্তর টাকায় ঢুকে তখন সে অফিসের ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছে। তা হতে গিয়ে তাকে কী মূল্য দিতে হয়েছে তার খবর বাইরের লোক কেউ জানে না। তা না জানুক, তাতে তার কিছু আসে যায় না। তা না জানাই ভালো।

কিন্তু সেই ওয়েলফেয়ার অফিসারের পোস্টে আটকে থাকলে তার চলবে না। তাকে আরো উঁচুতে উঠতে হবে। আরো আরো উঁচুতে। তাই বার বার ম্যানেজিং-ডাইরেক্টারের কথাগুলো তার মনে পড়তে লাগলো। মিস্টার সেনের গলার আওয়াজটা আবার ভেসে উঠলো—ইউ আর এ লাকি চ্যাপ্‌ রায়, ইউ হ্যাভ গট্‌ এ লাকি পার্টনার ইন্‌ লাইফ্‌—

সত্যিই সে ভাগ্যবান। স্ত্রীর দিক থেকে সে ভাগ্যবান। পি-বি-দাশবাবুর মেয়েকে বিয়ে করাটাই হয়েছিল তার পক্ষে এক সৌভাগ্য।

—ডাজ্ সি ড্রিংক ? আপনার স্ত্রী কি মদ খান ?

সোহম্ বলেছিল —নো স্যার।

—কেন ? হোয়াই নট্ ? ড্রিংক করা কি ভাইস্ ? ড্রিংক করা কি পাপ ?

—না স্যার।

—আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে তো ক্লাবে যান ?

—না।

—কেন ? আপনি যখন ক্লাবে যান তখন আপনার স্ত্রী কী করেন ? একলা বাড়িতে থাকেন ?

—না স্যার, আমার স্ত্রীর খুব পুজো করার বাতিক আছে। তিনি পুজো করেন।

—পুজো ? কী পুজো ?

সোহম্ বলেছিল—শিবপুজো। বিয়ের আগে থেকে তার মা তাকে শিবপুজো করতে শিখিয়েছিলেন, সেই শিবপুজো অভ্যাসটা তাঁর এখনও আছে। ওটা ছাড়ে নি—

মিস্টার সেন অবাক হয়ে সোহমের দিকে চেয়ে রইলেন। যেন এমন অদ্ভুত ঘটনা তিনি জীবনে এই প্রথম শুনলেন।

বললেন —আপনি সত্যিই আমাকে অবাক করলেন মিস্টার রায়। এই স্পেস্-ফ্লাইটের যুগে যখন মানুষ চাঁদে যাচ্ছে, যখন পুরো দুনিয়াটা মানুষ নিজের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে, যখন মানুষ জুপিটারে পেঁৗছোবার জন্যে পাড়ি দিয়েছে, তখন আপনি আপনার স্ত্রীর এই সব কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন ?

সোহম্ চুপ করে রইল।

মিস্টার সেন আবার বলতে লাগলেন —না না মিস্টার রায়, আপনার ওয়াইফ্‌কে এ-রকম প্রশ্রয় দেবেন না। এতে আপনারও ভাল হবে না, আপনার স্ত্রীরও ভাল হবে না। আপনি নিজে দেখছেন আমরা এখন উপনিষদ বেদ রামায়ণ মহাভারতের যুগ অতিক্রম করে কত দূরে এগিয়ে এসেছি। এখন টেক্‌নোলজির যুগ। টেক্‌নোলজিই এখন ভগবান, এই টেক্‌নোলজিই মানুষকে একদিন স্বর্গের কাছাকাছি নিয়ে যাবে। এই টেক্‌নোলজির জন্যেই আপনি এখন কলকাতার গরমে দার্জিলিং-এর সুখভোগ করছেন। আর আপনার স্ত্রী কিনা এখনও শিব-পুজো করছেন ? আপনি তাঁকে ক্লাবে নিয়ে যাবেন। প্রথম প্রথম তিনি আপত্তি করলেও আপনি শুনবেন না। জোর করে তাঁকে ক্লাবে নিয়ে যাবেন। দেখবেন আস্তে আস্তে ও-সব বাতিক চলে গেছে—। এমন সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছেন আর তাঁকে সকলকে দেখাবেন না ? তাতে তো আমাদের কোম্পানির বিজনেস বাড়বে! ইউ মাস্ট্ ক্যাপিট্যালাইজ হার, ইউ মাস্ট্ ! তাতে আপনার কেরিয়ারেরও উন্নতি হবে। জানেন না, এ বিউটিফুল ওয়াইফ্ ইজ্ এ প্রফিটেবল্ ইন্‌ভেস্ট্‌মেন্ট্ !

সোহম্ বলেছিল—ঠিক আছে মিস্টার সেন, আপনি যা বলেছেন আমি তাই-ই করব. আমি আজই গেট ঈস্টার্ন ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাব।

মিস্টার সেন বলেছিলেন—হ্যাঁ, যদি মিস্টার প্যাটেলকে হাত করে মিডল-ঈস্টের কিছু অর্ডার আমাদের কোম্পানিতে ডাইভার্ট করিয়ে নিতে পারেন তো আপনাকে আমি পার্সোনেল অফিসার করে নেব—

অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাবার পথে সোহম্ মনে মনে আবার কথাগুলো আউড়ে নিতে লাগল। প্রথমে ক্লার্ক, দুশো পঁচাত্তর টাকার মাইনের ক্লার্ক, তার পর তা থেকে ওয়েলফেয়ার অফিসার। বলতে গেলে সমস্তই সেই ক্ষেত্রবাবুর কল্যাণে!

কিন্তু চরিত্র?

ওটা থাক। ওই চরিত্রের কথাটা এখন ধামা-চাপা থাক। সেটা তো বাইরে থেকে কেউ দেখতে পায় না। ফরসা দামী সুটের আড়ালে ও-সব কেনই বা দেখতে চাইবে আর কে-ই বা দেখতে পাবে?

অন্য দিনের চেয়ে আগেই সোহম্ বাড়িতে এসে পৌঁছল। এসে গাড়িটা গ্যারাজে পুরে রেখে দিলে। তারপর বাড়ির সদর দরজায় কলিং-বেলটা বাজাতেই রতন দরজা খুলে দিলে।

এত সকালে সাহেব কোনও দিন বাড়ি আসে না, তাই সাহেবকে দেখে রতন একটু অবাক হয়ে গেল। তার মানে তাকে তখন সব কাজ ফেলে রেখে সাহেবের চা-টোস্ট্ করতে হবে।

সোহম্ দাঁড়িয়ে ছিল, রতন সোহমের গা থেকে কোটটা সন্তর্পণে খুলে নিয়ে তার ওয়ার্ডরোবে রেখে দিতে গেল। এটা রতনের রোজকার ডিউটি।

কিন্তু হঠাৎ ধুপ্-ধুনোর গন্ধ নাকে আসতেই সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে, মেমসাহেব কোথায় রে? কী করছে?

রতন বললে—মেমসাহেব পুজো করছেন সাব!

—পুজো? এখন পুজো? এই সময়ে?

রতন বললে—হ্যাঁ, হুজুর, ডেকে দেব?

—না—তুই যা—

বলে সোহম্ নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ধুপ্-ধুনোর গন্ধ তখন আরো তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে নাকে এসে লাগল। সোহম্ জানত সুমিত্রা রোজ শিব-পুজো করে। কিন্তু সে তো সকালে, খুব ভোরে। সোহম্ ঘুম থেকে ওঠবার অনেক আগে। অত ভোরে উঠে স্নান করে নিয়ে পুজো করে। সুমিত্রার মুখেই সোহম্ শুনেছে সে-কথা। কিন্তু সে-পুজো যে সে বিকেলেও করে তা সে জানত না। তাই রতনের কথায় সে একটু অবাক হয়ে গেল। সত্যিই তো, মিস্টার সেন তো ঠিকই বলেছেন, এই স্পেস্-ফ্লাইটের যুগে এইসব পুজো-টুজো তো কুসংস্কার! এখন তো টেক্নোলজিই ভগবান। এই কলকাতার গরমে ঘরের মধ্যে যে দার্জিলিং-এর আবহাওয়া ভোগ করছে, এও তো সেই টেক্নোলজিরই কল্যাণে! এত সুন্দরী বউ পেয়েছে সোহম্, সে কি শুধু ঘরের মধ্যে সকলের চোখের আড়ালে ঝরে পড়ে নষ্ট হবার জন্যে? ইউ মাস্ট্ ক্যাপিট্যালাইজ হার, ইউ মাস্ট্! জোর করে তাঁকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখাবেন! তাতে

আমাদের কোম্পানির বিজ্‌নেস বাড়বে। আর তাতে আপনার কেরিয়ারেরও উন্নতি হবে। জানেন না যে, এ বিউটিফুল ওয়াইফ্‌ ইজ্‌ এ প্রফিটেবল্‌ ইন্‌ভেস্ট্‌মেণ্ট! মদ খাওয়া কি পাপ? মদ খাওয়া যদি পাপই হতো তো গভর্মেণ্ট মদের লাইসেন্স দিচ্ছে কেন লোকদের? পৃথিবীর কোনও গভর্মেণ্ট্‌ মদ খাওয়া বন্ধ করতে পেরেছে? যে গভর্মেণ্ট মদ খাওয়া বন্ধ করতে চেয়েছে সে গভর্মেণ্টই ফল্‌ করেছে। সে আমেরিকাই হোক আর ইণ্ডিয়াই হোক! কেন? তার কারণ কী? তা কি কখনও ভেবেছেন?

হঠাৎ বোধ হয় রতনের কাছ থেকে খবর পেয়ে সুমিত্রা দৌড়ে ঘরে এল।

বললে—ওমা, তুমি হঠাৎ এত সকাল সকাল?

সোহম্‌ কিছু বললে না, শুধু একবার সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

সেই সুমিত্রা! পি-বি-দাশবাবুর মেয়ে। একদিন পি-বি-দাশবাবু তাকে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে টিফিন খাইয়েছিলেন। সেই টাকা শোধ দিতে সোহম্‌ পি-বি-দাশবাবুর বাড়িতে গিয়েছিল সে-কথাও সোহমের মনে পড়ল!

সুমিত্রা বললে—দাঁড়াও, তোমার চা নিয়ে আসছি—

সোহম্‌ বললে—না যেও না, দাঁড়াও, ও রতন নিয়ে আসবে। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, জরুরী কথা—

সুমিত্রা বললে—কী কথা? আবার বুঝি সেই মেহেরালি সাহেব এসেছিল? ও-সব ফাটকা বাজারে কেন তুমি টাকা ঢালো? ও তো জুয়ো খেলা।

সোহম্‌ সুমিত্রার হাতটা ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সুমিত্রা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে।

বললে—আমি পুজোর কাপড় পরে আছি। আমাকে ছুঁয়ো না, আমি কাপড়টা বদলে আসি গে—

কিন্তু সোহম্‌ তার আপত্তি শুনলে না। খপ্‌ করে সুমিত্রার হাতটা ধরে ফেললে।

সুমিত্রা বললে—ওমা, করলে কী, করলে কী, ছুঁয়ে দিলে?

সোহম্‌ বললে—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।

—কী কাজ?

—মদ খেতে পারবে?

—মদ?

হঠাৎ রতন চা নিয়ে এসে হাজির হলো। কোথায় সুমিত্রা; এতক্ষণ কি তাহলে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিল সে? সোহম্‌ চায়ের কাপটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—মেমসাহেবকে খবর দিয়েছিস তুই?

রতন বললে—হ্যাঁ হুজুর, মেমসাহেব বললেন তিনি পুজো সেরে এখখুনি আসছেন, বেশি দেরি হবে না—

সোহম্‌ একলা-একলাই চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলো। অন্যদিন হলে সুমিত্রাও এসে তাকে সঙ্গ দিত। চা খেতে খেতে দু'জনে নানা গল্প হতো। আজ সে অন্য দিনের চেয়ে সকাল-সকাল বাড়িতে এসেছে। এ-সময়ে তার বাড়িতে

আসাটা অস্বাভাবিক। আর রতনও সাহেবকে দেখে তাই অবাক হয়ে গেছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতেই ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলো তার মনে পড়লো। "To a good man no evil can happen, whether alive or dead." কিন্তু তাহলে শেষ জীবনে সরকারী হুকুমে তাঁকে বিষ খেয়ে মরতে হলো কেন? বিষ খেয়ে মরতেও তো যন্ত্রণা হয়! কোনটা ভালো তাহলে? নিজের জীবনে যন্ত্রণা পেয়ে মৃত্যুর পর অমর হয়ে যাওয়াটা বড়, না সারা জীবন খেয়েদেয়ে ভোগ করে একদিন অসুখে-ব্যাধিতে শয্যাশায়ী হয়ে মারা যাওয়া ভালো? মানুষের কোনটা কাম্য? এই দুটো পথই মানুষের জীবনের সামনে খোলা আছে!

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন— তোমার দাদা তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে—আর তোমার পিসিমা কিছু বললেন না?

সোহম্ বলেছিল—পিসিমা দাদার মুখের ওপর কী করে কথা বলবে স্যার? আমার নিজের বাবা-মা কেউ-ই বেঁচে নেই। সংসার চলছে দাদার উপার্জনে। দাদার মুখের ওপর কথা বলবার সাহস কী করে হবে পিসীমার?

—তাহলে কী করবে তুমি ঠিক করেছ?

সোহম্ বলেছিল—সেই কথা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি স্যার। আপনি যদি গোটাকয়েক ছাত্র পড়ানোর কাজ যোগাড় করে দেন, তাহলে আমি কোনও রকমে খরচটা চালিয়ে নিতে পারি।

ক্ষেত্রবাবু সোহমের কথাগুলো শুনে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবতে লাগলেন।

তারপর বললেন—সে আমি তোমাকে যোগাড় করে দিতে পারবো। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আগে থেকেই বলে দিই। মানুষের জীবনে সব চেয়ে দামী জিনিস কী বলো তো? বলো কোন্ গুণটা থাকলে মানুষ বলে মানুষ গণ্য হয়?

সোহম্ বললে—মনুষ্যত্ব!

'মনুষ্যত্ব' কথাটা সোহম্ বইতে পড়েছিল। কথাটার মানে না বুঝেই সোহম্ ক্ষেত্রবাবুকে ওই উত্তরটা দিয়েছিল। ইস্কুলের বইতে 'মনুষ্যত্ব' কথাটা কবে সে পড়েছিল।

ক্ষেত্রবাবু উত্তরটা শুনে তেমন খুশী হলেন না।

জিজ্ঞেস করলেন—'মনুষ্যত্ব' কথাটা তো বললে তুমি। কিন্তু কথাটার মানে বুঝিয়ে বলতে পারো? সোহম্ চুপ করে রইল। 'মনুষ্যত্ব'র মানে আবার কী? 'মনুষ্যত্ব'র মানে বুঝিয়ে বলবার মত বিদ্যে তার ছিল না।

বললে—মনুষ্যত্বের মানে জানি না স্যার।

ক্ষেত্রবাবু বললেন—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছ আর মনুষ্যত্বের মানে বোঝ না? তা মানুষ আর পশুর মানে বোঝ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, জন্তু মানে জানোয়ার। জানোয়ার কথা বলতে পারে না, কিন্তু মানুষ কথা বলতে পারে!

ক্ষেত্রবাবু বললেন—হলো না। মানুষ আর জানোয়ারের মধ্যে যে তফাৎ তা ঠিক বোঝনি তুমি। আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। দেখ, ঘুম থেকে উঠে মানুষ কী করে? সারাদিনের খাবার জিনিস কিনতে বাজারে যায়। তারও

আগে যায় আজকাল দুধের বোতল আনতে। তারপর খাওয়া দাওয়া করে অফিসে-কাছারিতে যায়, বা যার-যার ব্যবসা করতে যায়। তারপর সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাত্রে বাড়ি ফিরে হয় সিনেমায় যায়, নয় তাস খেলে, আর নয় তো কেউ-কেউ বাড়িতে বসে টেলিভিশন্ দেখে। আর তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর পরের দিন আবার সেই একই কাজ। একই পুনরাবৃত্তি। দুধ আনতে যাওয়া, বাজার যাওয়া, অফিস যাওয়া আর টেলিভিশন্ বা সিনেমা-থিয়েটার দেখে ঘুমিয়ে পড়া। এই তো?

সোহম্ মাথা নেড়ে বললে—হ্যাঁ স্যার!

ক্ষেত্রবাবু বললেন—আর জন্তু-জানোয়ার? জন্তু-জানোয়াররাও বলতে গেলে সেই একই কাজ করে। তারা হয়ত দুধ খায় না, অফিসে যায় না, টেলিভিশন্ দেখে না। কিন্তু ঠিক মানুষের মত ঘুম থেকে উঠেই নিজের আর নিজের পরিবারের জন্যে খাবার যোগাড় করতে বেরোয়। আর তা যোগাড় হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত। তখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়। আর পরদিন আবার সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি। এই তো?

সোহম্ আবার বললে—হ্যাঁ স্যার!

ক্ষেত্রবাবু আবার বলতে লাগলেন—তাহলে দু'জনের তফাৎটা কোথায়? নিশ্চয় জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের একটা তফাৎ থাকা দরকার। সেই তফাৎটা কী জানো? তফাৎ হচ্ছে এই যে প্রকৃতির যে দান, যেমন চাঁদের আলো, সূর্যের তাপ আর আলো, দক্ষিণের বাতাস, এর ওপর এখনও পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও গভর্মেণ্ট ট্যাক্স বসায়নি। তাই জীব-জন্তু জানোয়ার-মানুষ কেউই তার জন্য ট্যাক্স দেয় না। কিন্তু মানুষের মত মানুষ যারা তাঁরা তার জন্যে ট্যাক্স দেন।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—তার মানে স্যার?

ক্ষেত্রবাবু বলতে লাগলেন—শুধু খেয়ে পরে সিনেমা-টেলিভিশন্ দেখে যারা জীবন কাটায় তারা শুধু নিজেদের বউ-ছেলে-মেয়ের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না। কিন্তু বিশ্ব-সংসারে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এমন এক-একজন মানুষও জন্মায় যারা দেশের বা সমাজের সকলের কথাই ভাবে। যেমন যীশুখৃষ্টের ছ'শো বছর আগে এমন একজন জন্মেছিলেন যিনি তা ভাবতেন। তাঁর নাম সোক্রেটিস। তিনি দেশের সব মানুষকে ভালো হতে বলতেন, সৎ হতে বলতেন, যিনি সকলের ভালো চাইতেন। যেমন আমাদের দেশের এক রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ। যাকে আমরা তথাগত বুদ্ধদেব বলে জানি। তিনি তো রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর কিসের দুঃখ ছিল যে তিনি সব আরাম সব ঐশ্বর্য ছেড়ে দিয়ে ভিখারির মত পথে বেরিয়ে পড়লেন? মানুষের কীসে ভালো হয়, কী করলে মানুষ ত্রিতাপ-জ্বালা থেকে মুক্তি পায়, সেই পথ আবিষ্কার করবার জন্যে সব কিছু ত্যাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। আরো অনেক নাম করতে পারি। এই আমাদের যুগের সুভাষ বোসের কথাই ভাবো না। আই-সি এস পাশ করে আরামে মোটা মাইনের চাকরিতে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু কেন তিনি সে-চাকরি ছেড়ে

দিলেন ? তাঁর মাথায় কী পোকা ঢুকেছিল ?

সোহম্‌ এর উত্তর জানতো না। শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে ছিল ক্ষেত্রবাবুর দিকে। সে এসেছিল টাকার ধান্ধায়, হঠাৎ ক্ষেত্রবাবুর মুখোমুখি বসে এ-সব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তা সে ভাবেনি।

ক্ষেত্রবাবু বলেছিলেন—এরই নাম 'চরিত্র'। শুধু দু'টো হাত দু'টো পা আর দু'টো চোখ থাকলেই মানুষ হয় না। সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে এই 'চরিত্র' চাই। আমি চাই তুমিও বড় হয়ে চরিত্রবান হবে। আমি তোমার টাকার যোগাড় করে দিচ্ছি। আমি বলে দিলে কেউ আমার কথায় অরাজি হবে না। কিন্তু আমার ইচ্ছে তুমি সত্যিকারের একজন মানুষ হবে। তুমি কথা দাও তুমি এই ভগবানের দানের জন্যে ট্যাক্স দেবে ? মানে চরিত্রবান হবে ?

সোহম্‌ বলেছিল—আপনি আশীর্বাদ করুন স্যার, আমি আপনার এই পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আমি আপনার কথামত বড় হবার চেষ্টা করবো। শুধু নিজের কথাই ভাববো না, দেশের সমাজের সকলের মঙ্গল-চিন্তাই করবো। আমি সত্যি-কারের মানুষ হবো।

মনে আছে প্রফুল্লর কাছে এসে সোহম্‌ সব কথা যথাযথ বলেছিল।

শুনে প্রফুল্ল বলেছিল—সব গুল !

—গুল মানে ?

প্রফুল্ল বলেছিল—সব ধাপ্পা। এইটে জেনে রাখ্‌, আগে নিজের উন্নতি, নিজের স্বার্থ, তারপর অন্য কথা। ও-সব বড় বড় কথা বইতেই শুধু লেখা থাকে। ও-সব কথা মানতে গেলে এ-যুগে আমাদের চলে না। ক্ষেত্রবাবুরা সে-কালের লোক, ওঁরা সেই সব পুরোন আদর্শ এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন। তবে ওঁকে চটিয়ে লাভ নেই। তুই জবাবে কী বললি ?

সোহম্‌ বললে—হেড্‌মাস্টার মশাই যা বললেন আমি চুপ করে তাই-ই শুনে গেলুম। শেষকালে বলে এলুম আমিও জীবনে চরিত্রবান হবার চেষ্টা করবো।

প্রফুল্ল বললে—ভালোই করেছিস। বুড়ো মানুষকে চটিয়ে লাভ নেই। আসল কথা কার্যসিদ্ধি। কার্যসিদ্ধি করতে গেলে মিথ্যে কথা তো বলতেই হবে ! তুই ভালোই করেছিস। শেষকালে তুই চরিত্রবান হলি কি হলি না তা তো আর বুড়ো মানুষ দেখতে আসছে না !

মনে আছে সে-ই সোহমের জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ সুরু ! জীবনের একটা বছর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাভের অঙ্ক দশগুণ ডিভিডেণ্ড হয়ে ফিরে এসেছিল।

সত্যিই ভোলাদা অদ্ভুত-কর্মা পুরুষ। একেবারে ক্ষেত্রবাবুর উল্টো। বলতো—চরিত্র-ফরিত্র ও-সব কথা ভুলে যেতে হবে। এখন চরিত্রের মানেও বদলে গেছে। ইতিহাস যেমন বদলায়, ভূগোল যেমন বদলায়, ডিক্সনারি যেমন বদলায়, যুগে যুগে সমস্তই বদলায়, তেমনি চরিত্রও বদলায়। এ যুগে বিবেকানন্দ অচল, সুভাষ বোস অচল, সচল হলো শুধু কেরীয়ার !

—কেরীয়ার ?

ভোলাদাই প্রথম বললে—হ্যাঁ কেরীয়ার। সাইকেলের পেছনে যে কেরীয়ার থাকে, সেই কেরীয়ার। সাইকেলের কেরীয়ার আগে পেছনে থাকতো, এখন পেছনেও একটা কেরীয়ার আছে, আবার সামনেও তার একটা কেরীয়ার আছে। সেই কেরীয়ারে যার যত দামী জিনিস থাকবে সে তত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। সামনে পেছনে কেরীয়ারের দামী জিনিসগুলো একদিন সাইকেল-ওয়ালাকেও যখন ঢেকে ফেলবে, তবে তার উন্নতি হবে।

—সাইকেলওয়ালাকে ঢেকে ফেলবে মানে?

ভোলাদা বললে—তার মানে মানুষ তো ফালতু রে। সাইকেলওয়ালা তো একজন তুচ্ছ মানুষ, তাকে ছোট হতে হবে, তাকে তুচ্ছ হতে হবে। বড় হতে হবে তার কেরীয়ারকে।

—কিন্তু কেরীয়ারকে বড় করতে গেলে তো খুব পরিশ্রম করতে হবে, খুব খাটতে হবে, দিনরাত বই পড়তে হবে, বই পড়ে এক্‌জামিনে পাশ করে ডিগ্রী যোগাড় করতে হবে।

ভোলাদা বললে—যারা খাটবে, যারা পরিশ্রম করবে, যারা মন দিয়ে বই পড়বে এ-যুগে তাদের কিস্‌সু হবে না। ও-সব সে-যুগে ছিল। তুমি আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যাও, আমি তোমাকে এক্‌জামিনে পাশ করিয়ে দেব।

সোহম্‌ বললে—আজকে তো এখন টাকা দিতে পারবো না। এখন আমার কাছে একটি পয়সাও নেই। আমি এখন প্রফুল্লর বাড়িতে থাই। খাওয়া-থাকার জন্যে ওকে আমার এখন পয়সা দিতে হয় না। আমাদের হেড্‌মাস্টার ক্ষেত্রবাবু আমাকে কয়েকটা টিউশানি যোগাড় করে দিয়েছেন। এই মাস থেকেই ছাত্র পড়াতে আরম্ভ করেছি। পরের মাসে মাইনে পাবো, তখন আপনাকে টাকাটা দেব।

ভোলাদা লোক খুব ভালো বলতে হবে। বললে—তুই ভাবছিস আমি নিজের পেট-পুজো করবার জন্যে টাকা নিচ্ছি? দূর বোকা-পাঁঠা! কত গরীব ছেলে আছে কলকাতায়, তোর চেয়েও গরীব তারা। তাদের কেউ কোথাও নেই, তাদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে টাকা চাইছি, নইলে আমার টাকা চাইবার কী দরকার—

তা বটে! সোহম্‌ প্রথম মাসেই দেড়শো টাকা উপায় করলে ছাত্র পড়িয়ে। ক্ষেত্রবাবু চিঠি লিখে দিয়েছিলেন, তাই-ই কেউই আপত্তি করেনি। তা থেকে পঞ্চাশ টাকা ভোলাদাকে দিয়ে ভোলাদার দাতব্য-ক্লাবের মেম্বার হয়ে গেল। তারপর প্রফুল্লর বাড়ি ছেড়ে একটা মেসে উঠে গেল।

মেসে নানা বয়সের লোক থাকতো। বিচিত্র সে-সব লোক। একজনের নাম এখনও এতদিন পরেও মনে আছে। আর একজনের নাম সত্যেন ভাদুড়ী। সবাই চাকরি করে।

ভোলাদাই বলতে গেলে এই মেসে সোহম্‌কে ঢুকিয়ে দিলে।

সত্যেন ভাদুড়ী মশাই জিজ্ঞেস করলে—তোমার বয়েস কত হে ছোকরা?

সোহম্‌ বললে—ষোল। এবার সতেরোয় পড়বো!

শৈলেশবাবু বললে—এ বয়েসটা বড় খারাপ হে, খুব সাবধানে থাকবে!

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—এ বয়েসটা খারাপ কেন?

শৈলেশবাবু বললে—কলকাতার মত জায়গায় বয়েসটা খারাপ নয়? যত পাপ আর পাকামির জায়গা এই কলকাতা, তা জানো? তার ওপর বাড়িতে থাকলে আলাদা কথা। এটা তো বাড়ি নয়, মেস। এখানে তুমি সোনাগাছিতে রাত কাটালে না নাইট-ক্লাবে রাত কাটালে তা দেখবার কেউ নেই। একটু সাবধানে থাকবে ছোকরা, দিন-কাল বড় খারাপ।

তা হোক, পরের কথা কানে তুললে তখন চলতো না। একটা ভাঙা তক্তা-পোশ, মাথার ওপর একটা ছাদ আর দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, তাই-বা কোথায় পেত।

এমনি করেই দেখতে দেখতে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলে সোহম্। পরীক্ষার খাতা নিজের হাতে লিখতে হলো না তাকে। কোনও রকমে লেখবার ভান করে দু'তিন ঘণ্টা কোনও রকমে কাটিয়ে দিলে। তারপর যথাসময়ে জানালা দিয়ে একটা দড়ি নেমে এল গলির মোড়ে; সদর রাস্তার সকলের চোখের আড়ালে। নিচে থেকে সেই দড়ির ডগায় আট-দশটা খাতা মজবুত করে বাঁধা অবস্থায় ওপরে উঠে এল। আর সেই খাতাগুলোর ওপর নিজের নাম-ধাম রোল-নাম্বার লিখে সবাই হেড্-গার্ডের কাছে পাঠিয়ে দিলে।

সে পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেল অনেকে! সোহম্ ক্ষেত্রবাবুর বাড়িতে গিয়ে প্রণাম করলে।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেমন পরীক্ষা দিলে?

সোহম্ বললে খুব ভালো স্যার!

ক্ষেত্রবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—ফার্স্ট ডিভিশন্ পাবে তো?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, ইংরেজীতে 'লেটার'ও পাবো।

ক্ষেত্রবাবু বললেন—তাই নাকি? তাহলে খুব ভালো করে পড়া-শোনা করেছ বুঝি?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, এক মাস ধরে রাত জেগেছি। দিন-রাত ধরে সমস্তক্ষণ কেবল পড়েছি।

জবাব শুনে খুব খুশী হলেন ক্ষেত্রবাবু। বললেন—ভেরি গুড্। তোমার ওপরে খুব খুশী হয়েছি। আমি যে-সব উপদেশ দিয়েছিলুম সেইগুলো সব মানছো বুঝি?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই এক্সারসাইজ করি, তারপর একমুঠো ভিজে ছোলা।

ক্ষেত্রবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন—চরিত্রটা ঠিক রাখবে, বুঝলে?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, আপনি যা-যা বলে দিয়েছিলেন আমি তাই সব মেনে চলি। আমি সিনেমা-থিয়েটার কিছুছু দেখি না স্যার। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা একটা বই কিনে পড়ছি—

—কী বই?

—স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'রাজযোগ'।

ক্ষেত্রবাবু খুব খুশী হলেন। বললেন—ভেরি গুড্, ভেরি গুড্। দেখবে, আমি তোমাকে বলে রাখছি জীবনে তুমি খুব উন্নতি করবে। চরিত্রটা সব সময় ঠিক রাখবে, তাহলে কেউ তোমায় রুখতে পারবে না—

এমনি করে একদিন ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষাও দিলে সোহম্। সেবারও ভোলাদা খাতা সাপ্লাই করে দিলে। তবে আগেকার মত পঞ্চাশ টাকায় আর হলো না।

ভোলাদা বললে—ওরে, আর পঞ্চাশ টাকায় কুলোচ্ছে না। এবার দু'শো টাকা দিতে হবে তোকে।

সত্যিই তো, জিনিসপত্রের দাম যে-রকম দিন-দিন বাড়তে আরম্ভ করেছিল তার তুলনায় দু'শো টাকা কিছু বেশি নয়। যারা অ্যানসার-পেপার লিখে দেবে তারাও তো কলেজের সব প্রফেসার। তাদেরও তো চাল ডাল কিনে পেট ভরাতে হয়। যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। সবাই ভেবেছিল যুদ্ধ থেমে গেলেই জিনিস-পত্রের দাম আবার আগেকার দরে নেমে আসবে। কিন্তু তা হলো না। মেসের মাসকাবারি খরচ ছিল কুড়ি টাকা, তা বেড়ে তখন পঞ্চাশ টাকায় উঠেছে। যুদ্ধের সময় যারা চাকরি পেয়েছিল, যুদ্ধ মিটে যাবার পর আবার তাদের চাকরি গিয়েছে।

কিন্তু ভোলাদা সেবারও সোহম্‌কে যা সাহায্য করেছিল তা ভোলবার নয়। অনার্স পরীক্ষার পর যেদিন পরীক্ষার ফল বেরোল সেদিন শৈলেশবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বলেছিল—তুমি কী করে ইংরিজীতে অনার্স পেলে হে ছোকরা! তুমি তো ইংরিজীর কিছুই জানো না।

সোহম্ বলেছিল—আমি তো ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে গিয়ে লেখা-পড়া করেছি—

সত্যেন ভাদুড়ী বলেছিল—কে জানে বাবা তুমি কখন পড়েছ! আমি তো বরাবর দেখেছি তুমি বেলা আটটার সময় ঘুম থেকে উঠতে, আর তোমাকে আমি মেট্রোর সামনে দেখেছি সিগারেট খেতে খেতে সিনেমা দেখে বেরোতে—

সোহম্ বলেছিল—আপনি অন্য কাউকে দেখেছেন হয়ত। আমার সিনেমা দেখবার পয়সা কোথায় যে সিনেমা দেখবো!

তারপর ক্ষেত্রবাবুর কাছে সন্ধ্যেবেলা গিয়েছিল এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে।

ক্ষেত্রবাবু সন্দেশ হাতে সোহম্‌কে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সোহম্ হেড্-মাস্টার মশাইএর পায়ের ধুলো মাথায় নিতেই বলে উঠলেন—কী হলো? অনার্স পেয়েছ?

সোহম্ বলেছিল—হ্যাঁ স্যার, তাই আপনার কাছে এই সন্দেশ দিতে এসেছি—

ক্ষেত্রবাবু বললেন—তুমি অনার্স পেলে তোমার নিজের চরিত্রগুণে, তার জন্যে আমাকে সন্দেশ দিতে এলে কেন?

সোহম্ বলেছিল—না স্যার, আপনি আমার যা উপকার করেছেন সে-ঋণ

আমি জীবন দিয়েও শোধ দিতে পারবো না। আমার দাদা কাশী দত্ত যখন আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন আপনিই আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। সে-কথা আমি কি জীবনে ভুলতে পারি ?

কী করে যে সেদিন সোহম্ বি-এ পরীক্ষায় ইংরিজীতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছিল তা একমাত্র সে নিজে জানতো আর জানতো ভোলাদা। ভোলাদা যে তার উপকার করেছে সে শুধু নগদ টাকার বিনিময়ে। ভোলাদা যে এমন কত ছেলেকে উদ্ধার করেছে তার সংখ্যা জানা নেই। মোটা টাকা দিয়ে কলেজের প্রফেসারদের ভোলাদা হাত করেছিল। ভোলাদা ছিল ঠিক ক্ষেত্রবাবুর উল্টো। ভোলাদা জানতো শুধু নয় বিশ্বাসও করত যে টাকা দিয়ে সব কিনে ফেলা যায়। আর কলেজের প্রফেসার ? তারাই হচ্ছে সব চেয়ে বেশি টাকার কাঙাল। অন্ততঃ ভোলাদার সেই ধারণাই ছিল। টাকা দিয়ে ভোলাদা তাই আগে থেকেই সব কোশ্চেনগুলো আদায় করে আবার তাদের দিয়েই উত্তর লিখিয়ে নিত।

তাতে কার কী লাভ হতো আর কার কী লোকসান হতো তা জানবার দায় ছিল না। সোহমের তখন যেমন করে হোক পাশ করতে পারলেই হলো।

অনার্স পাবার পর সোহম্ ভোলাদার বাড়িতে গিয়েও প্রণাম করে এসেছিল আর এক বাক্স সন্দেশ দিয়ে এসেছিল।

ভোলাদা বলেছিল—এখন দেখলি তো, এখন আমার কথা বিশ্বাস হলো তো যে এ পৃথিবীতে টাকাটাই সব !

সোহম্ মাথা নেড়ে ভোলাদার কথায় সায় দিয়েছিল।

ভোলাদা আরও বলেছিল—তোর ক্ষেত্রবাবুর কথা ভুলে যা, বুঝলি ? ও-সব চরিত্র-ফরিত্র সমস্ত গুলি মেরে দিবি। তুই নিজেই তো দেখলি টাকার কী জোর। একেবারে হাতে হাতে তো প্রমাণ পেয়ে গেলি। তোর প্রফুল্লর কথা মনে আছে ?

সোহম্ বলেছিল—হ্যাঁ—

—সেই প্রফুল্ল এখন কোথায় জানিস ?

—না।

—সেই প্রফুল্ল এখন কুয়েত-এ। কুয়েত কোথায় জানিস তো ? আরব দেশে। সেখানে সে কত মাইনে পায় বল্ তো ? একটু আন্দাজ কর্ !

সোহম্ বলেছিল—দুশো টাকা হবে।

ভোলাদা বলেছিল—দূর, তুই একটা আস্ত বোক্‌চন্দর। সে সেখানে কোয়ালিটি-কন্‌ট্রোল ইন্‌জিনীয়ার হয়েছে।

সোহম্ বললে—কিন্তু সে তো ইন্‌জিনীয়ারিং পাশ করেনি।

—না-ই বা পাশ করলে। আমি তাকে ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজের ডিগ্রী পাইয়ে দিয়েছি। এখন সেখানে দিনে মাইনে পায় সতেরোশো টাকা !

—কী করে ?

ভোলাদা বললে – টাকা দিয়ে। কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে।

—কিন্তু ওর তো অত টাকা ছিল না। ও তো গরীবের ছেলে। শুধু বিধবা মা ছাড়া আর কিছু ছিল না ওর।

ভোলাদা বললে—মা মারা যাবার পর প্রফুল্ল বাড়িটা বিক্রি করে কুড়ি হাজার টাকা পেলে। সেই কুড়ি হাজার টাকা দিতেই আমি ওকে একটা সার্টিফিকেট যোগাড় করে দিয়েছিলুম। তারপর ওর ব্রেন। একদিন বোম্বাই চলে গেল। সেখান থেকে একটা জাহাজে উঠে কুয়েতের মাইলখানেক দূরে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পাসপোর্ট করতে হলো না, ভিসা করতে হলো না, বোম্বাইতে ওর এক বন্ধু ছিল, সে কুয়েতে গিয়ে ওকে সেখানে ওর জন্যে সব কিছু বন্দোবস্ত করে চিঠি দিয়েছিল। সে সব পথ বাতলে দিয়েছিল। তারপর বন্ধুর জন্যে সমুদ্রের ধারে অপেক্ষা করছিল—

এর পর আর কথা শেষ হলো না। হঠাৎ দিল্লী থেকে একটা ট্রাংক কল এসে গেল। ভোলাদা সেই দিনই কল্ পেয়ে দিল্লী চলে গেল।

সোহমের জীবনে এই প্রথম টাকার স্বাদ! প্রথম টাকার অনুভব! টাকা দিয়ে প্রফুল্ল এত বড় হয়ে গেল! আর সে কিনা এখনও বেকার?

অবক্ষয়টা সুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। সেই ১৯১৪ সাল থেকেই বলতে গেলে। কিন্তু ইণ্ডিয়ার মানুষ তখনও এত নিষ্ঠুরভাবে তা টের পায়নি। তখনও ইণ্ডিয়ার ওপর বড় বড় মহাপুরুষদের প্রভাব বেশ প্রবলই ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বড় বড় মহাদেশগুলো পরস্পরের বড় কাছাকাছি এসে গেল। তাতে সবাই-এর নজরে পড়লো মানুষে মানুষে পার্থক্য-গুলো। একজন চাকরি করে দিনে সতেরোশো টাকা মাইনে পায় আর ঠিক তেমনি তার পাশের মানুষটাই দিনে একটা পয়সাও রোজগার করে না। স্রেফ বেকার।

এই দেখতে পাওয়ার পর থেকেই পৃথিবীটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ পাওয়ার দলে, আর আর, এক ভাগ না-পাওয়ার দলে। অন্য ছোট-ছোট দেশগুলো এক-একটা বড় দলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে টিঁকে থাকবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। ইণ্ডিয়ার মহাগুরু নিপাত হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের মধ্যে ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর বাকি দু'জন। একজন সুভাষচন্দ্র, তিনি চলে গেলেন ১৯৪৫ সালে। বাকি ছিলেন গান্ধীজী। তিনিও চলে গেলেন ১৯৪৮ সালে।

ক্ষেত্রবাবুর বাড়িতে গিয়ে সোহম্ দেখলে হেডমাস্টার মশাই কাঁদছেন। সোহম্‌কে দেখে চোখের জল মুছে নিলেন। নিজের বলতে ক্ষেত্রবাবুর কেউই ছিল না। ছিল শুধু দেশ আর তাঁর ছাত্ররা। তাদের জন্যে তাঁর আর বিয়ে-সংসার করা হয়নি।

সোহম্‌কে দেখে বললেন—দেখলি তো, দেশের লোকেরা কী-রকম নিমক-

হারাম। যে-মানুষটা দেশের জন্যে এত করলে তাকে কি না মেরে ফেললে! ভাবছিস একদিন এ-পাপের গুণোগার দিতে হবে না?

কথাগুলো তিনি যেন সোহমকে শোনাচ্ছিলেন না, নিজেকে নিজের অন্তরাত্মাকে শোনাচ্ছিলেন।

বলছিলেন—মহাত্মা গান্ধী যাওয়া মানে শুধু মহাত্মা গান্ধী চলে যাওয়া নয়, একটা চরিত্র চলে যাওয়া। একটা বনস্পতি চলে যাওয়া। একটা বনস্পতি সৃষ্টি করতে বিধাতাপুরুষকে কত অসংখ্য বৃক্ষকে নষ্ট করতে হয়েছে, অথচ সেই তিনিই চলে গেলেন।

তারপর একটু ঢোক গিলে দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন—১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছিলেন, 'আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত হবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।' স্বাধীন অবশ্য হলো, কারণ মহাপুরুষের বাণী কখনও মিথ্যে হয় না। কিন্তু কী মূল্য দিতে হলো তার বদলে বলো তো?

তারপর ক্ষেত্রবাবু যখন একটু শান্ত হলেন তখন সোহম্ তার নিজের কথাটা পাড়লে।

বললে—স্যার, এবার আমার চাকরির যদি একটা ব্যবস্থা করে দেন তাহলে বড় উপকার হয়, আমি আর পারছি না—

সেই দিনই ক্ষেত্রবাবু চিঠি দিয়ে দিলেন তাঁর এক ছাত্রকে। টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাকসন্ কোম্পানির অফিসার নীহারবিন্দু সেনকে।

মিস্টার এন্ বি. সেন। ক্ষেত্রবাবুর প্রিয় ছাত্র। টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাকসন্ কোম্পানির বড় সাহেব।

ক্ষেত্রবাবুর চিঠি নিয়ে সোহম্ সোজা রাস্তায় এসে পড়লো। বড় রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বাসের জন্যে। ক্ষেত্রবাবু মিস্টার সেনের বাড়ির ঠিকানায় চিঠিটা দিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও বাসের দেখা নেই।

সোহম্ পায়ে পায়ে আরো এগিয়ে গেল। সন্ধ্যে নেমে আসছে। চারদিকে শোকের ছায়া। কলকাতার সমস্ত মানুষ এই মর্মান্তিক আকস্মিকতায় যেন বোবা হয়ে গেছে। বাস-ট্রাম চলাচলও যেন সেই শোকের ঘটনায় ঝিমিয়ে এসেছে। একটা রাস্তার মোড়ে আসতেই নজরে পড়লো ভোলাদার বাড়িতে খুব আলো জ্বলছে। লোকজনের ভিড়ও খুব।

সোহম্ সেদিকে এগিয়ে গেল। এত আলো, এত লোকজনের ভিড় কেন ভোলাদার বাড়িতে?

সামনে যেতেই ভোলাদার সঙ্গে দেখা। ভোলাদার খুব-হাসি খুশী ভাব, আর লোকজনের সঙ্গে কথা কইতেও ব্যস্ত!

সোহমকে দেখে সামনে এগিয়ে এল। বললে—কী রে, এসেছিস? ভালোই হয়েছে।

তারপর কাকে লক্ষ্য করে বললে—এই বাদল, সোহমকে রসগোল্লা দিয়ে যা—রসগোল্লা দিয়ে যা—

রসগোল্লা ! সোহম্ বললে—কী হয়েছে এখানে ? কীসের পার্টি ?

ভোলাদা বলে উঠলো—তুই জানিস না ? এখনও খবর পাসনি ? বেণেটা তো মারা গেছে !

—বেণেটা ? তার মানে ?

ভোলাদা দাঁত বার করে বলে উঠলো—গান্ধী রে গান্ধী ! তোরা যাকে মহাত্মা বলিস ! সে খুন হয়েছে খবর পাসনি ?

সোহম্ স্তম্ভিত হয়ে গেল ভোলাদার কথা শুনে। এ কী-রকম লোক ভোলাদা ! একজন মহাপুরুষ খুন হয়ে গেলেন আর ভোলাদা হাসছে ! আবার বলছে 'বেণে'টা ! অথচ মৃত্যুর খবর পাবার পর থেকেই ক্ষেত্রবাবু কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে গেছেন।

ততক্ষণে রসগোল্লা এসে গেছে।

সোহম্ বললে—তুমি আজ রসগোল্লা খাওয়াচ্ছো ভোলাদা ?

ভোলাদা বললে—খাওয়াবো না ? আজ এই আনন্দের দিনে মিষ্টি খাওয়াবো না তো কবে খাওয়াবো ? জানিস ওই গান্ধী দেশের কত সব্বোনাশ করেছে ! গান্ধীই তো দেশটাকে ভাগ করে পাকিস্তান করে তাকে পঞ্চাশ কোটি টাকা দিয়ে দিলে—

তারপর অন্য একজনকে দেখে সেই দিকে এগিয়ে গেল ভোলাদা। আরো অনেক লোক আসছে। সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে ভোলাদা রসগোল্লা খেতে !

সোহম্ কিছু বুঝতে পারলে না। কে ঠিক ? ক্ষেত্রবাবু, না ভোলাদা ? দু'জনেই সোহমের উপকার করেছে। কিন্তু দু'জন মানুষের মধ্যে কত তফাৎ ! সোহমের কেমন ঘেন্না হলো ভোলাদার ওপর। টাকার বদলেই তো ভোলাদা তার উপকার করেছে। অনেক টাকা দিয়েছে সে ভোলাদাকে। ছাত্র পড়িয়ে যা টাকা সে পেয়েছে তার প্রায় সবটাই সে ভোলাদাকে দিয়েছে কলেজে পাস করিয়ে দেবার জন্যে। আর ক্ষেত্রবাবু ? ক্ষেত্রবাবু যে এই চিঠিটা দিয়েছেন টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানির বড় সাহেব মিস্টার এন্-বি-সেনের নামে তার জন্যে তো ক্ষেত্রবাবুকে একটা পয়সাও দিতে হয়নি।

লোকটার হাতের রসগোল্লা হাতেই রয়ে গেল, সোহম্ একটা রসগোল্লাও ছুঁলে না।

লোকটা বললে—কী হলো, রসগোল্লা খাবেন না ?

সোহম্ বললে—না—

বলে সে আবার যেদিক দিয়ে এসেছিল সেই দিক দিয়েই হন্ হন্ করে এগিয়ে চলতে লাগলো।

হঠাৎ কা'র পায়ের আওয়াজে সোহম্ চমকে উঠলো। সামনে চেয়ে দেখে সুমিত্রা ! সুমিত্রার এ অন্য চেহারা। লালপাড় গরদের শাড়ি পরেছে সে। কপালে সিঁদুরের গোল টিপ্। দেখেই মনে হয় এখনই পুজো সেরে উঠেছে সে।

সুমিত্রা বললে—ওমা, কখন এলে তুমি ? তোমার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে ?

সোহম্ বললে—কী করবো, তুমি ব্যস্ত ছিলে।

সুমিত্রা বললে—একটু পুজো করছিলাম, এত সকাল-সকাল তো কখনও আসো না তুমি অফিস থেকে—

সোহম্ বললে—সকালে তো পুজো করোই, আবার বিকেলেও কি পুজো করো নাকি! এত পুজো করে কি হয়?

সুমিত্রা বললে—পুজো তো তোমার ভালোর জন্যেই করি। আমি শিবের পুজো করি বলেই তো তোমার চাকরিতে এত উন্নতি হয়েছে। আমি কি আর আমার নিজের জন্যে পুজো করি মনে করো? মনে করে দেখো তো, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন তোমার কত কম মাইনে ছিল?

সোহম্ বললে—সত্যিই কি তুমি আমার ভালো চাও?

সুমিত্রা বললে—ওমা, কী বলছো তুমি? ছি, ছি, আমার যে পাপ হবে!

সোহম্ বললে—আমি যে এসেছি তা রতন তোমাকে বলেনি?

সুমিত্রা বললে—আমি যে পুজো করছিলাম, কী করে সে বলবে? একটু বোস, আমি আরও চা আনছি—

বলে সুমিত্রা চলে যাচ্ছিল, কিন্তু সোহম্ যেতে দিলে না। তার একটা হাত খপ্ করে ধরে ফেললে। বললে—চা খেয়েছি, আর খাবো না। তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে, একটু বোস—

সুমিত্রা বসলো, বললে—কী কথা?

—খুব জরুরী কথা!

সুমিত্রা বললে—হোক জরুরী কথা! তুমি আগে প্যাণ্ট-শার্ট বদলাও, হাতে-মুখে জল দাও, তারপর বোল, ততক্ষণে আমার চা তৈরি হয়ে যাবে। আমি নিজেও যে চা খাইনি।

তারপর কী যেন মনে পড়ে গেল। বললে—আমার পুজোর প্রসাদ খাবে না? দাঁড়াও নিয়ে আসছি। একটুও দেরি হবে না। আমি যাবো আর আসবো—

সোহম্ বললে—শোন, আজকে গ্রেট ঈস্টার্ন ক্লাবে নিয়ে যাবো তোমাকে—

—গ্রেট ঈস্টার্ন ক্লাব? কেন, সেখানে কী আছে?

সোহম্ বললে—সেখানে তোমাকে মেম্বার করে নেব। মিস্টার সেনের অর্ডার। জানো আজ তোমার ছবিটা হঠাৎ মিস্টার সেনের নজরে পড়ে গেছে।

—কী করে?

সোহম্ বললে—আমি জানতুম না আমার ডায়েরির মধ্যে তোমার ফোটোটা আছে। আমি ডায়েরিটা খুলতেই তোমার ফোটোটা ডায়েরির ভেতর থেকে ফস্ করে মিস্টার সেনের টেবিলের ওপরে পড়ে গেছে, আর মিস্টার সেনের নজরে পড়ে গেছে—

—কী সব্বোনাশ, তারপর?

—তারপর তোমার চেহারা দেখে একেবারে মুগ্ধ। বললে—ইউ হ্যাভ্ গট্ এ লাকি পাটনার ইন্ লাইফ রায়! ওকে ক্লাবের মেম্বার করে নাও—। এ বিউটিফুল্ ওয়াইফ্ ইজ্ এ লুক্রেটিভ ট্রেজার। হোয়াই ডোণ্টউ ইন্ভেস্ট হার?

—তার মানে!

সোহম্ বললে—তার মানে সাহেব বলতে চায় তোমাকে ক্লাবের মেম্বার করে নিতে।

—ক্লাবে কী হয় ?

সোহম্ বললে—ক্লাবে গেলে বড় বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। চাকরিতে উন্নতি হয়। সেখানে কক্‌টেল্ পার্টি দিতে হয়।

—কক্‌টেল পার্টি মানে ?

—মানে মদ খাওয়ার পার্টি।

সুমিত্রা বললে—সেখানে মেম্বার হলে আমাকেও মদ খেতে হবে নাকি ?

সোহম্ বললে—মদ খেতে দোষ কী ?

—কী বলছো তুমি ? আমি মদ খাবো ?

—কেন, মদ কি খারাপ জিনিস ? তুমি তো ইচ্ছে করে মদ খাচ্ছো না, স্বামীর কল্যাণের জন্যে মদ খাচ্ছো। আর তুমি যে শিব-পুজো করো, তোমার শিব-ঠাকুর তো গাঁজা চরস সিদ্ধি ভাঙ্ সমস্ত খায়, তার বেলায় ?

হঠাৎ রতন ঘরে ঢুকলো। বললে—সাব, মেহেরালি সাহেব এসেছে—

সোহম্ বললে—আচ্ছা উঠি, এখ্খুনি দেখা করে আসছি—

বলে বাইরের ড্রয়িং-রুমের দিকে এগিয়ে গেল।

মেহের আলি এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক। এই মেহের আলি আজ প্রথম আসেনি সোহমের বাড়িতে। অনেক আগেই এসেছে। আর নিজে এসে নিজেরই পরিচয় নিজে দিয়েছে।

যখন প্রথম সোহম্ ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে নিজের চেম্বার পেয়েছিল, তখনই চাপরাসীর হাত দিয়ে একটা ছাপানো কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছিল। সোহমের সঙ্গে সাধারণতঃ লেবার-লীডারদেরই কাজ-কারবার। কিন্তু কার্ডখানা পেয়ে সোহম্ অবাক হয়ে গিয়েছিল। ছাপানো দামী কার্ডের ওপর লেখা :

মেহের আলি মোহম্মদ

মেম্বার, স্টক্ এক্সচেঞ্জ, ক্যালকাটা।

নিচের এক কোণে টেলিফোন নম্বর।

শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে সোহমের কোনও দিন কোনও সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্ক করবার ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু মেহের আলির নামটার কেমন যেন একটা আকর্ষণ ছিল। ছোটবেলায় পড়া একটা গল্পের চরিত্রের নাম মেহের আলি। সে কেবল বলতো—তফাৎ যাও, সব ঝুট্ হ্যায়—

চাপরাসীকে বললে—সাহেবকে ভেতরে ডাকো—

ভেতরে ঢুকেই মেহের আলি সাহেব নমস্কার করে তার নিজের বিদ্যে জাহির করেছিল। বলেছিল সে নাকি আগে বোম্বের দালাল স্ট্রীটের স্টক-এক্সচেঞ্জে কাজ করতো, কিন্তু এখন এসেছে কলকাতার লায়ন্স-রেঞ্জে। আসবার কারণ এখানে সে তার ভাগ্য ফেরাবে। বোম্বাই-এর সব বড় বড় ক্লায়েণ্ট যারা ছিল সবাই কলকাতায় এসেছে। বিড়লা, গোয়েঙ্কা, টাটা, মাহীন্দ্র, প্যাটেল এণ্টার-এণ্টারপ্রাইজ, আরো কত কোম্পানির নাম করেছিল মেহের আলি সাহেব।

মেহের আলি সাহেব ভেতরে ঢুকেই একটা লম্বা সেলাম করেছিল কপালে হাত ছুঁয়ে।

বলেছিল—আপনি আমাকে চিনবেন না রায় সাহেব। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।

সোহম্ অবাক হয়ে গিয়েছিল মেহের আলির কথা শুনে। জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি আমায় চিনলেন কী করে?

মেহের আলি বলেছিল—এই অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিস্টার সেন আপনার ওপর খুব খুশী। আপনি ক্লার্ক থেকে প্রমোশন পেয়ে একেবারে এ অফিসের ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছেন। আপনার গুণ না থাকলে কি এটা সম্ভব হতো? মিস্টার সেনই তো আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—আমাকে কী করতে হবে বলুন?

মেহের আলি সাহেব জবাবে বলেছিল—আমি আপনার সেবা করতে চাই। আমি অনেকের সেবা করেছি, এবার আপনাকেও আমি সেবা করতে চাই—

—আপনি আমার সেবা করবেন? কী করে করবেন সেবা?

মেহের আলি সাহেব বলেছিল—আপনার কোনও উপকার করে!

—আমার আবার কী উপকার করবেন?

মেহের আলি সাহেব বলেছিল—আপনি তো অফিসের কোয়ার্টারে থাকেন। কলকাতা শহরে আপনার নিজের কি বাড়ি আছে?

সোহম্ বলেছিল—না—

মেহের আলি সাহেব বলেছিল—কলকাতা শহরে যদি আপনার নিজের বাড়িই না হলো তাহলে আপনার কীসের উন্নতি হলো? এই কলকাতা শহরে আপনার নিজের বাড়ি হওয়া চাই—

সোহম্ আরো অবাক।

বলেছিল—আমার অত টাকা কোথায় যে কলকাতা শহরে আমি বাড়ি করব?

মেহের আলি সাহেব বলেছিল—আমি আপনার একটা বাড়ি করে দেব।

—কী করে করে দেবেন?

—আপনাকে টাকা পাইয়ে দিয়ে।

সোহম্ বলেছিল—একটা বাড়ি করতে তো অনেক টাকা লাগে। অত টাকা আপনি কী করে পাইয়ে দেবেন?

মেহের আলি সাহেব বলেছিল—শেয়ার মার্কেট থেকে!

—শেয়ার মার্কেট? আমি শেয়ার মার্কেট সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

—আপনার কিছু জানবার দরকার নেই। আমি জানলেই আপনার সব জানা হয়ে যাবে। আমাকে বিশ্বাস করুন। আমি যা বলব তাই করুন। আমিই আপনার বাড়ি করিয়ে দেব।

—তা আমাকে কী করতে হবে?

মেহের আলি সাহেব বলেছিল—আমি যা বলব, তাই আপনাকে করতে হবে। আমার কথা শুনতে হবে।

—কী করবো বলে দিন?

মেহের আলি সাহেব বলেছিল—আমাকে আপনি বিশ্বাস করে নগদ পাঁচশো টাকা দিন। আমি আপনাকে রসিদ দিয়ে দেব।

—পাঁচশো টাকা? পাঁচশো টাকা তো এখন আমার কাছে নেই। চেক বইও আমার কাছে নেই—

মেহের আলি সাহেব বলেছিল—চেক্ দিলে চলবে না। তাহলে ইন্‌কাম-ট্যাক্সের খপ্পরে পড়বেন। আমি ক্যাশ টাকা চাই—

সোহম্ বলেছিল—আমার কাছে ক্যাশ টাকা এখন নেই—

তাতেও মেহের আলি সাহেব একটুও দমে নি। আজ নেই তো কী হয়েছে। আমি আপনার বাড়িতে যাবো, বাড়ি গিয়ে টাকা নিয়ে আসবো। কাল যাবো?

সোহম্ বলেছিল—তাই-ই আসুন—

তা মেহের আলি সাহেবের কথার ঠিক ছিল। স্বার্থের দায়ে বেশির ভাগ মানুষ কথা রাখে এ-কথা সোহম্ জানতো। কিন্তু তা বলে মেহের আলি সাহেবকে দোষ দেওয়া যায় না। এর সঙ্গে তো সোহমের স্বার্থও জড়িয়ে ছিল। পরের টাকা খাটিয়ে মেহের আলি সাহেব যদি নিজে কিছু কমিশন নেয় তো দোষ কী? মুনাফার মোটা অংশ তো সোহমেরই রইল।

সত্যিই পরের দিন মেহের আলি সাহেব এল।

সোহম্ ঘরে আসতেই মেহের আলি সাহেব বললে—এ কী বাড়ি আপনার রায় সাহেব? এ-বাড়িতে আপনি থাকেন কী করে?

—কেন? আমার তো কোনও কষ্ট হয় না।

মেহের আলি সাহেব বললে—আপনার কষ্ট হয় না, কিন্তু আপনার বিবির নিশ্চয় কষ্ট হয়! বাড়ির সামনে একটা বাগান নেই, দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া পাওয়া যায় না। এ কী রকম বাড়ি আপনার?

সোহম্ বললে—আমি খুব গরীবের ছেলে ছিলুম মেহের আলি সাহেব, এই যে চাকরি পেয়েছি, এইটেই যথেষ্ট—

মেহের আলি সাহেব মাথা নেড়ে বললে—না না রায় সাহেব, এত অল্পে খুশী হলে চলবে না। আপনাকে আরো বড় হতে হবে।

—আরো বড় হবো আমি?

—নিশ্চয়। আরো আরো বড়। আমি কত গরীব লোককে বড় করে দিয়েছি তা জানেন? এই যে কলকাতার রাম মল্লিক, রাম মল্লিককে চেনেন?

—কী বললেন? রাম মল্লিক? সে আবার কে?

—সে কী ? রাম মল্লিককে জানেন না ? ব্র্যান্ডি মল্লিকের ছেলে, হুইস্কি মল্লিকের নাতি। ওই রাম মল্লিক শুধু 'রাম' খেত। রাম খেয়ে খেয়ে একেবারে পথের ভিখিরি হয়ে গিয়েছিল। অত বড় বাড়ি, তাও মর্টগেজ হয়ে গিয়েছিল। শেষকালে আমি তাকে বাঁচালুম।

সোহম্ বললে—কী করে বাঁচালেন ?

মেহের আলি সাহেব বললে—আবার কী করে ? শেয়ার কিনিয়ে। জুট মিলের শেয়ার কিনিয়ে দিলুম একশোটা। এক-একটা ইকুইটি শেয়ারের দাম ছিল চল্লিশ টাকা বারো আনা। ছ' মাসের মধ্যে সেই শেয়ারের দাম উঠলো একেবারে একশো দশ টাকা। আমি সেই শেয়ার বেচার টাকা গিয়ে দিয়ে এলুম রাম মল্লিককে। রাম মল্লিক সেই টাকা পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলে। টাকাটা পেয়েই একেবারে সঙ্গে সঙ্গে দু' বোতল রাম খেয়ে ফেললে। আমাকেও একটা বোতল দিলে। বললে—যাও, বাড়ি গিয়ে খাও—

এ এক অদ্ভুত মানুষ মেহেরালি সাহেব।

সুমিত্রাকে বললে—দাঁড়াও, দেখে আসি মেহের আলি সাহেব আবার কী করতে এসেছে। বোধ হয় টাকা এনেছে—

সুমিত্রা বললে—কেন তুমি ওর সঙ্গে মেশো ? আমি জানি ফাট্‌কাবাজ লোকরা ভালো হয় না। শেষকালে কোন্ দিন তোমাকেও ফাঁসাবে।

সোহম্ বললে—না, না, তুমি জানো না। ও আমাকে কথা দিয়েছে আমায় একটা বাড়ি করে দেবে।

—কিন্তু আমাদের বাড়ি তো রয়েছে, আবার বাড়ির কী দরকার !

সোহম্ বললে—এটা কি আমাদের বাড়ি ? এটা তো কোম্পানির দেওয়া কোয়ার্টার। এ-বাড়িতে দক্ষিণের হাওয়া ঢোকে না, সামনে একটা বাগান নেই। এর চেয়েও ভালো বাড়ি করে দেবে ও, তা জানো ?

সুমিত্রা বললে—আমরা তো দু'টো মানুষ, আমাদের অত টাকার দরকার কী ?

সোহম্ বললে—আজ না-হয় দু'জন আছি, কিন্তু একদিন তো তিনজন হতে পারি। হয়ত বা চারজনও হতে পারি। তখন ?

সুমিত্রার মুখ-চোখ কেমন রাঙা হয়ে গেল এই কথাগুলো শুনে। তার মুখ দিয়ে আর কোনও জবাব বেরোল না।

তা সেই মেহের আলি আদিযুগে এসেছিল এই বাড়িতে। তখন সবে সে ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছে। মেহের আলি সাহেব বাড়ি দেখেই বলেছিল—এ ফ্ল্যাটে আপনি থাকেন রায় সাহেব ? আপনার কষ্ট হয় না ?

সোহম বলছিল—তা হয়।

—তা যদি হয় তবে এ ফ্ল্যাটে পড়ে আছেন কেন ? একটা নতুন বাড়ি করুন না।

সোহম্‌ হেসে উঠলো।

বললে—আমার অত টাকা কোথায় যে বাড়ি করবো। বাড়ি করতে তো লাখ খানেক টাকা লাগবেই—

মেহের আলি সাহেব বললে—আমার ওপর আপনি বিশোয়াস করুন, আমি আপনাকে পাঁচ লাখ পাইয়ে দেব!

—কী করে ?

মেহের আলি বললে—শেয়ার কিনিয়ে দিয়ে।

—আপনি ভরসা দিচ্ছেন ?

মেহের আলি বললে—ভরসা নয়, গ্যারাণ্টি। আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি—

সেই তখনই প্রথম সোহম্‌ মেহের আলি সাহেবকে বিশ্বাস করে ক্যাশ পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। আর মজা এই যে ঠিক তার কয়েক মাস পরে সেই পাঁচশো টাকা তার কাছে পাঁচ হাজার টাকা হয়ে ফিরে এসেছিল।

সেই-ই সুরু। মানে সেটাই সূত্রপাত। তারপর কত টাকা যে মেহের আলি সেই টাকা ডবলের ডবল করে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

ঘরে ঢুকতেই মেহের আলি সাহেব বললে—আজকে একটা খবর আছে রায় সাহেব।

—কী খবর ?

—আন্দাজ করুন তো কী খবর ?

সোহম্‌ বললে—আমি কী করে আন্দাজ করব। আপনিই বলুন না।

মেহের আলি তখন মুচকি মুচকি হাসছে।

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করলে—অত হাসছেন কেন মেহের আলি সাহেব ? অত হাসির কী হলো ?

মেহের আলি বললে—আজকে বেঁটে দত্ত কাৎ—

—বেঁটে দত্ত কে ?

—সে কি রায় সাহেব, বেঁটে দত্তর নাম শোনেন নি ? ঠনঠনিয়ার ফাটা দত্তর ছেলে। বাপের টাকা পেয়ে ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করত। রবারের বেলুনের মত একেবারে হাওয়ায় উড়ে বেড়াতো। শেষকালে টাকা করবার জন্যে শেয়ার বাজারে এল আমার সঙ্গে টেক্কা দিতে। শেষকালে আজ একেবারে কুপোকাত্‌—

তারপর কী যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। পকেটে হাত দিয়ে বললে—আরে আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গিয়েছি—

কী কথা ?

মেহের আলি বললে—আপনার টাকার কথা!

বলে বুক পকেট থেকে একটা নোটের তাড়া বার করে দিলে।

বললে - গুণে দেখে নিন, ওতে এক হাজার টাকা আছে—

সোহম্‌ টাকাটা নিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল—এ কীসের টাকা ?

—আপনার প্রফিট। আপনি জুট-মিলের শেয়ার কিনেছিলেন, সেইটে বেচে দিলুম।

— আমি তো মাত্র পাঁচশো টাকা দিয়েছিলুম। তার বদলে এত টাকা ?

—টাকায় যে বাচ্ছা পাড়ে রায় সাহেব! তা ওইটেই সব নয় আরও টাকা আছে—

বলে আর একটা পকেট থেকে আরও একটা টাকার বাণ্ডিল বার করে দিলে। সোহম্ টাকাটা নিয়ে আরও অবাক। বললে—আরও এক হাজার ?

মেহের আলি প্যাণ্টের পকেট থেকে আরও একতাড়া নোট বার করলে। বললে—এই নিন এই তিন হাজার হলো—

সোহমের তখন চোখ দু'টো আরও বড় হয়ে গেছে।

ততক্ষণে মেহের আলি আরও দু'টো পকেট থেকে আরও দু'টো বাণ্ডিল বার করলে।

বললে—এই সবসুদ্ধু পাঁচ হাজার হলো, এখন খুশী তো ?

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—এ টাকা কি ইন্‌কাম ট্যাক্সের খাতায় দেখাবো ?

মেহের আলি বললে—খবরদার, খবরদার! এ-টাকার কথা শুধু আপনি জানলেন আর আমি জানলুম। মিস্টার সেনকেও যেন বলবেন না।

সোহম্ আবার জিজ্ঞেস করলে—এতে কোনও ভয় নেই তো ?

—কিসের ভয় ? আমি আপনার টাকা নিয়ে অন্যের নামে শেয়ার কিনেছিলুম। সে-নামে কোনও লোকই নেই কলকাতায়, আর আমি যে পেমেণ্ট নিলুম তাতেও আমি নিজের নাম সই করিনি!

সোহম্ বললে—কিন্তু এটা তো পাপ, এটা তো চরিত্রহীনতা!

—কে বললে এটা পাপ ? কে বললে এটা চরিত্রহীনতা!

সোহম্ বললে—ক্ষেত্রবাবু, আমাদের স্কুলের হেড-মাস্টার মশাই, যিনি আমাকে চাকরিটা করে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন পাপ আর পারা কখনও চাপা থাকে না। একদিন তা প্রকাশ হয়ে পড়বেই, একদিন তা ফুটে বেরোবেই—

মেহের আলি বললে—সব ঝুট্ বাৎ রায় সাহেব। সব বিলকুল ঝুট্! আমাদের শেয়ার মার্কেটে তো সবাই ইন্‌কাম-ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। কে কখন কী বেচছে আর কে কখন কী কিনছে তার কোনও রেকর্ড থাকে না। এত লোক তো পাপ করছে, কই, তা তো ফুটে বেরোচ্ছে না।

তারপর হঠাৎ বললে—তা যাক গে, আমায় এখুনি আর একজন ক্লায়েণ্টের কাছে যেতে হবে, আমি চলি রায় সাহেব, পরে দেখা হবে। গুড নাইট—

মেহের আলি চলে যেতেই সোহম্ আবার নিজের ঘরের ভেতরে এল। তখনও সুমিত্রা সোহমের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, লোকটা আবার কী করতে এসেছিল তোমার কাছে ?

সোহম্ টাকাগুলো দেখিয়ে বললে—এই টাকাগুলো দিতে। এতে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা আছে!

—এত টাকা কোথা থেকে এল ?

সোহম্ বললে—আমি মেহের আলি সাহেবকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলুম, সে ফাট্কা বাজারে সে-টাকা খাটিয়ে এই পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছে। সেই টাকা-গুলোই দিতে এসেছিল। এ টাকা তো অফিসে দেওয়া যায় না—

সুমিত্রা বললে—কিন্তু ফাট্কা খেলাও তো এক রকমের জুয়া। তুমি কি জুয়া খেল নাকি ?

সোহম্ বললে—না না, তুমি শেয়ার কেনা-বেচাকে জুয়া বলছ কেন ?

সুমিত্রা বললে—ওই একই কথা হলো। যার নাম শেয়ার কেনা বেচা তার নামই জুয়া।

সোহম্ বললে—সব্বাই তো শেয়ার কেনা-বেচা করে, তাহলে কি তুমি বলতে চাও তারা সবাই জুয়াড়ী ?

—হ্যাঁ, জুয়াড়ী। শুধু নামটা আলাদা। তুমি ও খেলা খেলতে পারবে না। তুমি ওই মেহের আলিকে আসতে বারণ করে দেবে। ও যেন আর আমাদের বাড়িতে না আসে।

সোহম্ বললে—ঠিক আছে, আমি ওকে না-আসতে বলে দেব। কিন্তু আমার আসল কথাটার তো জবাব দিলে না ?

—কি কথা ?

—ওই যে বললুম আমার সঙ্গে তোমাকে ক্লাবে যেতে হবে।

সুমিত্রা বললে—তাহলে আমার মা'কে জিজ্ঞেস করি আগে, মা যদি ক্লাবে যেতে বলে তাহলে আমার যেতে আপত্তি নেই।

—কিন্তু আমি তোমার স্বামী, আমার চেয়ে তোমার মা'ই বড় হলো ?

সুমিত্রা বললে—ছোটবেলা থেকে আমি তো মা'র কথাই বরাবর শুনে এসেছি। মা যা-যা বলেছে আমি বরাবর তাই-ই করে এসেছি। এই যে রোজ শিবপুজো করি, এ তো মা'র কথাতেই করি, মা পুজো করতে বলেছে বলেই তো পুজো করি।

সোহম্ বললে—তা তোমার মা যদি ক্লাবে যেতে আপত্তি করেন তো তুমি ক্লাবে যাবে না ?

সুমিত্রা বললে—না।

সোহম্ বললে—আমি তোমার স্বামী, তোমার স্বামীর চেয়ে তোমার কাছে তোমার মা'ই বড় হলো ? তোমার মা'ই তো বলেছেন স্বামীর ভালোর জন্যে সব কিছু করতে।

সুমিত্রা বললে—আমি তো তোমার ভালোর জন্যে শিবপুজো করি রোজ।

—তা তুমি শিবের পুজো করলে আমার ভাল হবে এ-কথা কে বললে তোমাকে ?

সুমিত্রা বললে—তোমার ভাল হয়নি বলতে চাও ?

সোহম্ স্বীকার করলে—তা অবশ্য হয়েছে। এই যে আজকে মেহের আলি সাহেব আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেল এ তো তোমার শিব পুজোরই ফল,

নইলে আমি তো এ আশাই করিনি! এই নাও, টাকাটা তোমার জন্যেই হাতে পেলুম। তুমি এটা ভালো করে আলমারিতে তুলে রাখো।

সুমিত্রা নোটের বাণ্ডিলগুলো নিয়ে আলমারিতে তুলে দরজায় তালা-চাবি বন্ধ করে দিলে। তারপর চাবিটা শাড়ির আঁচলে বেঁধে কাছে এল।

বললে—আমার কিন্তু বড় ভয় করছে গো—

—কেন ভয় কীসের?

—জুয়া খেলে এতগুলো টাকা পাওয়া কি ভালো? এতে যদি নেশা হয়ে যায় শেষকালে?

সোহম্ বললে—নেশা আমার হবে না। নেশা হলে আগেই হোত। মেহের আলি তো কতদিন থেকে আমাকে ফাটকা খেলতে বলছে, কিন্তু আমি কি খেলেছি?

সুমিত্রা বললে—না, তা অবশ্য খেলনি, আমার খুব ভয় করে তাই তোমাকে বলছি—

—কীসের ভয়?

সুমিত্রা বললে—তোমাকে হারাবার ভয়।

সোহম্ বললে—পাগল হয়েছ? তোমার জন্যেই আমার ভাগ্য ফিরেছে। তোমাকে বিয়ে করেছিলুম বলেই আজকে আমার চাকরিতে এত উন্নতি।

সুমিত্রা বললে—আমার শুধু কষ্ট হয় বাবার কথা ভেবে।

—কেন?

সুমিত্রা বললে—বাবা তোমার এই উন্নতি চোখে দেখে যেতে পারলেন না। দেখতে পেলে তিনিই সব চেয়ে খুশী হতেন।

সোহম্ বললে—তুমি দুঃখ কোর না, তিনি স্বর্গ থেকে সমস্তই দেখছেন। তাঁর আশীর্বাদ না থাকলে কি আমি চাকরিতে এত উন্নতি করতে পারতুম!

তারপর একটু থেমে সোহম্ আবার বললে—ও-সব কথা থাক, এখন কী করবে বলো। মিস্টার সেন তোমাকে ক্লাবের মেম্বার করে নিতে বলেছেন। তুমি যদি মেম্বার না হও তাহলে তাঁর কাছে আমি মুখ দেখাবো কী করে বলো তো?

সুমিত্রা বললে—কিন্তু তুমি যে বলছো সেখানে গেলে আমাকে মদ খেতে হবে?

—তা তো খেতে হবেই।

—মদ খেলে যদি আমার বমি পায়, তখন?

সোহম্ বললে—মদ খেলে কারো বমি পায় না, আর তোমারই বমি পাবে?

সুমিত্রা বললে—আমি যে একটা মাতালকে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে বমি করতে দেখেছি -

সোহম্ বললে—সে তো বেশি ভাত খেলেও লোকে বমি করে। করে না?

সুমিত্রা বললে—তা অবশ্য করে। কিন্তু শুনিছি খারাপ মেয়েমানুষরা মদ খায়। আমার যদি শেষকালে নেশা হয়ে যায়? নেশা হয়ে গেলে তুমি আমাকে নেশা ছাড়াতে পারবে?

সোহম্ বললে—আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি তোমার নেশা হবেই না—

—তুমি কথা দিচ্ছ ?

—নিশ্চয়ই। শুধু প্যাটেল ইণ্টারন্যাশন্যাল এন্‌টারপ্রাইজের মিস্টার প্যাটেলের সঙ্গে একটু ঢলাঢলি করবার ভান করতে হবে তোমাকে। আর কিছু নয়।

—ঢলাঢলি মানে ?

সুমিত্রা একটু ভয়ে শিউরে উঠলো। বললে—সে আমার গায়ে হাত দেবে নাকি ?

সোহম্ বললে—তা দিলে দেবে। তাতে তো আর তোমার গা ক্ষয়ে যাবে না। আর যদি মিস্টার প্যাটেল তোমার হাতে মদের ডিকেণ্টার তুলে দেয় তুমি যেন তা রিফিউজ কোর না। তাহলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে—

—কিন্তু তোমার তো চাকরিতে অনেক উন্নতি হয়েছে। আর উন্নতির কী দরকার ?

সোহম্ বললে—উন্নতি আর তেমন কী হয়েছে ?

—বারে, তুমি তো চার হাজার টাকা মাইনে-হাতে পাও। বিয়ের সময় পেতে দুশো প'চাত্তর টাকা। এত উন্নতির পরেও তোমার সাধ মেটেনি ?

সোহম্ বললে—উন্নতির কি শেষ আছে সুমিত্রা ? মিস্টার সেন বলেছেন এই মিস্টার প্যাটেলকে যদি ঘায়েল করতে পারি তাহলে আমাকে কোম্পানির ডাইরেক্টর করে দেবেন।

—তাহলে তখন কত মাইনে হবে ?

সোহম্ বললে—প্রায় হাজার বারো। ইনকাম ট্যাক্স কেটে নিয়ে আমার হাতে তখন থাকবে পাঁচ হাজার ! তাছাড়া আমি এণ্টারটেনমেণ্ট অ্যালাউয়েন্স পাবো। তাও রোজ প্রায় দুশো টাকার মত। তারপরে ডাক্তারের খরচ লাগবে না। এর চেয়েও আরও বিরাট কোয়ার্টার পাবো। তারপর বছরে একবার এক মাসের ছুটিতে কোম্পানির খরচায় বিলেতে বেড়াতে যেতে পাবো। একটা পয়সাও পকেট থেকে খরচা করতে হবে না। আমি এই সমস্ত ভেবেই তোমাকে আমার এই উপকারটা করতে বলছি—নইলে তোমাকে কেন এত পীড়াপীড়ি করছি—

সুমিত্রা এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না।

সোহম্ আবার বলতে লাগলো—আর তা ছাড়া মদ জিনিসটা যদি খারাপই হবে তাহলে গভর্মেণ্ট মদ-বিক্রির দোকানের জন্যে লাইসেন্স দিচ্ছে কেন, সেই কথাটা বলো। আর এমন একটা চান্স তো আর জীবনে আসবে না আমার—

সুমিত্রা বললে—একবার মাকে জিজ্ঞেস করে আসবো ?

সোহম্ বললে—না না, ও'রা সেকেলে মানুষ, ও'রা ঠিক জিনিসটার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন না—ও'কে জিজ্ঞেস করতে যেও না। তোমার নিজের ইচ্ছে হলে খাবে, আর না ইচ্ছে করলে খাবে না, আমি তোমার ওপর জোর করতে চাই না—

সুমিত্রা সোহমের মুখের দিকে ভালো করে নজর দিয়ে বললে—সত্যিই আমি ক্লাবে গিয়ে মদ খেলে তোমার চাকরিতে উন্নতি হবে ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। নইলে কি আমি মিছিমিছি তোমাকে এত পীড়াপীড়ি করছি ?

সুমিত্রা বললে—তাহলে একটু মদ এনে দাও, আমি আগে একটু চেখে দেখি কী রকম লাগে খেতে !

সোহম্ বললে—মদ তো কিনেই এনেছি, আমার পোর্টফোলিও ব্যাগে রয়েছে। বার করবো ?

সোহম্ অফিস থেকে আসবার সময়েই একটা বোতল কিনে এনেছিল। সোহম্ ব্যাগটা খুলে বোতলটা বার করতে যাচ্ছিল।

সুমিত্রা বললে—দাঁড়াও, এখন বোতল বার কোরো না, আমি দরজাটায় খিল দিয়ে আসি—

সোহম্ বললে—তাহলে এক গ্লাস জল দিতে বলে দাও রতনকে—

রতন এক গ্লাস জল দিয়ে গেল। সে চলে যেতেই সুমিত্রা দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

ততক্ষণে সোহম্ গ্লাসে মাপ-মতন মদ ঢেলে ফেলেছে, আর তার সঙ্গে জল মিশিয়ে দিয়েছে।

গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বললে—এই নাও, খাও—

গ্লাসটা হাতে নিয়ে সুমিত্রা আবার জিজ্ঞেস করলে—বমি হবে না তো ?

সোহম্ সাহস দিয়ে বললে—বমি হবে কেন ? দেখবে একটা আমেজ আসবে। বেশ আরাম হবে। বেশ মনে হবে পৃথিবীটা খুব সুখের জায়গা, খাও, খেয়ে দেখ—

সুমিত্রা গ্লাসটা নিয়ে মরি-বাঁচি করে সমস্ত মদটা গলার মধ্যে উপুড় করে ঢেলে দিলে।

—ও কী করলে ? ও কী করলে ? একসঙ্গে খেয়ে ফেললে কেন ?

কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। সুমিত্রা কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ধপাস করে বিছানায় ঢলে পড়লো।

সোহম্ তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে বললে—ও-রকম এক ঢোঁকে খেয়ে ফেললে কেন ? এক চুমুক এক চুমুক করে খেতে হয় ! তোমাকে এক চুমুকে সব খেয়ে ফেলতে কে বলেছে ?

সুমিত্রা তখন বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট করছে—ওগো, আমার গলা জ্বলে গেল যে, আমার মাথাটা ঘুরছে, আমার যে গা বমি-বমি করছে—

সোহম্ বললে—তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো—

বলে সিলিং-এ ঝোলানো ফ্যানটা আরো জোরে চালিয়ে দিলে। বন বন করে ঘুরতে লাগলো পাখাটা।

—এখন একটু ভালো লাগছে ?

সুমিত্রা বললে—তুমি আমার এ কী করলে গো ? আমি এখন কী করি ? আমার মাথাটা যে টলছে—

—যদি বমি পায় তো বাথরুমে চলে যাও—

সুমিত্রা বললে—আমি যে মাথা তুলতে পারছি না গো! আমার কী হবে? আমার যে কিছুছু ভালো লাগছে না—

সোহম্ বললে—তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো। এখ্খুনি ঘুম এসে পড়বে, ঘুমোলে দেখবে খুব আরাম হবে। চোখ বোঁজো, চোখ বুঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করো—

সুমিত্রার তখনও অস্বস্তি কাটেনি। সে বললে—লোকে কেন এ-সব ছাই-পাঁশ খায় বলো তো, এ খেয়ে কী সুখ পায় তারা—কী জানি—

শেষকালের দিকে সুমিত্রার গলায় কথাগুলো জড়িয়ে আসছিল। তারপর আস্তে আস্তে চোখ দু'টো বুঁজে এল। সোহম্ তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যখন সুমিত্রা একেবারে ঘুমিয়ে পড়লো তখন সে সে-ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে ঘরের দরজায় শেকল দিয়ে দিলে। আর রতনকে ডেকে বলে দিলে কেউ যেন ও-ঘরের দিকে না যায়। মেমসাহেব এখন ঘুমোচ্ছে।

টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিস্টার এন-বি-সেন, মানে নীহারবিন্দু সেন, সোজা রাস্তায় চাকরিতে উন্নতি করেনি। আরো দশজন ক্ষেত্রবাবুর ছাত্রদের মধ্যে মিস্টার সেনও একজন। ঠিক কাজের জন্যে ঠিক লোকটিকে বেছে নেবার ক্ষমতা মিস্টার সেনের আছে। সোহম্ যখন ক্ষেত্রবাবুর চিঠি নিয়ে এসেছিল তখনই মিস্টার সেন ঠিক-ঠিক চিনে নিয়েছিল তাকে। প্রথমে সাধারণ চাকরিই দিয়েছিল সোহম্কে।

মিস্টার সেন বরাবর সকলকে বলতো—ভালো করে কাজ করো, উন্নতি তোমাদের হবেই হবে। এমার্সনের একটা কথা মনে রাখবে—অনেস্টি নেভার কাম্স্ টু লস্। সততার পুরস্কার একদিন না একদিন পাবেই।

টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানি খাঁটি ব্রিটিশ ফার্ম। যাদের নামে এই কোম্পানি তারা এখন পরলোকে। কিন্তু এখনও তাদের দু'জনের নামটা অমর হয়ে আছে কোম্পানিতে। সেই ব্রিটিশ আমলেই মিস্টার সেন এই অফিসে ঢুকেছিল একজন সাধারণ কর্মী হয়ে। কিন্তু জানতো কী করে চাকরিতে উন্নতি করা যায়। তখন সাধারণ কেরানী ছিল মিস্টার সেন। মাইনে পেত দেড়শো টাকা। কিন্তু তার চেহারা দেখে কে বলবে তার মাইনে অত কম! দেড়শো টাকার মাইনে পেয়েও মিস্টার সেন যে স্যুট পরতো তার দামই দু'শো টাকা। তার সঙ্গে নেকটাই আর ভার্নিস করা চক্চকে জুতো। কাজ যত না করতো তার চেয়ে বেশি ছিল কাজের ভান। দরকারে অদরকারে বড় সাহেবের ঘরে যেত ঘন ঘন। তারপর যখন ডিসেম্বর মাসে এক্সমাস উৎসব হতো তখন নিউ মার্কেট থেকে কেক আর গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে আসতো বড় সাহেবের বাড়িতে। তাতে বড়

সাহেব যত না খুশী হতো তার চেয়ে বেশি খুশী হতো মেমসাহেব।

তখনই বড় সাহেবের নজর পড়ে গিয়েছিল মিস্টার সেনের ওপর। মেমসাহেব বড় সাহেবকেও খুব তাড়া দিত। বলতো—সেনের মত লোককে তুমি মাত্র দেড়শো টাকা মাইনে দিচ্ছ, দিস ইস্ এক্সপ্লয়টেশন।

আর তাছাড়া তখনকার দিনে সাহেবরাও ভালো পোশাক-আশাকেরও কদর দিত। ভালো পোশাক-আশাক হচ্ছে স্মার্টনেসের পরিচয়। মিস্টার সেন স্মার্টনেস দেখেই মানুষের বিচার করতো। শেষকালে ১৯৪৭-এর কয়েক বছর পরেই পাকা ইংরেজ সাহেবরা ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে গেল। তারপরে ওয়েলফেয়ার অফিসারের পোস্টটা খালি হলো।

তখন নতুন ওয়েলফেয়ার অফিসারের জন্যে দরখাস্ত করার নোটিশ এলো।

পি-বি দাশবাবু বললেন—তুমিও একটা দরখাস্ত করে দাও হে রায়—

সোহম্ বললে—আমাকে কি নেবে সাহেব ?

পি বি-দাশবাবু বললেন—দরখাস্ত একখানা করতে দোষ কী ? তুমি তো ইংরিজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছ। আর সেন সাহেবও তোমাকে খুব ভালোবাসে।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—কী করে আপনি বুঝলেন আমাকে বড় সাহেব ভালোবাসে ?

পি বি-দাশবাবু বললেন—বুঝতে পারি হে বুঝতে পারি। এতদিন চাকরি করছি আর এটা বুঝতে পারবো না কে কোন মানুষটাকে ভালোবাসে !

—ওয়েলফেয়ার অফিসারের স্টার্টিং মাইনে কত ?

পি-বি-দাশবাবু বললেন—এক হাজারের কম তো নয়—

সোহম্ বললে—কী জানি ! আমার যে ফাটা কপাল !

পি বি-দাশবাবু বললেন—তোমার ফাটা কপাল যদি হয়ও, আমার সুমিত্রার কপাল তো আর ফাটা নয় ! যেদিন থেকে আমার সুমিত্রা জন্মেছে সেদিন থেকেই আমার অবস্থা ফিরে গেছে তা জানো ? আমার মেয়ে রোজ শিবপুজো করে তা জানো ? পুজো করে শুধু তোমার মত স্বামী পাবার জন্যে। দেখবে তাকে বিয়ে করলে তোমার ভালোই হবে, দেখে নিও—

পি-বি-দাশবাবুর সঙ্গেই সোহমের ঘনিষ্ঠতাটা বেশি হয়েছিল। কয়েকদিন সোহম্ অফিসে আসতে পারেনি, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছিল একজনের হাত দিয়ে।

মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। সবাই-ই জিজ্ঞেস করেছিল সোহম্‌বাবুর কী হয়েছে। অসুখে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেওয়া সাধারণ নিয়ম। অসুখ না হলেও অসুখের ভান করা অফিসের জীবনে সবাই করে

থাকে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেওয়াটা তাই কিছু অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে কলকাতা শহরের বর্ষাকালে, যখন রাস্তায় রাস্তায় জল জমে গিয়ে পুকুর হয়ে যায়। তখন ছুটি নেওয়ার লোকের সংখ্যা বেড়েই যায়।

কিন্তু পি-বি-দাশবাবু বললেন—না হে, সোহমের তো এ-রকম অভ্যেস নয়, নিশ্চয়ই কিছু একটা সিরিয়াস অসুখ হয়েছে তার—

মেস-বাড়ি তখন খালি। যার যার নিজের কাজে অফিসে চলে গেছে তখন। সোহম্ একটা ঘরের কোণের একটা বিছানায় জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট করছিল। এমন সময় পি বি-দাশবাবু গিয়ে হাজির।

পি-বি দাশবাবুকে দেখে সোহম্ চোখ খুললে।

ক্ষীণ গলায় বললে—আপনি?

পি বি-দাশবাবু অবাক হয়ে গিয়ে বললেন—তুমি তো আশ্চর্য ছেলে হে, এত বড় একটা অসুখে ভুগছো আর আমাকে একটা খবর দিলে না?

—কোনও লোক পাইনি খবর দেবার।

—তা ছুটির দরখাস্ত তো পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তাকে দিয়ে আমাকে একটা খবর দিতে পারলে না? কী হয়েছে তোমার? টায়ফয়েড্ না সর্দিজ্বর? ডাক্তার কী বলছে?

সোহম্ বললে—ডাক্তার ডাকিনি তো।

—সে কী? জ্বর হয়েছে অথচ ডাক্তার ডাকোনি?

—কে ডেকে দেবে?

—ওষুধ কী খাচ্ছো?

—কিছু ওষুধই খাচ্ছি না।

পি-বি-দাশবাবু বললেন—তোমাকে নিয়ে তো মহা মুশকিল হলো দেখছি। ডাক্তারও দেখাবে না, ওষুধও খাবে না। এই অবস্থায় তোমাকে ফেলে আমি কী করে যাই বলো তো?

তারপর একটু ভেবে বললেন—তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আছেন? তুমি বলো তো তাদের একবার খবর দিতে পারি।

সোহম্ বললে—আমার কেউ নেই পি-বি-দাশবাবু. নিজের বলতে পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। এক আপনি ছাড়া।

পি-বি-দাশবাবু বললেন—তাহলে এখানে তোমাকে এই অবস্থায় একলা ফেলে কী করে বাড়ি যাই বলো তো?

তারপর একটু ভেবে বললেন—তাহলে এক কাজ করি, তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই। সেখানে তবু তোমাকে দেখবার লোক থাকবে। আমার স্ত্রী আছে, সুমিত্রা আছে—

—সুমিত্রা কে?

—আমার মেয়ে, যাকে তুমি প্রথমে দেখেছিলে। তুমি যেদিন আমার বাড়িতে গিয়েছিলে, আমি বাড়ি ছিলুম, তোমাকে দরজা খুলে দিয়ে বসতে বলেছিল। সেই তো সুমিত্রা! আমি যতক্ষণ অফিসে থাকবো, তারা ততক্ষণ তোমার

দেখাশোনা করবে !

সোহম্ এই কথার কোনও জবাব দেয়নি। তারপর পি-বি-দাশবাবু নিজেই একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসেছিলেন আর সেই ট্যাক্সিতেই তাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন নিজের বাড়িতে। সেখানে পি-বি-দাশবাবুর স্ত্রী আর মেয়ে যে সেবা-যত্ন করেছিল তা জীবনে ভুলতে পারবে না সোহম্।

পি-বি-দাশবাবু সকালবেলাই সাড়ে ন'টার মধ্যে খেয়েদেয়ে অফিসে চলে যেতেন। আর তারপর সারাদিন পি-বি-দাশবাবুর স্ত্রী আর মেয়ে তার কাছে কেউ-না-কেউ একজন থাকতো। ঠিক-ঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়ানো থেকে আরম্ভ করে পথ্য পর্যন্ত সব তারাই করতো।

সোহম্ বলতো—আপনাদের বড় কষ্ট দিচ্ছি মাসিমা, আমার বড্ড লজ্জা করছে—

মাসিমা বলতো—তুমি থামো তো তোমাকে বেশি কথা বলতে হবে না—

সুমিত্রাও বলতো—আপনি বেশি কথা বলবেন না, ডাক্তারবাবু মানা করে দিয়েছেন।

সোহম্ বলতো—তোমরা আমার জন্যে এত করছো, এ ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না—

পি-বি-দাশবাবু অফিস থেকে ফিরে এসে বলতেন—তুমি নাকি বলেছ তুমি আমাদের ঋণ শোধ করতে পারবে না !

সোহম্ বলতো—সত্যি, যা সত্যি তাই-ই আমি বলেছি—

পি-বি-দাশবাবু বলতেন—ঋণ শোধ করতে হবে না মানে ? তোমাকে আলবৎ ঋণ শোধ করতে হবে। তোমার অসুখের জন্যে আমার কত টাকা খরচ হয়েছে জানো ? তুমি ভাবছো আমি খুব বড়লোক, আমার অনেক টাকা আছে ? জানো, আমি অফিসে কত মাইনে পাই ? এই বাড়িটা করতেই আমার অনেক টাকা ধার করতে হয়েছে। তারপর আজ এক মাস ধরে তোমাকে রোজ ডাক্তার এসে দেখে যাচ্ছে, তাকে আট টাকা করে রোজ ফিস দিতে হচ্ছে, তার ওপর আছে ওষুধের খরচা। আমি এই সব খরচার হিসেব রাখছি।

সোহম্ বললে—আমি তো মাসে মাত্র দু'শো পঁচাত্তোর টাকা মাইনে পাই, তা থেকে মাসে আপনাকে পঞ্চাশ টাকা করে দেব !

—আর সুদ ? সুদ দেবে না ?

সোহম্ বললে—যা সুদ চাইবেন তাই-ই দেব !

—তোমার জন্যে আজ পর্যন্ত ট্যাক্সি-ভাড়া ডাক্তার ওষুধ সব কিছু নিয়ে এগারোশো টাকার মতন খরচ হয়েছে। বারো পার্সেন্ট হিসেবে আমাকে সুদ দিতে হবে। সুদ আমি ছাড়বো না।

সোহম্ বলতো—অফিসে ঢুকে হাতে মাইনে পেলেই আপনার সব দেনা শোধ করবো, সুদও দেব, কথা দিচ্ছি—

পি-বি-দাশবাবু বলতেন—মেসে থাকলে তো তুমি মারা যেতে। বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে। যেতে না ?

সোহম্ বলতো—তা তো যেতুমই। আপনি সেদিন আপনার বাড়িতে না নিয়ে এলে আমি মারাই যেতুম। আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আপনাকে ছোট করতে চাই না। আপনি আমার জন্যে যা করেছেন আমার নিজের বাবা বেঁচে থাকলেও বোধ হয় তা করতেন না—

পি বি-দাশবাবু বললেন—কথাগুলো মুখে তো বললে, কিন্তু অন্তর থেকে বললে বুঝবো তুমি আমাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করো—। তা পরে আবার এ-সব কথা ভুলে যাবে না তো ?

—আমি কথা দিচ্ছি জীবনে কখনও এ-কথা ভুলবো না।

—তাহ'লে আমি যা অনুরোধ করবো তুমি তা রাখবে কথা দাও ?

সোহম্ বললে—আপনি যা বলবেন আমি তাই করবো।

—আমি তোমাকে যদি বিষ খেতে বলি তো বিষ খাবে ?

সোহম্ কী জবাব দেবে এ-কথার তা বুঝতে পারলে না।

কিন্তু তার আগেই পি বি-দাশবাবু বললেন—তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করবে ?

হঠাৎ সোহমের বুকটা ধড়াস করে উঠলো। তার সমস্ত শরীরটা যেন থর-থর করে কাঁপতে লাগলো। মাথা থেকে পা পর্যন্ত অস্বস্তিতে ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগলো।

বললে—কিন্তু সুমিত্রা যদি আমাকে পছন্দ না করে ?

—সে সব আমার ওপর ছেড়ে দাও তুমি !

সোহম্ বললে—কিন্তু বিয়ে করে আমি বউ নিয়ে যাবো কোথায় ? আমি তো মেসে থাকি। সেখানে আমার একলার জন্যেই পড়ে মাসে একশো পঞ্চাশ টাকা। আর মাইনে যা পাই তা আপনি নিজেই জানেন !

পি-বি-দাশবাবু বললেন—তা চিরকাল তো তোমার এত কম মাইনে থাকবে না। মাইনে তোমার শিগ্গির বেড়ে যাবে।

—কী করে জানলেন আমার মাইনে বেড়ে যাবে শিগ্গির ?

—তাহলে কথা দাও যখন বাড়বে তখন আমার মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে ? তবে আমি জানি তোমার মতন ছেলের মাইনে না-বেড়ে থাকতে পারে না। তোমার গুণ আছে, এটা সেন সাহেব জানে। জানে যে তুমি ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স !

—কিন্তু সে তো···

কথাটা পুরো বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। আর একটু হলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল কথাগুলো। সেই প্রফুল্ল, সেই ভোলাদা—তারা দু'জনে মিলে তাকে যে কী করে অনার্স ডিগ্রী পাইয়ে দিয়েছে, তার জন্যে কত টাকা নিজের পকেট থেকে বার করতে হয়েছে তা বাইরের লোক কী করে বুঝবে ? তবু জিনিসটা ভুলতে পারে না সোহম্। এখনও ঘুমের মধ্যেও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে শিউরে ওঠে সে—ওই বুঝি সবাই জানতে পেরে তাকে ধিক্কার দিচ্ছে। বলছে —ওই যে, ওই ছেলেটা ঘুষ দিয়ে ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স সার্টিফিকেট

আদায় করেছে। সত্যি বলতে কী, তার সার্টিফিকেট পেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। ভোলাদা পুলিসকে কিছু টাকা দিয়েছিল আর কোন্ কলেজের এক প্রফেসারকে দু'হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে অ্যানসার-পেপার লিখিয়ে নিয়েছিল। তারপর পুলিসের চোখের সামনেই ওপর থেকে সুতো ঝুলিয়ে ওপরে তার হাতে তুলে দিয়েছে।

এ-সব অবিশ্বাস্য খবর বাইরের লোকরা জানে বটে, কিন্তু হাতেনাতে ধরতে তো কেউ পারে না।

পি-বি-দাশবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—কী ভাবছো ?

সোহম্ বললে—আপনি আমাকে বড় বিপদে ফেললেন। ভাবছি আপনার কথা আমি এড়াবো কী করে ?

পি বি-দাশবাবু বললেন—না না, তুমি সোজা বলে দাও 'না', আমি কিছুছু মনে করবো না।

আগে যিনি ওয়েলফেয়ার অফিসার ছিলেন তিনি মিস্টার সান্ন্যাল। দয়াশংকর সান্ন্যাল। তাঁর ওপর মিস্টার সেনের তেমন আস্থা ছিল না। তাঁর রিটায়ার করবার বয়েস প্রায় হয়ে এসেছিল। ঠিক সেই সময়েই একটা গণ্ডগোল হলো অফিসে। সোহম্ তখন অসুখ থেকে সেরে উঠে আবার তার মেসে গিয়ে উঠেছে। সেরে ওঠবার পর অফিসে গিয়ে দেখে হৈ-চৈ কাণ্ড চলেছে সেখানে। এতদিন অসুস্থ ছিল বলে পি-বি-দাশবাবু তাকে কোন খবরই দেননি।

অফিসে গিয়ে দেখলে অফিসে ঢোকবার মুখে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়েছে—বোনাসের দাবীতে ধর্মঘট। বোনাসের দাবীতে ধর্মঘট। "দালাল সাহেবের বিচার চাই", "মেহনতী মানুষের রক্ত দিয়ে মুনাফা করা চলবে না চলবে না।" "সান্ন্যাল সাহেবের রক্ত চাই", "রক্তের বদলে রক্ত দেব কাজের বদলে বোনাস নেব", "আমাদের দাবী মানতে হবে নইলে কোম্পানি জাহান্নমে যাবে", "বিশ পার্সেণ্ট বোনাস চাই নইলে কোম্পানির রেহাই নাই", "গরীব মেরে অফিসার পোষা চলবে না, চলবে না", "পুঁজিপতির দালাল সান্ন্যাল সাহেবের খুন চাই, খুন চাই।"

আরো কত রকমের সব লেখা। এগুলো আগে ছিল না। অফিসের ভেতরেও নোটিশ-বোর্ডের ওপরে শুধু এই রকম পোস্টার আর পোস্টার। খবরের কাগজের ওপরে লাল কালি দিয়ে সব হাতে লেখা। টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানির ফ্যাক্টরির ইউনিয়নের তরফ থেকে পোস্টারগুলো লেখা হয়েছে।

অনেকদিন পরে সোহম্ অফিসে এসেছে। সবাই জেনে গিয়েছিল সোহমের অসুখের কথা। পি-বি-দাশবাবুর অতিথি সৎকারের কথাও লোকে জেনে গিয়ে-

ছিল। সোহমের জন্যে পি-বি-দাশবাবুর টাকা খরচের কথাও জেনে গিয়েছিল। সোহম্ অফিসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। সবাই জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন আছেন?

সোহম্ বললে—এই পি-বি-দাশবাবু না থাকলে এ-যাত্রা মরেই যেতুম। তা এসব কী সব পোস্টার দেখছি চারদিকে! ব্যাপার কী!

কেষ্টবাবু বললে—ধর্মঘট হবে আগস্ট মাসের ষোল তারিখ থেকে—আমাদের ইউনিয়ন মিটিং করে ঠিক করেছে—আপনিও একজন মেম্বার আমাদের। আপনাকেও এই ধর্মঘট করতে হবে।

—সকলেই ধর্মঘট করবে?

—হ্যাঁ, সকলেই ধর্মঘট করবে। এমন কি বুড়ো মানুষ পি বি-দাশবাবু পর্যন্ত ধর্মঘট করবেন।

সোহম্ বললে—ধর্মঘট করলে যদি চাকরি যায়?

কেষ্টবাবু বললে—সকলের চাকরি চলে যাওয়া অত সোজা কাজ নয়।

—যদি কোম্পানি লক্-আউট্ ঘোষণা করে অফিসের গেট বন্ধ করে দেয়?

—কতদিন লক্-আউট্ করবে?

সোহম্ বললে—কোম্পানি তো উঠে যেতে পারে! কলকাতার অফিস তুলে দিয়ে শুধু বোম্বাইতে অফিস রাখতে পারে।

কেষ্টবাবু বললে—অত ভয় করলে চাকরি করা চলে না। আমরা যদি সবাই এক-কাট্টা হই তো কোম্পানি কুড়ি পার্সেন্ট বোনাস না দিয়ে যাবে কোথায়? কোম্পানীকে বাপ-বাপ বলে আমাদের দাবী মানতে হবে। আপনাদের মতন লেখা-পড়া-জানা লোক যদি আমাদের সঙ্গে হাত মেলান তাহলে আমরা কাউকে ভয় করি না। আপনি আমাদের লীডার হবেন।

সোহম্ বললে—আমি তো ট্রেড ইউনিয়নের কিছুই জানি না। টাকা দিতে হয় তাই দিই। আমি ও-সব কাজ করতে পারবো না আমাকে মাফ্ করবেন। তা ছাড়া আমি সবে টাইফয়েড্ থেকে উঠেছি। আমি অত পরিশ্রম করতে পারবো কেন?

কেষ্টবাবু বললে—আপনাকে তো কিছু করতে হবে না, শুধু নামে প্রেসিডেন্ট্ হবেন। মাঝে মাঝে মীটিং হবে তাতে গরম গরম বক্তৃতা দেবেন আর মালিকদের গালাগালি দেবেন। আসল কাজ করবো আমরাই। আমরা পোস্টার লিখবো, মিছিল করবো, ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার সান্যালকে ঘেরাও করবো।

সোহম্ বললে—ঘেরাও করা কি ভালো? বুড়ো মানুষ, হার্টের অসুখ। হঠাৎ যদি মারা যান?

কেষ্টবাবু বললে—মারা গেলেই তো ভালো। আমরা শালা গরীব বলে কি মানুষ নই? আপনি একটু ভাবুন, ভেবে আমাদের বলে দেবেন। আমাদের ব্যালট নেওয়া হবে। আপনি দাঁড়ালে তাহলে সবাই আপনাকেই ভোট দেবে—

কেষ্টবাবু চলে যেতেই সোহম্ আবার ডাকলে—কেষ্টবাবু শুনুন, আর কিছুদিন সবুর করুন, আমি দু'তিনদিন একটু ভেবে দেখি—

—ঠিক আছে—

বলে কেন্টবাবু চলে গেল।

তারপর একে একে সবাই-ই বাড়ি চলে গেল। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বেজেছে। পি-বি-দাশবাবু কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—কী হে, তুমি বাড়ি যাবে না? পাঁচটা তো বেজে গেছে—

সোহম্ বললে—আর একটু কাজ বাকি আছে, এই হাতের কাজটা সেরেই উঠবো—

পি-বি-দাশবাবু বললেন—তুমি সবে টাইফয়েড থেকে উঠেছ, এখন এত কাজ করা কি ভালো!

সোহম্ বললে—আপনি ভাববেন না, আমি একটু পরেই উঠবো।

পি-বি-দাশবাবু চলে গেলেন। অফিস ফাঁকা। হঠাৎ খোদ সেন সাহেবের চাপরাসী এসে বললে—বাবু, সেন সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়া—

—আমাকে?

সোহম্ একটু অবাক হয়ে গেল। বেলা পাঁচটার সময়ই তো সেন সাহেব বাড়ি চলে যায়, আজ এতক্ষণ অফিসে রয়েছে শুনে একটু খট্‌কা লাগলো মনে। আর সেন সাহেব জানতেই বা পারলে কী করে যে সে এখনও অফিসে আছে। কিংবা বোধ হয় চাপরাসীর কাছে খবর নিয়েছে। আস্তে আস্তে সে সেন সাহেবের ঘরে গেল। ভেতরে ঢুকে দেখলে সেন সাহেব ছাড়া সান্যাল সাহেবও রয়েছে।

সোহম্ ঘরে ঢুকতেই সেন সাহেব বললেন—ওখানে বসুন!

সোহম্ বসলো। সেন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—আপনি তো বহুদিন অসুস্থ ছিলেন, তার পরেও এতক্ষণ অফিসে আছেন কেন?

সোহম্ বললে—কতকগুলো কাজ এরিয়ার পড়ে আছে বলে সেগুলো শেষ করছিলুম—

—আপনি তো ইংরেজী ফার্স্ট ক্লাস অনার্স, না?

সোহমের মুখখানা লজ্জায় আত্মগ্লানিতে বেগুনী হয়ে উঠলো। বললে—হ্যাঁ স্যার—

—আপনি এখন মাইনে পাচ্ছেন কত?

সোহম্ বললে—দু'শো পঁচাত্তর টাকা।

সেন সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি এখানকার লেবার ইউনিয়নের মেম্বার?

সোহম্ বললে—আমি ইউনিয়নের মেম্বার হতে চাইনি স্যার, ওরা জোর-জবরদস্তি করে আমাকে মেম্বার করে নিয়েছে।

—অর্ডিনারি মেম্বার, না লীডারদের মধ্যে একজন?

সোহম্ বললে—লীডারও না, কিছুই না, শুধু চাঁদা দিতে হয় তাই দিই—

—কখনও কোনও মীটিং অ্যাটেন্ড করেছেন?

—না, স্যার।

সেন সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন—ওরা কখনও আপনাকে ওদের মীটিং

এ্যাটেণ্ড্ করতে বলেনি ?

সোহম্ বললে—বলেছিল, কিন্তু আমি যাইনি।

—কেন যাননি ?

সোহম্ বললে—ভয়ে। আমি গরীবের ছেলে, আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। আমার এ-চাকরি চলে গেলে আমি খাবো কী ? ওদের মীটিং এ্যাটেণ্ড্ করলে পাছে আপনি আমায় চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেন তাই ওদের মীটিং-এ কখনও যাইনি।

মিস্টার সেন বললেন—আচ্ছা, ঠিক আছে। ক্ষেত্রবাবুর চিঠিতে তো আপনার চাকরি হয়েছিল ?

—হ্যাঁ স্যার, তা আমার মনে আছে।

মিস্টার সেন বললেন—আপনি একবার একটা কাজ করতে পারবেন ?

—কী কাজ ?

—কাল সন্ধ্যের পর আমার বাড়িতে একবার যেতে পারবেন ?

সোহম্ বললে—বলুন স্যার, কখন ক'টার সময় যাবো ?

—এই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার থেকে আটটার মধ্যে। আমার বাড়ির ঠিকানাটা জানেন তো ?

—হ্যাঁ স্যার। প্রথম দিন তো ক্ষেত্রবাবুর চিঠি নিয়েই আপনার বাড়িতে গিয়েছিলুম !

সেন সাহেব বললেন—ঠিক আছে, তাহলে ওই কথাই রইল, আপনি কাল একবার ঠিক সন্ধ্যেবেলা আমার বাড়িতে যাবেন। আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা বলবার আছে—এখন আপনি যেতে পারেন।

সোহম্ সেন সাহেবকে নমস্কার করে চলে এল।

সোহম্ বাইরে চলে যেতেই মিস্টার সেন মিস্টার সান্ন্যালকে বললেন—ছেলেটাকে দেখে আপনার কী রকম ইম্প্রেশান হলো ?

মিস্টার সান্ন্যাল বললেন—ছেলেটা খুব লাজুক। এই সব ছেলেদের দিয়েই কাজ হাঁসিল করা যায়। সবাইকে স্যার যদি কুড়ি পার্সেণ্ট্ বোনাস দিতে হয় তাহলে তো হেড্-অফিস থেকে কৈফিয়ৎ তলব করে বসবে—

মিস্টার সেন বললেন—দেখি, কাল তো ও আমার বাড়িতে আসবে, তখন কী করা যায় ভাববো—

পরের দিন অফিসের পর সোহম্ একটু সকাল সকাল মেস থেকে বেরোল। যতটা সম্ভব একটু ফরসা জামা-কাপড় বার করে পরে নিয়েছে। বহুদিন আগে ক্ষেত্রবাবুর চিঠি নিয়ে প্রথম দিন গিয়েছিল সেন সাহেবের বাড়িতে। রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ক্ষেত্রবাবু স্যারের সঙ্গে।

তাড়াতাড়ি স্যারের সামনে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালো।

—কে? কে তুমি?

বুড়ো মানুষ, বয়েস হয়েছে। প্রথমটায় চিনতে পারেননি।

বললেন—ও সোহম্, তুমি? কোথায় যাচ্ছো?

সোহম্ বললে—আমাদের অফিসের সেন সাহেবের বাড়িতে, আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

—ও নীহার? নীহার তোমাকে ডেকেছে! যাও বাবা, যাও। তা তোমার চাকরি কেমন চলছে?

সোহম্ বললে—আপনার আশীর্বাদে ভালোই চলছে স্যার। আপনার আশীর্বাদ না পেলে জীবনে আমি কিছুই করতে পারতুম না।

ক্ষেত্রবাবু বললেন—আমি কে? আমি তো নিমিত্ত মাত্র। তুমি তোমার চরিত্রটা ঠিক রেখেছিলে বলেই ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছিলে। তাই এমন ভালো চাকরি পেয়েছ। আমার চিঠিটা উপলক্ষ মাত্র। সবই তোমার নিজের গুণে। নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম শুনেছ?

সোহম্ বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—নরেন্দ্রনাথ দত্ত কে?

—নরেন্দ্রনাথ দত্তর নামও শোনোনি? আশ্চর্য! একটা কুড়ি টাকার মাইনের চাকরির জন্যে সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছে নরেন। যদি নরেন সেদিন সে-চাকরি পেত তাহলে আর সেই নরেন দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারতো না, তা জানো? অথচ সে-যুগের ক'টা ছেলেই বা বি-এ পাস করেছিল? হাতে গুণে তা বলা যেত। যদি সেদিন নরেন চাকরি পেত তো বড় জোর কোনও বড় সাহেব কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়ে রিটায়ার করতো। তাতে কী লাভ হতো বলো তো তার?

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আসল কথা হলো চরিত্র। তা সবাই স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারে না—হওয়া সম্ভবও নয়। তবে যেটুকু তোমার হয়েছে তাই-ই যথেষ্ট। এখন তুমি কত মাইনে পাচ্ছ?

সোহম্ বললে—দু'শো পঁচাত্তর। আর ছাত্র পড়িয়েও পাই শ'দেড়েক টাকা—

ক্ষেত্রবাবু যেন নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—ভেরি গুড্, ভেরি গুড্, যখন তোমার পিসতুতো দাদা তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখনকার কথা একবার ভাবো তো!

সোহম্ বললে—সবই আপনার দয়ায় স্যার। আপনি সেদিন মিস্টার সেনকে চিঠি লিখে না দিলে আমার কিছুই হতো না—

ক্ষেত্রবাবু বললেন—না না, ও-কথা বোলো না। বলো তোমার চরিত্রের গুণেই এসব উন্নতি হয়েছে। চরিত্রটার দিকে নজর রেখো, দেখবে জীবনে তুমি আরো উন্নতি করবে। আর নীহারকে আমার কথা বোলো। আমি চলি—

ক্ষেত্রবাবু চলে গেলেন।

সোহম্ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিক ভাবলে। চরিত্র! 'চরিত্র' কথাটার

ওপরেই ক্ষেত্রবাবু বেশি জোর দিয়েছেন। কিন্তু তার যে উন্নতি হয়েছে, সে যে না পড়ে ভোলাদাকে টাকা দিয়ে পাস করেছে সে-কথা যদি ক্ষেত্রবাবু একবারও জানতে পারতেন !

কিন্তু না, আসলে চরিত্র টরিত্র সমস্তই বাজে কথা। এ জগতে যে সকলকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে সে-ই জিতে যাবে। জয় তারই হবে ! ক্ষেত্রবাবুদের জগৎ আর এ-যুগের জগৎ আলাদা। ক্ষেত্রবাবু নিজের মনের ভেতরে এক জগৎ তৈরি করে নিজেই সেখানে একলা বাস করছেন। এই চারপাশের জগৎটা যে কত পাল্‌টে গেছে তার খবর তিনি পাননি।

সোহম্‌ এবার সেন সাহেবের বাড়ির পথটা ধরলে। সেখানে সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে যাওয়ার কথা আছে। সাড়ে সাতটা তখনও বাজেনি। আরও পাঁচ মিনিট বাকি আছে তখনও সাড়ে সাতটা বাজতে। তবু সোহম্‌ সেন সাহেবের বাড়িতে গিয়ে কলিং-বেলটা বাজালে।

সেন সাহেবের চাপরাসী এসে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালে।

সোহম্‌ চারদিকে চেয়ে দেখলে। বিলাস আর ঐশ্বর্যের চিহ্ন যেন ফেটে পড়ছে। প্রত্যেকটা দরজা জানলায় পর্দা, প্রত্যেকটা সোফা-সেটির স্থান নির্ণয়ের পেছনে যেন অনেক যত্ন অনেক প্রচেষ্টার ছাপ রয়েছে। সত্যিই, সোহম্‌ মনে মনে ভাবলে, টাকাটাই সব। সকলের চেয়ে বড় হলো টাকা। যেদিন তার টাকা হবে সেদিন সেও এমনি করে ঘর-বাড়ি সাজাবে।

হঠাৎ সেন সাহেব ঘরে ঢুকতেই তার ভাবনার স্রোতে বাধা পড়লো। সোহম্‌ সসম্মানে উঠে দাঁড়ালো।

সেন সাহেব ঘরে ঢুকেই একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। বললেন—বোস বোস, দাঁড়িয়ে আছো কেন ?

সোহম্‌ সবিনয়ে বসে পড়লো।

সেন সাহেব বললেন—তোমায় কী জন্যে ডেকেছি জানো ?

সোহম্‌ বললে—না স্যার—

সেন সাহেব বললেন—তাহলে শোন। খুব মন দিয়ে শোন। আজকে তোমাকে এমন একটা কথা বলবো যা খুব কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল। বুঝতে পারলে ?

সোহম্‌ বললে—না স্যার, আমি কাউকে বলবো না—

—না, কারণ এটা খুব জরুরী আর কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল, আর সেই জন্যেই তোমাকে আমার বাড়িতে ডেকে এনেছি। এখন শোন—

বলে মিস্টার সেন একটা সিগারেট ধরালেন। আর যা কখনো করেননি, তাই-ই করলেন।

সিগারেটের প্যাকেটটা আর দেশলাইএর বাক্সটা সোহমের দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন—খাও, একটা সিগারেট খাও—

সোহম্‌ হাত জোড় করে বললে—না স্যার, আমি সিগারেট খাই না। ক্ষেত্র-বাবু বারণ করে দিয়েছেন।

মিস্টার সেন বললেন—সে কী, ক্ষেত্রবাবু বলেছেন বলে তুমি সিগারেট

খাও না ?

—না !

মিস্টার সেন বললেন—সে যাক্ গে, তুমি যা ভালো বুঝেছ তাই-ই করেছ, কিন্তু এটাও সত্যি যে অত গুরুভক্তি ভালো নয়। ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হলে প্রণাম করবে, তাঁকে শ্রদ্ধা করবে। মাথা নীচু করে কথা বলবে, তাঁর কথায় প্রতিবাদ করবে না, ওই পর্যন্ত। তা বলে তাঁর অবর্তমানে নিজের সাধ-আহ্লাদ মেটাবে না, এতটা গুরুভক্তি ভালো নয়।

তারপর একটু থেমে বললেন—ক্ষেত্রবাবু তোমাকে চরিত্র ঠিক রাখবার উপদেশ দেননি ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। বলেছিলেন মানুষের চরিত্রটাই বড় জিনিস।

মিস্টার সেন বললেন—আমাকেও ক্ষেত্রবাবু একদিন সে-কথা বলেছেন। আমিও প্রতিবাদ না করে তা শুনে গিয়েছি। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে সেটা কি সত্যি ? চরিত্রের চেয়েও তো আরো বড় জিনিস আছে এ-যুগে !

—কী সেটা ?

মিস্টার সেন বললেন—কেরীয়ার ! মানুষের জীবনে কেরীয়ারটাই এ-যুগে সব চেয়ে বড় জিনিস। দেখ, আমি যদি ক্ষেত্রবাবুর কথামত চলতুম তাহলে আমিও আজ তোমার মত ছোট চাকরি করেই জীবন কাটাতুম। কিন্তু আমি তা চাইনি। আমি ক্ষেত্রবাবুকে অশ্রদ্ধা করছি না। শুধু বলছি যে তিনি ব্যাক-ডেটেড্, তাঁর যুগ আর আমাদের যুগে আকাশপাতাল তফাৎ হয়ে গেছে।

সোহম্ চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল।

মিস্টার সেন বললেন—যাক্ গে এ-সব বাজে কথা। এবার আসল কাজের কথাটা বলি। তুমি কি ইউনিয়নের মেম্বার ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ। ওরা জোর করে আমাকে ওদের মেম্বার করে নিয়েছে।

মিস্টার সেন বললেন—মেম্বার হয়েছ ভালোই করেছ। মেম্বার যদি না-ও হতে তবু আমি তোমাকে মেম্বার হতে বলতুম।

—কেন স্যার ?

—সেই কথা বলতেই তো আমি তোমাকে আজ আমার বাড়িতে ডেকে এনেছি। আমি চাই যে তুমি আমাদের অফিসের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট্ হও।

—আমাকে তারা তাদের প্রেসিডেণ্ট্ করবে কেন ?

—তুমি টাকা খরচ করবে !

সোহম্ বললে—আমি অত টাকা পাবো কোথায় ?

মিস্টার সেন বললেন—আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব। টাকার জোরে এ বাজারে সব হওয়া যায়। ওরা দাবী তুলেছে এবার পুজোর আগে ওদের টুয়েণ্টি পার্সেণ্ট্ বোনাস দিতে হবে। কিন্তু আমি এইট পয়েণ্ট থার্টি-থ্রি পার্সেণ্ট-এর বেশি বোনাস দেব না। তোমাকে লেবার ইউনিয়নের ভেতরে ঢুকে সব কিছু বানচাল করে দিতে হবে।

সোহম্ বললে—আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারলুম না স্যার—

মিস্টার সেন বললেন—এটা তো সোজা কথা। টাকা খাইয়ে ওদের যারা লীডার তাদের হাত করবে।

—কী করে হাত করবো ?

—আমাকে গালাগালি দিয়ে। অফিসে মিটিং-এর মধ্যে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে "পুঁজিপতির দালালকে হালাল করো"। বলবে "মিস্টার সেন মুর্দাবাদ", "টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাকসন্ ইউনিয়ন জিন্দাবাদ"—

—তারপর ?

—তারপর আমি তোমার নামে চার্জশীট্ দেব।

সোহম্ বললে—চার্জশীট্ দিলে তো আমার চাকরি চলে যাবে। আমি খাবো কী ?

মিস্টার সেন বললেন—সে-ব্যবস্থা আমি করবো। ব্যাক-ডোর দিয়ে তোমাকে দুনম্বরী টাকা পাইয়ে দেব।

মিস্টার সেন তারপর সমস্ত প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিলেন। সোহমের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত সোজা হয়ে গেল। তারপর যদি মিস্টার সেনের কথামত সোহম্ কাজ করতে পারে, যদি আট পয়েণ্ট থার্টিথ্রি পার্সেণ্ট্ বোনাসে সব কেরানীদের রাজি করাতে পারে তাহলে মিস্টার স্যান্যাল রিটায়ার করবার পরেই সোহম্‌কে ওয়েলফেয়ার অফিসার করে প্রমোশন দিয়ে দেবেন।

সোহম্ বললে—কিন্তু তখন তো সবাই আমাকে দালাল বলবে।

মিস্টার সেন বললেন—তা যাতে কেউ না বলে তার জন্যে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তোমাকে আমি প্রথমে আমাদের বোম্বাই-অফিসে ট্রানস্‌ফার করে দেব। তারপরে সময় বুঝে এখানে বদলি করে আনবো—

সোহম্ কথাগুলো সব চুপ করে শুনলো। মিস্টার সেন বললেন—তুমি আজকে বাড়ি যাও, আমার কথাগুলো বেশ ভালো করে ভেবো। তারপর কী ঠিক করলে বলে যেও। মনে রেখো তোমার কথার ওপর কোম্পানির কোটি-কোটি টাকার লাভ-লোকসান নির্ভর করছে। আর একটা কথা, আমাকে যদি তুমি 'হারামজাদার বাচ্ছা' কিম্বা 'হারামীর বাচ্ছা' বলে লেকচার দাও, তাতেও আমার কোনও ক্ষতি নেই। কারণ কোম্পানির লাভটাই বড় কথা—

সোহম্ চলে আসছিল।

মিস্টার সেন বললেন—কই, কিছু টাকা নিয়ে গেলে না ?

সোহম্ কিছু জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল।

মিস্টার সেন আলমারি খুলে একতাড়া নোট বার করে সোহমের দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন—এই দশ হাজার টাকা এখন দিলুম, পরে আরো চল্লিশ হাজার টাকা দেব। দেখবো তুমি কী রকম করে ম্যাটারটা ট্যাক্‌ল্ করো—

সোহম্ টাকাটা নেবে কি নেবে না, তা ভাবছিল। কিন্তু মিস্টার সেন নোটগুলো সোহমের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—এগুলো পকেটে রেখে দাও—ক্ষেত্রবাবুর উপদেশের কথা ভুলে যাও। এযুগে চরিত্র-ফরিত্তর কথা সব ভুলে

যাও, এখনুগে শুধু কেরীয়ার। তোমার কেরীয়ার যদি ভালো করতে চাও তাহলে আমি যা বলেছি করতে তাই করো। নইলে চিরকাল ওই দু'শো প'চাত্তর টাকা মাইনেতেই পচে মরতে হবে। বুঝলে কিছু ?

—হ্যাঁ স্যার, বুঝলুম।

এ-সব অতীতের কথা।

তারপর হঠাৎ একদিন সবাই অবাক হয়ে দেখলে সোহম্ ইউনিয়নের লীডার হয়ে গেছে। কী করে কী উপায়ে যে সোহম্ লীডার হয়ে উঠলো তা সকলের কাছেই রহস্যময় হয়ে উঠলো। কিন্তু মনে মনে সবাই জানলো যে সোহম্ অত্যন্ত স্পষ্টবাদী সত্যবাদী লোক। নিজের চাকরিকেও সে পরোয়া করে না।

যেদিন টিফিন রুমে ইউনিয়নের মীটিং হলো সেদিন সোহমের সে কী প্রশংসা সকলের মুখে মুখে। একজন বললে—সোহম্‌বাবুর মত লোককেই আমাদের প্রেসিডেণ্ট্ করা উচিত।

আর হলোও তাই। ইউনিয়নের ব্যালট্-বাক্সের ভোট যখন গোনা হলো তখন দেখা গেল সোহমই সকলের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে।

সোহম্‌বাবুর লেকচার নয় তো যেন এ্যাটম্ বোমা।

সেদিন সোহম্ প্রেসিডেণ্ট্ হয়েই বক্তৃতা দিলে—বন্ধুগণ—

ঘর-ভর্তি অফিসের কর্মচারী। তারা সবাই প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা শোনবার জন্যে ব্যাকুল।

—বন্ধুগণ, আমরা টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানির কর্মচারী। আমাদের সকলের অবস্থা আজ সব চেয়ে খারাপ। এর জন্যে দায়ী কে ?

সভার লোকজন সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—সেন সাহেব।

—সেন সাহেব ইচ্ছে করলেই আমাদের বোনাস বাড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি কেবল নিজের মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছেন আর কোম্পানির মুনাফা বাড়িয়েছেন। আমাদের ভাতে মেরে তিনি নিজের ষোল আনা সুবিধে করে নিয়েছেন। আমাদের দাবী আমরা কুড়ি পার্সেণ্ট্ বোনাস চাই—

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—

সোহম্ আবার বলতে লাগলো—১৯৬১ সালে সরষের তেলের দাম কত ছিল ?

—দু' টাকা!

—আজ তার দাম কত ?

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—সতেরো টাকা! সতেরো টাকা!

—তখন একজন ক্লার্কের মাইনে কত ছিল ?

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—দেড়শো দু'শো টাকা—বেড়ে হয়েছে দু'শো প'চাত্তর টাকা—

সোহম্ বললে—আর তার বদলে কাগজে-পত্রে কোম্পানির লাভ কত হয়েছে ? নাইন্ হান্‌ড্রেড্ পার্সেণ্ট্। এটাই হচ্ছে অডিটারের রিপোর্ট। শুধু সরষের তেল নয়, চাল ডাল আলু পটল বেগুন কয়লা কেরোসিন, কোন্ জিনিসটার দাম বাড়েনি, বলুন আপনারা ? যে অনুপাতে নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের দাম বেড়েছে

সে অনুপাতে কি আমাদের মাইনে বেড়েছে? এই অবস্থায় বন্ধুগণ আপনারাই বলুন কোম্পানিতে পুঁজিপতিদের দালাল কে?

সবাই তারপর চিৎকার করে বলে উঠলো—সেন সাহেব, আবার কে?

—আবার বলুন পুঁজিপতিদের দালাল কে?

—সেন সাহেব, আবার কে?

সোহম্ আবার চেঁচিয়ে বলে উঠলো—দালালের শাস্তি কী?

সবাই বলে উঠলো—সেন সাহেবকে হালাল করা, সেন সাহেবকে হালাল করা।

—হারামজাদার বাচ্ছা কে?

—সেন সাহেব, আবার কে?

ঘরের ভেতরে বসে বসে সেন সাহেব সব শুনছিলেন আর মনে মনে হাসছিলেন।

সোহম্ তখন বলছে—এর প্রতিকার কী?

—ধর্মঘট্ ধর্মঘট্!

সোহম্ আবার বললে—আমরা কত পার্সেন্ট্ বোনাস চাই?

—টোয়েন্টি পার্সেন্ট্, টোয়েনটি পারসেন্ট্—

—টোয়েনটি পার্সেন্ট্ বোনাস না দিয়ে কোম্পানি আমাকে চার্জশীট দেবে!

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—সোহম্ রায় জিন্দাবাদ, সেন সাহেব মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ—

সোহম্ তখন আবার বলতে লাগলো—আমার যদি চাকরি যায়, তখন আপনারা কী করবেন?

সবাই বললে—আমরা কোম্পানির কাজ অচল করবো। আমরা কোম্পানির কাজ অচল করবো!

টিফিন-টাইম শেষ হয়ে গেল। সবাই সোহমকে কাঁধে তুলে নিলে। বললে—সোহম্ রায় জিন্দাবাদ, সেন সাহেব মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ।

টিফিনের পর সবাই আবার যে-যার চেয়ারে এসে বসলো।

পি-বি-দাশবাবু সোহমের কাছে এলেন।

বললেন—এ সব কী করলে হে সোহম্, সেন সাহেব যদি তোমার চাকরি খেয়ে নেয়? তুমি কেন ওই সব ঝামেলার মধ্যে যাচ্ছো! এর ফল কিন্তু ভালো হবে না, এই তোমায় বলে রাখছি। যারা তোমায় খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে তাদের তুমি 'হারামজাদার বাচ্ছা' বলে গালাগালি দিলে, তোমার একটু কৃতজ্ঞতা-বোধ নেই?

সোহম্ বললে—রবীন্দ্রনাথ কী বলে গেছেন তা আপনার মনে নেই? অন্যায় সহ্য করাও তো এক রকম অন্যায়—

—যদি তোমার চাকরি যায়?

—যায় যাবে! একদিন আমার পিসতুতো ভাই কাশী দত্ত আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সেদিন তো আমি রাস্তাতেই এসে দাঁড়িয়েছিলুম। আবার না হয় আমি সেই রকম রাস্তায় গিয়েই আশ্রয় নেব। কিন্তু অন্যায় করাও যেমন

পাপ, তেমনি অন্যায় সহ্য করাও পাপ—

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে সুমিত্রার গলা শোনা গেল।

—কই গো, কোথায় গেলে তুমি ?

সোহম্ অতীত রোমন্থন করছিল। কী করে সে ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছিল তারই অতীতটা খতিয়ে দেখছিল। কেমন করে ভোলাদা তাকে বি.এ-তে অনার্স ডিগ্রী পাইয়ে দিয়েছিল, কেমন করে সে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, সেই সব ভাবনাই ভাবছিল। হঠাৎ সুমিত্রার গলার আওয়াজে সোহম্ আবার বর্তমানে ফিরে এল।

তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে ঢুকেই দেখলে সুমিত্রার নেশাটা একটু কেটেছে। সে সুমিত্রার মাথায় হাত বুলোতে লাগলো।

বললে—এখন কেমন বোধ করছো ?

সুমিত্রা বললে—মাথাটা একটু ঘুরছে এখনও—

সোহম্ বললে—এই প্রথমবার কিনা তাই একটু ও-রকম মাথাটা ঘুরে উঠেছিল। দেখবে আর দু-একদিন প্র্যাক্‌টিস্ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সকলেরই ও-রকম হয়। আমারও প্রথমবার ও-রকম হয়েছিল। তারপর এখন অভ্যেস হয়ে গেছে!

—এ-রকম বিচ্ছিরি জিনিস কেন তুমি খাও ?

সোহম্ বললে—আমি কি সাধ করে খাই, চাকরিতে উন্নতি করবার জন্যে ককটেল-পার্টি দিতে হয়, তাইতেই খেতে হয়। নইলে কি আমি তোমাকে মিছিমিছি খেতে বলছি ?

সুমিত্রা বললে—আমি আর এ খেতে পারবো না—

সোহম্ বললে—তোমাকে আজই খেতে হবে না। শুধু প্র্যাক্‌টিস্ করতে বলছি। আজকে তোমাকে খেতে বলেছি বলে কি রোজই খেতে বলবো ? একটু একটু করে মেডিক্যাল ডোজে খেও। আর যদি নেশা হয়ে যায় তো একটু দই কিম্বা নেবু খেয়ে নিও, তোমার নেশা কেটে যাবে!

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আর তাছাড়া আর একটা কথা, যেই ভানুভাই প্যাটেল আমাদের কোম্পানিতে তিরিশ লাখ ডলারের অর্ডারটা কন্‌ভার্ট করে দেবে তখন আর তোমাকে খেতে বলবো না। আর তুমি তো জানো আমার চাকরিতে যদি একবার ডিরেক্টার হয়ে যেতে পারি তো তখন তোমাকেই বা পায় কে আর আমাকেই বা পায় কে ? তখন তোমারও একটা গাড়ি হবে, আমারও একটা গাড়ি হবে। তুমি তোমার গাড়ি নিয়ে যেখানে ইচ্ছে যাবে, আর আমিও আমার গাড়ি নিয়ে অফিসের কাজে ঘুরবো। আর শুধু কি তাই ? কল্পনা করো তো অনেক টাকা হলে আমাদের কত আরাম!

সুমিত্রা কিছু বললে না। শুধু চুপ করে শুনতে লাগলো সোহমের কথাগুলো। বোধ হয় বুঝতে পারলে যে সোহম্ কিছু অন্যায় বলছে না।

বললে—তুমি আমার হাতটা ধরো তো, আমি একবার উঠে দাঁড়াই, আমার কেমন যেন নিজেকে দুর্বল-দুর্বল লাগছে।

সোহম্ বললে—ওঠবার দরকার কী ? তুমি শুয়ে থাকো না ! আমি বরং তোমাকে একটা লাইম্-জুস্ আনিয়ে দিচ্ছি—

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লাইম্-জুস্ আনতে।

সুমিত্রা আবার চোখ বুজিয়ে নেশার ঘোরে শরীরটা এলিয়ে দিলে।

টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানি শুধু কলকাতার নয়, বোম্বাই-এরও বটে। সেটাই হেড্ অফিস। সেখান থেকে নিয়ম করে যখন-তখন টেলিফোনে এ-অফিসের সঙ্গে কথা হয়। মিস্টার এন্ বি সেন এদিক থেকে কথা বলেন। ওদিক থেকে কথা বলেন মিস্টার আয়েঙ্গার।

মিস্টার আয়েঙ্গার জিজ্ঞেস করেন—স্ট্রাইকের পোজিশন কী, মিস্টার সেন ?

মিস্টার সেন বলেন—ভালো।

মিস্টার আয়েঙ্গার জিজ্ঞেস করেন—হাউ ? হাউ কুড্ ইউ ম্যানেজ ? আপনি কী করে ম্যানেজ করলেন ?

মিস্টার সেন তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলেন।

—কী বললেন—কী বললেন ? একজন ক্লার্ক ? কী নাম ? সোহম্ রায় ?

মিস্টার সেন বলেন—হ্যাঁ। আমি তাকে দশ হাজার টাকা দিয়েছি।

—ছেলেটা রিলায়েবল্ তো ? বিশ্বাসী তো ?

মিস্টার সেন বলেন—খুব বিশ্বাসী। আমরা একই স্কুলের স্টুডেণ্ট্।

—এখন কত স্যালারি পায় ?

—দু'শো পঁচাত্তর টাকা।

—যদি এতগুলো টাকা হাতে পেয়ে আমাদের ঠকায় ?

মিস্টার সেন বলেন—না না, আমি লোক চিনি মিস্টার আয়েঙ্গার। এ কখনও বিট্রে করতে পারে না। একে আমি কথা দিয়েছি যে, যদি ও লেবারদের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট্ হতে পারে তাহলে আরো চল্লিশ হাজার টাকা ওকে দেব। টোট্যাল পঞ্চাশ হাজার টাকা। টাকাটা লেবার-লীডারদের মধ্যে ও ডিস্ট্রিবিউট করে দেবে। যদি সত্যিই তা পারে, তাহলে ওকে ওয়েলফেয়ার অফিসার করে দেব।

—সে পোস্ট্-এর ভেকেন্সি আছে ?

—হ্যাঁ, মিস্টার সান্যাল তো চার-পাঁচ মাস পরেই রিটায়ার করছেন !

—দ্যাটস অল্ রাইট। ততদিন ওকে বোম্বে অফিসে ট্র্যানস্ফার করে দেবেন। মোট কথা আট পয়েণ্ট তেত্রিশ-এর বেশি বোনাস যেন দিতে না হয় কোম্পানিকে।

মিস্টার সেন বললেন—সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কথা শেষ হবার পর মিস্টার সেন টেলিফোন রিসিভার রেখে দিলেন। সন্ধ্যে-

বেলা বাড়িতে গিয়েই ডেকে পাঠালেন সোহম্‌কে।

সোহম্‌ এসে দাঁড়াতেই সেন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কিছু খবর আছে ?

—হ্যাঁ স্যার। এখন সবাই রাজি। আপনি আমাকে চার্জশীট দিয়েছেন দেখে ওরা সবাই রাজি হয়ে গেল। আমার চাকরি চলে গেছে এটা লেবার-মহলে প্রচার হয়ে গেছে।

—আর সেই দশ হাজার টাকা ?

—ওটা চারজনের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। আরো টাকা চাইছিল স্যার ওরা।

মিস্টার সেন বললেন বাকি চল্লিশ হাজার তোমাকে দিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে তোমাদের ইউনিয়ন থেকে আমাকে একটা লিখিত প্রস্তাব পাঠাতে হবে যে আট পয়েন্ট ত্রিশ টাকা বোনাসেই আমরা রাজি!

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। সেই রাত্রেই সোহম্‌ ভাইস্‌-প্রেসিডেন্ট্‌ ইব্রাহিমের বাড়িতে গেল। শুধু ইব্রাহিম নয়, কেশব মাইতি, বিভূতি পোদ্দার, যারা যারা ইউনিয়নের প্রধান পাণ্ডা, যাদের সাসপেণ্ড করা হয়েছে, তাদের সকলের বাড়িতেই গেল। সব বুঝিয়ে বললে। সকলেরই মাথা পিছু দশ হাজার করে পড়বে। খুশী হয়েছে সবাই খবরটা শুনে। আসলে নামেই সাসপেণ্ড হয়েছে। পুরো মাইনেটা সবাইকে নিজের হাতে লুকিয়ে লুকিয়ে সোহম্‌ যার যার বাড়িতে গিয়ে দিয়ে এসেছে।

কথা শুনে মীটিং ডাকা হলো। জেনারেল মীটিং। সবাই এসে জড়ো হলো। রবিবার সন্ধ্যেবেলার দিকে। প্রথমে ইব্রাহিম লেকচার দিলে, তারপর দিলে কেশব মাইতি, তারপর বিভূতি পোদ্দার।

সবাই ইউনিয়নের রিং-লীডার। সবাই মেহনতী মানুষের জন্যে নিজেদের চাকরি খুইয়েছে।

সবাই-ই স্লোগান দিয়ে উঠলো আমাদের লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই চলছে চলবে।

সেই স্লোগানে গলা মিলিয়ে সবাই বলে উঠল—আমাদের লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই চলছে চলবে—

সকলের শেষে বক্তৃতা দিতে উঠল সোহম্‌। সে বলতে লাগলো – ঠিক কথাই বলেছ তোমরা, এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই চলছে চলবে—

কথাটা শুনে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—প্রেসিডেন্ট্‌ সোহম্‌ রায় জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ—

সোহম্‌ বললে শুধু আমাকে জিন্দাবাদ দিলেই চলবে না। আমাদের মালিকের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, আমাদের চরম শত্রু আমাদের মালিক। কিন্তু সেই মালিককে আমরা ধ্বংস করতে চাই না। আমরা চাই আমাদের ওপর মালিকের ন্যায্য ব্যবহার। আমাদের উপোস করিয়ে মালিকের বড়লোক হওয়া আমরা চাই না। আমরা চাই এর প্রতিকার। কর্মচারীদের মাথা পিছু প্রত্যেককে এখন একশো টাকা করে বাড়তি দিতে হবে। এটা হবে এক-কালীন দান। এখন বর্তমানে আমরা এইটুকুতেই খুশী হবো। তারপর ? তারপর ভবিষ্যতের

বৃহত্তর সংগ্রামের জন্যে আমাদের তৈরি হতে হবে। এখন থেকে সেই সংগ্রাম চালিয়ে যান বন্ধুগণ, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি তো আমাদের জয় হবেই। টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাকসন ইউনিয়ন জিন্দাবাদ!

সবাই সোহমের গলায় গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

রাত যখন গভীর হলো তখন সোহম্ খুব সাবধানে গিয়ে হাজির হলো মিস্টার সেনের বাড়িতে। মিস্টার সেন তৈরিই ছিলেন। টাকা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সোহমের। সোহম্ না চাইতেই মিস্টার সেন টেবিলের ড্রয়ার থেকে একশো টাকার নোটে মোট চল্লিশ হাজার টাকা বের করে বললেন, দশ হাজার তোমাকে আগেই দেওয়া ছিল। বাকিটা ইব্রাহিম, কেশব মাইতি, বিভূতি পোদ্দার সকলের মধ্যে ভাগ করে দিও—

নোটগুলো গুনে সোহম্ সেগুলো প্যাণ্টের পকেটে পুরে নিলে।

তারপর জিজ্ঞেস করলে—আমার লেকচারটা আজ শুনেছিলেন স্যার?

মিস্টার সেন বললেন—ওয়াণ্ডারফুল, ওয়াণ্ডারফুল—আমার কানে এসেছিল!

—সকলকে মাথা-পিছু একশো টাকা করে না পাইয়ে দিলে আমাদের আর মান-ইজ্জৎ থাকত না।

মিস্টার সেন বললেন—ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে তো আমার কথাই হয়ে আছে। মিস্টার সান্যালের রিটায়ার করবার ডেট্ হয়ে এল। তার আগেই তোমাকে বোম্বাই অফিসে ঢুকিয়ে নেব। তুমি বোম্বাই যাবার জন্যে তৈরি হও। খুব শীগগিরই যেতে হবে। মাত্র দু'মাসের জন্যে যাচ্ছো—তারপরেই তোমাকে এখানে ওয়েলফেয়ার অফিসার করে নিয়ে আসবো।

সোহম্ বললে—আমাকে যদি সরাসরি অফিসার করে দেন তাহলে আমাদের ইউনিয়নের লোকেরা সন্দেহ করবে স্যার—

—সে-জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি তার আগে একটা পরীক্ষা নেব। সেই এগজামিনেশনে যে ফার্স্ট হবে তাকেই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেব। কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। তুমিও এগজামিন দেবে, বুঝলে?

সোহম্ সেখানে আর দাঁড়ালো না। মিস্টার সেনকে নমস্কার করে মেসে চলে এল।

সোহম্ চলে যেতেই বোম্বাই অফিস থেকে মিস্টার আয়েঙ্গার টেলিফোন করলেন। জানতে চাইলেন ফ্যাক্টরির সিচুয়েশন কেমন।

মিস্টার সেন এদিক থেকে বললেন—এভ্রিথিং ও-কে।

তারপর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট্ সোহমের সঙ্গে যা-যা কথা হয়েছিল তাও বললেন। শুনে মিস্টার আয়েঙ্গার খুশী। কোটি কোটি টাকা বেঁচে গেল কোম্পানির।

সোহমের সে-সব দিনের সব কথা মনে আছে। ফ্যাক্টরির মিস্ত্রীদের ঠকিয়ে সোহম্‌রা সেদিন যে কত টাকা অন্যায়ভাবে নিজেদের পকেটে পুরেছে তার বুঝি শেষ নেই। অথচ ওয়ার্কস্মিথ্‌রা সোহম্‌কে কত ভক্তিই না করতো।

আজ নিউ আলিপুর থেকে গাড়ি চালাতে চালাতে সেদিনকার সব কথা তার মনে পড়তে লাগল। সমস্ত জীবনটা কেবল নিজেকে ফাঁকি দিয়েছে, আর পরকে ফাঁকি দিয়েছে, ফাঁকি দিয়ে কেবল নিজের কার্যসিদ্ধি করেছে। ভেবেছে এইটেই ঠিক রাস্তা। এমনি করেই জীবনে উন্নতি করতে হয়, এমনি করেই এ-যুগে উন্নতির শিখরে ওঠবার রাস্তা তৈরি করতে হয়।

একমাত্র ক্ষেত্রবাবুই দেখা হলে বলতেন—ভালো আছো তো ?

সোহম্ বলতো—হ্যাঁ স্যার, ভালো আছি। আমি বোম্বাই বদলি হয়ে যাচ্ছি অফিসের কাজে, এখানে এসে ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে যাব। মিস্টার সেন আমায় কথা দিয়েছেন।

শুনে খুব খুশী হয়েছিলেন ক্ষেত্রবাবু। বলেছিলেন—খুব ভালো, খুব ভালো সংবাদ। তোমার উন্নতি হবে না তো কার হবে ? তুমি সচ্চরিত্র ছেলে, সৎ পরিশ্রমী, জীবনে কখনও কাউকে ঠকাওনি, বরাবর সত্য কথা বলে এসেছ, সত্যি, তোমার উন্নতি হবে না তো কার হবে ? বড় খুশী হলাম খবরটা শুনে, বুঝলে, বড় খুশী হলাম—

ক্ষেত্রবাবু সত্যিই মন থেকে আশীর্বাদ করলেন সোহম্‌কে। অথচ কত বড় মিথ্যেটা সে নির্বিবাদে বলে গেল। তার সমস্তটাই যে অভিনয় তা একবারও জানতে দিলে না ক্ষেত্রবাবুকে। বলতে গেলে সকলের সঙ্গেই সে অভিনয় করে গেছে কেবল। পি-বি-দাশবাবুর সঙ্গেও অভিনয় করেছে, এমন কি পি বি-দাশ-বাবুর মেয়ে সুমিত্রার সঙ্গেও অভিনয় করে গেছে সারা জীবন। অথচ তখন তারা কেউই তা বুঝতে পারেনি, ধরতেও পারেনি।

মনে আছে পি-বি-দাশবাবু খবরটা জানতে পেরেই বললেন—তুমি নাকি বোম্বাই চলে যাচ্ছ ?

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি কোথা থেকে শুনলেন ?

পি-বি-দাশবাবু বললেন—অফিসময় কথাটা রটে গেছে।

সোহম্ বললে—আমিও আপনার মত তাই-ই শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি কোম্পানির সঙ্গে লড়াই করলুম বলেই হয়ত আমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

—না না, তা কেন, তোমাকে প্রমোশন্ দেবে বলেই একবার বোম্বাই অফিস ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে। এ অফিসের নিয়মই এই।

সোহম্ বললে—কী জানি, আমি তো কিছুই জানি না। আমাকে অমন করে চার্জশীট দিলে, আমাকে সাসপেণ্ড করে রাখলে, এর পরেও প্রমোশন্ দেবে !

পি-বি-দাশবাবু বললেন—দেবে দেবে, দেখে নিও—। কিন্তু তুমি তো তোমার কথাটা রাখলে না হে !

—কী কথা ? কী কথা ?

পি-বি-দাশবাবু বললেন—বাঃ রে, এর মধ্যেই ভুলে গেলে ! যখন মেসের বাসায় তোমার অসুখ হয়েছিল তখন আমি তোমাকে আমার বাড়িতে এনে

তুলেছিলুম। সেদিন কে তোমায় সেবা করে ভালো করেছিল, মনে আছে?

—হ্যাঁ, সুমিত্রা আপনার মেয়ে!

পি-বি-দাশবাবু বললেন—সেদিন তুমি আমার স্ত্রীকে কথা দাওনি যে তুমি তাকে বিয়ে করবে?

সোহম্ চুপ করে রইল। কিছু জবাব তার মুখে এল না।

পি-বি দাশবাবু বললেন—এখন তো সে-সব কথা ভুলে যাবেই, কিন্তু মনে থাকে যেন তোমার অসুখে ডাক্তার-বদ্যি-ওষুধে অনেক টাকা আমার খরচ হয়ে গিয়েছে—

সোহম্ বললে—আমার মাইনেটা বাড়লেই আমি সে-দেনা শোধ করে দেব।

—শুধু টাকা দিয়েই দেনা শোধ হয়? আর আমার টাকার কথা ছেড়ে দাও, সুমিত্রার সেবার দেনা? তার শোধ করবার কী করবে?

—আমি সুমিত্রাকে বিয়ে করবো!

—বোম্বাই যাবার আগে করবে, না পরে?

সোহম্ বললে—পরে।

—পরে আর করেছ! তখন এত বড় হয়ে যাবে তুমি যে গরীবদের কথা আর মনে থাকবে না। আমাদের তখন তুমি দেখলে চিনতেও পারবে না—। আর কতদিনের জন্যে বোম্বাই যাচ্ছো তারই কি ঠিক আছে? হয়ত কলকাতার অফিসে আর ফিরেই আসবে না!

সোহম্ বললে—ঠিক, আমার ওপর যখন এতই সন্দেহ তখন আপনি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করুন, বোম্বাই যাবার আগেই আমি সুমিত্রাকে বিয়ে করবো।

সোহমের মনে আছে এসব অনেক আগের খবর। পি-বি-দাশবাবু খুব ঘটা করে তার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।

মনে আছে সুমিত্রার মা সোহমকে বলেছিলেন—আমার মেয়ের খুব পুজো-পুজো বাতিক আছে, তুমি যেন আপত্তি কোর না বাবা। আমিই ওকে পুজো করতে শিখিয়েছি, শুনেছি বোম্বাই খুব সাহেবিআনার জায়গা, পুজো-টুজো সেখানে কেউ করে না, শুনেছি সেখানে চা'এর বদলে মদ খায়—

সোহম্ বলেছিল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মা, আমরা বাড়িতে কাউকে মদ খেতে দেব না। আপনার মেয়ে যত ইচ্ছে পুজো করুক, আমি কোনও আপত্তি করবো না। বরং আমি নিজেও ওর সঙ্গে পুজো করবো। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি বোম্বাইতে গিয়ে মদ আমরা ছোঁবই না।

বলে সুমিত্রার মায়ের পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ওই প্রতিজ্ঞা করেছিল।

কিন্তু আজ?

আজ মনে হচ্ছে সমস্তটাই তারই পরিণতি। মানুষকে, লেবারকে, পি বি-দাশ-বাবুকে, সুমিত্রার মা'কেও ঠকানোর এই বুঝি পরিণতি। তখন সোহম্ বিশ্বাস করতো অবিশ্বাসই সকলের চেয়ে বড় সাধুতা। সেই প্রথম স্কুল থেকেই তো তার এ শিক্ষা! প্রফুল্লই তো তাকে শিখিয়েছিল যে—এগজামিনে যে ফেল করে সে বোকা! না পড়েও যে পাস করা যায় এ কথা তো প্রফুল্লই প্রথম শিখিয়েছিল। প্রফুল্লই শিখিয়েছিল যে ক্ষেত্রবাবুদের কথা ঠিক নয়, আসলে ঠিকটা হলো ভোলাদার কথা!

সোহম্ নিজেও তো দেখেছে যে ভোলাদার চারদিকে কী প্রতিষ্ঠা, কী প্রতিপত্তি। অথচ ভোলাদার টাকাকড়ি যে কোথা থেকে আসতো, কী করে ভোলাদার বাবুয়ানি চলতো তা বোঝা যেত না। ভোলাদা প্লেনে করে হামেশা দিল্লি যেত আর আসতো। তারপর কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশতো। নেহরুজী কলকাতায় আসছেন, তাঁকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে যেতে হবে কাকে? ভোলাদাকে!

ভোলাদাকে জিজ্ঞেস করতাম—তোমার সঙ্গে কি নেহরুজীর পরিচয় আছে নাকি ভোলাদা?

ভোলাদা বলতো—পরিচয়? পরিচয় মানে? সে কি আজকের পরিচয়? আজকে এয়ারপোর্টে আসবার আগেই আমার কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন, না গেলে রেগে কাঁই হয়ে যেতেন। খুব রাগী লোক তো নেহরুজী!

আশ্চর্য, তখন বোধ হয় সোহম্ও খুব সরল ছিল। প্রফুল্ল আর ভোলাদার সব মিথ্যে কথাগুলো অকপটে বিশ্বাস করতো।

কিন্তু ওইটেই বোধ হয় ঠিক। ক্ষেত্রবাবুর কথা আর উপদেশগুলো যে মিথ্যে তা আজ জানতে পেরেছে সে। সে যদি ক্ষেত্রবাবুর কথামত চলতো তাহলে কি সে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে বি. এ পাস করতো। না, কেবল সেই কাশী দত্তের মত, তার পিসতুতো দাদার মত কেবল কেরানী হয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিয়ে অভিশপ্ত দিন যাপন করতো। সেই জন্যেই বোধ হয় তার দাদা তার সঙ্গে অফিসে দেখা করতে এসেছিল। জানতে এসেছিল কী করে কোন্ কায়দায় সে ম্যাট্রিকে ফেল করেও পাঁচ হাজার টাকার চাকরি যোগাড় করেছে।

বোম্বাইতে বেশি দিন থাকতে হয়নি সোহমকে। শুধু লোক-দেখানো ট্রানস্ফার।

সুমিত্রাকে বিয়ে করেই নিয়ে গিয়েছিল সেখানে।

সুমিত্রা বোম্বাই দেখে অবাক, কোথায় কলকাতায় সেই গুলু ওস্তাগর লেনের বাড়ি, আর কোথায় বোম্বাই-এর এই ফার্নিশড্ ফ্ল্যাট।

তারই মধ্যে একটা ছোট ঘর দেখে সুমিত্রা সেটা তার পুজোর ঘর তৈরি করিয়ে নিয়েছিল।

সোহম্‌ বলতো—তোমার তো দেখছি এখানে এসে পুজোর ঘটা বেড়ে গিয়েছে।

সত্যিই সুমিত্রা সকালে সন্ধ্যেয় পুজো করেই কাটিয়ে দিত।

সুমিত্রা বলতো—কী করবো বলো, তুমি তোমার অফিস নিয়ে এত মেতে আছো যে আমার সময় কী করে কাটবে তা তো তুমি একবারও ভাবো না! তাই বাধ্য হয়ে পুজো নিয়ে মেতে থাকি। এখানে কথা বলবার মত লোক তো পাই নে!

সোহম্‌ বলতো—এখন কিছুদিন একটু কষ্ট করো লক্ষ্মীটি!

সুমিত্রা বলতো—তুমি অফিস থেকে একটু সকাল-সকাল আসতে পারো না? সারাদিন আমি একলা-একলা কী করে কাটাই বলো তো?

সোহম্‌ বলতো—এখন তো নতুন চাকরি এখানে, তাই একটু বেশী কাজ করে মিস্টার আয়েঙ্গারের মন ভোলাতে চেষ্টা করি। মিস্টার আয়েঙ্গার অফিস থেকে না চলে গেলে তো আমি বাড়ি আসতে পারি না?

—কিন্তু আমার কথাটাও তো তুমি একবার ভাববে!

সোহম্‌ বলতো—তোমার কথাই তো সব সময়ে ভাবি। অফিসে গিয়েও কাজের মধ্যে কেবল তোমার কথাই মনে পড়ে। তুমি তো জানো আমার ডায়েরির খাতার মধ্যে তোমার ছবি আটকে রেখেছি। যখনই তোমার কথা ভাবি তখন তোমার ছবিটা বার করে চুমু খেয়ে নিই।

সুমিত্রা বলতো—ও মা, কী লজ্জা, কেউ যদি দেখতে পায়, তখন?

সোহম্‌ বলতো—দেখতে পায় দেখবে, তুমি তো আর পরের স্ত্রী নও যে দেখতে পেলে লজ্জায় পড়বো!

মাত্র তিন মাসের জীবন-যাত্রা বোম্বাইতে। মিস্টার আয়েঙ্গার জানতো যে তিন মাস পরে সোহম্‌কে ফেরত পাঠাতে হবে কলকাতায়। ছোকরা কোম্পানির পঞ্চাশ লক্ষ টাকা স্ট্রাইকের সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে।

মিস্টার আয়েঙ্গার একদিন ডাকলেন সোহম্‌কে নিজের ঘরে।

সোহম্‌ এসে দাঁড়ালো।

মিস্টার আয়েঙ্গার বললেন—সিট্‌ ডাউন্‌ মিস্টার রায়।

সোহম্‌ বসলো।

মিস্টার আয়েঙ্গার বললেন—এবার তো তোমাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে তোমাকে একটা এগজামিন্‌ দিতে হবে, ডু ইউ নো দ্যাট্‌?

সোহম্‌ বললে—ইয়েস, আই নো স্যার—

মিস্টার আয়েঙ্গার বললেন—তোমার ভয় করবে না তো?

সোহম্‌ বললে—কেন, ভয় করবে কেন স্যার?

মিস্টার আয়েঙ্গার বললেন—তুমি তো লেবার ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট্‌ ছিলে। তারা যদি জানতে পারে যে তুমি তাদের ইন্‌টারেস্টে ঘা দিয়েছ, মানে তুমি তাদের

ঠকিয়েছ ?

সোহম্‌ বললে—না স্যার, লেবাররা আহাম্মক, লীডাররা যা বোঝায় তারা তাই-ই বোঝে। ট্রেড-ইউনিয়নের সব লীডাররাই এই করে। আগে নিজের স্বার্থ তারপর তাদের স্বার্থ ! যদিও মুখে তারা আমাকে কম্‌রেড বলে ডাকে।

—তোমাকে যদি তারা কোনও দিন হ্যারাস্‌ করে, যদি অপমান করে ?

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করেছিল—কেন স্যার, অপমান করবে কেন ?

—না, তোমাদের ইব্রাহিম, কেশব মাইতি, বিভূতি পোদ্দার, তারা তো তোমার সঙ্গে একসঙ্গে ইউনিয়নের কাজ করেছে ! তারা যদি তোমার প্রমোশনে রেগে গিয়ে তোমাকে কোম্পানির বা মালিকের দালাল বলে ? তারা যদি তোমার কোয়ার্টারে গিয়ে হামলা করে ?

সোহম্‌ বললে— হামলা করলে আর কী করবো ? পুলিসে খবর দেব।

—তার চেয়ে এক কাজ করো।

মিস্টার আয়েঙ্গার বললেন—আমি মিস্টার সেনকে বলে দেব ওদের সকলকেই এগজামিনে ডাকতে। ওয়েলফেয়ার অফিসারের পোস্টের জন্য ওই ইব্রাহিম, কেশব মাইতি, আর বিভূতি পোদ্দারদেরও এ্যাপ্লিকেশন ইন্‌ভাইট করতে। ওরাও পরীক্ষা দিক।

—ওরা স্যার লেখাপড়া জানে না। মিস্ত্রীর কাজ করে।

— তা হোক, তবু যেন ওরা বলতে না পারে যে তুমি কোম্পানির পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লাভ করিয়ে দেবার জন্যে লেবারদের ঠকিয়েছ। ওদেরও এ্যাপ্লিকেশন ইন্‌-ভাইট করা হবে। আমি মিস্টার সেনকে টেলিফোন করে দেব। বলে দেব তোমাকে আগে থেকে কোশ্চেনগুলো বলে দিতে। তুমি তো বি এ. অনার্স পাস করেছ ?

সোহম্‌ সবিনয়ে বললে—ইয়েস স্যার—

কথাটা বলতে সোহমের মুখে এতটুকু বাধলো না, চোখ এতটুকু কোঁচকালো না, বিবেকে এতটুকু বাধলো না—

—আর একটা কথা।

—বলুন স্যার !

মিস্টার আয়েঙ্গার বললেন—মিস্টার সেনকে আমি বলে দেব তোমাকে একটা রিভলবারের লাইসেন্স করিয়ে দিতে। তোমার কাছে সব সময়ে একটা রিভলবার থাকা উচিত।

রিভলবার !

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করলে—কেন স্যার ? রিভলবার আমার কী হবে ?

মিস্টার আয়েঙ্গার বললেন—তোমরা লেবার লীডার, তোমাদের এক পক্ষ লেবার আর এক পক্ষ মালিক। ছোটলোকদের বিশ্বাস নেই। তারা যদি কখনও ক্ষেপে গিয়ে তোমার কিছু ক্ষতি করতে চায়, তখন ? তখন একটা প্রোটেকশন্‌ রাখা ভালো—

সোহম্‌ বললে—তা দেবেন—

হায় রে, আজ সেই সোহম্ কিনা জীবনের রেস-এ লাস্ট হর্স! চার ফারলঙ রাস্তা যেতে এত লাগছে কেন? হঠাৎ পেছন ফিরে দেখলে। মনে হলো মেহের আলি সাহেব যেন সমান তালে ঘণ্টায় ষাট সত্তর মাইল বেগে ছুটে আসছে তার মোটরের পেছনে পেছনে। এই বয়েসে এত জোরে দৌড়তে পারছে মেহের আলি? তবে কি তার চোখের ভুল? না তারও মতিভ্রম হয়েছে?

সোহম্ গাড়িটা থামালো।

তারপর পকেট থেকে রিভলবারটা বার করলে। ও যদি সত্যিই মেহের আলি না হয়ে অন্য কোনও প্রেতাত্মা হয় তো রিভলবারের ট্রিগারটা টিপে দেবে।

কিন্তু না, সোহম্ গাড়িটা থামাতেই মেহের আলি একেবারে লাফাতে লাফাতে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো।

—মেহের আলি সাহেব?

মেহের আলি বললে—হ্যাঁ, আমি মেহের আলি! আমি অনেকক্ষণ আপনার ফ্ল্যাটে বসেছিলুম। আমাকে তো আসতে বলেছিলেন আপনি। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—আমি আর শেয়ার কিনবো না মেহের আলি সাহেব! আমি ব্রোক্ হয়ে গেছি, আমি ভেঙে পড়েছি, আমি জীবনের রেস-এর মাঠে আজ লাস্ট হর্স। আমি আর শেয়ার কিনবো না—

—কেন রায় সাহেব? শেয়ার মার্কেট কী দোষ করলো?

সোহম্ বললে—না মেহের আলি সাহেব, শেয়ার মার্কেট মিথ্যে! সব মিথ্যে, জীবনটাই মিথ্যে!

—না রায় সাহেব, সব ঠিক হ্যায়—জীবন মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু শেয়ার মার্কেট বিলকুল ঠিক হ্যায়—

সোহম্ বললে—না মেহের আলি সাহেব, আমি বলছি—আপনি ভুল বলছেন—সব ঝুট্ হ্যায়—

না, আবার মেহের আলি ছায়ামূর্তির মত অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। রিভলবারটা পকেটে রেখে দিয়ে সোহম্ আবার গাড়ি চালাতে লাগল।

মনে পড়তে লাগল সেই সব বোম্বাই-এ থাকার সময়কার কয়েকটা দিনের ঘটনা। প্রথম প্রথম সুমিত্রা খুশি হয়েছিল। জীবনে কখনও কলকাতা ছেড়ে বাইরে যায়নি সে। এই প্রথম বাইরে যাওয়া তার। সারাদিন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল।

একবার বললে—ওই দেখ, চেয়ে দেখ, ওটা কী করছে গো?

সোহম্‌ দেখে বললে—ওরা চাষী, জমিতে লাঙল দিচ্ছে—

এই রকম যা কিছু দেখে তাতেই অবাক হয়ে যায় সুমিত্রা। এ এক নতুন জীবন যেন ফিরে পেয়েছে সে। আগে কলকাতার একটা অঞ্চলকেই সে পৃথিবী বলে ভাবতো। তারপর দেখলে যে-অঞ্চলটাকে সে পৃথিবী বলে ভেবেছিল তার চেয়েও বড় আর এক পৃথিবী আছে। পেডার রোডের একটা ফ্ল্যাট্‌ বাড়িতে উঠে সারাদিন বাইরে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকত। হাঁ করে দেখত রাস্তার লোকজন — গাড়ি—লরি চলার দৃশ্য। সোহম্‌ সকাল আটটার সময়েই অফিস চলে যেত। তারপর ডাব্বাওয়ালা সাহেবের খাবার নিতে আসত বেলা বারোটার সময়। তার মধ্যে ভাত দু'টো তরকারি তৈরি করে টিফিন-কেরিয়ার সাজিয়ে রাখত। লোকটা এসে যদি ডাব্বা না পায় তাহলে এক মিনিটও দাঁড়াবে না। খালি হাতেই চলে যাবে সে। সেই জন্যে সন্ধ্যেবেলাই বাজার করে রাখতো সে। যাতে পরের দিন রান্না করতে দেরি না হয়।

একদিন সুমিত্রা বললে—একটা টব্‌ কিনে এনে দিতে পার? আর একটা শাঁখ?

—টব্‌ কী করবে?

—একটা তুলসী গাছ পুঁতবো। হিন্দুর বাড়িতে তুলসী গাছ থাকবে না, দেখলে লোকে কী বলবে! আর সন্ধ্যেবেলা শাঁখ না বাজালে কি বাড়ি পবিত্র হয়!

সোহম্‌ বললে—বোম্বাই তোমার কলকাতা নয়, এখানে ও-সব না করলেও কেউ কিছু বলবে না। এখানে কেউ কারো বাড়ি যায় না। একদিন তোমায় সিনেমায় নিয়ে যাব—

সুমিত্রা বললে—সিনেমায় গিয়ে কী হবে?

—সময় কাটবে।

সুমিত্রা বললে—সন্ধ্যেবেলা তুমি একটু সকাল-সকাল বাড়ি এস, তাহলে আর সময় কাটাবার জন্যে ভাবতে হবে না। আর দু'দিন পরেই তো আমাদের কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। তখন তো তোমার মাইনে বাড়বে!

হঠাৎ সেদিন অফিস থেকে ফিরে এসে কোটটা খুলে রাখতে গিয়ে সুমিত্রার খেয়াল হল পকেটটা খুব ভারি।

বললে—পকেটে তোমার কী আছে গো?

বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিতেই বললে—এটা কী গো?

জিনিসটা দেখে চমকে উঠলো সুমিত্রা। আবার বললে—এটা কী গো?

সোহম্‌ তাড়াতাড়ি রিভলবারটা সুমিত্রার হাত থেকে কেড়ে নিলে।

বললে—এটাতে হাত দিলে কেন?

—এটা কী, বলো না?

সোহম্‌ বললে—এটা রিভলবার।

—রিভলবার? রিভলবার মানে? এ দিয়ে কী হয়?

সোহম্‌ বললে—এটা দিয়ে মানুষ খুন করা যায়!

—ওমা, তুমি মানুষ খুন করবে নাকি? কেন?

—না না, আমি মানুষ খুন করব না। কেউ যদি আমায় খুন করতে আসে,

তখন আমি তাকে খুন করব।

—তুমি খুনোখুনি করবে? এ তোমার কী রকম চাকরি? তুমি এ-রকম চাকরি কোর না। এ চাকরি ছেড়ে দাও। আমরা উপোস করে মরি সেও ভাল, তবু তুমি এ চাকরি ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে চল!

সোহম্ বললে—আমি কী করব, আয়েঙ্গার সাহেব যে রিভলবারের লাইসেন্স্ করে পাইয়ে দিলে। কাউকে দেয় না। আমাকে আয়েঙ্গার সাহেব ভালোবাসে বলেই তো রিভলবার দিলে। নইলে কি দিত, এটা তুমি বুঝতে পারছো না?

—না না, আমি বলি কী, তুমি এ-চাকরি ছেড়ে দাও।

সোহম্ বললে—ছি, ছেলেমানুষি কোর না, আর দু'দিন বাদে আমি টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাকশন্ অফিসের ওয়েলফেয়ার অফিসার হতে যাচ্ছি, আর তুমি কি না আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলছ? তুমি অমন পাগলামি কোর না।

সুমিত্রা বললে—তাহলে তুমি বল একটা তুলসী গাছ এনে দেবে, আর একটা মাটির টব্, আর একটা শাঁখ! শাঁখ বাজালে আমাদের ভালো হবে দেখে নিও—তাড়াতাড়ি তোমার মাইনে বেড়ে যাবে!

মনে আছে সেদিন অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সুমিত্রাকে ঠাণ্ডা করেছিল সে। আর তারপর তুলসী গাছের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল, আর শাঁখেরও—

আর আশ্চর্য, সুমিত্রার সন্ধ্যেবেলা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে শাঁখ বাজানোর জন্যে কিনা কেউ জানে না, সোহমের নামে চিঠি এল কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষায় বসবার জন্যে!

সুমিত্রা বললে—দেখলে তো, আমি সন্ধ্যেবেলা পুজো আরতি করতুম বলে তোমার কলকাতা অফিস থেকে চিঠি এল!

এ-সব অনেক দিনের আগের কথা। তারপর সোহম্ পরীক্ষা দিয়েছিল। সবাইকে ডাকা হয়েছিল পরীক্ষা দিতে। ইব্রাহিম, কেশব মাইতি আর বিভূতি পোদ্দাররা কেউ পরীক্ষা দিতে পারেনি। অন্য যারা দিয়েছিল তারা কেউই পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি।

পরীক্ষার ফল যেদিন বেরোল সেদিন অফিসময় তোলপাড় পড়ে গেল।

অফিসময় কুলি মজুর সবাই ঝাণ্ডা নিয়ে খানিকক্ষণ চিৎকার করলে—'কম্‌রেড সোহম্ রায় জিন্দাবাদ', 'কম্‌রেড সোহম্ রায় জিন্দাবাদ।'

ফুলের মালায় সমস্ত শরীরটা গলা থেকে পেট পর্যন্ত ঢেকে গেল।

ইব্রাহিম, কেশব মাইতি আর বিভূতি পোদ্দাররা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর তুলে চেঁচাতে লাগলো—বলো ভাইলোগ্ কমরেড্ সোহম্ রায় জিন্দাবাদ!

সবাই এক সুরে গলা মিলিয়ে বলে উঠল—কম্‌রেড সোহম্ রায় জিন্দাবাদ—

সোহম্ রায়ও একটা লম্বা লেকচার দিয়ে দিলে।

বললে—যদিও আমি আর এখন কম্‌রেড্ নই ভাই, তবু জেনে রেখো ভাই সব, আমি বরাবর তোমাদের স্বার্থই দেখবো। এটা ভালো করে জেনে রেখো, ওয়েলফেয়ার অফিসার হলেও আমি তোমাদেরই লোক--

কিছুদিন এই সব নিয়ে ডামাডোল চলল। তারপর মিস্টার সান্ন্যাল কোয়ার্টার ছেড়ে দিতেই সোহম্ সপরিবারে সেখানে এসে উঠলো।

পি-বি-দাশবাবু মেয়েকে দেখতে এলেন। সঙ্গে মা-ও এল।

পি-বি-দাশবাবু বললেন—অফিসের লোকরা তোমার প্রমোশনে খুব খুশী হে! আগে যারা তোমার বিরুদ্ধে ছিল এবার তারাও খুশী। সবাই বললে—খুব লেখা-পড়া করা মানুষ, বি এ-তে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স, ওর প্রমোশন হবে না তো কার হবে!

সুমিত্রা বললে—না, বাবা, আমি বোম্বাইতে গিয়ে শিবপুজো করতুম বলেই আপনার জামাই-এর এই উন্নতি হলো। আবার জানো বাবা, বোম্বাই-এর বড় সাহেব আবার ওঁকে একটা রিভলবার দিয়েছে—

—চুপ চুপ চুপ

সোহম্ থামিয়ে দিল তাড়াতাড়ি।

বললে—ওই জন্যেই বলে মেয়েমানুষের পেটে কোনও কথা থাকে না—

সুমিত্রার মা বললে—তুমি কিছু মনে কোর না বাবা, ও তো এখন ছোট, যখন বয়েস হবে তখন সব শিখে নেবে। তুমি ওকে যেমন শেখাবে, ও তেমনি করবে। ওকে আমি ওর ছোটবেলা থেকে শিখিয়ে এসেছি, স্বামীর ভালোর জন্যে তুমি শিবপুজো করবে। ওকে তুমি ভুল বুঝো না বাবা!

এই সময় খবর পেয়ে কাশী দত্ত অফিসে এসেছিল। যতদিন তার চাকরিতে উন্নতি হয় নি ততদিন কেউই তার খোঁজ নেয়নি। বেশি ভাত খায় বলে যে একদিন পিসিমার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সে-ই আবার তার অফিসে তার সঙ্গে দেখাও করতে এসেছিল। লজ্জাও করেনি তার! এ-সংসারে বোধ হয় টাকারই খাতির, মনুষ্যত্বের নয়। আর টাকারই যদি এত খাতির তা হলে সে সকলকে দেখিয়ে দেবে কাকে টাকা হওয়া বলে!

রাত্রে পি-বি-দাশবাবুর সঙ্গে দেখা হলো।

বললেন—তুমি শুনেছ, তোমার পিসতুতো দাদা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

সোহম্ বললে—স্লিপ পাঠিয়েছিল আমার চাপরাসীকে দিয়ে!

—তা হাজার হোক, নিজের পিসিমার ছেলে তো, দেখা করলেই পারতে! আগে তোমার সঙ্গে যেমন ব্যবহারই করুক, এখন তো তুমি বড় হয়েছ, মানুষ হয়েছ, বলবার মত মাইনে হয়েছে—

সোহম্ বললে—ওই জন্যেই তো এসেছিল। যেই শুনেছে যে আমি পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছি ওমনি আমি মামাতো ভাই হয়ে গেলুম! কেন, সেদিন মনে ছিল না যেদিন আমাকে রাত্তির বেলা বাড়ি থেকে রাস্তায় বার করে

দিয়েছিল !

পি-বি-দাশবাবু বললেন—আবার অফিস-সুদ্ধ লোককে বলছিল তুমি নাকি ম্যাট্রিকে ফেল করেছ—ম্যাট্রিক ফেল করলে কী করে এত বড় চাকরি পায়—

সোহম্ বললে—তবেই বুঝুন, কত হিংসে ! হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছে একেবারে। আমি যে বি-এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ইংরিজীতে অনার্স তা অফিস-সুদ্ধ লোক সব্বাই জানে, আর এখানে এসেই সকলকে বলছে আমি ম্যাট্রিক ফেল ! আমি সেই রকম লোকের সঙ্গে দেখা করবো ? আমি শুনেছি আমায় নাকি গালাগালি দিয়েছে অন্য লোকের সামনে—

এ-সবও অনেক দিন আগের কথা। তারপরে কত কী ঘটে গেল। কত কী অঘটন ! জীবন তো সহজ নয়। অত সহজ নয় বলেই জীবন নিয়ে এত কাহিনী, এত উপন্যাস, এত কাব্য লেখা হয়েছে আর লেখা হচ্ছেও।

এর পর পি-বি-দাশবাবু রিটায়ার করেছেন, তাঁকে ফেয়ারওয়েলও দেওয়া হয়েছিল। তারপর একদিন মারাও গিয়েছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর শাশুড়ী একলা থাকতে লাগলেন বাড়িতে।

সুমিত্রা বলেছিল—মা, আমাদের ছোট ফ্ল্যাটে তুমি চলে এসো না, এখানে একলা-একলা থাকবে, কে দেখাশোনা করবে তোমার ? অসুখ-বিসুখ হলে কে তোমাকে দেখবে ? কে ওষুধ খাওয়াবে ? কে সেবা করবে ?

মা বলেছিল—না রে সুমি, আমি শেষ বয়েসে এই শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেতে চাই না, পাশেই গঙ্গা, গঙ্গা আর শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কোথায় যাবো ?

মা শেষ পর্যন্ত সোহমের বাড়িতে আসেনি। শুধু সুমিত্রা মাঝে মাঝে গিয়ে মা'র সঙ্গে দেখা করে আসে। ভালো কিছু রান্না করলে মা'কে খেতে দিয়ে আসে।

মা বলে—বাঃ, তুই তো খুব ভালো রান্না করেছিস রে !

সুমিত্রা বলে—না মা, আমি রান্না করিনি, আমাদের ঠাকুর রান্না করেছে—

—তুই বোধ হয় শিখিয়ে দিয়েছিস তাকে !

—তাকে শুধু একটু বলে দিই মাঝে মাঝে।

—তাহলে আর ক'দিন পরেই ভালো রান্না করতে পারবে !

সেদিন সোহমের প্রস্তাব শুনে সুমিত্রা বললে—একবার মাকে জিজ্ঞেস করে আসবো ?

সোহম্ ভয় পেয়ে গেল। বললে—খবরদার খবরদার, মাকে যেন এসব কথা বোল না।

সুমিত্রা বললে – কাল রাত্তিরে কিন্তু ঘুমটা ভালো হয়েছিল—

সোহম্ বললে—দেখবে, আজ খুব চনচনে ক্ষিধে হবে।

সুমিত্রা বললে—ক্ষিধে তো এখনই পাচ্ছে—

—তাহলে কিছু খাও এখন।

—আচ্ছা, ককটেল পার্টিতে যারাই যায় তারাই মদ খায় কি? মদ খাওয়া কি নিয়ম?

সোহম্ বললে—মদ যে খেতে হবেই তার কোনও নিয়ম নেই, কিন্তু না খেলে লোকে আনাড়ি বলবে। আর তা ছাড়া ভানুভাই প্যাটেল যাতে খুশি হন্ সেই চেষ্টা করবার জন্যেই তো তোমাকে নিয়ে যাওয়া। মিস্টার সেন-এর তো তাই অর্ডার।

—ভানুভাই প্যাটেল? তিনি খুব বড়লোক?

—খুব বড়লোক। মিডল্ ইস্টে তিনি তিরিশ কোটি ডলার-এর কাজ পেয়েছেন। তাঁকে আমি নেমন্তন্ন করেছি। মানে পার্টি দিচ্ছি। সুতরাং আমি হচ্ছি হোস্ট্ আর তিনি হচ্ছেন গেস্ট্, মানে অতিথি। আমার তরফ থেকে তুমিই তাকে এন্টারটেন করবে। মোট কথা তাঁকে খুশী করতে গেলে যা করতে হয় তা তুমি করবে। তিনি যদি তোমাকে সিগারেট খেতে বলেন তো তুমি যেন 'না' বোল না।

—সিগারেট?

—হ্যাঁ, সিগারেট! কেন, ভয় পাচ্ছ?

—সিগারেট তো খাইনি কখনও! যদি কাশি পায়?

সোহম্ বললে—এই দেখ না, আমি একটা সিগারেট ধরালুম, এই দেখ ধোঁয়া বার করবো—দেখবে আমার কাশি পাবে না।

বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে লম্বা করে ধোঁওয়া ছাড়লে। একটুও কাশি এল না।

সুমিত্রা বললে—তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের কথা আলাদা।

সোহম্ বললে—পুরুষ মানুষ বলে নয়, বলো অভ্যেস নেই বলে খেতে ভয় করছে।...অবশ্য তোমাকে যে সিগারেট খেতেই হবে তা নয়, হয়ত খেতে না-ও হতে পারে। কিন্তু একটু একটু শিখে রাখা ভালো। জায়গা বিশেষে কাজে লাগতে পারে। ধরো হঠাৎ যদি মিস্টার প্যাটেল তোমাকে সিগারেট অফার করেন, তুমি কি রিফিউজ্ করবে?

সুমিত্রা কিছু জবাব দিতে পারলে না।

—বলো রিফিউজ করবে?

তারপর একটু থেমে বললে—মিস্টার সেনের স্পেশ্যাল অর্ডার, মিস্টার প্যাটেলকে তোমায় খুশী করতে হবে, তা সে যেমন করে হোক!

—তোমাদের পার্টি কবে?

—যেদিন তুমি তৈরি হবে সেইদিনই ইনভাইট করবো মিস্টার প্যাটেলকে। যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মিস্টার সেন খুশী হবে। দেরি হলে হয়ত অর্ডারটা ফসকে যেতে পারে!

সুমিত্রা বললে—তাতে কি সত্যিই তোমার মাইনে বাড়বে?

সোহম্ বললে—নিশ্চয় বাড়বে! নইলে আমি তোমাকে এত পীড়াপীড়ি করছি কেন?

—এখন তো তুমি শুধু ওয়েলফেয়ার অফিসার, মাইনে বাড়লে তখন তুমি কী হবে?

—তখন হবো পারসোনেল অফিসার। একেবারে সেন সাহেবের নিচেই। তখন আমার মাইনে হবে সাত হাজার। বলো তো আমাদের কত আরাম হবে তখন! আমি একবার কোম্পানির পঞ্চাশ লাখ টাকার লোকসান বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম, তা জানো? তার জন্যেই আমি একজন ক্লার্ক থেকে একেবারে ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছিলাম। এবারও যদি তোমার সাহায্য পাই তাহলে ওয়েলফেয়ার অফিসার থেকে একেবারে পারসোনেল অফিসার হবো। আর আসলে তো জীবনে টাকাটাই সব। কী বলো?

সুমিত্রা কিছু উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

সোহম্ বললে—কী হলো, তুমি কিছু কথার উত্তর দিচ্ছ না যে?

সুমিত্রা বললে—তা তো বটেই!

সোহম্ বললে—ও-রকম মিউ মিউ করে কথা বলছো কেন? টাকাটা সব নয়? এই যে তোমাকে এখন নিজের হাতে কিছুই কাজ করতে হয় না, নিজের হাতে রান্না করতে হয় না, নিজের হাতে বাসন মাজতে হয় না, নিজের হাতে ঘর-ঝাঁটও দিতে হয় না, তারপরে আমার গাড়ি চড়ে তুমি তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করে আসো, বাসে ভিড়ের মধ্যে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যেতে হয় না, এ সবই তো টাকার জন্যে! একে তুমি কী বলবে? এটা সুখ নয়? যদি টাকা না থাকতো, যদি দু'শো প'চাত্তর টাকা মাইনে পেতাম তাহলে কি এ সুখ হতো? তাই জন্যেই তো বলছি জীবনে টাকাটাই হলো সব!

সুমিত্রা বললে—ঠিক আছে, তুমি যা বলছো আমি তাই-ই করবো। কিন্তু মা যদি জানতে পারে?

- মাকে তুমি বলবে কেন? আমাদের বাড়ির সব কথা কি তুমি মাকে গিয়ে বলো নাকি?

সুমিত্রা বললে—হ্যাঁ। মা জিজ্ঞেস করে যে সব কথা!

সোহম্ বললে—অন্য সব কথা বললে আপত্তি নেই, কিন্তু এই যে আমি তোমাকে কক্‌টেল পার্টিতে গিয়ে মদ খেতে বলছি, সিগারেট খেতে বলছি, মিস্টার ভানুভাই প্যাটেলের সঙ্গে আলাপ করতে বলছি, এসব কথা যেন বোল না—

সুমিত্রা বললে—তুমি যখন বলতে বারণ করছো তখন বলবো না।

—হ্যাঁ, এসব কথা শুধু মাকে নয়, কাউকেই বলতে নেই। শুধু আরো বেশি টাকার জন্যে তোমাকে এই সব করতে বলছি. কারণ তুমিই বলো, জীবনে টাকার চেয়ে বড় আর কিছু আছে?

সুমিত্রা বললে—না, টাকাই সব চেয়ে বড়।

তারপর বললে—এখন আমাকে সিগারেট খেতে শিখিয়ে দাও—শুনেছি নাকি সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়? তোমার মত কী?

সোহম্ বললে—দূর, কে এসব বাজে কথা বলেছে তোমাকে ? নইলে মেয়েরা, বিশেষ করে ইংরেজ মেয়েরা তো সিগ্রেট খায়, কিন্তু ইণ্ডিয়ান মেয়েরা তো সিগারেট খায় না, বিধবারাও খায় না, তাদের কেন ক্যানসার হয় ?

তারপর একটু থেমে বললে—আর সিগ্রেট খেলে যদি ক্যানসারই হবে, তাহলে গভর্মেণ্ট তো কই আইন করতে পারত এই বলে যে, যে সিগ্রেট তৈরি করবে বা যে সিগ্রেট খাবে তার জেল হয়ে যাবে! কই, সে-রকম আইন তো কই করে না গভর্মেণ্ট!

সুমিত্রা একটু কী যেন ভাবলে।

তারপর বললে—তাহলে দাও একটা সিগারেট, আমাকে শিখিয়ে দাও সিগারেট খাওয়া। আর তার আগে ঘরের দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে আসি, যদি ঠাকুর-ঝি-চাকর কেউ দেখে ফেলে—

বলে ঘরের দরজা-জানালাগুলো সব ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলে। তারপর বললে—দাও সিগারেট, তুমি বলছো যখন তখন দাও, এখন আর ভয় নেই, কেউ জানতে পারবে না। দাও—

সোহম্ সিগারেটটা নিজে ধরিয়ে সুমিত্রাকে দিয়ে বলল—এইবার আস্তে আস্তে টান—

স্বামীর নির্দেশমত সিগারেট টানতে গিয়ে একটা কাশিতে একেবারে অস্থির হয়ে উঠল সুমিত্রা। কাশতে কাশতে একেবারে দম বেরিয়ে যাবার যোগাড়!

সোহম্ তাড়াতাড়ি বাইরে থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে এল দরজা খুলে। বললে—জল খাও, জল খাও শীগগির, কাশি থেমে যাবে—

বলে জলের গেলাসটা সুমিত্রার হাতে দিতেই বদ্যিনাথ এসে খবর দিলে—সাব, মেহের আলি সাহেব এসেছেন, ড্রয়িংরুমে বসিয়েছি, আপনাকে ডাকছেন—

সোহম্ বললে—বল্ গিয়ে, আমি আসছি—

বদ্যিনাথ চলে গেল। এদিকে জল খেয়েও কাশি থামে না সুমিত্রার। হাতে জ্বলন্ত সিগারেটটা তখন হাত থেকে মেঝেতে পাতা কার্পেটের ওপর পড়ে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সোহম্ তখন গেলাসের জলটা আগুনের ওপর ফেলতেই সেটা নিভে গেল।

তারপর বদ্যিনাথকে ডাকলে। বদ্যিনাথ আসতেই বললে—বদ্যিনাথ এই দ্যাখ্, আমার হাতের পোড়া সিগ্রেট কার্পেটে পড়ে কী হয়েছে, দ্যাখ্—

বদ্যিনাথ এক বালতি জল নিয়ে এসে কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে দিলে। তারপর বালতি নিয়ে চলে গেল।

সোহম্ সুমিত্রার মুখের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে—এখন একটু ভাল বোধ করছো ?

সুমিত্রা তখনও ভালো করে কথা বলতে পারছে না।

বললে—বড় কষ্ট হচ্ছে গলায়, তুমি সিগারেট খেও না, তোমার গলায় অসুখ করবে। খবরদার খেও না, ও খাওয়া ভাল নয়। গভর্মেণ্ট আইন করে সিগারেট বিক্রি করা বন্ধ করে দেয় না কেন, আর লোকেই বা এ বিষ খায় কেন ?

সোহম্ বললে—তুমি শুয়ে থাকো, মেহের আলি সাহেব এসেছে, শুনে আসি সে কী বলে।

সুমিত্রা কাশতে কাশতে বললে—মেহের আলি আর সময় পেলে না, ঠিক এই সময়েই এসে গেল!

সোহম্ বললে—আমি বেশি দেরি করবো না, আমি তার সঙ্গে একটু কথা বলেই এখ্খুনি চলে আসছি—

বলে বাইরের পার্লারে এল।

মেহের আলি সাহেব তখন ফুর্তির মেজাজে ছিল। মেহের আলির স্বভাবটাই এইরকম। যখন শেয়ার বাজারে কোনও বড়লোক কুপোকাত হয় তখন তার উল্লাসের সীমা থাকে না।

তাই সোহম্ ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলে—আজকে আবার কে কুপোকাৎ হলো মেহের আলি সাহেব? ছুঁচো মল্লিক, না হুইস্কি দত্তর ছেলে ব্র্যাণ্ডি দত্ত?

মেহের আলি কিছু জবাব না দিয়ে পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করে বললে—এই নিন, আপনার ডিভিডেণ্ড্! এতে এক হাজার আছে। গুনে নিন।

—এক হাজার?

—আপনি গুনুন না রায় সাহেব। আগে গুনুন—

সোহম্ গুনে দেখলে ঠিক এক হাজার টাকাই আছে। বললে—এ কীসের টাকা?

ততক্ষণে আর এক তাড়া নোট বার করেছে মেহের আলি সাহেব আর এক পকেট থেকে। বললে - এই নিন আর এক হাজার। গুনে নিন—

টাকাটা নিয়ে সোহম্ বললে—এ কীসের টাকা মেহের আলি সাহেব?

—আগে টাকাগুলো গুনুন তো, তারপরে বলছি—

সোহম্ টাকা গুনছিল, ওদিকে আর এক পকেট থেকে আর এক তাড়া নোট বার করলে মেহের আলি সাহেব।

এই রকম করে জামা-প্যাণ্টের পাঁচটা পকেট থেকে মোট পাঁচ হাজার টাকা বেরোল।

সোহম্ অবাক! তার মুখ দিয়ে তখন আর কথা বেরোচ্ছে না। শুধু বললে—এত টাকা?

মেহের আলি সাহেব বললে—এতেই আপনি চম্কে যাচ্ছেন রায় সাহেব? এর পর তো আরো মোটা অঙ্কের টাকা দেব!

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু এই পাঁচ হাজার কীসের জন্যে?

মেহের আলি সাহেব বললে—সেই যে আমি আপনার কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়েছিলুম জুটের শেয়ার কিনতে, সেই জুটের দাম হু-হু করে পাঁচগুণ বেড়ে গেছে! এবার ডিভিডেণ্ড্ বেড়ে গিয়ে আপনার ভাগে এই পাওনা হয়েছে!

—কিন্তু একদিন যদি আবার হঠাৎ জুটের দাম পড়ে যায়?

—তাহলে মেহের আলি আছে কী করতে? পড়বার আগেই আমি শেয়ার

বেচে দিয়ে আপনাকে টাকা দিয়ে যাবো! তাহ'লে এখন চলি রায় সাহেব?

—আচ্ছা, ঠিক আছে!

—আর যদি কোনও খবর থাকে তো আপনাকে দিয়ে যাবো! এইটে মনে রাখবেন রায় সাহেব, মেহের আলি ক্লায়েণ্টের ভালো করবার জন্যেই এই দুনিয়ায় জন্মেছে। আমার আর কে আছে যে আমি তার জন্যে দেখবো!

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—সে কি, আপনার কেউ নেই?

—কেউ নেই রায় সাহেব, কেউ নেই!

বলতে বলতে মেহের আলি সাহেবের চোখ দু'টো জলে ছল্‌ছল্ করে উঠলো।

—তাহলে কা'র জন্যে আপনি এত খেটে মরছেন?

—নেশা রায় সাহেব, নেশা। শেয়ার মার্কেটের একটা নেশা আছে। অথচ একদিন যখন প্রথম শেয়ার মার্কেটে ঢুকেছিলাম তখন সব ছিল রায় সাহেব। আমার বিবি ছিল, লেড়কী ছিল, বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল। বোম্বাইতে আমার সব কুছ্ ছিল। কিন্তু যেদিন সব হারিয়ে গেল সেদিন আমি বোম্বের দালাল স্ট্রীট ছেড়ে কলকাতায় রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস্ লায়নস্ রেঞ্জে চলে এলুম। আজ আমার কিছু নেই রায় সাহেব, শুধু আছে আমার শেয়ার মার্কেট আর আমি। আর আছে আমার ক্লায়েণ্ট্‌রা।

সোহম্ মেহের আলির কথাগুলো অবাক হয়ে শুনছিল।

বললে—কিন্তু সব চলে গেল কেন মেহের আলি সাহেব? কী হয়েছিল?

—সে আমি আপনাকে আর একদিন বলব। আমি চলি, সেলাম—

বলে মেহের আলি সাহেব ঘরের ভেতর থেকে ঝড়ের বেগে চলে গেল।

সোহম্ খানিকক্ষণ সেখানে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে মেহের আলির কথাই ভাবতে লাগল। হাতে তখনও তার সেই পাঁচ হাজার নগদ পড়ে পাওয়া টাকা!

১৯৪৭ সালে ইণ্ডিয়া স্বাধীন হল আর তারপর থেকেই বলতে গেলে এইসব মাৎস্যন্যায় সুরু হলো। কোথা দিয়ে কেমন করে যে সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেল তা এক গবেষণার বিষয়। ঝরাপাতার মত উড়ে যেতে লাগল দিন মাস বছরগুলো। গরীব বড়লোক হল, বড়লোক গরীব। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ আর দেশ-ভাগের মর্মান্তিক পরিণতির ভারি বোঝা নিয়ে আমরা শুনতে পেলাম ভারত নামক দেশটা নাকি স্বাধীন হয়েছে। ১৯৩৮ সালে, অর্থাৎ যুদ্ধের ঠিক আগের বছরে সোনার ভরি ছিল ৩৪ টাকা ৪ আনা। একশো ভরি রুপোর দাম ছিল ৫১ টাকা ১০ আনা। চালের বাজারে কামিনী আতপ এক মণ ৪ টাকা ৪ আনা। সেদ্ধ চাল এক মণ সাড়ে তিন টাকা। গুড় এক মণ ৪ টাকা। চিনি এক মণ ৭ টাকা ১০ আনা। ময়দা এক মণ ৬ টাকা ২ আনা। একটন কয়লা পোনে পাঁচ

টাকা। শ্রী-ঘি এক মণ ৫৭ টাকা। দেশলক্ষ্মী গাওয়া ঘি এক মণ ৪৪ টাকা। হলুদ এক মণ ৯ টাকা, জিরে আঠারো টাকা, লঙ্কা ১৩ টাকা।

সাতচল্লিশে সোনার ভরি ছিল ৬৫ টাকা। সরষের তেল এক সের ১ টাকা ১২ আনা। কয়লা এক মণ দেড় টাকা। ঘি এক সের সাড়ে চার টাকা। চাল টাকায় ২ থেকে আড়াই সের। চিনি আড়াই সের ২ টাকা ২ আনা। দুধ টাকায় পাঁচ পোয়া, সন্দেশ এক সের আড়াই টাকা।

সাতান্ন সালে এক সের আলু ১৭ পয়সা, বড় ট্যাংরা মাছ এক সের ১ টাকা। বড় চিংড়ি মাছ এক সের বারো আনা। চিনি এক সের ১৩ আনা। সর্ষের তেল এক সের ১ টাকা ১৪ আনা।

এলো চৌষট্টি সাল। বাজার আগুন। চাল এক কেজি ৮০ পয়সা। লক্ষ্মী ঘি এক কেজি ৮ টাকা ১০ পয়সা, সর্ষের তেল এক কেজি সাড়ে তিন টাকা।

আটাত্তর সালে এক কেজি চাল ২ টাকা ৪০ পয়সা। চিনি এক কেজি সাড়ে ৩ টাকা। সর্ষের তেল এক কেজি দশ টাকা। গায়ে মাখা সাবান একখানা দেড় টাকা। রুই মাছ এক কেজি ১৮ টাকা। মাংস এক কেজি ১৫ টাকা। আটা এক কেজি ১ টাকা ৬০ পয়সা, আলু এক কেজি এক টাকা ৪০ পয়সা। দুধ এক কেজি সাড়ে তিন টাকা। সোনার ভরি ৭৬০। আর আজ? আজ সোনার ভরি দু' হাজার টাকা।

এত যে দর বাড়ছে, এর মধ্যে শুধু একটাই সান্ত্বনা আমরা স্বাধীন ভারত-বাসী। পণপ্রথার শিকার হয়ে নববিবাহিতা আত্মহত্যা করুক, মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে হরিজনরা গুলি খেয়ে মরুক, কিম্বা পেটের আগুন চোখের জলে নেভাতে গিয়ে গরীব গ্রামবাসী নিজের মেয়েকে বেচে দিক, তবুও আমরা স্বাধীন এটাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। আর এই সান্ত্বনা নিয়েই আমরা প্রতিদিনের জীবনের কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কালোবাজারীদের নিষ্ঠুর মুখব্যাদানের সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা জানাই,—হে কৃষ্ণকান্ত, দয়া করে এক লিটার কেরাসিন তেল দাও, পাঁচশো গ্রাম চিনি দাও। তুমিও তো স্বাধীন ভাবেই লক্ষ্মীর আরাধনা করছো, তাই স্বাধীন নাগরিকদের দিকে একবার দয়া করে ফিরে তাকাও।

এই হলো সোহমের জীবনের চালচিত্র। আর শুধু সোহম্ নয়, সোহমের মত আরো কোটি কোটি ছেলের জীবনেরও ওই একই চালচিত্র। সোহম্‌কে বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে এই চালচিত্র পেছনে রেখেই করতে হবে।

মিস্টার সেন সেদিন আবার ডেকে পাঠালেন।

বললেন—মিস্টার প্যাটেলকে পার্টি দেবার কী হলো? এত দেরি করছো কেন?

সোহম্ বললে—আমার মিসেসের জন্যে দেরি হচ্ছে—

—কেন?

সোহম্ বললে—এখনও ড্রিঙ্কটা ভালো করে অভ্যেস হয়নি।

—কেন? এখনও কি বমি হচ্ছে ড্রিঙ্ক করলে?

সোহম্ বললে—হচ্ছে, তবে একটু কম। তবে সিগারেট খেলে এখনও কাশি হয়।

মিস্টার সেন বললেন—খুব কন্টীল সিগারেট দেবে। আর একটা কাজ করো। মিস্টার প্যাটেলকে কক্‌টেল পার্টি দেবার আগে দু'চার দিন আগে থেকে ক্লাবে গিয়ে গিয়ে প্র্যাক্‌টিস করিয়ে নেবে—

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার স্ত্রী ইংরিজী বলতে পারেন ?

—না স্যার, ওই একটা ডিফেক্ট আছে আমার স্ত্রীর।

মিস্টার সেন বললেন—আজকাল তো পাড়ায় পাড়ায় 'স্পোকেন ইংরিজী' শেখাবার ক্লাস হচ্ছে, তারই একটাতে ভর্তি করিয়ে দেবে।

—কিন্তু সে শিখতে তো অনেক টাইম লাগবে।

মিস্টার সেন বললেন—তা লাগুক, আজ না হোক পরে কাজে লাগবে। সারা জীবন তো পড়ে আছে সামনে। আরো অনেক কক্‌টেল পার্টিতে যেতে হবে তোমাকে, আরো অনেক কক্‌টেল পার্টি দিতেও হবে। তখন খুব কাজে লাগবে।

তারপর একটা টেলিফোন এল। সেটা ধরে বললেন—হ্যালো, সেন স্পীকিং,—

তারপর সোহম্‌কে চলে যেতে ইঙ্গিত করতেই সোহম্‌ ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

প্রথম যেদিন সোহম্‌ সুমিত্রাকে নিয়ে ক্লাবে গিয়েছিল সেদিন বড় ভয়-ভয় করেছিল সুমিত্রার। কী রকম ভাবে লোকের সঙ্গে মিশতে হবে! কী রকম করে লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে! কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলবে!

আগের দিন নিউ মার্কেটে গিয়ে সোহম্‌ সুমিত্রাকে নতুন দামী শাড়ি ব্লাউজ জুতো কিনে দিয়েছিল। তাই পরে খুব গরম লাগছিল।

সোহম্‌ শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল সুমিত্রাকে।

বলেছিল—কেউ যদি কিছু দেয় তোমাকে…

সুমিত্রা বাধা দিয়ে বলেছিল—আমাকে আবার কী দেবে লোকে? আমার তো কারও সঙ্গে জানাশোনা নেই!

সোহম্‌ বলেছিল—ধরো, একটা সিগারেট অফার করলে—

—আমি তো সিগারেট খাই না!

—তবু যদি দেয় তো রিফিউজ কোর না। বলবে—থ্যাঙ্কু—

—থ্যাঙ্কু মানে ?

—মানে ধন্যবাদ।

হঠাৎ সোহম্‌কে দেখে একটা মেয়ে কাছে এল। বললে—গুড্‌ ইভ্‌নিং মিস্টার রায়—

সোহম্‌ স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। বললে—দিস ইজ মিসেস রায় আর দিস ইজ মিস্‌ সুরিটা। মিস্টার ভানুভাই প্যাটেলের সেক্রেটারি কাম্‌ পি-এ

মিস্ সুরিটা—

মিস্ সুরিটা মিসেস রায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—ভেরি গ্ল্যাড্ টু মীট ইউ—

সুমিত্রা বললে - থ্যাঙ্কু -

তারপরে সোহমের মুখের দিকে চাইলে। সোহম্ খুশী। যেমন সোহম্ শিখিয়েছিল ঠিক তেমনিই করেছে।

—আচ্ছা মিস্ সুরিটা, মিস্টার প্যাটেলের খবর কী ?

তিনি এখন জাপানে।

—কবে ফিরছেন ইণ্ডিয়ায় ?

—এই মাসের শেষে।

সোহম্ বললে—তিনি কলকাতায় ফিরে এলে একটা কাজ করতে পারবেন দয়া করে ?

—কী ?

—আমার টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানির অফিসে আমাকে একটা খবর দিতে পারবেন ? এই নিন আমার কার্ড। এতে টেলিফোন নাম্বার আছে।

সুরিটা বললে—কেন খবর দেব না, নিশ্চয় খবর দেব। কেন, তাঁর সঙ্গে আপনার কী কাজ ?

সোহম্ বললে—আমি তাঁর সম্মানে এই ক্লাবে একটা পার্টি দেব, কক্টেল পার্টি। তিনি রাজি হবেন তো ?

সুরিটা বললে—সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে খবর দেব আর যাতে মিস্টার প্যাটেল সেটা এ্যাকসেপ্ট্ করেন তার চেষ্টাও করব। আই মাস্ট ডু ইট্ ফর ইউ—

তা মিস্ সুরিটা সত্যিই কথা রেখেছিল। মিস্ সুরিটা সোহমের চেনা মেয়ে। সে সব ক্লাবেই যায়। একবার ক্যালকাটা ক্লাবের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল মিস্ সুরিটাকে। তখনই সে সভ্য সমাজের মুকুট-মণি। মুকুট-মণি হবার কারণও ছিল। সৌন্দর্য সকলেরই থাকে। বিশেষ করে যৌবনে। কিন্তু মিস্ সুরিটার খ্যাতি অন্য কারণে। সে গ্র্যাণ্ড হোটেলের বিউটি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল। তখন থেকেই ক্লাবের মেম্বার মানে সভ্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রতনে রতন চেনে। রতনরা মিস্ সুরিটার জন্যে পয়সা খরচ করে আনন্দ পেত। সুরিটা যদি কারো হাত থেকে মদের ডিকেণ্টার তুলে নিত তাহলে সে ধন্য হয়ে যেত। মিস্ সুরিটাকে খুশী করবার লোকের কখনও অভাব হয়নি। আর মিস্ সুরিটাও পরকে খুশী করে খুশী হতে চাইত।

সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে যে এমন রূপ কোথা থেকে পেল কে জানে! পাঁকেই তো পদ্মফুল জন্মায়! বোধ হয় কোনও বস্তি থেকেই তার উদ্ভব হয়েছিল। তারপর ধাপে ধাপে কেমন করে যে সে টাকাওয়ালা সভ্য লোকেদের নজরে পড়ে গিয়েছিল তা আজ তার মনেও নেই।

এমনি একজন টাকাওয়ালা সভ্য লোক ভানুভাই প্যাটেল। প্যাটেল ইণ্টার-ন্যাশনাল এণ্টারপ্রাইজের স্বনামধন্য মালিক। তিনি যে-সে লোক নন। বিশেষ গুণ তাঁর এই যে তিনি একজন ব্যাচিলর।

ইণ্ডিয়া যেদিন স্বাধীন হলো, সেদিন কেউই ভানুভাই প্যাটেলকে চিনতো না। চিনলো অনেক দিন পরে যখন ইণ্ডিয়ার ভাঁড়ারে ফরেন-এক্সচেঞ্জের চাহিদা বাড়লো। মিডল্ ইস্টের দেশগুলো তখন নতুন স্বাধীন হয়েছে। তাদের দেশের জন্যে ইন্ডাস্ট্রি চাই। নতুন কংক্রীটের বাড়ি চাই। কে দেবে সিমেণ্ট, কে দেবে লোহা, কে দেবে নো-হাউ? বাইরের পশ্চিমের দেশগুলো থেকে তা আনতে গেলে অনেক টাকা লাগবে। তার চেয়ে নতুন স্বাধীন হওয়া ইণ্ডিয়ার মাল আর নো-হাউ অনেক সস্তা! ইণ্ডিয়া থেকে শুধু র মেটিরিয়ালই নয়, ইঞ্জিনীয়ার গেল সে-দেশে। আর তাদের পরিচালনা করবার জন্যে গেল ভানুভাই প্যাটেলের 'প্যাটেল ইণ্টারন্যাশন্যাল এন্টারপ্রাইজে'র মত নতুন গড়ে ওঠা কোম্পানিগুলো। তারা তখন মিডল্ ইস্টে নতুন এক্সপোর্টের বাজার খুঁজে পেয়েছে। সেখান থেকে অনেক টাকা এসে জমছে তাদের হাতে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের নতুন এ্যারিস্টোক্র্যাট। আগেকার সব টাকাওয়ালা লোকরা তখন বাজারের পেছনের সারিতে পড়ে গেছে। কারণ প্যাটেল সাহেবদের মত ফরেন এক্সচেঞ্জের ঢালোয়া সাপ্লাই তাদের নেই। আর ফরেন এক্সচেঞ্জই যদি তোমার হাতে না থাকলো তাহলে তুমি কীসের বড়লোক? আমরা বড়লোকদেরই খাতির করবো, বিশেষ করে যারা ইণ্ডিয়ার ফরেন এক্সচেঞ্জ উপায় করে।

তা মিস্ সুরিটার ভাগ্য ভালো বলতে হবে। ভানুভাই প্যাটেলের মত এমন একজন বড়লোকের নজরে পড়ে যাওয়ার সৌভাগ্য সোজা সৌভাগ্য নয়। বিউটি প্রতিযোগিতায় অনেকেই জেতে, কিন্তু ক'জন মেয়ে ভানুভাই প্যাটেলের মত বড়লোকের নজরে পড়ে! সেই নজরে পড়ার ফলেই সে ভানুভাই প্যাটেলের সেক্রেটারি কাম্ পি-এ। এখন অবশ্য তাই-ই আছে, কিন্তু এমন তো হতেও পারে যে একদিন ভানুভাই প্যাটেল তাকে বিয়ে করে তাকে সংসার দেবে, গৃহ দেবে। সে হবে প্যাটেল সাহেবের গৃহিণী, সে হবে মা!

সুরিটা অনেকবার বলেছে—তুমি যে বলেছিলে আমাকে বিয়ে করবে?

মিস্টার প্যাটেল বলেছে—বলেছি তো বিয়ে করবো। আমি কি বলছি বিয়ে করবো না?

সুরিটা বলেছে—কিন্তু কবে? কবে বিয়ে করবে?

মিস্টার প্যাটেল বলেছে—অত তাড়া কীসের? আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না! আর তা ছাড়া নতুন একটা কন্ট্র্যাক্ট্-এর কথা হচ্ছে সিরিয়ার সঙ্গে। তাই নিয়েই তো বার বার দিল্লি আর মিডল্-ইস্ট করছি। আমি কি এক জায়গায় বসে

আছি ? তুমি তো সবই দেখতে পাচ্ছ ! চিঠিগুলো তো সব তুমিই টাইপ করছো।

এমনি করে দিন যাচ্ছিল সুরিটার। বোম্বাই-এর আধা ইণ্ডিয়ান আধা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে সুরিটা মিস্টার প্যাটেলের প্রলোভনে পড়ে কলকাতায় এসেছিল। সাধ ছিল একদিন মিস্টার প্যাটেলের শোবার ঘরের শোভা হয়ে সিঁথিতে সিঁদুর দেবে। সংসারের লক্ষ্মী হয়ে মিস্টার প্যাটেলের মনটার মত দেহটাকেও বন্দী করে রাখবে। এক কথায় মিস্টার প্যাটেলের বৈধ শয্যাসঙ্গিনী হবে।

কিন্তু তাতে সব সময় একটা-না-একটা বাধা এসে সব বানচাল করে দেয়।

এবার মিস্টার প্যাটেল বলেছে—এবার জাপান যাচ্ছি, সেখান থেকে এসে একটা কিছু ডিসিশন নেব—

সুরিটা বলেছে—তুমি তো প্রত্যেকবারই বাইরে যাবার আগে তাই-ই বলে যাও—

মিস্টার প্যাটেল বলেছে কিন্তু তুমি তো দেখতে পাও আমার এতটুকু সময় নেই, দিনরাত কত ব্যস্ত—

তা বিয়ে করতে আর কত সময় লাগে ?

মিস্টার প্যাটেল বলেছে—তা বিয়ে করবার জন্যেই বা তুমি অত ব্যস্ত কেন ? তোমাকে কি আমি কম সুখে রেখেছি ? তোমাকে আমি কি কিছু কম দিয়েছি ? কী দিইনি তোমাকে বলো তো ? তুমি যা চেয়েছ তার চেয়ে অনেক বেশিই তোমাকে দিয়েছি—

—কিন্তু সংসার ?

মিস্টার প্যাটেল বলেছে—বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চেও না সুরিটা—

—কী বললে ?

—যা বললাম তা ঠিকই বলেছি।

—তার মানে ?

মিস্টার প্যাটেল বলেছে—তোমাকে আমি এক লাখ টাকার ফ্ল্যাট দিয়েছি, মাসে দশ হাজার টাকার মাইনে দিচ্ছি, বিশ্বসুন্দরী হলে কি এর চেয়েও বেশি সুখ পেতে ? রাণীর হালে রেখেছি তোমায়, এতেও তুমি খুশী নও ?

—মেয়েমানুষ কীসে খুশী হয় তা তুমি জানো না ?

মিস্টার প্যাটেল বলেছে—বাড়ি গাড়ি গয়না সিকিওরিটি, কোন্‌টা তুমি পাওনি ? ভাবো তো কী ছিলে তুমি আর কী তুমি হয়েছ। কলকাতার সব ক্লাবের মেম্বার করে দিয়েছি তোমাকে। সারা ওয়ার্লডে প্লেনে করে ঘুরিয়েছি, সেখানে সব ফাইভ্ স্টার হোটেলে রেখেছি।

—কিন্তু মা ? আমি কি মা হতে পেরেছি ?

মিস্টার প্যাটেল আর বেশি কথা বলতে চায়নি, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েছে। তার অত সময় নেই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজন মেয়েমানুষের নাকি-কান্না শুনবে। কিন্তু বাধা দিয়েছে সুরিটা, কোটটা চেপে ধরেছে হাত দিয়ে। বলেছে—পালাচ্ছো কেন, আমার কথার জবাব না দিয়ে পালাচ্ছো কোথায় ?

মিস্টার প্যাটেল চেঁচিয়ে উঠে নিজের কোটটা সুরিটার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। কোটটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার সময় বলে গিয়েছে—পাগলের সঙ্গে আমি কথা বাড়াতে চাই না, আমার সময়ের দাম আছে—

বলে ঘরের বাইরে চলে গেছে!

এ একদিনের ঘটনা নয়, বা একবারের কথাও নয়। এই রকমই চলছে সুরিটার সঙ্গে ভানুভাই প্যাটেলের পরিচয় হবার প্রথম দিন থেকেই। তারপর হাওড়ার পুলের তলা দিয়ে কত জল গড়িয়ে গেল, মিডল্ ইস্ট থেকে কত টাকা গড়িয়ে এল, ভানুভাই প্যাটেলের নাম দেশে বিদেশে আরো ছড়িয়ে গেল। লোকে জানলো নতুন বড়লোকদের তালিকায় আরো একটা নাম জুড়ে গেছে—প্যাটেল ইণ্টারন্যাশন্যাল এন্টারপ্রাইজ!

টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন কোম্পানির মিস্টার এন্-বি-সেন বহুদিন থেকেই মিডল্ ইস্টের একটা অর্ডার পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। অনেকবার টেণ্ডারও পাঠিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের কমার্স মিনিস্টারের সঙ্গে এ নিয়ে দেখাও করেছেন, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারেননি। কোথা থেকে কে একজন ভানুভাই প্যাটেল উড়ে এসে জুড়ে বসলো। একদিন আগেও কেউ যার নাম জানতো না, সে এখন বিখ্যাত হয়ে উঠলো ফরেন ট্রেডের কারবারে। তখন খোঁজ নিতে আরম্ভ করলেন। খুঁজে পেলেন তাঁর কুলুজি। তিনি শুধু কলকাতার বাসিন্দাই নন, তিনি কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের মেম্বারও।

তারপর এক মতলব আঁটলেন। দেখলেন এ-কাজ আর কাউকে দিয়েই হবে না। হবে একমাত্র সোহম্ রায়কে দিয়েই। তখনই ঘরে ডেকে পাঠালেন সোহম্‌কে।

তারপরের ঘটনা আজ সবই সোহমের মনে পড়ছে।

সুরিটার সঙ্গে তার পর থেকে রোজই দেখা হতে লাগলো। মিস্ সুরিটার সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ করবার জন্যে সুমিত্রাকে নিয়ে রোজই সোহম্ ক্লাবে যেতে লাগলো।

প্রথম দিনে সুমিত্রার যে জড়তা, যে আড়ষ্টতা ছিল, পরের দিনও সেই একই জড়তা একই আড়ষ্টতা রইল।

বাড়ি এসে সোহম্ বললে—ক্লাবে গিয়ে অত আড়ষ্ট হয়ে থাকো কেন?

সুমিত্রা বললে—কই, কখন আড়ষ্ট হয়ে থাকলুম? তুমি যা-যা বলেছিলে আমি তো তাই-তাইই করেছি। তোমার কথামত আমি তো হুইস্কি খেয়েছি, সিগারেটও খেয়েছি—

সোহম্ বললে—কিন্তু মিস্ সুরিটা যখন তোমাকে আর এক পেগ্ অফার করলে তখন তো তুমি রিফিউজ্ করলে। আর এক পেগ্ খেলে তোমার কী এমন ক্ষতি হতো, তোমার মহাভারত কী এমন অশুদ্ধ হয়ে যেত?

সুমিত্রা বললে—কিন্তু আমার যে তখন মাথা ঘুরছিল, আমার পা টলছিল। আমার কেবল ভয় হচ্ছিল আমি যদি পড়ে যাই—

সোহম্ বললে—এত রিহার্শাল দিয়েও তোমার এখনও প্র্যাকটিস্ হলো না? তাহলে কবে প্র্যাকটিস্ হবে? তোমার যত দেরি হবে আমারও প্রমোশন হতে যে তত দেরি হয়ে যাবে!

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে—প্রমোশন হলে তোমার কত মাইনে হবে?

সোহম্ বললে—পাঁচ হাজার, সব মিলিয়ে!

সুমিত্রা বললে—পাঁচ হাজার? আমার বাবা কত মাইনে পেতেন কে জানে।

সোহম্ বললে—তোমার বাবা সাড়শো টাকাতে রিটায়ার করেছেন—

—কিন্তু তাতে তো আমাদের কষ্ট হয়নি।

সোহম্ বললে—কষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু তোমাদের কি নিজেদের বাড়ি ছিল? তোমরা তো ছিলে ভাড়াটে। তোমরা তো ভাড়া বাড়িতে বাস করতে!

—আমরাও তো ভাড়া বাড়িতে বাস করি।

—আরে, এ তো অফিসের কোয়ার্টার। এর ভাড়া তো কোম্পানী দেয়!

—কেন, তোমাকে কেন কোয়ার্টার দিয়েছে কোম্পানী?

সোহম্ বললে—বা রে, দেবে না? আমি কোম্পানির লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছি, তা জানো?

—কী করে বাঁচালে?

—লেবার ইউনিয়নের লীডার হয়ে। সেন সাহেবই আমাকে লেবার ইউনিয়নে ঢুকতে বললে। ইউনিয়নে ঢুকে আমি বরের ঘরের মাসি আর কনের ঘরের পিসী হয়ে গেলাম। সে কথা তো সমস্তই তোমাকে বলেছি।

—কাজটা কিন্তু তুমি ভালো করোনি, তুমি যা-ই বলো আর তাই বলো। তাদের নেতা সেজে তাদেরই সর্বনাশ করে তুমি নিজের কাজ গুছিয়ে নিলে?

সোহম্ বললে—ও রকম না করলে তোমার বাবার মত চিরকাল কম মাইনের চাকরিতেই আটকে পড়ে থাকতাম। তাহলে আর এখন যেমন আরাম করছো তা আর করতে পারতে না। যেমন যুগ পড়েছে তেমনই তো করতে হবে। এ-যুগে তো টাকাটাই সব! আমি তো টাকার জন্যেই ওটা করেছি—

তারপর একটু থেমে আরো বলতে লাগলো—জানো, আমার একজন হেড্-মাস্টার মশাই ছিলেন, তাঁর নাম ক্ষেত্রবাবু। তাঁর সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল। তিনি আমার এই চাকরির উন্নতির কথা শুনে বলেছিলেন—আমি সৎ পথে আছি বলেই আমার এত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু আসল ভেতরের ব্যাপারটা তো তিনি জানেন না। জানো সুমিত্রা, তোমার কাছেই বলছি, কারণ তুমি আমার স্ত্রী, আর কাউকে যেন বোল না, আমি যে বি-এ পাস করেছি, তাও মিথ্যে। আমি স্কুল ফাইন্যাল থেকে বি-এ পর্যন্ত কোন পরীক্ষাই পড়ে পাস করিনি। সমস্ত পরীক্ষাগুলোই টুকে পাস করেছি। কিন্তু তার জন্যে কি আমার কোনও ক্ষতি হয়েছে? তুমিই বলো! ক্ষতি তো দূরের কথা, আমার তো কেবল উন্নতিই হয়ে চলেছে। এখন তুমিই আমার ভরসা। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করলে

এবার ওয়েলফেয়ার অফিসার থেকে একেবারে পারসোনেল অফিসার হয়ে যেতে পারি—। বলো সাহায্য করবে ?

সুমিত্রা বললে—সাহায্য তো করছিই। তুমি যা যা করতে বলেছিলে আমি তো তাই-ই করেছি। তুমি হুইস্কি, রাম, খেতে বলেছিলে বলে আমি তাই খেয়েছি। তুমি সিগারেট খেতে বলেছিলে বলে আমি সিগারেটও খেয়েছি—

সোহম্ বললে—সে তো আমি জানি। তুমি হুইস্কি খেয়েছ, রাম খেয়েছ, সিগারেট খেয়েছ। সে সবই আমার দিকে চেয়ে করেছ। সেটা কি আমি অস্বীকার করেছি ?

সুমিত্রা বললে—আর কী কী করতে হবে বলো ? তুমি যা বলবে আমি তাই-ই করবো।

—ওই যে বললাম মিস্ সুরিটা যা বলবে তাও করতে হবে তোমাকে।

—কেন ? মিস্ সুরিটা কে ? ও কী করে তোমাকে চাকরিতে উন্নতি করাবে ?

সোহম্ বললে – আরে ও-ই তো সব ! মিস্ সুরিটাও যা ভানুভাই প্যাটেলও তা। মিস্ সুরিটা যা বলবে প্যাটেল সাহেবও তাই করবে। মিস্ সুরিটা যদি বলে দেয় টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাকসন কোম্পানিকে তিরিশ কোটি টাকার মিডল্ ঈস্টের সাব-কনট্রাক্ট্ দিয়ে দাও তাহলেই প্যাটেল সাহেব তাই দিয়ে দেবে !

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে – কেন ? মিস্ সুরিটার অত ক্ষমতা কী করে হলো ? ও তো প্যাটেল সাহেবের সেক্রেটারি আর পি-এ !

সোহম্ বললে তুমি একটা আস্ত বোকা ! বুঝতে পারছো না, প্যাটেল সাহেব তো ওকে বিয়ে করেনি ! আর মিস্ সুরিটা কত সুন্দরী ! এর পরেও তোমাকে সব বুঝিয়ে বলতে হবে ?

– তা তোমাদের প্যাটেল সাহেব মিস্ সুরিটাকে বিয়ে করে না কেন ?

সোহম্ বললে—সেদিকে প্যাটেল সাহেব শুনেছি খুব সেয়ানা। বিয়ে না করেই যদি কাউকে ভোগ করা যায় তাহলে বিয়ে করতে যাবে কোন্ দুঃখে ? প্যাটেল সাহেব অত বোকা নয় !

- বোকা যদি না হয় তো আমার কথায় সে একেবারে ভুলে যাবে ?

—ভুলে যাবে ! আমি বলছি ভুলে যাবে !

—কী করে বুঝলে ?

সোহম্ বললে—মিস্টার সেন বলেছে। মিস্টার সেন তোমার ছবিটা দেখে একেবারে মুগ্ধ ! বলেছে তোমাকে দেখলেই মিস্টার প্যাটেল একেবারে পাগল হয়ে যাবে। শুধু বলেছে তোমাকে ড্রিঙ্ক করতে হবে, আর তাহলেই আমাদের অফিসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে !

সুমিত্রা কিছু বললে না। শুধু চুপ করে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলে—তা প্যাটেল সাহেব কবে ইন্ডিয়ায় আসবে ?

—সে খবর মিস্ সুরিটাই কেবল বলতে পারে !···তা আজও ক্লাবে যাবে তো ?

—যাবো !

—মিস্ সুরিটা আজ যদি ড্রিংকস্ অফার করে তবে রিফিউজ্ করবে না তো ?

সুমিত্রা কিছুক্ষণ ভাবলে। তারপর বললে—দু'পেগ্ খাবার পর যদি আমার মাথা ঘুরতে থাকে, তখন ?

—তখন তো আমি আছিই। আমি তো তোমার পাশেই থাকবো সব সময়। আমি তোমায় ধরে ফেলবো।

যদি বমি করে ফেলি !

সোহম্ বললে—না না, বমি হতে যাবে কেন মিছিমিছি ! খাঁটি বিলিতি স্কচ্ হুইস্কি, অনেক দামী জিনিস। যদি বমি পায় আমাকে বোল, আমি তোমায় টয়লেটে নিয়ে যাবো। কেউ জানতে পারবে না। আর তা ছাড়া আমি পকেটে করে লবঙ্গ নিয়ে যাবো, তুমি সেটা মুখে ফেলে দিও, দেখবে মাথা হাল্কা হয়ে গেছে—

সুমিত্রা স্বামীর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুমি আমায় দেখবে তো ঠিক ? আমাকে লজ্জায় ফেলবে না তো ?

সোহম্ দুই হাতে সুমিত্রার মুখখানা ধরে আদর করতে করতে বললে—তুমি বলছো কী সুমিত্রা ? আমি তোমার স্বামী হয়ে তোমাকে লজ্জায় ফেলবো ? এতদিন আমার সঙ্গে ঘর করছো, তবু তুমি এই কথা বলছো ? এতদিনেও তুমি আমাকে চিনলে না ? তোমার লজ্জা তো আমারও লজ্জা, তোমার সম্ভ্রম তো আমারও সম্ভ্রম। তুমি আর আমি কি আলাদা ? বলো, আমার কথার জবাব দাও ?

সুমিত্রা তখন সোহমের কথায় একেবারে বিগলিত হয়ে তার বুকে মুখ লুকিয়েছে। বুকের মধ্যে তেমনি মুখ রেখেই বললে—ঠিক আছে, আমি রাজি !

ককটেল-পার্টি এক অদ্ভূত জিনিস। এ জিনিসটা পৃথিবীতে কবে কে আবিষ্কার করেছিল কে জানে, কিন্তু এটা এখন কার্যসিদ্ধির একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ইংরেজি অভিধানে ককটেলের মানে লেখা আছে'—A concoction of spirituous or other liquors, used as an appetiser. যা একদিন ক্ষুধাবর্ধক হিসেবে আবিষ্কার হয়েছিল, তা-ই এখন কার্যসিদ্ধির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। যদি আমি তোমাকে আমার দলে টানতে চাই তো তোমাকে আমি আমার দেওয়া ককটেল-পার্টিতে নেমন্তন্ন করবো। দু'তিন পেগ মদ খাইয়েও যদি তুমি আমার দলে না ভেড়ো তো আরও কয়েক পেগ খাইয়ে দেব। তাতেও যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয় তাহলে একেবারে মাতাল করিয়ে দেব। মাতাল করে দিয়ে তোমাকে দিয়ে যে-কোনও কাগজে সই করিয়ে নেব।

এটা আধুনিক পদ্ধতি। এতদিন যে কাজের ফয়শলা করতে হাজার হাজার চিঠি লিখতে হতো, খোসামোদ করতে হতো, দরকার হলে ঘুষও দিতে হতো,

আজকে মাত্র এক বোতল হুইস্কি খাইয়েই সেই কাজ সমাধা হয়ে যায়।

বর্তমান যুগের এটাই হলো কার্যসিদ্ধির ডিপ্লোমেসি।

যুগ যেমন বদলায় তেমনি যুগের কার্যসিদ্ধির পদ্ধতিও বদলায়। ব্রিটিশ আমলে কোম্পানির বড় সাহেবদের বাড়িতে গিয়ে ভেট দেওয়ার নিয়ম ছিল বড় কাজের কনট্র্যাক্ট পাওয়ার জন্যে। ভেট মানে উপহার বা ঘুষ। সেই ভেটের ডালাতে থাকত ফল, টার্কি, আর সব চেয়ে দামী জিনিসটা থাকতো একটা বা দু'টো খাঁটি বিলিতি হুইস্কির বোতল।

তারপর সে-যুগ বদলে গিয়েছে। ভেট আর নেই। এখন হয়েছে কক্‌টেলের যুগ। দু'টো দেশের রাজনীতিক দলের মিলন চাই। দাও একটা পার্টি—সে-পার্টিতে খাওয়া-দাওয়া যা থাকবার তা তো থাকবেই, আসল জিনিস যেটা থাকা অনিবার্য সেটা হলো হুইস্কি বা রাম বা জিন্‌ বা বিয়ার। যার যেমন অভিরুচি।

মিস্টার এন-বি-সেন ধূর্ত মানুষ। এবং এ-যুগের মানুষ। কোম্পানি যদি সোজাসুজি পার্টি দেয় প্যাটেল ইণ্টারন্যাশন্যাল এন্‌টারপ্রাইজকে তাহলে সেটা খারাপ দেখাবে। মনে হয় ঘুষ দিচ্ছি। কিন্তু কোম্পানির অফিসার যদি পার্টি দেয় তা হলে আর সেটা ঘুষ বলা চলবে না, বলা হবে বন্ধুত্ব সৃষ্টি।

সেদিন সোহম্‌ সোজাসুজি টেলিফোন করলে মিস্‌ সুরিটাকে।

—গুড্‌ মর্ণিং মিস্‌ সুরিটা। দিস ইজ রায় স্পিকীং ফ্রম্‌ টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাকসন্‌—

—গুড্‌ মর্ণিং, গুড্‌ মর্ণিং—

—মিস্টার প্যাটেলের খবর কী? তিনি কবে আসছেন জাপান থেকে?

—আর কোনও খবর পাই নি। মনে হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যেই এসে যাচ্ছেন।

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করলে—আজ ক্লাবে দেখা হচ্ছে তো?

—আপনি যাবেন?

—সিওর। আপনি যদি যান তো আমি নিশ্চয়ই যাবো। আপনাকে যে-কথা বলেছি তা আপনার মনে আছে তো?

—মনে থাকবে না?

সোহম্‌ বললে—ক'দিন আপনি ক্লাবে যান্‌ নি বলে মনে হচ্ছে আপনি আমার প্রোপোজ্যালটা ভুলে গেছেন!

—সে কী? অত ভুলে গেলে কি প্যাটেল ইণ্টারন্যাশন্যালের কাজ চালাতে পারি?...তা মিসেস রায় কেমন আছেন?

—কোয়াইট ও-কে! আপনি এখনও ওকে ভোলেন নি দেখছি!

—ওই যে বললুম, আমি কিছুই ভুলি না। আর বিশেষ করে মিসেস রায়কে। সি ইজ্‌ সো লাভ্‌লি এ লেডী! ওঁর সঙ্গে আলাপ হলে মিস্টার প্যাটেলও খুশী হবেন।

—ডু ইউ থিঙ্ক সো?

—নিশ্চয়ই! আপনি কিন্তু মিসেস রায়কে সঙ্গে করে আনতে ভুলবেন না।

সেদিন ওঁকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। নিশ্চয়ই আনবেন।

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করলে—ওকে কেন আপনার ভালো লাগলো? ও তো এখনও ভালো করে ম্যানার্স শেখে নি।

মিস্‌ সুরিটা বললে—ওই জন্যেই তো আপনার মিসেসকে আমার অত ভালো লেগেছে। সি ইজ্‌ এ নাইস্‌ লেডী। আপনি মিসেসকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন, ভুলবেন না যেন!

সোহম্‌ বললে—ঠিক আছে, ওই কথাই রইল, বাই-বাই—

মিস্টার সেন সেদিনও তাগাদা দিলেন—ওদিকের কী খবর? মিস্টার প্যাটেল ইণ্ডিয়ায় ফিরেছেন?

সোহম্‌ বললে—না স্যার, আমি কন্‌ট্যাক্ট্‌ রেখে যাচ্ছি ওঁর পি-এ'র সঙ্গে—

—কী বলছে সে?

—বলছে তো দু'একদিনের মধ্যে ফিরবেন।

—আর আপনার মিসেস? ক্লাব-ম্যানার্স শিখে নিয়েছেন?

—আগের চেয়ে অনেকটা ইজি হয়েছে, সড়গড় হয়েছে। এখন সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়লে আর কাশি হয় না।

—গুড্‌। রোজ প্র্যাকটিস্‌ করছেন তো বাড়িতে?

—হ্যাঁ, রোজ!

—আপনি ড্রিংকের বিল্‌ কোম্পানির কাছে প্রেস করছেন তো?

—না।

মিস্টার সেন বললেন—কেন? এ খরচ তো আপনার দেবার কথা নয়। সমস্ত খরচ বেয়ার করবে কোম্পানি। আপনি ক'বোতল হুইস্কি কিনেছেন?

—বারো বোতল বাড়িতে। আর ক্লাবে অনেক বোতল। ক্লাবে সব হিসেব আছে, আমার ঠিক মনে নেই।

মিস্টার সেন বললেন—আপনি ক্লাবের বিলগুলো আমার কাছে পেশ করুন, বাড়ির জন্যে যে সব বোতল কিনেছেন তার বিলও পে করবে কোম্পানি। আপনি তো কোম্পানির ইণ্টারেস্টেই এ-সব করেছেন। আপনার পার্সোন্যাল ইণ্টারেস্টের জন্যে তো নয়।

সোহম্‌ বললে—ঠিক আছে স্যার, আমি কালকেই বিল সাবমিট করবো—

—ইয়েস্‌, ডু ইট্‌—আর সব সময় মিস্টার প্যাটেলের পি-এ'র সঙ্গে টাচ্‌ রাখবেন!

—ইয়েস স্যার। আই শ্যাল!

যখন বাধা আসে তখন বোধহয় এমনি করে বিনা নোটিশেই আসে। বড় বিচিত্র এই জীবনের যাত্রা-পথ! জীবন কখনও সোজা পথে চলতে জানে না। যেতে যেতে কখনও সে ব্লাইন্ড-লেনে গিয়ে আটকে যায়। তখন মনে হয় সে বুঝি আর চলতে পারবে না। কিন্তু কখন কোন্ গলির পথ দিয়ে কার বাড়ির উঠোন পেরিয়ে, কার বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে হঠাৎ সে ঠিক তার নিজের পথ চিনে নেয়।

সেদিন এমনি ঘটনাই ঘটলো সোহমের জীবনে। বাধা বলে বাধা!

তখন সোহম্ও হুইস্কির গেলাসে একটু চুমুক দিয়েছে, সুমিত্রাকেও সে একটু খাইয়েছে। সুমিত্রা খেতে চায়নি প্রথমে।

বলেছে—এত আগে থেকে কেন খেতে বলছো?

সোহম্ বলেছে—একটু তৈরি হয়ে যাওয়াই ভালো। মিস্ সুরিটাকে আমি কথা দিয়ে রেখেছি যে তোমাকে নিয়ে আমি ক্লাবে যাবো। সে আমাকে বিশেষ করে বলেছে তোমাকে নিয়ে যেতে—

—সত্যি আমাকে নিয়ে যেতে বলেছে?

—হ্যাঁ, তোমাকে তার খুব ভালো লেগেছে।

—সে কী? আমার কী দেখে তার ভালো লেগেছে?

সোহম্ বললে—তোমাকে ভালো লাগবে না? তোমাকে কা'র না ভালো লাগে! আমাদের মিস্টার সেন তো তোমাকে দেখে পাগল। তবুও তো তোমাকে সশরীরে দেখে নি, শুধু ফোটো দেখেছে, তাতেই ওই, চেহারা দেখলে না জানি কী হতো! মিস সুরিটার ভালো লেগেছে তোমার ম্যানার্স। তুমি নাকি খুব আন্‌সফিস্‌টিকেটড!

—তার মানে?

—আন্‌সফিস্‌টিকেটেড্ মানে সরল। তুমি খুব সরল। মানে তোমার আনাড়িপনা।

সুমিত্রা বললে—ওমা, সেটা কি আবার কারো গুণ হলো নাকি!

—সরলতা গুণ নয়?

—কিন্তু আমাকে যে আনাড়ি বলেছে! সেটা তো নিন্দে!

—নিন্দে না গো, নিন্দে না। অনেকের কাছে আনাড়িপনা একটা গুণ। যারা মদ খেতে ওস্তাদ তারা আনাড়িদের মদ খাইয়ে খুব আনন্দ পায়। তারা তাদের খুব পছন্দ করে!

সুমিত্রা বললে—তা ক্লাবে গিয়ে আমি কি খুব আনাড়িপনা করি নাকি?

—তা একটু করো বৈকি! তুমি তো এখনও এক্স্‌পার্ট হও নি!

—কী করলে এক্সপার্ট হবো?

সোহম্‌ বললে—সে তুমি আর কিছুদিন গেলে নিজেই শিখে নেবে।

—কী করে শিখে নেব? তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে?

সোহম্‌ বললে—সে তোমাকে শেখাতে হবে না। তুমি নিজেই শিখে নেবে একদিন—তুমি একটা ভালো শাড়ি পরে নেবে আজকে। যেন তোমাকে দেখে সকলের ভালো লাগে। আমি অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরবো।

বলে গাড়ি নিয়ে অফিসে চলে গেল।

সুমিত্রা সারাদিন বাড়িতে একটার পর একটা শাড়ি পরে নিজেকে আয়নাতে দেখতে লাগলো! একটা শাড়ি পরে পছন্দ হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে থাকে, তারপর আবার সেটাকে বদলে অন্য শাড়ি পরে। সেটাও পছন্দ হয় না; তখন আবার নতুন একটা শাড়ি পরে ফেলে। সারাদিন ধরে একটার পর একটা শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিহার্শাল দেয়। নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার দেখে। কিছুতেই আর নিজেকে পছন্দ হয় না তার।

কতক্ষণ যে এমনি করে কেটেছিল তার খেয়াল ছিল না সুমিত্রার। খেয়াল থাকবেই বা কি করে? এও তো এক-রকম আত্মদর্শন। নিজেকে নিজের চোখ দিয়ে যেমন দেখা, তেমনি পরের চোখ দিয়েও দেখা। পরের চোখে তাকে কেমন দেখাবে বার বার সেইটেই পরীক্ষা করছিল সে। এটা সবাই-ই চায় যে অন্য লোকের চোখে তাকে দেখতে ভালো লাগুক। অথচ আগে এমন ছিল না। নিজেকে নিজের ভালো লাগলেই চলতো। কিম্বা সোহমের তাকে দেখতে ভালো লাগবে কি না সেই কথাটাই তার প্রধান ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে সোহম্‌ তাকে নিয়ে ক্লাবে যেতে আরম্ভ করেছে সেইদিন থেকেই তার দৃষ্টিকোণ বদলে গেছে। এখন কেবল মনে হয় ক্লাবের সকলের চোখে তাকে কেমন লাগবে।

তাই যখন সোহম্‌ বাড়ি এল তখন দেখলে সুমিত্রা একগাদা শাড়ির পাহাড়ের মধ্যে বসে আছে।

জিজ্ঞেস করলে—এ কী, করছো কী?

সুমিত্রা বললে—কোন্‌ শাড়িটা পরলে আমাকে ভালো লাগবে বলো তো?

সোহম্‌ বললে—তুমি যে-শাড়িই পরবে তাতেই তোমাকে ভালো দেখাবে।

সুমিত্রা বললে—কী যে বলো তুমি। আমি তোমার বউ তো তাই আমার সব কিছু তোমার ভালো লাগে। অন্য লোকের কী রকম লাগবে তাই জিজ্ঞেস করছি তোমাকে!

সোহম্‌ সুমিত্রাকে জড়িয়ে ধরতে গেল। বললে ভালো লাগবে গো ভালো লাগবে, ক্লাবের সকলের চোখেই তোমাকে ভালো লাগবে—এসো, যাবার আগে এক পেগ খেয়ে নিই—

বলে রামকে ডাকলে—রাম

রাম এল। বললে—আমাকে ডাকলেন সাব?

—হ্যাঁ, বলছি দু'পেগ জিন নিয়ে আয় তো—জলদি, এখুনি বেরোব। আর ড্রাইভারকে বলে রাখ্‌, আমরা এখুনি বেরোব, বেশি দেরি হবে না—

ওদিকে হাওড়া স্টেশনে একটা গাড়ি এসে পৌঁছুতেই কুলিগুলো তৈরি হয়ে রইল। আর ট্রেনটা ভালো করে থামতে-না-থামতেই নামার জন্যে প্যাসেঞ্জারদের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যেই একজন ছিল কাশী দত্ত।

কাশী দত্ত অফিসের ছুটি নিয়ে সপরিবারে ভূপাল থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছুল। সঙ্গে বুড়ী মা।

মা বলেছিল - হ্যাঁ রে, এতদিন বাদে সোহমের বাড়ি যাচ্ছিস, তার আগে একটা চিঠি দিলে হতো।

কাশী দত্ত বলেছিল—নিজের মামাতো ভাইএর বাড়িতে যাবো তার আবার খবর দেবার কী আছে? আমরা কি পর? আমাদের বাড়িতে সে কতদিন থেকেছে, মামা-মামী মারা যাবার পর কত দিন কত বছর আমাদের কাছেই মানুষ হয়েছে, সে-কথা কি সে ভুলে গেছে বলতে চাও? আর তুমি নিজেই ভেবে দেখ দিকিনি তুমি কতদিন তার ভাত রেঁধেছ আর জামাকাপড়ে সাবান দিয়ে দিয়েছ! সোহম্‌টা যদি নেমোকহারাম না হয় তো সে নিশ্চয় সব মনে রেখেছে -

মা জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, তা সত্যিই সে এখন খুব বড় চাকরি করছে?

কাশী দত্ত বললে—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, আমি কি মিথ্যে কথা বলছি বলতে চাও তুমি? কত মাইনে পায় সে জানো?

—কত?

—পাঁচ হাজার টাকা। ভাবতে পারো, লেখা-পড়া কিছুছু করতো না, এগজামিনে কেবল গাড্ডু মারতো, সেই ছেলে কিনা মাইনে পাচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা, আর আমি সৎপথে থেকে তোমাদের দু বেলা পেট ভরে খাওয়াতে-পরাতে পারি না। ভগবানের কী বিচার দেখেছ?

মা বলেছিল—ও-সব নিয়ে তুই কিছু মন খারাপ করিস নি বাবা!

কাশী দত্ত বলেছিল—মন খারাপ করবো না মানে? তুমি বলছো কী মা? আমি যদি সেদিন ওকে আমার বাড়িতে রেখে না খাওয়াতুম তো ও বাঁচতো? ও কত ভাত খেতো তা মনে আছে তো তোমার? একটা জ্যান্ত রাক্ষস ছিল ও। রোজ ওর ভাতে কম পড়তো তা ও ভুলে যেতে পারে বটে, কিন্তু আমি কি ভুলে যেতে পারি?

তারপর একটু থেমে আবার বলেছিল—অথচ আমি ওর সঙ্গে ঝগড়াও করি নি বিবাদও করি নি। শুধু বলেছি তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। তা অন্যায়টা আমি কী বলেছি, তুমিই বলো? চালের দাম বাড়ছে, জিনিস পত্তোরের যা দাম বাড়ছে তাতে আমার ঘাড়ে বসে বসে খাবে আর বছর বছর এগ্‌জামিনে ফেল করবে, এ আমি ছাড়া আর কেউ সহ্য করবে?

মা বলেছিল—হ্যাঁ রে, সত্যিই সে এখন পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে? তুই ভুল শুনিস নি তো?

কাশী দত্ত বলেছিল—তার অফিসের লোকরাই তো বললে। আমি কী করে জানবো? আর ওই পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পেয়ে এত অহঙ্কার হয়েছে যে আমি তার ঘরে দেখা করবার জন্যে স্লিপ্ পাঠালুম, তা দেখাই করলে না আমার সঙ্গে। চাপরাসীকে দিয়ে বলে পাঠালে—দেখা করবার সময় নেই—

মা বলেছিল—তা বেশি কাজ থাকলে দেখা করবার সময় হবে কী করে? তার দোষ কী?

এ-সব কথা ভুপালেই হয়ে গিয়েছিল। তারপর মা-ই বলেছিল—চল্ না অফিস থেকে ছুটি নিয়ে একবার কলকাতায় সোহমের বাড়ি যাই। আমি গেলেই দেখবি একেবারে কত ভালো ব্যবহার করবে। ছোটবেলা থেকেই ও তো আমার কাছেই মানুষ, আমার চেয়ে কি তুই ওকে বেশি চিনবি?

সেই কথা অনুযায়ী কাশী দত্ত অফিস থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিলে। ট্রেন এসে হাওড়া স্টেশনে পেঁছুতেই সোজা ট্যাক্সি নিয়ে সোহমের বাড়ির দিকে রওনা দিলে। ঠিকানাটা আগের বারেই জিজ্ঞেস করে রেখেছিল। সঙ্গে বিধবা মা। বউ আর ছেলেমেয়ে ভুপালে রেখে এসেছে।

ট্যাক্সিটা যখন সোহমের বাড়ির সামনে গিয়ে থামলো তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

মা ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে চেয়ে বললে—ওমা, সোহমের কি এত বড় বাড়ি?

কাশী দত্ত তখন ট্যাক্সি থেকে বাক্স বিছানা ঝুলি-ঝোলা নামাতে ব্যস্ত। বললে—হ্যাঁ, এই বাড়িরই একটা ফ্ল্যাটে থাকে সে—

আশেপাশে কোনও লোকজন ছিল না। কাশী দত্ত ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে নিজেই দু'হাতে দুটো মাল নিয়ে গেট দিয়ে ঢুকে সামনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

ওপরের একটা দরজার ওপর পেতলের ট্যাবলেটে লেখা—এস রায়।

কাশী দত্ত কলিং-বেল্-এর বোতামটা টিপে দিলে। টিপতেই একজন চাপরাসী শ্রেণীর লোক এসে দরজা খুলতেই কাশী জিজ্ঞেস করলে—সোহম্ রায় বাবু আছেন?

চাপরাসীটা বললে—হ্যাঁ সাহেব আছেন, কী নাম বলবো বলুন?

—বলো গিয়ে ভুপাল থেকে তোমার সাহেবের পিসীমা এসেছেন, আর সঙ্গে এসেছে পিসতুতো ভাই কাশী দত্ত—

চাপরাসীটা কথা শুনে ভেতরে চলে গেল সাহেবকে বলতে।

দু'হাতে দু'টো বোঝা। বোঝা দু'টো মেঝের ওপর রেখে সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

মা বললে—দাঁড়ালি কেন, ভেতরে ঢোক্—

কাশী দত্ত বললে—আগে চাপরাসীটা আসুক, সাহেব কী বলে শুনি, তবে তো ঢুকবো। নইলে তোমার ভাইপো যদি রেগে যায়।

কথাটা শুনে পিসীমা আর কিছু বললে না। সেইখানে দাঁড়িয়েই ভাইপোর হুকুমের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। সমস্ত দিন-রাত ট্রেনের ধকলে কেটেছে, শরীর আর বইছে না তখন। নিজের ভাইপো, তার বাড়িতে ঢুকতেও এত সংকোচ! তবে কি কাশী যা বলেছে তাই-ই ঠিক? কিন্তু না, মা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, ভেতরে ঢুকে পড়লো। ডাকতে লাগলো—সোহম্, ওরে সোহম্ রে—

ভেতর-বাড়িতে তখন সুমিত্রার একটু একটু নেশা হয়েছে।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? মাথা ঘুরছে নাকি?

সুমিত্রা বললে—বেশি না, একটু একটু—

সোহম্ বললে—এরই মধ্যে মাথা ঘুরছে? সবে তো এক পেগ খেয়েছ!

সুমিত্রা বললে—এখন আর খাবো না, এর পর ক্লাবে গিয়ে তো আরো খেতে হবে! তখন যদি টলে পড়ে যাই? এখন একটু কম খাওয়াই ভালো।

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, আজকে একটু সাবধানে থাকবে। সব সময়ে আমার কাছাকাছি থাকবে। আজ মিস্ সুরিটাকে ক্লাবে আসতে বলেছি।

এমন সময় দরজার কলিং-বেলটা বেজে উঠলো।

চাপরাসী গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে শব্দ এল—সোহম্, ওরে সোহম্ রে, তোরা সব কোথায়?

বলতে বলতে একেবারে পিসীমা ডাইনিং-রুমের ভেতরে এসে হাজির।

পিসীমাকে ওই ভাবে না-বলে না-কয়ে আসতে দেখে সোহম্ একেবারে অবাক।

একদিন তার দুর্দিনে যখন সোহম্ চোখের সামনে অন্ধকার দেখেছিল, যখন পৃথিবীর কোনও কোণে কোথাও মাথার ওপর ছাদ বলে কোনও বস্তু ছিল ন, তখন এই পিসীমাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল—কাঁদিস নে বাবা, আমি তো আছি, আমি থাকতে তোর ভয় কী?

আর শুধু কি তাই? পিসীমা যখন তাকে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছিল তখন সেই ছেলেবয়েসেই দুঃখে-শোকে শান্তি দিয়েছে। তাকে সংসারের সব রকম কাজ করতে হতো; বাজার করা থেকে আরম্ভ করে ঘর ঝাঁট দেওয়া পর্যন্ত সব কিছু। পিসেমশাইয়ের ছিল তামাক খাওয়ার নেশা। পিসেমশাইয়ের তামাক সাজা ছিল তার নিত্য কাজ। তাতেও সোহম্ কোনও দিন কোনও রকম প্রতিবাদ করেনি। অনেক দিন এমন হয়েছে যখন তামাক সাজতে দেরি হয়েছে বলে পিসেমশাই তাকে বকেছে, লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে সে, তখন ওই পিসীমাই ধমক দিয়েছে পিসেমশাইকে- ওকে কি তোমরা বাড়ির মাইনে করা চাকর পেয়েছ,

কেবল দিন-রাত সকলের হুকুম তামিল করবে? সব সময় ও যদি এই সব কাজই করে তাহলে ইস্কুলের লেখা-পড়া করবে কখন?

পিসীমার কথা শুনে সোহম্ তখন আরো জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতো।

পিসীমা তাকে তখন বুকের ওপর আরো জোরে জড়িয়ে ধরে আদর করতো। বলতো—সবাই পেয়েছে কী, তোর কেউ নেই বলে ভেবেছে ওরা যা ইচ্ছে তাই করবে? আমি তো মরে যাইনি, দাদা আমার জন্যে কত করেছে সে সব কথা যদি আমি ভুলে যাই তো নরকেও যে আমার ঠাঁই হবে না।

কিন্তু পরে সেই পিসীমারই আবার অন্য রকম চেহারা হয়ে গেল। তখন পিসেমশাই মারা গিয়েছে, বিধবা হয়েছে পিসীমা। আর ছেলে কাশী দত্ত তখন চাকরি করে সংসার চালাবার খরচ যোগাচ্ছে।

তখন পিসীমা ছেলের হাতের পুতুল। যেদিন কাশী দত্ত তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তখন পিসীমার মুখ থেকে প্রতিবাদের ভাষাও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

আজ এতদিন পরে সেই পিসীমাকে তার বাড়িতে আসতে দেখে সোহম্ রীতিমত অবাক হয়ে গেল।

বললে—পিসীমা, তুমি হঠাৎ?

ততক্ষণে পিসীমা সমস্ত পরিস্থিতিটা দেখে নিয়েছে। কাশী দত্তও ঘরে ঢুকে সব দেখলে, কিন্তু কিছু বললে না। শুধু বাড়িটার ভেতরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। যাকে একদিন সে তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তার আজ এই অবস্থা। অফিসে গিয়েও দেখে এসেছে সোহমের পদ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির বহর। তার ঘরে ঢুকতেই দেয়নি কাশী দত্তকে, এত অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। যখন কলকাতা থেকে ভুপালে ফিরে গিয়ে মাকে সব কথা বলেছিল, তখন মা বলেছিল—তুই কিছু মনে করিসনি রে, সোহম্ আমার সে রকম ছেলে নয়, নিশ্চয়ই তোকে চিনতে পারেনি। নইলে কি আর দেখা করতো না ভেবেছিস?

কাশী দত্ত বলেছিল—তুমি বলছো কী আমাকে চিনতে পারেনি? আমি নিজের নাম স্লিপে লিখে পাঠালাম আর তুমি বলছো চিনতে পারেনি? আসলে পাঁচ হাজার টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে একেবারে অহংকারে ফেটে পড়ছে। আমাকে আর মানুষ বলেই মনে করতে চায় না আর কী! লেখা পড়া কিছু শেখেনি তো! একেবারে গো মুখ্যু যে!

পিসীমা বলেছিল—কী যে বলিস তুই? তাই কখনও হতে পারে

কাশী দত্ত বলেছিল—আমিও তো তাই ভেবেছিলুম। হাজার হোক নিজের আপন পিসতুতো ভাইকে যে কেউ এ-রকম অপমান করতে পারে তা আমি তো কল্পনাও করতে পারিনি।

পিসীমা বলেছিল--তা তারই বা কী দোষ বল্! আমরা তো একদিন ওকে এক-কাপড়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম, সে-কথা হয়ত এখনও তার মনে

আছে! তা তুই ওর আপিসে গিয়েছিলিই বা কেন? তোর কিসের দরকার ছিল ওর সঙ্গে দেখা করবার?

—বা রে, কলকাতায় গিয়েছি এতদিন পরে, হঠাৎ মনে পড়লো তাই গেলুম। ভাবলুম আমাদেরই একজন নিকট-আত্মীয় বড় হয়েছে, তাই একবার দেখা করে যাই। আমি তার কাছে চাকরি চাইতেও যাইনি, টাকা চাইতেও যাইনি, কি ভিক্ষেও চাইতে যাইনি। একজন আত্মীয় আর একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় না? দেখা করতে যাওয়াটা কি আমার অপরাধ হয়ে গেল?

পিসীমা বলেছিল—যাক্ গে, ওকথা মনে পুষে রেখে তুই মন খারাপ করিস নি। এবার আমি যদি কখনও কলকাতায় যাই তো দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

এ-সব কথা অনেক আগেকার।

তারপর বহু দিন-মাস-বছর কেটে গেছে, সোহম্ ও-সব তুচ্ছ কথা মনেও রাখেনি। আর তা ছাড়া সে বরাবরই নিজের ছাড়া আর কারোর কথাই ভাবে না। শুধু বোঝে নিজের অফিস নিজের চাকরির উন্নতির কথা। আজকাল দুনিয়ায় চারদিকে এত প্রতিযোগিতা, এত ভিড়, এদের সকলকে টপ্‌কে কী করে সকলের মাথায় ওঠা যায় সেই চিন্তা করতেই মানুষের দিন-রাত-মাস-বছর কেটে যায় তা পরের কথা ভাববার সময় কোথায়? আর কাশী দত্তরা তো সোহমের কাছে পোকা-মাকড়ের মতন। কাশী দত্তর কথা মনে রাখবে এত বড় বেকুব নয় সোহম্।

তাই সোহম্ পিসীমা আর কাশী দত্তকে হঠাৎ তার বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

আবার বললে—পিসীমা তুমি? হঠাৎ?

পিসীমা আর কী বলবে। তাই বললে—অনেক দিন তোকে দেখিনি, তাই কাশী যখন কলকাতায় আসার কথা বললে তাই ভাবলুম আমিও তোর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

—তুমি কোথায় উঠেছ, এখানে?

পিসীমা বললে—কোথায় আর উঠবো, তুই ছাড়া এখানে আমাদের আপনার জন আর কে আছে। হাওড়া ইস্টিশান থেকে তাই সোজা একেবারে তোর কাছেই এসেছি—

-আমার কাছে?

পিসীমা বললে—হ্যাঁ রে, তুই আমাদের একেবারে ভুলে গেছিস! কাশী বলছিল তোর চাকরিতে নাকি খুব উন্নতি হয়েছে। তুই নাকি পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাস? আহা, দাদা-বৌদি বেঁচে থাকলে তাদের খুব আনন্দ হতো! তারা কেউ দেখে যেতে পারলে না।

কাশী এতক্ষণ পিসীমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সব কথাই শুনছিল, কিছু বলেনি। এবার বললে—তোরা কোথাও বেরোচ্ছিস নাকি?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, ক্লাবে যাচ্ছি—

—ক্লাবে? তার মানে?

পিসীমা ইংরিজী বোঝে না। তবু কিছু বলতে যাচ্ছিল।

কাশী বললে—তুমি চুপ করে থাকো না মা, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলো কেন ?

সোহম্ বললে—আমাদের অফিসের নিয়ম সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে যেতে হবে।

পিসীমা জিজ্ঞেস করলে—সেখানে যেতেই হবে ? সাহেবকে বলে ছুটি নিতে পারিস নে ?

কাশী বললে—আঃ, তুমি চুপ করো না মা।

তারপর সোহমের দিকে চেয়ে বললে—তুই একলাই যাবি না বউমাও যাবে—?

সোহম্ বললে—না, আমরা দু'জনেই যাবো।

এতক্ষণে পিসীমা সুমিত্রাকে দেখতে পেয়েছে যেন।

বললে—ওমা, তাই তো, বুড়ো হয়ে চোখের মাথাও খেয়েছি। আমার বউমা দাঁড়িয়ে রয়েছে তা আমি পোড়া চোখে দেখতেও পাইনি—

বলে সোজা একেবারে সুমিত্রার সামনে গিয়ে তার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে আদর করলে। বললে—ওমা, কী লক্ষ্মী বউ হয়েছে তোর, যেন ঠিক পটে আঁকা বিবি—

কথাটা বলেই পিসীমা মাঝপথে থেমে গেল।

বললে—এ কি বউমা, তোমার মুখ দিয়ে হোমোপ্যাথি ওষুধের গন্ধ বেরোচ্ছে কেন মা ? তোমার কী অসুখ হয়েছে ?

ব্যাপারটা বেশি দূরে না গড়ায় তাই সোহম্ মাঝপথে বাধা দিয়ে বললে—আমরা এখন যাই পিসীমা, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে ওদিকে—ঠাকুর চাকর সবাই আছে, তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না—

—আমরা কোন্ ঘরে থাকবো ?

সোহম্ বললে—সেসব তোমাদের ভাবতে হবে না—ওরাই সব ব্যবস্থা করে দেবে—

বলে ঠাকুরকে ডাকলে। ঠাকুর এলে তাকে সোহম্ বললে—ঠাকুর ইনি হলেন আমার পিসীমা, আর এই আমার পিসতুতো দাদা। বদ্রিকে বলে ওই পশ্চিমের ঘরে এঁদের শোবার ব্যবস্থা করবে, এঁরা এখানে কদিন থাকবেন, আমাদের যদি ফিরতে দেরি হয়, আমরা ক্লাব থেকেই খেয়ে আসবো, এঁদের খাবারের বন্দোবস্ত করে দিও, কিছু যেন বলতে না হয়—

ঠাকুর সব শুনে চলে গেল। ওদের বললে—আপনারা আমার সঙ্গে আসুন—

সোহম্ পিসীমার দিকে চেয়ে বললে—আপনারা ঠাকুরের সঙ্গে যান, ওরা আপনাদের ঘর দেখিয়ে দেবে। আপনাদের যা খেতে ইচ্ছে হয় ওকে বলবেন, ওরা সব ব্যবস্থা করে দেবে—

পিসীমা বললে—তাহলে তোমার সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে বাবা ?

সোহম্ বললে—আমাদের ফিরতে রাত হলে কাল সকালে দেখা হবেই। আর যদি সকাল সকাল ফিরি তো আজ রাত্তিরেই দেখা হবে। তা আমরা থাকি আর না থাকি বদ্রি রইল, ঠাকুর রইল, আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না—

পিসীমারা চলে যেতেই সোহম্ সুমিত্রাকে বললে—নাও নাও, তাড়াতাড়ি

তৈরি হয়ে নাও—

সুমিত্রার তারই মধ্যে একটু নেশা হয়ে গিয়েছিল।

বললে—এ কী বিপদ হলো বলো দিকিনি, ঠিক এই সময়েই কিনা ওদের আসতে হয়?

সোহম্ বললে একটু আস্তে বলো, ওরা শুনতে পাবে!

সুমিত্রা বললে—বা রে, তুমি তো আশ্চর্য মানুষ। তুমিই আমাকে মদ খেতে শেখাচ্ছে আর বলছো ওরা জানতে পারবে! তা এটা যদি খারাপ কাজ না হয় তো জানতে পারলে কী দোষ? তুমিই তো বলেছ শিব ঠাকুরও গাঁজা-ভাঙ্-সিদ্ধি খায়। ঠাকুরের বেলায় নেশা করলে দোষ হয় না, আর যত দোষ হয় মানুষরা খেলে?

সোহম্ বললে—অত চেঁচিও না, শুনতে পাবে—চলো, শিগ্গির তৈরি হয়ে নাও, বেরিয়ে পড়ি—

সুমিত্রা বললে—কিন্তু তোমার পিসীমা?

সোহম্ বললে—ওদের ব্যবস্থা তো তোমার সামনেই করে দিলুম!

—কিন্তু ওরা আমাদের বাড়িতে কতদিন থাকবে—তুমি জিজ্ঞেস করলে না কেন?

সোহম্ বললে—এখন জিজ্ঞেস করলে কী মনে করবে! পরে জিজ্ঞেস করা যাবে। আমার তো ছোটবেলায় বাবা-মা মারা যায়, তখন ওই পিসীমাই আমাকে নিজের ছেলের মত করে মানুষ করেছিল, সে-কথা কি আমি ভুলতে পারি? সেদিন যদি পিসীমা আমাকে ওদের বাড়িতে আশ্রয় না দিত তো আমাকে হয়ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেট চালাবার জন্যে ভিক্ষে করতে হতো। তবে ওই পিসতুতো দাদাটা বড় বদমাইশ।

—বদমাইশ? তার মানে?

সোহম্ বললে তুমি জানো না, আমি ছোটবেলায় বেশি ভাত খেতুম, সেই জন্যে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। রাত তখন দশটা। সেই রাত্তিরে আমাকে পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল—

—তারপর?

—তারপর সে অনেক কথা। আমি যে তখন কত কষ্ট করেছি, লুকিয়ে লুকিয়ে কত চোখের জল ফেলেছি তা কেউ জানে না। লোক শুধু সাক্সেস্টাই দেখে, কিন্তু সেই সাক্সেসের পেছনে যে কত কান্না লুকিয়ে থাকে সেটা কেউ দেখতে পায় না, দেখতে চায়ও না—

একটু পরেই সুমিত্রা তৈরি হয়ে নিলে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে একতলায় রাস্তায় গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

সোহম্ তখনও বলে চলেছে—দেখ সুমিত্রা, সাক্সেস্ বড় আজব জিনিস, এর জন্যে চিরকাল স্ট্রাগল করে এসেছি, আর এখনও স্ট্রাগল করে চলেছি। এই সাক্সেস্‌ই সবাই চায়। যারা সাক্সেস্ পায় না তারা খাঁটি বন্ধুও পায় না, খাঁটি শত্রুও পায় না। আর যারা সত্যিকারের সাক্সেস্ পায় তারা সত্যিকারের বন্ধুও পায় আর সত্যিকারের শত্রুও পায়—

—তোমার আবার শত্রু কে?

কী বলছো তুমি? আমার শত্রু নেই? আজ টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাক্‌সন্‌ কোম্পানির লেবার ইউনিয়নের সবাই আমার শত্রু। তারা মনে করে আমি কোম্পানির দালাল।

আর বন্ধু? বন্ধু কে?

সোহম্‌ বললে—তুমি—আমি যা তোমাকে করতে বলেছি তুমি তাই-ই করছো—তুমিই বলতে গেলে আমার সব!

সুমিত্রার গলা তখন একটু-একটু করে জড়িয়ে আসছিল। বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি তো বাইরের লোক নই।

সোহম্‌ বললে—বাইরের লোকের মধ্যে বন্ধু বলতে যারা, তারাই তো আমাদের বাড়িতে আজ এল। ওরা কেমন করে টের পেয়েছে যে আমার টাকা হয়েছে বা আমার ক্ষমতা হয়েছে, তাই এতকাল পরে ঠিকানা খুঁজে আমার বাড়িতে এসেছে। অথচ যখন আমি একটা থার্ড ক্লাস মেসে দিন কাটাচ্ছি, তখন ওরা কেউ খবরও নিতে আসেনি আমার কী করে চলছে।

তারপর একটু থেমে বললে—তবে একজন সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী আছে আমার, তাঁর কথা তোমায় অনেকবার বলেছি। তিনি হচ্ছেন ক্ষেত্রবাবু। তিনি আমার সাক্‌সেস্‌ দেখে আমাকে ভালোবাসেন নি। তিনি চিঠি না লিখে দিলে এ-অফিসে আমার চাকরিই হতো না। একদিকে তাঁর আশীর্বাদ আর একদিকে আমার হাত-যশ। এই-ই হচ্ছে আমার জীবনের মূলধন।

—আর আমি?

তোমার কথা তো আমি আগেই বলেছি। তুমি আমি কি আলাদা?

বলে সোহম্‌ নিঃশব্দে একটু আদর করলে সুমিত্রাকে। ড্রাইভার তা জানতে পারলে না।

এইবার গাড়িটা গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের গেটের সামনে এসে হাজির। সাহেবের গাড়ি দেখেই দারোয়ান স্যালুট দিলে মিলিটারি কায়দায়। গাড়িটা ক্লাবের সামনের মাঠে গিয়ে ঢুকলো। তারপর একেবারে পোর্টিকোর তলায় গিয়ে ব্রেক কষলে।

সোহম্‌ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর কাশী দত্ত বললে—মা, দেখলে তো সব? আমি যা-যা বলেছিলুম সব সত্যি কিনা?

মা তখন ফ্ল্যাটটার ভেতরে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কী চমৎকার সাজানো ঘরটা। আহা, এমন ঘর খোকার নেই। ভূপালে যে-বাড়িতে কাশী থাকে তার ভেতরে কী নোংরা! সে-বাড়ির তুলনায় এ-বাড়ি যেন স্বর্গ!

কাশী জিজ্ঞেস করলে—অমন করে অবাক হয়ে কী দেখছো মা তুমি ?

মা বললে দেখছি কী চমৎকার বাড়ি করেছে সোহম্ ! তোর এই রকম একটা বাড়ি হলে খুব ভাল হতো !

কাশী বললে তুমি শুধু সেইটেই দেখলে, আর তোমার নাকে কিছু গন্ধ পাওনি ?

মা কিছু বুঝতে পারলে না। বললে—গন্ধ ? কীসের গন্ধের কথা বলছিস ?

তারপর মনে পড়ে গেল যেন। বললে হ্যাঁ হ্যাঁ, যেন হোমোপ্যাথি ওষুধের গন্ধ নাকে আসছিল বটে—

কাশী বললে—হোমিওপ্যাথি ওষুধের গন্ধ বলছো কেন ? ওটা তো হচ্ছে মদের গন্ধ

—মদের গন্ধ ?

শুনে মা চমকে উঠলো। আবার বললে—মদের গন্ধ আবার কোত্থেকে আসতে যাবে ? ও তো হোমোপ্যাথি ওষুধের গন্ধ রে। আমি হোমোপ্যাথি ওষুধের গন্ধ চিনি নে ?

কাশী বললে তুমি কিছুছু বোঝ না মা, দেখলে না টেবিলের ওপর দু'টো মদের গেলাস ছিল, গেলাসের ভেতরে আধ খাওয়া সোনালি রং-এর মদ। আমরা যখন এলাম তখন ওরা দু'জনে মদ খাচ্ছিল !

—মদ ? তুই ঠিক বলছিস ? বউমাও মদ খাচ্ছিল ?

কাশী বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে আর বলছি কী ? সোহম্ নিজে মদ খাচ্ছে খাক্, কিন্তু এমন হারামজাদা যে নিজের বউটাকে পর্যন্ত মদ ধরিয়েছে—

মা বললে—না না, তুই ওকে অমন করে গালাগাল দিসনে। মদ খাক্ আর যা-ই খাক বাপু, বাড়িটা কিন্তু বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে। তোর বাড়ির মতন হতচ্ছিরি নয়।

এমন সময় একটা লোক ঘরে ঢুকলো। সেই বামুন ঠাকুরটা।

বামুন ঠাকুর জিজ্ঞেস করলে—আজ রাত্তিরে আপনারা কি খাবেন মা ? ভাত না রুটি ? যা বলবেন আমি সেই রকম রান্না করবো।

মা বললে—আমি বাপু বিধবা মানুষ, আমার আঁষ রান্না চলবে না। আর আমার ছেলের জন্যে তোমাদের যা আছে তাই-ই কোর। ও সব খায়, মাছ মাংস মুরগী, সব—

—রুটি না ভাত ?

—রুটি রুটি। রাত্তিরে আমরা রোজ রুটিই খাই। তোমার সায়েব আর মেমসায়েব কী খাবে ?

ঠাকুর বললে—সায়েব আর মেমসায়েব আজ দু'জনের কেউই বাড়িতে খাবেন না, বলে গেছেন। শুধু আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে গেছেন।

কথাগুলো বলে ঠাকুর চলে যাচ্ছিল।

কাশী আবার ডাকলে। বললে—ঠাকুর শোন—

ঠাকুর যেতে গিয়েও থমকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। অর্থাৎ—বলুন—

কাশী জিজ্ঞেস করলে—তোমার সাহেব আর মেমসাহেব রোজই মদ খায় নাকি ?

ঠাকুর তো অবাক এই প্রশ্ন শুনে। কিছুক্ষণ তার মুখে কোনও কথা যোগালো না। তারপর বললে—কী জানি বাবু, আমি তো রান্নাঘরে থাকি, বদ্রির জানে, বদ্রিরই বাইরের কাজগুলো করে—

কাশী আবার জিজ্ঞেস করলে—তা কত মাইনে পায় তোমার সাহেব তা বলতে পারো ?

—তা বলতে পারি না বাবু—

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে। যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকেই চলে গেল।

সেই কোথায় কত দূরে ভুপাল আর কোথায় এই কলকাতা! অনেক দূরের রাস্তা। ট্রেনে আসতে আসতে পিসিমার মনে হয়েছিল এ রাস্তা বুঝি আর শেষ হবে না। তার ওপর মনের কোণে একটা সংকোচ ছিল। সোহম্ কেমন করে তার পিসিমাকে গ্রহণ করবে কে জানে! এখন নাকি অনেক বড়লোক হয়েছে। পাঁচ হাজার টাকা মাইনে হয়েছে। তার নিজের ছেলে সব মিলিয়ে পাঁচশো টাকাও হাতে পায় না। আর সেই বাপ মা মরা ভাইপোটা কিনা এত বড়লোক হয়েছে!

চলন্ত ট্রেনের মধ্যে এমন কথাগুলো পিসিমার মাথায় ঘুর-ঘুর করছিল।

আহা, কাশীটার যদি এমনি একটা চাকরি হতো। আর কাশীর বউটাও যেমন হয়েছে! কোনও কাজের যদি ছিরি থাকে বউমার। কেবল বছর-বছর ছেলেই বিয়োতে পারে!

তারপর হাওড়ায় ট্রেনটা পাঁচ ঘণ্টা দেরিতে এসে পৌঁছেছে। সারাদিন খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়নি। বিধবা মানুষ, ট্রেনে উঠে জলস্পর্শ করাও নিষেধ। তারপরে একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা এই বাড়িতে। এখানে এসেই এই দৃশ্য।

সোহমের ঠাকুরটা যা হোক রাঁধে ভালো।

পিসিমা জিজ্ঞেস করে যাচাই করে নিয়েছিল—হ্যাঁ গা বাছা, তুমি বামুন তো ?

ঠাকুর এ-প্রশ্ন শুনে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—হ্যাঁ মা, আমি বামুনের ছেলে, পেটের দায়ে পরের বাড়ি রান্নার কাজ করি, এই দেখুন না আমার পৈতে—

বলে গেঞ্জির তলায় নিজের পৈতেটা দেখালে।

পিসিমা ঠাকুরের গলার পৈতে দেখে আশ্বস্ত হলো। বললে—ঠিক আছে, আমি বিধবা মানুষ, আমার খাবারটা যেন অন্য খাবারের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, দেখো—

ঠাকুর বললে—হ্যাঁ মা, আমি দেখবো, আপনার জন্যে আমি আলাদা রান্না করবো। আমিষের রান্নার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হবে না—

ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে পিসিমা আবার তার নিজের ঘরে এল। কাশী দত্ত তখনও অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখছে। চারদিকেই কেবল ঐশ্বর্যের ছাপ। যে-ঘরে তার আর তার মা'র শোবার বন্দোবস্ত হয়েছে তারই পাশে আর একটা তক্তপোশে তার নিজের বিছানা করে দিয়েছে বদ্রি।

বদ্রি বললে—আজকে এই ঘরে আপনারা শোবেন দাদাবাবু—

কাশী দত্ত জিজ্ঞেস করলে—আর তোমার সাহেব—আর মেমসাহেব? তারা?

বদ্রি বললে—সাহেবের নিজের আলাদা শোবার ঘর আছে।

তারপর একটু থেমে বদ্রি বললে—রান্না কেমন হয়েছে? খেতে ভালো লেগেছে আপনাদের?

পিসিমা বললে—খুব ভালো। তোমাদের ঠাকুরের রান্না খুব ভালো। তোমার সাহেবকে বলে দিও আমাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না—

বদ্রি জিজ্ঞেস করলে—সকাল বেলা কটার সময় আপনাদের চা দিতে হবে?

পিসিমা বললে—আমরা কেউ চা খাইনে বাবা, আমিও চা খাই না আমার ছেলেও চা-টা খায় না—তুমি বাবা অনেক কষ্ট করেছ আমাদের খাওয়া-শোওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্যে, তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাই না, তুমি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো গে যাও—

বদ্রি চলে গেল।

মিস্টার ভানুভাই প্যাটেল গুজরাট প্রদেশের লোক। এককালে ভীষণ গরীব ছিল। অনেকদিন খেতে পায়নি, এমন অবস্থাও গেছে। লেখা-পড়া করবার সুযোগ বেশি পায়নি জীবনে। বাবা মারা গিয়েছিল ছোট বয়েসেই। একমাত্র মা'ই তাকে কষ্টে-সৃষ্টে মানুষ করেছিল। সেই মা'ই যখন হঠাৎ একদিনের জ্বরে মারা গেল তখন প্যাটেল সাহেব চোখে অন্ধকার দেখলো। তারপর আর লেখাপড়া হলো না। সেদিন মনে হয়েছিল তার বেঁচে থাকা বুঝি একেবারে চিরদিনের মত অর্থহীন হয়ে গেল।

কিন্তু না, মানুষের বিধাতা-পুরুষ কখন কা'র মধ্যে দিয়ে যে তাঁর নিজের ইচ্ছে পূরণ করেন তা বোধহয় কোনও জ্যোতিষীর সাধ্য নেই যে বলে! তাই যখন কোনও দিকে কোনও আশার আলো দেখতে পেলে না প্যাটেল সাহেব, তখন লুকিয়ে কাউকে কিছু না বলে বোম্বাই প্রদেশে চলে গেল। সেখানে কাজ জুটলো একটা ইরানী হোটেলে। ইরানী হোটেলের কাজ হলো বাসন ধোওয়া-মোছা আর ঘরদোর পরিষ্কার করা। তার মত আরো অনেক ছেলে ছিল সেখানে। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তার খুব আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল।

দু'জনেরই কেউ নেই। যখন অনেক রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়তো তখন দু'জনে চুপি চুপি গল্প হতো। দু'জনেরই ঘুম আসতো না।

বন্ধুটার নাম পবন যোশী।

যোশী বলতো—জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল রে।

প্যাটেল বলতো—আমার জীবনটাও বরবাদ হয়ে গেল। সারা জীবন এই বাসন মাজা আর ঘর ঝাড়-পোঁছ করতেই জীবন কেটে যাবে দেখছি—

যোশী জিজ্ঞেস করতো—দুনিয়ায় তোর আপনার বলতে কে আছে ?

প্যাটেল বলতো—কেউ নেই, এক মা ছিল, সেও মারা গেছে—

পবন যোশী বলতো—আমারও কেউ নেই ভাই। আয় দু'জনে মিলে একটা মতলব ভাঁজি—

—কী মতলব ?

যোশী বলতো—চল্, আরব দেশে পালিয়ে যাই। বাঁচলে সেখানেই বাঁচবো আর মরলে সেখানেই মরবো। শুনেছি সে-দেশে অনেক টাকা! শুয়ে ঘুমিয়ে থাকলেও পকেটে নাকি হাজার-হাজার টাকা ঢুকে যায়!

—কে বললে ?

—আমার এক দোস্ত্ বলেছে। সে বলেছে সেখানে যদি কোনও রকমে যেতে পারি তো আমি লাখপতিয়া হয়ে যাবো।

—কিন্তু কী করে যাবি সেখানে ? অত টাকা কোথায় পাবি ? যাবার জাহাজ ভাড়া তো লাগবে!

তখন আর কত বয়েস দু'জনের। বারো কী তেরো। একটা পয়সা পকেটে নেই কারো, শুধু ছেঁড়া চারপাইতে শুয়ে লাখপতিয়া হওয়ার স্বপ্ন দেখা।

আজকের 'প্যাটেল ইণ্টারন্যাশন্যাল এন্টারপ্রাইজে'র মালিকের সূত্রপাত যে এইভাবে হয়েছিল এ-কথা কি কেউ কল্পনা করতে পারবে ?

কিন্তু সত্যি যা তা অনেক সময় কল্পনাকেও হার মানায়। সেই পবন যোশী একদিন হঠাৎ বোম্বাই-এর ইরানী হোটেল থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আর কোনও পাত্তা নেই তার। একজন বন্ধু যাও বা জুটেছিল তাও হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেল। একলা-একলা প্যাটেল নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিত। আর রাত্রে নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সমস্ত রাত জেগে কাটাতো।

যারা বোম্বাইতে গিয়েছে তারা জানে বোম্বাই কলকাতা নয়। বোম্বাই হলো বোম্বাই। ইণ্ডিয়ার অন্য কোনও শহরের সঙ্গে তার মিল নেই। বোম্বাইতে কেউ কারো নয়। তুমি তোমার আমি আমার। তার বেশি কিছু চাইতে যেও না। চাইলে হতাশ হতে হবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে এক বছরের মধ্যেই হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল।

কাণ্ডটা আর কিছু নয়। পবন যোশীর একটা চিঠি এসে হাজির হলো তার নামে। পবন যোশী চিঠিতে লিখেছে—'আমি কোনও রকমে ভাসতে ভাসতে অনেক দেশ ঘুরে এই দেশে এসে পেঁছেছি। এ দেশের নাম কোয়েত্। এখানে টাকা ছড়ানো আছে। তুই এখানে চলে আয়। আমি এখানে একটা লোকের বাগানে মালীর কাজ করি। মাইনে পাই দু' হাজার টাকা। তুই যে কোনও রকমে একটা জাহাজে চড়ে এখানে চলে আয়। তোরও চাকরি হয়ে যাবে।

এখানে আসবার সময় জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বি। তারপর সাঁতার কেটে কোনও রকমে পাড়ে উঠবি। একবার এসে পড়লে আর কোনও ভয় নেই। তারপর আমি তোকে খুঁজে নেব। আমিও এই রকম করেই এসেছিলুম।'

চিঠিটা রহস্যময়। চিঠিটা পড়ে ভাবতে ভাবতেই দু'টো দিন কেটে গেল। চিঠির উত্তরে ভানুভাই কী লিখবে ভেবে পেলে না। তারপর অনেক ভেবে চিন্তে একটা চিঠি লিখলে। লিখলে—আমি তোর কথামত যাবার সব চেষ্টা করছি—

সেদিন কেমন করে কত চেষ্টা করে ভানুভাই প্যাটেল কোয়েতে গিয়ে নিজের বন্ধু পবন যোশীর সঙ্গে দেখা করেছিল তার একটা লম্বা ইতিহাস আছে।

সে ইতিহাস যথাস্থানে উল্লেখ করবো। কিন্তু এখানে শুধু এইটুকু বললেই চলবে যে সোহম্ এ-সব কথা জানতে পেরেছিল মিস্ সুরিটার কাছে। ক্লাবে গিয়ে যখন মদের গেলাস নিয়ে গল্প করতে বসে তখন মানুষ বড় দুর্বল অসহায় হয়ে যায়। তখন সকলের মনের কবাট খুলে যায়।

ঠিক সেদিনও তাই হলো।

সুমিত্রাকে নিয়ে যখন সোহম্ গ্রেট ইস্টার্ণ ক্লাবে ঢুকলো তখন ক্লাবের লনের ওপর অনেকগুলো চেয়ার-টেবিলে অনেক লোক বসে বসে অনেক জটলা করছে। আবার কোথাও বা প্রতিদিনের রুটিন মাফিক তাস খেলা চলছে। হাতে তাসের গুচ্ছ আর সামনে মদের গেলাস। কোনও গেলাসের রং ঘোর বাদামী, কোনও গেলাসের রং জলের মত, আবার গেলাসের রং কুচকুচে কালো, কিম্বা সুন্দর সোনালি।

মিস্ সুরিটা বোধহয় একটু আগেই এসেছিল।

সোহম্‌কে দেখেই হাতে গেলাস নিয়ে কোথা থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

বললে—গুড্ ইভ্‌নিং গুড্ ইভ্‌নিং মিস্টার এ্যান্ড মিসেস রায়—

সোহম্ সুমিত্রাকে চুপি চুপি বললে—বলো, গুড্ ইভ্‌নিং মিস্ সুরিটা—

সুমিত্রাও থতমত খেয়ে আড়ষ্ট গলায় বললে—গুড্ ইভ্‌নিং মিস্ সুরিটা—

সুরিটা মাথা নিচু করলে, সুমিত্রাও দেখাদেখি মাথা নিচু করলে। সোহম্ নিজেও যথারীতি মাথা নিচু করে মিস্ সুরিটাকে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালে।

মিস্ সুরিটা হাতের গেলাসটা রেখে সোহমের আর সুমিত্রার হাত ধরে টেনে নিজের কাছের একটা টেবিলে বসালে। তাতে মিস্ সুরিটা ছাড়াও আরো দুটো খালি চেয়ার ছিল। সোহম্ সুমিত্রাকে একটা খালি চেয়ারে বসিয়ে সুরিটাকে একটা চেয়ারে বসতে বললে। সুরিটা বসবার পর সোহম্ নিজে বাকি চেয়ারটাতে বসলো।

মিস্ সুরিটা বললে—কী খাবেন মিসেস রায়? হুইস্কি না রাম?

সুমিত্রার ভয়-ভয় করছিল। চারদিকে কত পুরুষ, কত মেয়ে, কত জাঁক কত জমক। এটা যে কলকাতা শহর, এখানে বসে তা বোঝা যায় না। এখানে কারো কোনও দুঃখ নেই, কারো কোন শোক-তাপ নেই। এখানে কারোর অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, শুধু আছে বর্তমান। এমন জায়গাও তো এ-কলকাতাতে আছে।

সোহমের গলার আওয়াজে সুমিত্রার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

সোহম্ তখন মিস্ সুরিটাকে বললে—আজকে আমরা আপনার হোস্ট্ মিস্ সুরিটা। আমরা মানে আমি আর মিসেস রায়। আপান আমাদের গেস্ট্—

সুমিত্রা সোহম্‌কে চিমটি কেটে বললে—কী বলছো ?

সোহম্ বললে—আমি বলছি আজকের সমস্ত খরচ আমার। মিস্ সুরিটা আমাদের অতিথি—

সুমিত্রা মিস্ সুরিটার দিকে চেয়ে বললে—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমরা আজ আপনাকে খাওয়াবো।

সুরিটা আপত্তি করলে না। যথারীতি ক্লাবের বয় এসে হাজির হলো অর্ডার নিতে।

সোহম্ সুরিটাকে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কী নেবেন ? ব্ল্যাক নাইট ?

—তাই-ই আনুক !

তখন আর সুমিত্রাকে জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না। তিনটে ব্ল্যাক নাইটের পেগ্ এল।

মিস্ সুরিটা সোডা মিশিয়ে নিয়ে গেলাস্‌টা উঁচু করে ধরলে।

সোহম্‌ও তার নিজের গেলাসটা উঁচু করে ধরলে।

সুমিত্রা যেমন বসে ছিল তেমনি বসেই রইল। সোহম্ তাকে মনে করিয়ে দেওয়াতে সেও তার হাতের গেলাসটা উঁচু করে ধরলো।

সোহম্ গেলাসটা উঁচু করে ধরেই বলে উঠলো—চীয়ার্স—

মিস্ সুরিটাও বললে—চীয়ার্স—

তাদের দেখাদেখি সুমিত্রাও যেন কেমন লজ্জায় পড়লো। কাকাতুয়ার মত সেও উচ্চারণ করে উঠলো—চীয়ার্স—

তারপর এক মুহূর্তও লাগলো না। সমস্ত কলকাতাটা তখন এক স্বপ্নের নগরী হয়ে উঠলো। এখানে কোনও হাহাকার নেই, এখানে কোনও ভিখিরি নেই, এখানে নেই কোনও বস্তি। শুধু ফুল আর ফুলের সুবাস, শুধু হাসি আর হাসির ফোয়ারা। এখানে সি এম. ডি এ. নেই, পাতাল রেল নেই, ফুটপাতে হকারের দৌরাত্ম্য নেই, এখানে চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি কিছু নেই। এখানে বাসে ট্রামে বাদুড়ঝোলা নেই। এখানে সবাই সৎ, এখানে সবাই নিয়ম-কানুন মেনে চলে। আরো মনে হলো এ-শহর সোনার শহর। এ-শহরে বাস করেও সুখ।

অনেক রাত হয়েছে।

সারা দিন রাত ট্রেনে কাটিয়ে কাশী দত্ত আর পিসীমা ক্লান্তই ছিল। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল। ভূপাল কি এখানে ? তার

ওপর আছে এ-বাড়ির গদীমোড়া নরম বিছানা। ঘুমের আর দোষ কী?

বিশেষ করে পিসীমার তো বয়েস হয়েছে। আগেকার মত কি স্বাস্থ্য আছে আর? আহা, বেঁচে থাকুক সোহম্, তার মাইনে আরো বাড়ুক! নিজের ভাই-পো, তার কিছু ভালো হলে তো তাঁরও ভালো।

হঠাৎ একটা শব্দে পিসীমার ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় যেন একটা ঘণ্টা বেজে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকর বলে উঠলো—হুজুর—

তারপর দরজা খোলার শব্দ হলো। পিসীমার মনে হলো রাত বোধ হয় দুটো বেজেছে। বাইরের দিকের বারান্দায় আলো জ্বলে উঠতেই ঘরের ভেতরে আধ-ফালি আলো এসে পড়লো।

সোহমের গলার শব্দ শোনা গেল। কী যেন বলছে সে। কী বলছে কিছু বোঝা গেল না।

পিসীমা আর শুয়ে থাকতে পারলে না। বিছানা ছেড়ে উঠলো। তারপর টিপি-টিপি পায়ে বিছানা ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো।

দরজাটার ফাঁক দিয়ে যা দেখলে তাতে অবাক হয়ে গেল পিসীমা। দেখলে বদ্রি সদর দরজা খুলে দিতেই সোহম্ বউমাকে নিয়ে ঢুকলো! কিন্তু বউমার এ কী অবস্থা! বউমার কি অসুখ করেছে? তবে দাঁড়াতে পারছে না কেন?

বউমাকে সোহম্ দুই হাতে জাপ্টে ধরেছে। একপাশে সোহম্ আর এক-পাশে ড্রাইভার। দু'জনে মিলে বউমাকে ধরে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠিয়েছে কোনও রকমে।

বউমার গলার স্বর জড়ানো। মুখ দিয়ে কী যেন বলতে চাইছে। কিন্তু তার কথা কেউ বুঝতে পারছে না।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো সুমি? কিছু বলবে?

সুমিত্রা হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তা আর বলতে পারলে না; তার আগেই বউমা সোহমের পায়ের ওপরেই হড়-হড় করে বমি করে দিলে। সেই বমিতে সোহমের দামী কোট-প্যাণ্ট্ সব জব্ জব্ করতে লাগলো। একটা কটু দুর্গন্ধ পিসিমার নাকে এসে লাগলো। পিসিমা আর দেখতে পারলে না। আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। তারপর টিপি-টিপি পায়ে আবার নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো।

ওদিকের খাটের ওপর তখন জোরে জোরে ঘর কাঁপিয়ে কাশীর নাক ডাকছে।

পিসীমা নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো বটে, কিন্তু তারপর আর ঘুম এল না। অত রাত হয়েছে চারদিকে, তবু যেন কানে নানা-রকম শব্দ আসতে লাগলো। ভুপালে অবশ্য সন্ধ্যের পর থেকেই সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সে অন্য দেশ। সেখানে এত মটর-গাড়িও নেই, এত ট্রাম-বাসও নেই। শুধু হয়ত কখনও কখনও অনেক দূর থেকে মাইকে রেকর্ডের গান ভেসে আসে। হয়ত কোনও বিয়েবাড়িতে গান বাজাচ্ছে।

আগেও কলকাতায় কত বছর কাটিয়ে গেছে পিসীমা। তখন কর্তার অবস্থা

ভাল ছিল না। একটা এঁদো-গলির ভেতরে একটা একতলা ভাঙা বাড়িতে চিরকাল ভাড়াটে হয়ে বাস করেছে তারা। তখন সে-বাড়িতে যেমন শব্দ যেত না, তেমনি হাওয়াও ঢুকতো না। কিন্তু সকাল-বিকেল-সন্ধ্যেতে সমস্ত বাড়িটা ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যেত।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে যেন ও-পাশের ঘর থেকে সোহমের আর বউমার গলার আওয়াজ একটু একটু শোনা যেতে লাগলো। পিসীমা তাদের কথাগুলো কান পেতে শোনবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। মনে হলো বউমা যেন কাঁদছে আর সোহম তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

কেন যে বউমা কাঁদছে তা পিসীমা বুঝতে পারলে না। যতক্ষণ পিসীমা জেগে ছিল ততক্ষণই বউমার কান্না কানে আসতে লাগলো। তারপর কখন ক্লান্তিতে নিজের অজান্তেই যে পিসীমা ঘুমিয়ে পড়েছে তা নিজেও জানতে পারলে না।

পবন যোশী আরব দেশে গিয়ে কী ভাবে পৌঁছিয়ে নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল চিঠিতে তা সবিস্তারে লিখেছিল ভানুভাই প্যাটেলকে। সামান্য তুচ্ছ ইরানী হোটেলের ছ'টাকা রোজের মাইনে আর বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার চাকরি ছেড়ে একদিন পবন যোশীর কথায় ভানুভাই একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে লাগলো। কেমন করে জাহাজে উঠবে, কোন্ জাহাজে উঠবে, কোন্ জাহাজ আরব দেশ ছুঁয়ে যাবে তার ঠিকানাই কি সে জানতো?

কিন্তু মানুষের চাওয়া যখন দুর্দমনীয় হয় তখন বোধ করি বিধাতাপুরুষও তাকে একটু দয়া-মায়া দেখান। আসল কথা হলো মনে-প্রাণে চাওয়া চাই। ভানুভাই প্যাটেলের তখন মনের যা অবস্থা তাতে এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়ে সে যে-কোনও পথ অবলম্বন করতে প্রস্তুত। তাতে যদি তার চাকরি চলে যায় তাতেও সে তার লক্ষ্য থেকে এক চুল নড়তে রাজি নয়। আর তা ছাড়া চাকরি চলে যাওয়া তো তুচ্ছ কথা, তাতে যদি তাকে ধরে পুলিস জেলেও পাঠায় তাও সে মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত। আর তারপর আছে জীবন সংশয়। সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেই কি হলো? গুজরাটের ছেলে ভানুভাই প্যাটেল, সাঁতার যে জানা নেই তার তা নয়। কিন্তু শুধু সাঁতার জানলেই কি হলো। এ তো পুকুর নয়, নদীও নয়, একেবারে অতল সমদ্র। অতল উত্তাল সমুদ্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। তাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটতে কাটতে যদি ডুবে যায় সে।

হোটেলের কাজ শেষ হতো অনেক রাত্রে। তখন ঘুমে চোখ ঢুলে আসতো। কিন্তু সে-ঘুমকে অগ্রাহ্য করে সে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াতো। দেখতো অনেক দূরে সমুদ্রের বুকের ওপর জাহাজগুলো নোঙর-বাধা অবস্থায় ভাসছে।

তারপর একদিন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে দাঁড়ালো বন্দরে।

কয়েকজনকে জাহাজের লোক বলে মনে হলো। সেই রকম পোশাক পরা; বোধ হয় জাহাজ থেকে নেমেছে ফুর্তি করতে। হ্যাঁ, ফুর্তিই করছে বটে। বেশ মদ খেয়েছে।

ভানুভাই নিজেই তার সঙ্গে যেচে আলাপ করলে।

ভাঙা ভাঙা ইংরিজীতে জিজ্ঞেস করলে—তুমি কোন্ দেশের লোক?

লোকটা সত্যিই মাতাল হয়েছিল। ভানুভাই-এর কথাগুলো বুঝতে পারলে না। বললে—আমি ড্রিংক করেছি—

বলে নিজের খোস মেজাজেই বেশ জোরে জোরে হাসতে লাগলো। তারপর বললে—এটা ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া খুব ভালো দেশ। এখানে মদ খুব সস্তা—

বলা শেষ করে আবার হাসতে লাগলো।

তারপর হাসি থামিয়ে বললে—তুমি মদ খাবে?

ভানুভাই জীবনে কখনও মদ খায়নি। কিন্তু মদ খেলে যদি লোকটার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায়, সেইটেই লাভ। যদি সে তাকে সঙ্গে করে বোম্বাই ছেড়ে অন্য কোনও দেশে নিয়ে যায় সেটাই তো সে চাইছে।

বললে—খাবো, কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেই—

লোকটা বললে—আমার কাছে টাকা আছে। কিন্তু একলা-একলা মদ খেতে ভালো লাগে না। তুমি যদি রাজি থাকো তো আমি তোমাকে মদ খাওয়াতে পারি—

তখন অনেক রাত। তবু ভানুভাই-এর জিদ্ চেপে গেল। একটা রাত জেগে কাটালে ক্ষতি কী? মদ খেলেই বা ক্ষতি কী? তাতে তো সে অপবিত্র হয়ে যাবে না।

লোকটা বললে—চলো তাহলো, একটা জায়গায় তোমায় নিয়ে যাই—

বলে ভানুভাইকে টানতে টানতে একটা দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সিতে উঠলো। তারপর কী যেন একটা জায়গার নাম বললে। সে কোন্ জায়গা তা বুঝতে পারলে না ভানুভাই। কিন্তু আপত্তিও করতে পারলে না সে। এমন সুযোগ যদি হাত-ছাড়া হয়ে যায় তখন কী হবে?

ট্যাক্সিটা গিয়ে দাঁড়াল একটা বস্তির সামনে। অত রাত্রেও কিন্তু বস্তিটা লোকে লোকে জম-জমাট। লোক মানে মেয়েমানুষে।

ভানুভাই জিজ্ঞেস করলে—এ কোথায় এলে ভাই?

লোকটা বললে—গার্ল্‌স্ ব্রাদার, গার্ল্‌স্—

ভানুভাই সেদিন বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এ-সব পাড়ায় গুন্ডারা থাকে। তারা পকেট কাটে। এদিকে আগে কখনও আসেনি ভানুভাই। এ সব পথ খারাপ বলেই ভানুভাই-এর ধারণা ছিল।

কিন্তু খানিক পরেই বোঝা গেল লোকটা এ-পাড়ায় চেনা। আগে যখনই ইন্ডিয়ায় এসেছে তখনই হাতে অনেক টাকা নিয়ে ডাঙায় নেমেছে আর দু'হাতে তা খরচ করেছে মদে আর মেয়েমানুষে।

একটা মেয়ে ভানুভাইকে দেখে জিজ্ঞেস করলে—এর সঙ্গে তুমি জুটলে কী করে? তুমি কে?

ভানুভাই বললে—এ বুঝি বরাবর এখানে আসে?

মেয়েটা বললে—এ তো আসে, কিন্তু তুমি কে? তুমিও কি জাহাজে চাকরি করো?

ভানুভাই বললে—না—আমি বোম্বাইএর লোক, এর সঙ্গে আজ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। এ-ই আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এল।

অদ্ভুত সে সব দিনের অভিজ্ঞতা। ভানুভাই গরীবের ঘরের মা-বাপ-মরা ছেলে। জীবনে অনেক রকম লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার, কিন্তু কোনও জাহাজের নাবিকের সঙ্গে এই-ই তার প্রথম আলাপ।

মেয়েটা বললে—তুমি আর কতক্ষণ থাকবে এখানে?

ভানুভাই বললে—ও যখন যাবে তখন আমিও চলে যাবো।

মেয়েটা বললে—ও এখন যাবে না। সারারাত এখানে থাকবে। তুমি চলে যাও—

ভানুভাই বুঝতে পেরেছে যে মেয়েটা তার আর্থিক অবস্থা জেনে ফেলেই তাকে চলে যেতে বলছে। তার ময়লা জামা, ময়লা প্যাণ্ট, ছেঁড়া চটি দেখে শুধু মেয়েটা কেন, যে কোনও লোকই আন্দাজ করতে পারবে যে তার পকেটে পয়সা নেই।

ভানুভাই-এর বড় অপমান বোধ হলো। একটা বাজারের মেয়েমানুষও কিনা এই রকম করে তাকে অপমান করতে সাহস পায়।

ভানুভাই উঠলো। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে একদিন এই পৃথিবীর অবহেলার সে প্রতিশোধ নেবে, যে পৃথিবী কেবল টাকাকেই শ্রদ্ধা করে। তার টাকা থাকলে আজকে মেয়েটা তাকে আদর করে বসতে বলতো, মদ খেতে বলতো।

জাহাজের সেলারটা তখন মদে অজ্ঞান অচেতন্য হয়ে বিছানায় বেতাল অবস্থায় শুয়ে রয়েছে। তার কথা বলবার ক্ষমতাও নেই, আর হয়ত তার কানেও কোনও কথা ঢুকছে না।

ভানুভাই উঠলো। উঠে ঘরের বাইরে এল। সেখানে তখনও মেয়েদের ধৈর্য-পরীক্ষা চলছে। তারা বোধ হয় রাত্তিরে ঘুমোয় না। রাত্রের জাগার শোধ তুলে নেয় দিনে ঘুমিয়ে। সে যে একজন পুরুষমানুষ, সেও যে একজন খদ্দের, সে বোধ তাদের হলো না তারা তার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখা দূরে থাক, তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

সেদিন প্রায় ভোরের দিকে আবার সে ফিরে এসেছিল নিজের ইরানী হোটেলে। আর তারপর সারাদিন ধরে আবার হোটেলের সেই হাড়-ভাঙা খাটুনি।

কিন্তু সেদিনও সে অপেক্ষা করছিল রাতটুকুর জন্যে। যেই সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে আর তখুনি কাউকে না জানিয়ে সে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারপর হাঁটতে হাঁটতে একেবারে জাহাজ-ঘাটায়। যদি সেই লোকটার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায়।

সেদিন অনেক চেষ্টা করলে ভানুভাই। কিন্তু তবু দেখা হলো না। এই রকম চললো পনেরো দিন। পনেরো দিনেও হাল ছাড়লে না ভানুভাই।

কিন্তু দেখা হয়ে গেল একদিন হঠাৎ। সেই লোকটাই।

ভানুভাই জিজ্ঞেস করলে—এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে?

লোকটা বললে—তুমি কোথায় ছিলে?

ভানুভাই বললে—আমি পনেরো দিন ধরে রোজ রোজ তোমার খোঁজ করতে এসেছি। হয়রান হয়ে তোমাকে খুঁজেছি কেবল। আমি ভাবলুম তুমি বুঝি চলে গেলে।

লোকটা বললে—এ কদিন লাইফটা খুব এনজয় করে নিলুম। আজ চলে যাচ্ছি—আজ আমাদের জাহাজ ছাড়ছে—

ভানুভাই বললে—এতদিন তোমার নামটাই জানা হয়নি। আমার নাম ভানুভাই প্যাটেল, তোমার নামটা কী?

লোকটা বললে—ফ্রেড্। ফ্রেড্রিক।

ভানুভাই বললে—তোমাদের জাহাজ কি অ্যারেবিয়ান সী দিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, কেন?

ভানুভাই বললে—আমাকে ভাই তোমাদের জাহাজে করে নিয়ে যাবে?

—তুমি কোথায় যাবে?

—যাবো কোয়েটে। সেখানে আমার এক ফ্রেন্ড্ আছে পবন যোশী। আমি তার কাছে যাবো,কিন্তু আমার কাছে টাকাপয়সা কিছু নেই,পাসপোর্ট-টাসপোর্টও কিছু নেই। সেখানে একবার গিয়ে পেঁছুতে পারলে সে আমায় একটা চাকরি করে দেবে লিখেছে। সেও এই রকম একটা জাহাজে করে সেখানে পালিয়ে গিয়েছিল। আমাকে তুমি কোনও রকমে নিয়ে যাবে?

—কিন্তু সেখানে তো আমাদের জাহাজ টাচ্ করবে না।

ভানুভাই বললে—না-ই বা টাচ্ করলো। আমি কোয়েটের কাছাকাছি কোস্টে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

ফ্রেড্-এর কী রকম যেন একটু দয়া হলো ভানুভাই-এর ওপর। ছেলেটা মদ খায় না, টাকাও ভিক্ষে করে না। যা পোর্টে-পোর্টে সব জায়গাতেই সবাই করে। জাহাজ ডাঙায় এসে পেঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই সব পোর্টেই ভিখিরির ভিড় লেগে যায়। কিন্তু এ-ছেলেটা তো সে-রকম নয়।

বললে—তোমার সঙ্গে মালপত্র আছে?

ভানুভাই বললে—যা আছে আমার সঙ্গেই আছে। আমার নিজের বলতে আর কিছু নেই—বললে আমি এখুনি যেতে পারি—

ফ্রেড্ বললে—আচ্ছা ঠিক আছে, আর পাঁচ ঘণ্টা পরে আমাদের জাহাজ ছাড়বে। আমি দেখে আসি ভেতরের কী অবস্থা। দেখে আসি কোথায় তোমাকে লুকিয়ে রাখবো, যাতে কেউ তোমাকে না দেখতে পায়। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও—

বলে জাহাজের ভেতরে ঢুকে গেল। ফিরে এল যখন তখন প্রায় এক ঘণ্টা

কেটে গেছে।

বললে—চলো, এখনও অন্ধকার আছে, সবাই ঘুমোচ্ছে. এইবার উঠে পড়বে। তার আগেই এসো, আমার পেছনে পেছনে এসো—

কোথাকার কোন্ দেশের লোক, কোথাকার কে-না-কে ফ্রেড্, তার পেছনে পেছনে ভানুভাই জাহাজের ভেতরে গিয়ে উঠলো। আধো-আধো অন্ধকার, তারই ভেতরে জাহাজের অলি গলি পেরিয়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো ফ্রেড্। ভানুভাইও থামলো।

ফ্রেড্ বললে—এখানে থাকো—আমি বাইরে থেকে দরজায় চাবি বন্ধ করে দিচ্ছি—

বলে বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে চাবি বন্ধ করার মৃদু শব্দ হলো। তারপর কতক্ষণ কাটলো কে জানে। অজানা পথের যাত্রা। কিন্তু তা হোক, যত কষ্টই হোক, কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যাবে কেন? টাকা উপায় করতে গেলে এমন কষ্ট করতে সে তৈরিই আছে।

অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যেত না কখন সকাল হচ্ছে আর কখনই বা রাত হচ্ছে। মাঝে মাঝে ফ্রেড্ এসে দরজা খুলে খাবার দিয়ে যেত। যা কিছু দিত গপ্ গপ্ করে খেয়ে ফেলতো ভানুভাই।

একদিন একটা বোতলও নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। মদের বোতল।

ফ্রেড্ বলেছিল খাবে?

ফ্রেড্ যদি বিষও দিত তাহলে তা-ও খেতে প্রস্তুত ছিল ভানুভাই। বললে—খাবো।

—তাহলে নাও। আমি তোমায় ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ডাকবো।

বলে আবার দরজায় চাবি বন্ধ করে চলে গেল। চারদিকে গুম্-গুম্ শব্দ। কোথা দিয়ে কোন্ দিকে জাহাজ চলেছে তা জানবার উপায় নেই। তবে এইটুকু শুধু বোঝা যায় যে জাহাজটা অল্প-অল্প দুলছে।

তারপর একদিন হঠাৎ ফ্রেড্ তাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুললো। ঘুমিয়ে পড়েছিল ভানুভাই। জেগে উঠে দেখে ফ্রেড্ তাকে ডাকছে। ধড়ফড় করে সে উঠে বসলো।

বললে—কী হলো?

ফ্রেড্ বললে—তোমাকে ডেকে দিতে এসেছি, এইবার তোমার জায়গা এসে গেছে—

—এখন কত রাত?

—রাত অনেক, দু'টো বেজেছে।

—দু'টো? এত রাত? এত রাতে কিছু দেখতে পাবো?

ফ্রেড্ বললে—তা হোক, রাত না হলে সবাই দেখে ফেলবে। তখন তুমি ধরা পড়ে যাবে। তখন মুশকিল হবে। তৈরি হয়ে নাও, আর সময় নেই—

সত্যিই তখন আর সময় ছিল না। মনে মনে একবার অদৃশ্য ভাগ্য-দেবতাকে স্মরণ করে নিলে। তারপর পরনের প্যান্টটা কোমরে ভালো করে এঁটে পায়ের

দুটো দিক গুটিয়ে নিলে। তাতে সাঁতার কাটতে সুবিধে হবে।

দু'পকেটে কিছুই নেই, সুতরাং কিছু নষ্ট হওয়ারও নেই। একটা পয়সাও নেই পকেটে যে গড়িয়ে পড়ে যাবে।

হু-হু করে হাওয়ার ঝাপটা দিচ্ছে। চারদিকে কেবল জল আর জল। কিছুই দেখা যায় না কোনও দিকে। তবে অনেক চেষ্টা করলে মনে হয় দূরে অনেক দূরে যেন বিন্দু বিন্দু আলোর কণা চিক্-মিক্ করছে।

কই, লাফিয়ে পড়ো! ভয় কী?

ভানুভাই এর সেদিন সেই আলোর চিকমিকিগুলো দেখে মনে হয়েছিল, ওগুলো যেন আলো নয়, হীরে। পান্না-হীরে চুনিগুলো যেন দূরে থেকে হাতছানি দিচ্ছে তাকে। বলছে—এসো এসো, এখানে অনেক টাকা, অনেক টাকা ছড়ানো আছে এখানে চলে এসো। বড়লোক হতে চাও তো এখানে চলে এসো—

ফ্রেড্ পেছন থেকে আবার তাড়া দিলে—কই, ঝাঁপিয়ে পড়ো—ঝাঁপ দাও—দেরি করছো কেন?

ভানুভাই প্যাটেল আর দেরি করলে না। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে সেই অচেনা অদেখা সমুদ্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

যেদিন টাকা আবিষ্কার হয়েছিল সেইদিন থেকেই মানুষ এমনি করে অচেনা অদেখা সমুদ্রের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ক্ষেত্রবাবুদের মত কিছু লোক শুধু মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ। যীশুখৃষ্টের জন্মের চারশো সত্তর বছর আগে সোক্রোটিসও এই কথা বলে গিয়েছিল। বলেছিল—আত্মানং বিদ্ধি। অর্থাৎ নিজেকে জানাই হচ্ছে ঈশ্বরকে জানা। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে তথাগত বুদ্ধদেব, মহাবীর, কনফুসিয়াস সকলেরই ওই এক কথা। কিন্তু যন্ত্র-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যখন কলের জাহাজ, স্টীম-ইঞ্জিন আবিষ্কার হলো তখন থেকে বিশ্বের মানুষ বলতে শুরু করলো টাকাই ধর্ম, টাকাই অর্থ, টাকাই মোক্ষ, টাকাই কাম। ত্যাগ মানে জড়তা, ভোগ মানেই এগিয়ে চলা। সুতরাং মানুষকে যদি এগিয়ে চলতে হয়, সভ্যতাকে যদি অগ্রসর হতে হয় তো টাকাকেই চরম জ্ঞান করতে হবে। সুতরাং ত্যাগ কোর না, তাতে থেমে যাবে, চরৈবেতি, চরৈবেতি। এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো, নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র, নমঃ নমঃ। আর যন্ত্র মানেই তো আরো টাকা। ইরানী হোটেলের ছ'টাকা মাইনের হোটেল-বয় যদি একদিন ছ'লাখ টাকার মালিক হতে চায় তো অন্যায় কোথায়? তেমনি টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানির মালিক মিস্টার আয়েঙ্গার, কলকাতা অফিসের মিস্টার এন্-বি-সেন, কি ওয়েলফেয়ার অফিসার সোহম্ রায় একদিকে, আর অন্যদিকে

ইব্রাহিম্, কেশব মাইতি আর বিভূতি পোদ্দার, সকলেরই তো একই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য এগিয়ে চলা। তার মানে চরৈবেতি চরৈবেতি। এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো। মাইনে বাড়াও, আরো মাইনে বাড়াও। তার মানে জীবনসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো।

বাপ-মা-মরা সোহম্ রায়ও তাই একদিন ঝাঁপিয়ে পড়লো ভাগ্যসমুদ্রে। বোম্বাই-এর অফিসের মিস্টার আয়েঙ্গার তাকে একটা রিভলবারের লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছিল। এবার মিস্টার সেন তাকে গ্রেট ইস্টার্ন-ক্লাবের মেম্বার হতে বলেছে। তার নিজের স্ত্রীকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে কক্‌টেল পার্টি দিতে বলেছে। সোহম্‌ও তাই ভানুভাই প্যাটেলের মতই জীবন-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ভানুভাই যেমন ঠিক ঠিক একদিন কোয়েটে গিয়ে পৌঁছিয়ে, পবন যোশীর সঙ্গে দেখা করে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছিল, সোহম্‌ও তেমনি তার নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে নেবে ভেবেছিল।

কিন্তু সুমিত্রা যে এত আনাড়ির মত ব্যবহার করবে তা কে জানতো!

সুমিত্রাও তখন বমি করে একটু তটস্থ হয়ে গেছে। সে অবাক হয়ে দেখলে সোহমের গায়ের ওপর বমি করে দিয়েছে আর তার সেই হড়হড়ে বমিতে তার দামী কোট-প্যান্ট-নেকটাই সব ভেসে গেছে। বমির পচা খাবারগুলো সোহমের গা বেয়ে পায়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

আকুল হয়ে সে অসহায়ের মত সোহমের দিকে চাইলে।

চেয়েই কেঁদে ফেললে। বললে—এ কী করলুম—এ কী করলুম গো আমি! আমি তোমার গায়ে বমি করে দিলুম—

সোহম্ সুমিত্রাকে আদর করে বলতে লাগলো—না না, এ কিছু হয়নি, তোমার দোষ নেই, এ কোট-প্যান্ট ড্রাইং-ক্লিনিং-এ দিলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, ওর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না—

সুমিত্রা তেমনি জড়ানো গলায় বলতে লাগলো—কিন্তু কেন আমার বমি হয়ে গেল গো? কেন আমার গা গুলিয়ে উঠলো—?

সোহম্ সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলো—তাতে কী হয়েছে, ও প্রথম-প্রথম ও রকম সকলেরই হয়। আমারও হয়েছে। তার জন্যে দুঃখ কোর না। দু'দিন একটু অভ্যেস করলেই তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে—তখন দেখবে তুমিই চেয়ে চেয়ে মদ খাবে! ওর জন্যে তুমি মন খারাপ কোর না—

—কিন্তু আমার যদি অভ্যেস না হয় তাহলে? তাহলে কী হবে?

—তাহলে কিছুই ক্ষতি হবে না—

সুমিত্রা তেমনি জড়ানো গলাতেই বললে—কিন্তু তোমার যে মাইনে বাড়বে না, তোমার যে চাকরিতে উন্নতি হবে না—

সোহম্ বললে—হবে হবে। একদিনে কি সব হয়? একদিনে কি মানুষ বড়লোক হয়? শুনলে না সুরিটার কথাগুলো?

—কী কথা?

সোহম্ বললে—ওই যে, কী করে ভানুভাই প্যাটেল ছ'টাকা রোজ মাইনের

চাকরি করতো বোম্বাই-এর এক ইরানী হোটেলে। তারপরে কী করে একটা জাহাজে উঠে কোয়েটের কাছে গিয়ে জাহাজ থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মানুষকে বড়লোক হতে গেলে উদ্যোগী পুরুষ হতে হয়। নিজের অবস্থায় যারা সন্তুষ্ট থাকে তারাই সারাজীবন একই মাইনেতে পচে মরে।

সুমিত্রা এবার কেঁদে ফেললে। একেবারে হাউ হাউ করে কান্না। সে-কান্না আর থামতেই চায় না।

সোহম্ বিব্রত হয়ে বললে—ও কি সুমিত্রা, কাঁদছো কেন? পাশের ঘরে পিসীমা আর আমার পিসতুতো দাদা রয়েছে। তারা যে সব শুনতে পাবে! তারা সব কী ভাববে বলো তো! তুমি অমন করে কেঁদো না।

সুমিত্রা তেমনি করে কাঁদতে কাঁদতেই বললে—কান্না কি আমি ইচ্ছে করে কাঁদছি! আমি যদি মিস্টার ভানুভাই প্যাটেলের গায়ে এমনি করে বমি করে ফেলি?

সোহম্ বললে—ততদিনে তোমার অভ্যেস হয়ে যাবে, দেখো!

সুমিত্রা যেন এবার একটু আশ্বস্ত হলো। এবার একটু চুপ করলো।

বললে—তুমি ঠিক বলছো?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। তুমি বাথরুমে চলো, তোমার মুখ-হাত ধুইয়ে দিই—

বলে সুমিত্রাকে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে তার মুখ-হাত ভালো করে ধুইয়ে দিয়ে তার মাথায় জল দিয়ে দিলে। তারপর সোহম্ তাকে ধরে ধরে বিছানার ওপর শুইয়ে দিলে।

রাত্রে ভালো করে ঘুম হয়নি পিসীমার। তাই খুব ভোরেই ভেঙে গেছে। ঘুম ভাঙার পর আগের রাত্রের দেখা ঘটনার কথা মনে পড়লো। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠলো। কাশীর তখনও নাক ডাকছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

পিসীমা ঘরের দরজাটার খিল খুলে বাইরে এল! বাইরে গিয়ে দেখলে বদ্যিনাথ তখন বারান্দার ওপর বালতিতে করে জল নিয়ে ঝাঁটা দিয়ে সব ধুচ্ছে।

পিসীমা জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ বাবা বদ্রি, ও-সব কী করছো? ওখানে কী হয়েছে? ও সব ময়লা কীসের?

বদ্রি বললে—এঁটো ভাত পড়ে গিয়েছিল কাল রাত্তিরে, তাই ধুচ্ছি—

—কী করে ভাত পড়লো ওখানে?

বদ্যিনাথ বললে—কালকে আমার হাত থেকে কখন পড়ে গিয়েছিল টের পাইনি—তাই ধুয়ে ফেলছি—

পিসীমা বুঝতে পারলে বদ্যিনাথ ব্যাপারটা চেপে যেতে চাইছে। পিসীমা আর কিছু না বলে সোজা বাথরুমের দিকে চলে গেল।

বাথরুম থেকে বাইরে এসে পিসীমা চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তার চেনা কলকাতার সঙ্গে এ যেন মোটেই মিলছিল না। আগে যে-পাড়ায় পিসীমারা থাকতো সে-পাড়া এ-রকম নয়। সেখানে টিনের চালাঘরও ছিল, একখানা দুখানা পাকা বাড়িও ছিল। কিন্তু এখানে সবই চারতলা পাঁচতলা ছ'তলা বাড়ি সব। কী চমৎকার বাহার এ পাড়ার।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে কোথাও একটা গাছ দূরের কথা, একটু আকাশও দেখা যায় না। অথচ ভূপালে শুধু গাছপালা আর লেকের জল। সেই পাড়ায় চারদিক থেকে ধোঁওয়া ঢুকতো। কিন্তু এখানে ধোঁওয়া নেই।

পাশের দিকে চেয়ে দেখলে, সেদিকটা বোধ হয় সোহমদের রান্নাঘর। পরের বাড়ির রান্নাঘর দেখতে মেয়েদের চিরকালের কৌতূহল। ঠাকুর যেন সেখানে কী কাজ করছিল।

পিসীমা ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলে—কী করছো গো ঠাকুর ?

ঠাকুর বললে—এই প্লেট-ডিশগুলো ধুচ্ছি।

পিসীমা দেখলে কল দিয়ে জল পড়ছে আর একটা বেসিনে কতকগুলো প্লেট ডিশ তার তলায় রয়েছে। সেগুলো সাবান দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে পাশের উঁচু তাকের ওপর সাজিয়ে রাখছে। প্রত্যেকটা প্লেট ডিশ একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুছে মুছে ঝকঝকে তকতকে করে তুলছে।

পিসীমা জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের সাহেব আর মেমসাহেব কাল কত রাত্তিরে বাড়ি ফিরলো গো ?

ঠাকুর বললে—সাহেবের ফিরতে সেই যার নাম রাত বারোটা। সাহেব রাত বারোটা-একটার আগে কোনও দিনই ফেরে না।

পিসীমা জিজ্ঞেস করলে—সেই অত রাত্তিরে ফিরে তখন খাওয়া-দাওয়া করে ?

ঠাকুর বললে—সাহেবরা তো রাত্তিরে বাড়িতে খায় না।—

—সে কী ? রাত্তিরে তোমার সাহেব বাড়িতে খায় না ? তাহলে উপোস করে থাকে নাকি ?

ঠাকুর বললে—না না, উপোস করে থাকবে কেন ? ক্লাবে যায় তো সাহেব, তাই সেখানেই রাত্তিরের খাওয়াটা একেবারে খেয়ে আসে।

—আর তোমার মেমসাহেব ?

ঠাকুর বললে—মেমসাহেবও সেই সঙ্গে খেয়ে আসে।

পিসীমা আশ্চর্য হয়ে গেল কথাটা শুনে। বাড়িতে লোকজন ঠাকুর-চাকর রয়েছে তবু বাইরে খাওয়া ? তাতে তো মিছিমিছি অনেকগুলো টাকা বাজে-খরচ হয়! এ কী রকম বেহিসেবীপনা!

পিসীমা বললে—তাহলে রাত্তিরে বাড়িতে শুধু তোমরা দুজনে খাও ? তুমি আর বদ্রি ?

ঠাকুর ডিশ-প্লেট্ ধুতে ধুতে বললে—হ্যাঁ, মাঈজী—

পিসীমা বললে—আমি তোমার সাহেবের কে, তুমি জানো তো ঠাকুর?

ঠাকুর বললে—ঠিক জানি না মাঈজী—

পিসীমা বুঝিয়ে বললে—আমি তোমার সাহেবের বাবার বোন। আপন বোন। তোমার সাহেব আমার কাছেই মানুষ, তা জানো তো?

ঠাকুর জানতো না, আর জানা দরকারও ছিল না তার। বললে—না—

পিসীমা বললে—হ্যাঁ, বললে বিশ্বাস করবে না, তোমার সাহেব বলতে গেলে ছোটবেলা থেকেই আমার কাছে মানুষ। আমিই তোমার সাহেবকে এই এতটুকু বেলা থেকে মানুষ করেছি আমার কোলে। আমার দাদা আর বৌদি তোমার সাহেবের ছোটবেলাতেই মারা গিয়েছিল। তারপর থেকে ভাইপো'কে আমার কাছে এনে রাখি। ছোটবেলা থেকেই খুব খেতে ভালোবাসতো তোমার সাহেব। কত যে ভাত খেতো তা বললে বিশ্বাস করবে না। দেখ, এই এত ভাত খেতো, এই এত—

বলে হাত নেড়ে ভাতের পরিমাণটা দেখালে।

ঠাকুরের অনেক কাজ তখন। সে একমনে কাজ করে চলেছে আর পিসীমা তার নিজের মনে বকর-বকর করে চলেছে। কেউ শুনুক আর না শুনুক তাতে পিসীমার কিছু ভ্রূক্ষেপ নেই। পিসীমা বলে চলেছে তখনো—কিন্তু তোমার সাহেব লোক খুব ভালো, জানো বাবা! মানুষটার মনে কোনও পাপ নেই। নিজের মা-বাবা কেউ নেই তো, তাই আমাকে পিসীমা পিসীমা বলতে একেবারে অজ্ঞান, আমাকে বড্ড ভালোবাসতো তোমার সাহেব—

এমন সময় কাশী দত্ত ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

এসেই বললে—চা হয়েছে ঠাকুর?

ঠাকুর বললে—একটু দেরি হবে বাবু—

—তাহলে যাই, বাইরে গিয়েই চা খেয়ে আসি—

বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

বাড়ি থেকে বেরোতেই রাস্তা। সেই রাস্তায় কোনও চায়ের দোকান নেই। কাশী দত্ত হাঁটতে হাঁটতে আরো দূরে চলতে লাগলো। কালকে বলে রাখতে অত মনে ছিল না। বড়লোকদের পাড়া। এ-পাড়ায় চায়ের দোকান-টোকান না-থাকাই নিয়ম। তাই একটু দূরে যেতে হলো।

দূর মানে বেশ দূর। সেদিকটার খানিকটা মধ্যবিত্তদের পাড়ার মতন। সেখানে কয়েকটা রিকশা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে কয়েকটা ডাস্টবিন। এরই মধ্যে কয়েকটা কাক কী-সব খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে আর লোকজনের যাতায়াত দেখলেই খানিকক্ষণের জন্যে উড়ে যাচ্ছে, আর তারপর আবার ফিরে এসে খুঁটে খুঁটে কী সব খাচ্ছে।

কাশী দত্ত কাছে যেতেও তারা একবার উড়ে গেল। কাশী দত্ত কাছে গিয়ে দেখলে একটা মরা ইঁদুর। একেবারে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। এ যেন অনেকটা ভুপালের পাড়ার মত চেহারা।

তার ওপাশেই দেখলে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। দোকানের চারদিকে

ঘিরে কয়েকজন ভাঁড়ে করে চা খাচ্ছে বসে বসে।

পাশে একটা ভাঙা বেঞ্চি। সেখানে যেতেই একজনকে কাশী দত্ত বললে—একটু সরে যাবে ভাই, বসবো—

সসম্ভ্রমে একজন সরে যেতেই কাশীনাথ সেখানে কোনও রকমে বসলো। বসতেই বেঞ্চিটা বেশি ভার পড়তেই মচ্ মচ্ শব্দ করে উঠলো।

বসে বললে—এক ভাঁড় চা দাও তো ভাই, একটু চিনি বেশি করে দিও—

দোকানদার কাশী দত্তর দিকে চাইলে। নতুন খদ্দের।

বললে—আপনি কি এ-পাড়ায় নতুন এলেন স্যার—

কাশী দত্ত বললে—হ্যাঁ, তোমার দেশ কোথায় ?

লোকটা বললে—আমরা বাঙলা দেশের লোক স্যার, কলকাতায় উদ্বাস্তু। এসে চায়ের দোকান দিয়েছি। কী আর করবো বলুন ?

হাতে চায়ের গরম ভাঁড়টা নিয়ে বললে—বাঃ, বেশ চা বানিয়েছ তো! চায়ের দোকান ক'বছর হয়েছে ?

লোকটা বললে—এই বছর পাঁচেক—তার আগে চাকরির জন্যে দশ বছর ঘুরেছি, কেউ চাকরি দেয়নি।

কাশী দত্ত চা খেতে খেতে বললে—তোমার চাকরি চাই ?

লোকটা বললে—চাকরি পেলে তো বেঁচে যাই স্যার, এ চায়ের দোকানে আর কোনও লাভ নেই—

কাশী দত্ত বললে—ইস্, তখন আমার সঙ্গে যদি তোমার দেখা হতো তো তোমাকে এই উঞ্ছবৃত্তি করতে হতো না—আমার আপন মামাতোভাই কে জানো ?

লোকটা বললে—কে ?

কাশী দত্ত বললে—টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাকসন কোম্পানির নাম শুনেছ ?

লোকটা বললে—নাম শুনিনি ? ওখানে গিয়ে কতদিন ধর্ণা দিয়েছি চাকরির জন্যে। কেউ একটা কথাও বলেনি—

—তা আমাকে বলোনি কেন ?

কথাটা বলেই একটু পরে বললে—তা আমাকে তুমি তখন পাবেই বা কোথায় ? আমি তো ভুপালে। ভুপালে গেলে আমি তোমার নির্ঘাত একটা চাকরি করে দিতুম।

লোকটা ভুপালের নাম শোনে নি।

জিজ্ঞেস করলে—ভুপাল কোথায় বাবু ?

কাশী দত্ত আবার চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিলে।

বললে—সেখানেও কত বাঙালী উদ্বাস্তুকে আমি চাকরি করে দিয়েছি।··· দাও, আর একটু চিনি দাও, চায়ে বড্ড চিনি কম হয়েছে—

এবার দোকানদার এক চামচ-ভর্তি চিনি চায়ের ভাঁড়ের ভেতরে ডুবিয়ে দিলে।

কাশী দত্ত বললে—ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর দিতে হবে না—

বলে ভাঁড়ে চুমুক দিলে।

দোকানদার বললে—কলকাতায় একটা চাকরি-বাকরি কিছু যোগাড় করে

দিতে পারেন না স্যার ?

কাশী দত্ত বললে—খুব পারি—কী চাকরি করবে তুমি তাই বলো না। তিন-শো টাকা মাইনে হলে চলবে তোমার ?

দোকানদার বললে—তাহলে তো আমি হাতে স্বর্গ পাই স্যার, তাহলে আর আমাকে এই উঞ্ছবৃত্তি করতে হয় না—

কাশী দত্ত বললে—তিনশো টাকা মাইনেতে যদি তোমার চলে তাহলে তো আর কথাই নেই—

দোকানদার বললে—আমাদের পাড়াতেই একজন ভদ্দরলোক আছে, মস্ত বড় চাকরি করেন, তাঁর কাছে একদিন গিয়েছিলাম। তা তাঁর ড্রাইভার আমার কথা শুনে আমায় তাড়িয়ে দিলে।

কাশী দত্তর কেমন সন্দেহ হলো।

জিজ্ঞেস করলে—কোন্ বাড়িটা বলো তো ?

দোকানদার বললে—এই সামনের রাস্তার মোড়টা পেরিয়ে, বাঁ-হাতি রাস্তাটা ধরে একটু এগোলেই হলদে রংএর একটা দোতলা বাড়ি। নিচেয় গ্যারেজ আছে —সেখানে গাড়ি আছে—

কাশী দত্ত কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

জিজ্ঞেস করলে—ভদ্দরলোকের নামটা কী বলো তো ?

দোকানদার বললে—পুরো নাম জানি না, সবাই রায় সাহেব বলে ডাকে। শুনিচি নাকি পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পায়—

কাশী দত্ত বললে—আরে ওর কথাই তো আমি বলছি। ও-ই তো আমার মামাতো ভাই। আমার মার আপন ভাই-পো। আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট—

—আপনার মা'র আপন ভাই-পো ?

—হ্যাঁ, আমি তো সেই বাড়িতেই থাকি। সেই বাড়ি থেকেই তো এখন আসছি। তুমি এতক্ষণ সে-কথা বলো নি কেন ? আমাকে আগেই তা বলবে তো !

দোকানদার আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তখন।

বললে—আর এক ভাঁড় চা নিন—স্যার—

কাশী দত্ত বললে—না, আর নেব না।

উঠে পয়সা দিতে যাচ্ছিল। দোকানদার রাজি হলো না। বললে—না স্যার, আপনার কাছে পয়সা নেব না, পয়সা দিয়ে আর আমার অপরাধ বাড়াবেন না—

কাশী দত্ত আবার পয়সাটা পকেটে পুরে রাখলে। উঠে যাবার সময় বললে—তোমার ওই তিনশো টাকাতেই চলবে তো ? আর না যদি চলে তো সাড়ে তিন-শো টাকা চাও তো তাও পাইয়ে দিতে পারি—

দোকানদার বললে—আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন স্যার, আমি আপনাকে আর কী বলে ধন্যবাদ দেব—

কাশী দত্ত বাড়ির দিকে যেতে যেতে বললে—আরে আমার নিজের মা'র

আপন ভাইপো, জানো ম্যাট্রিক পাস করেনি, অথচ এখন পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। একেই বলে কপাল—

যখন দুপুর বারোটা তখন সুমিত্রার ঘুম ভাঙলো। ঠাকুর তৈরিই ছিল। সে তাড়াতাড়ি নাস্তা বানাতে লাগলো।

পিসীমা রান্নাঘরের পাশেই ছিল। জিজ্ঞেস করলে—বউমা এখন ঘুম থেকে উঠলো বুঝি ?

ঠাকুরের তখন কথা বলবারও সময় নেই। কোনও ব্যাপারে যদি কোনও ত্রুটি ঘটে যায় তো তার চাকরি চলে যাবে।

—আর তোমার সাহেব ?

ঠাকুর বললে—সাহেব তো ভোরবেলাই চা খেয়ে অফিসে চলে গেছে !

পিসীমা অবাক হয়ে গেল ঠাকুরের কথা শুনে। অত রাত্তিরে বাড়িতে ফিরেই আবার ভোরবেলা অফিসে চলে গেল। পিসীমা কিনা টেরও পেলে না। গাড়িতে করেই নিশ্চয় অফিসে গেছে সে, আর গাড়ির শব্দও তো কানে যাওয়া উচিত ছিল।

পিসীমা জিজ্ঞেস করলে—তোমার সাহেব দুপুরবেলা বাড়িতে খেতে আসবে তো ?

ঠাকুর বললে—না, সাহেব অফিসে খায়।

—অফিসে কী খায় সাহেব ?

—ঠাকুর বললে—কী আর খাবে, ভাত তো খায় না আমার সাহেব—

—কেন ? ভাত খায় না কেন আমার ভাই-পো ? ভাত কী দোষ করলো ?

ঠাকুর বললে—আমার সাহেব বলে ভাত খেলে কাজ করতে পারে না, ঘুম পায়—

—ভাতের বদলে কী খায় ?

ঠাকুর বললে—চারটে টোস্ট্, একটা বড় মুরগীর কাটলেট আর পুডিং—

পিসীমা অবাক হয়ে গেল সোহমের খাবারের ফর্দ শুনে।

—এইটুকু খাওয়াতে তোমার সাহেবের পেট ভরে ? আগে পুরো একথালা ভাত খেয়েও পেট ভরতো না আমার ভাই-পোর, তা জানো !

ঠাকুরের এ-সব কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। যারা বড়লোক তাদের চাকর-ঝি'রাও বোঝে কাকে খাতির করতে হবে আর কাকে খাতির করতে হবে না। তারা বুঝতে পারে যারা বাড়িতে এসেছে তারা গরীব আত্মীয়, না বড়লোক আত্মীয়। গরীব আত্মীয় হলে তেমন খাতির-যত্ন না করলেও চলবে ! এ তথ্য

তাদের কেউ শিখিয়ে দেয়নি, কেউ বলেও দেয়নি! এই অর্থ-কৌলীন্যের ভাইরাস বোধ হয় বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বিশেষ করে শহরে। এই দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর আর কলকাতায়।

তাই ঠাকুরের এ-সব কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। সে তখন তাড়াতাড়ি করছিল খুব। মেমসাহেব ঘুম থেকে উঠে গোসলখানায় গেছে। নাস্তা নিয়ে যেতে দেরি করলেই মেমসাহেব রেগে যাবে।

পিসীমা দেখছিল সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দুটো ডিম একসঙ্গে ভেজে একটা অমলেট্ বানিয়ে ডিশের ওপর গোল করে পাকিয়ে রেখেছে। আর একটা ডিশের ওপর কী যেন ঢেলে রাখলে।

পিসীমা জিজ্ঞেস করলে—ওগুলো কী গো ঠাকুর?

ঠাকুর বললে—কর্ণফ্লেক্স্।

—সেটা কী জিনিস?

ঠাকুর বললে—তা জানি না পিসীমা, দুধ আর চিনি দিয়ে মিশিয়ে খেতে হয়। এইটে মেমসাহেব রোজ খায়—

—আর কী খাবে?

—পাঁউরুটির টোস্ট্, তাতে মাখন মাখিয়ে নেবে। আর শেষকালে রোজ চা কিংবা কফি।

পিসীমা বললে—এত খাবার পর ভাত খাবে কখন?

—ভাত খেতে খেতে যার নাম সেই দুপুর দু'টো আড়াইটে!

কথার মাঝখানে হঠাৎ কাশী এসে হাজির। সেই যে সে ভোরবেলা চা খেতে রাস্তায় বেরিয়েছিল, তারপর পাড়াটা ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতেই বেলা হয়ে গিয়েছিল। একটা তেলেভাজার দোকানে গিয়ে কিছু বেগুনী-ফুলুরী খেয়ে নিয়েছে। তারপর সেখানেও নিজের মামাতো ভাই-এর পার্বলিসিটি। তাদেরও বলেছে তার মামাতো ভাইকে বললেই একটা তিনশো সাড়ে-তিনশো টাকার চাকরি করে দিতে পারে সে!

তারাও বিশ্বাস করতে চায়নি।

তারা তার পরিচয় শুনে অবাক হয়ে বলেছে—তা রায় সাহেব যদি আপনার মায়ের আপন ভাই-পো তো আপনার এমন দুর্দশা কেন?

তখন সেই একই উত্তর দিয়েছে কাশী দত্ত। বলেছে—জানো, আমার মামাতো ভাই, তোমরা যাকে রায়-সায়েব বলো, সে ম্যাট্রিক ফেল?

শুনে তারা অবাক হয়ে গিয়েছে। বলেছে—ম্যাট্রিক ফেল? কী বলছেন স্যার আপনি? ম্যাট্রিক ফেল করে কেউ অত বড় হতে পারে?

কাশী দত্ত বলেছে—পারে পারে! এ-যুগে তোমাদের কলকাতায় সবই হতে পারে ভাই। কত ইণ্টারমিডিয়েট ফেল করা লোক যদি মন্ত্রী হতে পারে আর মন্ত্রী হয়ে যদি মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম্ করতে পারে, তাহলে ম্যাট্রিক ফেল করা ছেলেই বা পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাবে না কেন? সেইটে বলো আগে!

—তা রায়-সাহেবের পিসতুতো দাদা হয়ে আপনার এমন দশা কেন ? আপনি টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাকসন্ কোম্পানির একটা চাকরি নিয়ে কলকাতায় থাকতে পারেন না ? আপনি কেন মরতে ভূপালে পড়ে-আছেন ?

কাশী দত্ত বলেছে—যত সব বদ্মায়েশ লোকের আড্ডাখানা হয়েছে কলকাতাটা। একটা ভদ্রলোক খুঁজে পাওয়া যায় না যে শহরে সেটা আবার একটা শহর।

তারপর মনের এই রকম অবস্থায় বাড়ির কথা মনে পড়ে যেতেই বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে কাশী দত্ত। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে বাড়িতে এসেই দেখে ঠাকুর ডিমের অমলেট সাজিয়েছে প্লেটের ওপর। পাশে একটা ডিশের ওপর টোস্ট্, মাখনের ড্যালা ভাসছে জলের ওপর আর জ্যামের মুখ-খোলা কৌটো একটা।

কাশী দত্ত বললে—ঠাকুর, এসব কার জন্যে গো ? কে খাবে ? তোমার সাহেব ?

ঠাকুর কী আর বলবে, তবু বললে—মেমসাহেবের জন্যে নাস্তা বানাচ্ছি—

কাশী দত্ত বললে—তাহলে আমার জন্যেও একটু বানাও ঠাকুর, আমিও কিছু খাইনি সকাল থেকে—

পিসীমা কথাটা শুনেই বললে—দেখছিস বউমা'র জন্যে জলখাবার বানাচ্ছে, আর এই সময় কিনা তুই খাই-খাই করছিস ? তোর কি একটুও সবুর সয় না ? তুই কি জীবনে কখনও ডিম খাসনি নাকি ?

কাশী দত্ত খেঁকিয়ে উঠলো—তুমি চুপ করো তো মা, আমার ইচ্ছে হয়েছে ডিম খেতে তাই বলছি, তাতে তোমার কী ?

পিসীমা বললে একদিন বেশি ভাত খেয়েছিল বলে তুই সোহম্‌কে বাড়ি থেকে রাত্তির বেলা তাড়িয়ে দিয়েছিলি, তা তোর মনে নেই ?

কাশী দত্ত বললে—তুমি দেখছি মা একটা আস্ত পাগল, নইলে রাম রাবণে যুদ্ধ হয়ে কবে রাবণ মরে ভূত হয়ে গেল আর এতদিন পরে তুমি কিনা সীতা-হরণের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো। সে তো কবে চুকে-বুকে গেছে—

পিসীমা বললে—না চুকে-বুকে যায়নি, এখন তারই বাড়িতে ঢুকে তারই পয়সায় কেনা ডিম চেয়ে খেতে তোর লজ্জা করছে না ?

ঠাকুর দুজনের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—আপনি একটু অপেক্ষা করুন দাদাবাবু, আমি মেমসাহেবের নাস্তাটা দিয়ে এসেই আপনার জন্যে আবার নতুন করে দু'টো ডিম ভেজে দিচ্ছি—

বলে ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে নিয়ে মেমসাহেবের ঘরের দিকে চলে গেল। যাবার সময় কাশী দত্তর দিকে চেয়ে বলে গেল—আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি—

মা'র দিকে চেয়ে কাশী দত্ত বললে—দেখলে তো ? শুনলে তো ঠাকুরের কথা ? আমার হক আছে এ-বাড়িতে ডিম খাওয়ার। সোহম্ আমার নিজের মামাতো ভাই, এই কথা এতক্ষণ পাড়ার সবাইকে বলছিলুম, জানো। সকলকে

বলে এলুম। বললুম কারোর যদি চাকরির দরকার থাকে তো আমাকে বলো, আমি আমার ভাইকে বলে চাকরি করে দেব—

—কোন্ আক্কেলে তুই এই কথা তাদের বলে এলি? কাদের বলে এলি?

কাশী দত্ত বললে—সে তুমি চিনবে না।

—তা আমি যদি না চিনি তো তুই-ই বা তাদের চিনলি কী করে? তারা কারা?

কাশী দত্ত বললে—একজন চা-ওয়ালা। আর একজন হলো এক তেলে-ভাজাওয়ালা, দু'জনেই আমাকে চা খাওয়ালে, তেলেভাজা খাওয়ালে, পয়সা নিলে না। কত ভালো লোক আছে কলকাতায়, তা জানো?

—তা তুই তাদের চাকরি দিবি বলে এলি? কী করে দিবি চাকরি?

কাশী দত্ত বললে—সোহম্‌কে বলে।

—আজকে এই কথা বলছিস তুই? সেদিন যে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি বেশি ভাত খায় বলে, সে-কথা কি ভেবেছিস সোহম্ ভুলে গেছে?

কাশী দত্ত বললে—রাগের মাথায় মানুষ কত কী করে, কত কী বলে, তা নিয়ে কি কেউ মাথা ঘামায় তা কি কেউ মনে রাখে?

পিসীমা ছেলের কথা শুনে নিজের মনেই গজ-গজ করতে লাগল। যেন নিজের মনেই বলতে লাগল—এত বয়েস হলো তবু তোর একটু জ্ঞান-গম্যি হলো না—যাক, যা ভালো বুঝিস তাই কর্, আমি আর কী-বলবো! শেষকালে সোহম্ তোকেই এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে না দেয়—তখন কিন্তু তাকে দোষ দিতে পারবি না, এই কথা তোকে বলে রাখছি—

অফিসে গিয়ে সোহম্ অবাক হয়ে দেখলে মিঃ সেন তারও আগে এসে হাজির হয়েছেন।

যেদিন থেকে সোহম্ চাকরিতে প্রমোশন পেয়েছে সেই দিন থেকেই সে ভোরেই অফিসে আসার অভ্যেস করে আসছে। প্রমোশনটা হয়েছিল বোম্বাইতে। মিঃ আয়েঙ্গারও সকাল-সকাল অফিসে আসতেন। যারা ওপরের স্তরের অফিসার তাদের সকাল-সকাল অফিসে আসাই নিয়ম। তাতে নিচের স্তরের স্টাফরা ঠিক সময়ে অফিসে আসার শিক্ষা নেয়। সেই বোম্বাই থেকেই সোহমের সাতসকালে অফিসে আসার যে অভ্যাসটা হয়েছিল, কলকাতায় ফিরে এসেও সেটা ছাড়েনি। এখানে কলকাতায় বদলি হয়ে এসেও সে অভ্যেসটা সে চালিয়ে যাচ্ছে।

তখন সুইপার ডাস্টার কেউই আসেনি। আসার সময়ও হয়নি তাদের। কোনও দিনই আসে না তারা ওই সময়ে। কারণ তারা বাড়ি থেকে একেবারে দিনের খাওয়া খেয়ে অফিসে আসে।

সোহম্ দেখলে মিঃ সেনের ঘরে আলো জ্বলছে। সে একটু অবাক হয়ে গেল। সোহমের আগে মিঃ সেন কোনও দিনই অফিসে আসেন না। হঠাৎ আজকে কেন এলেন বুঝতে পারলে না সে।

সে নিজের কামরার জানালাটা খুললে ; তারপর আলোর সুইচ টিপে একটা ময়লা কাপড় দিয়ে টেবিল-চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিলে। তারপর সোজা মিঃ সেনের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মিঃ সেন মুখ তুলে সোহমকে দেখে বললেন—ও, তুমি এসে গেছো ?

সোহম্ বললে—আমি তো রোজ এই সময়ে আসি স্যার। কিন্তু আপনি আজ এত সকালে ?

—তুমি বোস, তোমার সঙ্গে একটা ইম্পর্ট্যান্ট্ কথা আছে—

সোহম্ চেয়ারের ওপর বসলো। বুঝতে পারলে না কী এত ইম্পর্ট্যান্ট কথা আছে, যার জন্যে তিনি এত সকাল-সকাল অফিসে এসেছেন।

মিঃ সেন সামনে রাখা একটা চিঠি সোহমের দিকে এগিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন—এটা পড়ো, রীড দিস্ লেটার।

সোহম্ চিঠিটা পড়ে অবাক হয়ে গেল। চিঠিটা লিখেছে ইউনিয়নের তিন-জন লীডার—ইব্রাহিম, কেশব মাইতি আর বিভূতি পোদ্দার। এরা সবাই তার এককালের ইয়ার-বন্ধু। এদের সঙ্গে মিশে এদের সঙ্গে বিড়ি খেয়ে এদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে একদিন সে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়েছিল। মিঃ সেন সেই রকম বুদ্ধিই দিয়েছিলেন। কোম্পানির ভালোর দিকে চেয়ে এই এদের সঙ্গেই কতদিন সে জেগে রাত কাটিয়েছে। কত টাকা খরচ করেছে সোহম্ এদের মদ খাওয়াতে। আর শুধু কি মদ ? মদের সঙ্গে চাট না খেলে কি চলে ? চাট মানে চাচার হোটেলের শিক্-কাবাব, কোনও দিন বা আমজাদিয়া হোটেলের বিরিয়ানী আর রোগনজুস্। ইব্রাহিম, কেশব মাইতি বা বিভূতি পোদ্দার জীবনে এই সব জিনিস খায়নি। সোহমের কল্যাণে এই সব খেতে পেয়ে তারা ধন্য হয়ে যেত তখন। আর সোহম্ও তারা যা খেতে চাইতো তাই খাওয়াতো। কারণ খরচের কথা তো ভাবতে হতো না তাকে। এ-সব খরচ দিত কোম্পানি, মানে মিঃ সেন। সে-কথা বাইরের কেউই জানতো না।

মাঝে মাঝে মিঃ সেনের সঙ্গে গিয়ে লুকিয়ে দেখা করতো সোহম্।

মিঃ সেন জিজ্ঞেস করতেন—কী খবর সেন ? কতদূর এগোল ? ওদের সামনে আমার বিরুদ্ধে খুব গালাগালি দিচ্ছ তো ?

—হ্যাঁ স্যার, আপনি যা-যা বলে দিয়েছিলেন করতে, সে সবই করছি।

—দিশি-বিলিতি মদ, যা-কিছু খেতে চায় ওরা সব খাওয়াচ্ছো তো ?

—সমস্ত সমস্ত, আপনি যা-যা করতে বলেছেন সবই আমি ঠিক ঠিক করে যাচ্ছি—

—চাচার হোটেলের শিক্-কাবাব্ ?

—হ্যাঁ খাইয়েছি—

—আমজাদিয়ার পরোটা আর 'রোগনজুস্' ?

—হ্যাঁ স্যার, তাও খাইয়েছি ওই তিনজকে।

মিঃ সেন বলেছেন—কোনও দিন গ্র্যান্ডে 'পাম্ গ্রোভে' কিংবা 'মোগল-হারেমে' ?

সোহম্ বলেছে—না, স্যার, ওতে অনেক টাকা খরচা হয়। ও-সব বড় বড় ফাইভ-স্টার হোটেলে গেলে ওদের সন্দেহ হবে!

মিঃ সেন বলেছেন—তোমাকে কত টাকা দিয়েছিলুম মোট ?

—আপনি খেপে-খেপে টাকা দিয়েছেন। সব আমি হিসেব রেখেছি স্যার। যতদূর মনে পড়ে আপনি আমাকে মোট হাজার পাঁচেক টাকা দিয়েছেন—

—হাতে আর কত আছে ব্যালেন্স ?

—এই শ' দু'একের মতন!

শুনেই মিঃ সেন চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। তারপর ঘরের কোণের দিকে একটা আয়রন-চেস্ট ছিল, সেখানে গেলেন। সেখানে ইম্প্রেশ্ট্ ক্যাশ টাকা থাকে। চাবিটা খুলে তার ভেতর থেকে আরো পাঁচ হাজার টাকা বার করলেন। করে নিজের চেয়ারে এসে টাকাগুলো সোহমের দিকে এগিয়ে দিয়েছেন।

সত্যি সত্যি, সোহমের মত চরিত্রের ছেলের পক্ষে অফিসের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হওয়া সহজ হয়নি। কোম্পানি টাকা দিয়েছে সোহম্‌কে, আর সোহম্ সেই টাকা খরচ করেছে এই ইব্রাহিম, কেশব মাইতি আর বিভূতি পোদ্দারের পেছনে।

তার পরের ইতিহাস সোজা। ইউনিয়নের মেম্বারদের ভোটে সোহম্ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়েছে। গরম গরম লেকচার দিয়েছে মিঃ সেনকে কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়ে। তারপর পেছন থেকে মিঃ সেনের কাছে টাকা খেয়ে বোনাস আর ধর্মঘটের দাবী বান্‌চাল করে দিয়েছে। তার ফলে সে-বছরে কোম্পানির চল্লিশ লক্ষ টাকা বেঁচে গেছে।

বোম্বাই থেকে মিঃ আয়েঙ্গার টেলিফোন করে জানতে চেয়েছেন কেমন করে স্ট্রাইক এড়ানো সম্ভব হোল, তার জবাবে মিস্টার সেন বলেছেন—এর পেছনে একটা লোকেরই বাহাদুরি, একটা লোকেরই ক্রেডিট আছে—

—সে কে ? হু ইজ হি ?

—সে আমাদের লোয়ার ক্যাডারের স্টাফ।

—হোয়াট ইজ হিজ নেম ? তার নাম কী ?

মিঃ সেন জবাব দিয়েছেন—সোহম্ রায়।

—কত মাইনে পায় সে এখন ?

মিঃ সেন বলেছেন—এ্যাবাউট্ থ্রি হানড্রেড, এই তিনশো টাকার মতন—

মিঃ আয়েঙ্গার ওধার থেকে বলেছেন—ভেরি পুওর পে। মাইনেটা বড্ড কম। ওকে এখন একটা প্রমোশন দেওয়া উচিত।

মিঃ সেন এধার থেকে বলেছেন—সেটা আমিও ভেবেছি! কোম্পানির চল্লিশ লক্ষ টাকা যে বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে একটা প্রমোশন দেওয়া উচিত। কিন্তু তাতে স্টাফের সন্দেহ হবে। তাই আমি ভাবছি একটা কাজ করবো…

—কী কাজ ?

—আমি তাকে ট্রানস্‌ফার করে দেব আপনার বোম্বে অফিসে। সেখানে তাকে আপনি একটা প্রমোশন দেবেন। তারপর এখানকার অফিসে ওয়েলফেয়ার অফিসারের পোস্টটা ততদিনে খালি হয়ে যাবে। তখন ওই পোস্টটার জন্যে যারা যারা গ্র্যাজুয়েট তাদের কাছ থেকে দরখাস্ত চাওয়া হবে। তখন নাম্-কা-ওয়াস্তে একটা লোক-দেখানো পরীক্ষার ব্যবস্থা করবো। তারপর ইণ্টারভিউ। সেই ইণ্টারভিউতে আমি সোহম্ রায়কে প্রমোশন দেব, তখন আর কেউ কিছু সন্দেহ করবে না—

মিস্টার আয়েঙ্গার ওধার থেকে বলেছেন—নাইস আইডিয়া, ক্যারি অন্—খুব ভালো মতলোব, আপনি এই মতলোব মতো কাজ করে যান। আমার এখানে একটা ভেকেন্সি আছে, সেণ্ড হিম হিয়ার। আই শ্যাল টেক হিম হিয়ার এ্যাণ্ড নাউ—

এই প্ল্যান অনুযায়ীই কাজ হয়েছিল। যার ফলে সোহম্ একজন সাধারণ ক্লাস-থি স্টাফ্ থেকে একেবারে গেজেটেড-অফিসারের চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। একেবারে পাঁচ হাজার টাকার গ্রেডে। ইংরিজী ভাষায় যাকে বলে 'ফ্রম লগ্-কেবিন টু হোয়াইট-হাউজ' !

এ শুধু সোহমের একলার ক্ষেত্রেই নয়, আরো হাজার-হাজার-লক্ষ-লক্ষ-কোটি কোটি সোহম্ রায় ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে। যেদিন থেকে 'ট্রেড-ইউনিয়ান' জিনিসটা আরম্ভ হয়েছে পৃথিবীতে সেই দিন থেকেই মালিক-পক্ষ তার বিরুদ্ধে একজন কি দশজন সোহম্ রায় খুঁজে বার করেছে এবং বিশ্বাসঘাতকতা করবার লোকেরও কোনও অভাব হয়নি। এ শুধু চাকরির ক্ষেত্রেই নয়, সব ক্ষেত্রেই এই রকম। কাউকে বশ করা হয়েছে টাকা দিয়ে, কাউকে বা উপাধি দিয়ে। খেলার ক্ষেত্রে আর রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা বেশি চলে। খেলোয়াড়রা পাকা চাকরি, ক্যাশ ব্ল্যাক মানি, আর একটা পশ্ সস্তার ফ্ল্যাট। আর মন্ত্রীরাও তাই। আর সাহিত্যিক কবিরা এতদিন এ-সবের ঊর্ধ্বে ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে সাহিত্য-আকাদমি হয়েছে, পুরস্কার প্রথার প্রবর্তন হয়েছে, সেইদিন থেকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোহম্ রায়েদের আবির্ভাব হয়েছে। রায়-সাহেব, রায়-বাহাদুর, পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণের বেলায়ও সেই একই ব্যাপার।

কিন্তু সে কথা থাক। মিঃ সেন সোহমের দিকে চেয়ে বললেন—চিঠিটা পড়লে ?

—হ্যাঁ। সেই ইব্রাহিম, কেশব মাইতি আর ভূপতি পোদ্দার ! তারা সই করেছে দেখছি চিঠির তলায়—

—স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে ; সেটাও লক্ষ্য করো। তুমি 'ওয়েলফেয়ার

অফিসার', তোমার বিরুদ্ধেই ওদের যত রাগ। আমি তখনই বলেছিলাম ওরা সবাই তোমাকে সন্দেহ করবে। ঠিক তাই-ই করেছে।

সোহম্ বললে—লিভ্ ইট্ টু মী। আমার ওপর এ-ব্যাপারটা ছেড়ে দিন স্যার। আমি সব বন্দোবস্ত করবো। শুধু কোম্পানির কিছু টাকা খরচ হবে। আমি জানি টাকাতে জব্দ হবে না এমন লোক দুনিয়ায় কেউই নেই, বিশেষ করে সেকেণ্ড্ ওয়ার্লড্ ওয়ারের পর। এই গেল-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা মানুষের মর্যালস্-এর ওপর চূড়ান্ত আঘাত দিয়ে গেছে। নীতি-বোধটা একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দিয়েছে।

মিস্টার সেন জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে কী করবে ভাবছো?

সোহম্ বললে—আমি তো বললাম 'লিভ্ ইট্ টু মী', আমার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে আপনি নাক ডাকিয়ে ঘুমোন। আমি নিজে এর রিপ্লাই দেব।

হঠাৎ মিস্টার সেন প্রসঙ্গ বদলে দিলেন। যেন একটা দরকারী কথা মনে পড়ে গেছে এমনি ভাবে বললেন—হ্যাঁ, ভালো কথা, সেই প্যাটেল ইণ্টারন্যাশন্যাল এন্‌টারপ্রাইজের ভানুভাই প্যাটেলের খবর কী? এখনও ক্লাবে যাচ্ছো তো?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, রোজ মিসেস্‌কে নিয়ে সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে যাচ্ছি—

তা মিসেসের এখন ড্রিঙ্কস্‌টা অভ্যেস হয়ে গেছে তো?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ। এখন আর তার মাথা ঘোরে না। গা-বমি করে না আগেকার মত। মিস্টার প্যাটেল এলে আমাদের কার্যসিদ্ধি করতে মনে হয় আর অসুবিধে হবে না।

বলে চিঠিটা নিয়ে সোহম্ দাঁড়িয়ে উঠলো।

বললে—এই চিঠিটার রিপ্লাইটা ড্রাফট্ করে আনছি, এখন চলি—

বলে সোহম্ চিঠিটা নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

কোম্পানির চল্লিশ লক্ষ টাকা লোকসান যে বাঁচিয়েছে, কোম্পানির কাছে তার ইজ্জৎ কম নয়। কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যই তো টাকা উপায় করা। কোম্পানি টাকা উপার্জন করলে তবেই তো তার স্টাফরা ভালো মাইনে পাবে। তাতে কোম্পানিরও যেমন লাভ, স্টাফেদের লাভও তেমনি। লাভ এই যে তাদের কর্তারা গাড়িতে চড়ে বেড়াবে, তাদের ছেলে-মেয়েরা সেই গাড়ি চড়ে স্কুলে যাবে, স্কুল থেকে আসবে। আর শুধু কি তাই? ছুটির সময়ে তারা অফিসের খরচে অফিসের গাড়িতে কাছাকাছির মধ্যে সপরিবারে দীঘা কি পুরী, কিংবা শিমুলতলা যাবে। আজকাল আবার হয়েছে মাইথন। দিন-দিন ভোগের উপকরণ তো বেড়েই চলেছে, অভাব হয়েছে শুধু টাকার।

আসলে এটা কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, অথচ এটা সকলেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোম্পানি দাঁড়ালেই তবে তো স্টাফরা দাঁড়াবে। কিন্তু কোম্পানির আয় বাড়লে যদি স্টাফদের মাইনে না বাড়ে? তাহলে?

তাহলেই যত বিরোধ বাধে। এই বিরোধ বাধে বলেই আজ 'ট্রেড-ইউনিয়ন-মুভমেণ্ট'র এত বাড়-বাড়ন্ত। আর ট্রেড-ইউনিয়ন-মুভমেণ্টের এত যত বাড়-বাড়ন্ত বলেই তা নিয়ে এত জুয়াচুরি। এই জুয়াচুরির জন্যেই এই এক-একজন

সোহম্ রায়ের জন্ম !

তাই পৃথিবীর সব অফিসেই এক-একজন সোহম্ রায় আছে। সেই সোহম্ রায়রা বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে বিরাজমান। কখনও তাদের নাম বিভীষণ, কখনও তাদের নাম মীরজাফর, কখনও তাদের নাম কুইস্লিং। আবার কখনও তাদের নাম সোহম্ রায়।

সোহম্ রায়দের বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ, সোহম্ রায়দের মুখ ভারি মিষ্টি। সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর মিষ্টি মুখের জোরে বিনা মূলধনে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারা সকলের মাথার ওপর গিয়ে ওঠে।

সেই কেশব মাইতি, ইব্রাহিম আর বিভূতি পোদ্দার ! সেই আগেকার দিনের সেই সব ইয়ার-বন্ধু। আগে চারজনে মিলে কত গালাগালি দিয়েছে কোম্পানির মালিককে। কত মুখ খিস্তি করেছে মিটিং-এ দাঁড়িয়ে এই সেন-সাহেবকে। তারপর সোহম্কেই তারা সবাই মিলে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট করে দিয়েছে। তারপর কোম্পানির কাজে সোহম্ রায় বদলি হয়ে গেছে বোম্বাইতে। আর সেখান থেকেই এই প্রমোশনটা নিয়ে এসে বসেছে একেবারে তাদের মাথায়।

এটা কারই বা সহ্য হয় ? সোহম্ বুঝতে পারলে যে তাদের যতটা না রাগ কোম্পানির ওপর, তার চেয়ে তাদের বেশি রাগ সোহমের ওপর।

সোহমের পকেটে তখনও সেই চিঠিটা ছিল। সে চিঠিটা বার করে আর একবার পড়লে। কোম্পানিকে ভয় দেখানো মানেই ওয়েলফেয়ার অফিসারকে ভয় দেখানো।

চিঠি পাওয়ার পনের দিনের মধ্যে উত্তর না দিলে তারা যথাবিহিত ব্যবস্থা নেবে। তার মানেই ধর্মঘট করবে।

সোহম্ ছুটির পর নিজের বাড়ি গেল না। সোজা গেল ইব্রাহিমের বাড়ি। পৈতৃক বাড়ি ইব্রাহিমের। ইব্রাহিমের অবস্থা ভালো। বড় ভাইরা কলকাতায় বড় বড় চাকরি করে। ভাইদের মধ্যে ইব্রাহিম শুধু চাকরিই করে না, ইউনিয়নের লীডার-গিরিও করে। সে নেতা।

তাই সে পোশাকে-পরিচ্ছদে বরাবর একটু সাধারণ সাদা-সিধে ভাবে থাকে। তাই বরাবর খয়েরি রং-এর একটা পাঞ্জাবি আর একটা সাদা রং-এর পায়জামা পরে সে। এই-ই তার চিরকালের সাজপোশাক।

ইব্রাহিমকে ডাকতেই সে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে সোহম্কে দেখে অবাক।

—আপনি ?

সোহম দুই হাত দিয়ে ইব্রাহিমের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো—সে কি রে ! আমি আবার তোর কাছে 'আপনি' হলুম কবে ? তোর কাছে আমি কি হঠাৎ এত বড় হয়ে গেলুম যে তুই আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলছিস ? তুই কি সে-সব দিনের কথা বেমালুম ভুলে গেলি ?

ইব্রাহিম একটু অবাক হয়ে গেল সোহমের কথা শুনে। আম্তা-আম্তা করে বললে—এখন তো তুই অফিসার হয়ে গেছিস ভাই—

সোহম্ হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললে—আমি অফিসার হয়ে গেলুম বলে কি আমি পর হয়ে গেলুম? কি বলছিস রে তুই? জীবনে কি টাকাটাই বড় হয়ে গেল রে? আমার মাইনে বাড়লো বলে আমাকে তোরা একেবারে পর করে দিবি? টাকা বড় না বন্ধুত্ব বড়?

তোকে 'তুই' বললে তুই রাগ করবি না তো?

সোহম্ বললে—সে-সব দিনের কথা দেখছি তাহলে তোর মনে নেই! এক-সঙ্গে কত বোতল মদ খেয়েছি সবাই মিলে, একসঙ্গে কত হোটেলে গেছি, কত অকম্ম কত কুকম্ম করেছি তা কি ভোলা যায়?

সব তোর মনে আছে?

সোহম্ বললে—সব মনে আছে। সব। তুই তো জানিস আমার বাপ-মা কেউ নেই। একদিন একটু বেশি ভাত খেয়েছিলুম বলে আমার পিসতুতো দাদা রাত দশটার সময় আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর কত কষ্ট করে কত লোককে খোসামোদ করে এই চাকরিটা পেয়েছিলুম, সে-সমস্তই তো তোদের বলেছি

ইব্রাহিম বোধ হয় সোহমের কথায় একটু ভিজলো। বললে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে কি লাভ? আয়, ভেতরে আয়—

সোহম্ বললে—না, চল্ কেশবের বাড়িতে যাই। অনেক দিন কারোর সঙ্গেই দেখা হয়নি। সব্বাইকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।

ইব্রাহিম বললে—এতদিন পরে তুই এলি, অথচ বাড়িতে বসলি না, এ-রকম তো আগে কখনও হয়নি—

সোহম্ বললে—এই অফিসটাই আমাকে মেরে ফেলবে রে। অথচ আগে একদিন তোদের সঙ্গে দেখা না হলে আমার পেটে ভাত হজম হতো না—তা জানিস?

ইব্রাহিম বললে—কিন্তু কেন এমন হলো?

সোহম্ বললে—যত দোষ আমার এই চাকরিটার—সেন সাহেব আমাকে প্রমোশন দিয়ে আমার সব রক্ত শুষে নিচ্ছে। সেই জন্যে আজ অফিস থেকে বেরিয়েই তোর বাড়িতে এসেছি—। আজকে আবার সেই আগেকার মত তোদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছে

ইব্রাহিম বললে—তুই সত্যি কথা বলছিস?

সোহম্ বললে—কেন, আমাকে তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

ইব্রাহিম বললে—কী করে বিশ্বাস হবে? যেদিন থেকে তোর মাইনে বেড়েছে সেদিন থেকে তুই আমাদের দিকে একবারও চেয়ে দেখেছিস? একবারও আমাদের কথা ভেবেছিস? তোকে যে ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছিলুম, তা কি এই জন্যে?

সোহম্ বললে—তুই যা বলছিস ঠিক এই কথা আমার স্ত্রীও আমাকে বলে—

—তাই নাকি? কী বলে?

—বলে—যারা তোমাকে এত ভালোবাসে তাদের সঙ্গে দেখা না করে তুমি

কেবল অফিস নিয়ে থাকো কেন দিন-রাত? বলে—তোমার মাইনে বেড়ে তো বড় মুশকিল হলো দেখছি।

তারপর একটু থেমে সোহম্ আবার বললে—আমার স্ত্রী দেখে কি না যে অফিসের ফাইল্ বাড়িতে নিয়ে এসে রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করি।

ইব্রাহিম বললে—তবে যে সবাই বলে তুই তোর বউকে নিয়ে ক্লাবে যাস!

—ক্লাবে যাই কি সাধে? সেও তো সেন-সাহেবের অর্ডার রে! সেও এক-রকম অফিসের কাজই বলতে পারিস। তাতে রেফারেন্স বাড়ে, কোম্পানির অর্ডার সিকিওর হয়। সেও তো এক-রকমের চাকরি—

ইব্রাহিম বললে · শুধু কি তাই, তোর খরচ-খরচা তো সব কোম্পানি দেয়?

—অফিসের কাজের জন্যে যা কিছু খরচ-খরচা হবে সব তো কোম্পানিই দেবে। তা নয় তো কি আমি পকেট থেকে দেব?

—কিন্তু তুই তো পরের পয়সায় মদ খেতে পাস? তার বেলায়?

সোহম্ বললে—চল্, গাড়িতে ওঠ্, চলতে চলতে বলি—গাড়িতে বসে এর জবাব দেব।—

গাড়ি চলতে লাগলো। ইব্রাহিম সোহমের গাড়ির ভেতরে বসে সোহমের সৌভাগ্যের কথা ভাবতে লাগলো। এই সেই সোহম্! ট্রেড-ইউনিয়নের কিছু জানতোই না একদিন এ। বিভূতি কেশব আর ইব্রাহিম, এই তিনজন মিলে তাকে সব শিখিয়েছিল। কী করে বক্তৃতা করতে হয়, কী ভাষায় কোম্পানির মালিককে গালাগালি দিতে হয়, এই সব শিক্ষা ওদের কাছ থেকেই সোহম্ পেয়েছে। সোহম্ তখন কার্ল মার্কস্-এর নামও শোনেনি। শুধু নাম নয়, নামের বানানটাও জানতো না।

কেশব বলতো—সে কী রে, তুই কার্ল মার্কস্-এর নামই শুনিসনি?

সোহম্ বলতো—না ভাই, সে কে?

—তুই মহাদেবের নাম শুনেছিস?

সোহম্ বলতো—হ্যাঁ, শুনেছি। মহাদেব মানে শিব!

—কালী?

সোহম্ বলতো—হ্যাঁ, কালীর নাম শুনেছি। কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে মা-কালীকে দেখেছি। ঠন্ঠনেতেও মা-কালী আছে—

কেশব আবার জিজ্ঞেস করতো—কার্তিক ঠাকুর দেখেছিস?

সোহম্ বলতো—হ্যাঁ, কার্তিক পুজোর সময় দেখেছি ময়ূরের ওপর কোঁচানো ধুতি পরে কার্তিক ঠাকুর বসে থাকে।

—সরস্বতী ঠাকুর?

সোহম্ বলতো—হ্যাঁ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, সব ঠাকুরকে দেখেছি।

—তুই চার্চিলের নাম শুনেছিস?

—হ্যাঁ, ইংল্যাণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার ছিল।

—হিটলার?

সোহম্ বলতো—হ্যাঁ, জার্মানীর ফুরের।

কেশব বলতো—তাহলে তো তুই সবাইকে চিনিস। বল্‌ তো, আব্রাহাম লিন্‌কন্‌ কে ?

সোহম্‌ বলতো—আমেরিকার একজন প্রেসিডেণ্ট—

—চৈতন্যদেব ?

সোহম্‌ বলতো—বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক আর প্রতিষ্ঠাতা—

—গৌতম বুদ্ধ ?

—বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা।

কেশব মাইতি, বিভূতি পোদ্দার ইব্রাহিম, সবাই সোহমের অজ্ঞতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কেশব বলতো—এ কী রে, যাদের নাম তুই করলি তাদের চেয়ে হাজার-হাজার গুণ যে বড় তার নামই শুনিসনি ? তোর ওই মহাদেব, গণেশ কার্তিক, কালী, সরস্বতী, গৌতম বুদ্ধ, চৈতন্যদেব, তাদের সকলের চেয়ে বড় হলো কার্ল মার্কস্‌। আর তুই সেই তাঁর নামটাই শুনিসনি ? কী করে তুই বি-এ পাস করলি, তা আমি বুঝতে পারছি না—। তুই বোধ হয় টুকে বি-এ পাস করেছিস।

সোহম্‌ সেদিন সত্যিই কার্ল মার্কস্‌-এর নাম শোনেনি! মানে, কেউ তাকে কখনও সে-নাম শোনায়নি। তাতে তার কী অপরাধ ?

বিভূতি বলতো—তুই কখনও লেবার-লীডার হতে পারবি না। তুই মিছিমিছি এ-লাইনে এসেছিস। তুই চিরকাল কেরানী হয়ে থাকবার জন্যে জন্মেছিস। তোর জীবনে কিস্‌সু হবে না। যে কার্ল মার্কস্‌-এর নামটা পর্যন্ত শোনেনি, সে কি আবার একটা মানুষ ?

সত্যিই সোহম্‌কে সেদিন মানুষ বলে মনে করতো না ওরা। আর ওদিকে তখন লুকিয়ে লুকিয়ে সোহম্‌ সেন-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতো।

সেন-সাহেব জিজ্ঞেস করতেন—কদ্দুর এগুলো রায় ?

সোহম্‌ বলতো—এগোচ্ছে একটু একটু করে—

—কী রকম ?

সোহম বলতো—আমি কার্ল মার্কস্‌-এর নাম শুনিনি, বলেছি।

—তাতে ওরা কী বললে ?

সোহম্‌ বলতো—ওরা বললে আমার নাকি এ-লাইনে আসা উচিত হয়নি। আমি বোধ হয় টুকে বি-এ পাস করেছি। আরো বললে—কার্ল মার্কস্‌ সব চেয়ে বড়। পৃথিবীর যত দেব-দেবী আছে তাদের চেয়েও বড়। এমন কি যীশুখৃস্টের চেয়েও বড়। আমাকে ওরা জ্ঞান দিতে লাগলো। আমি যত মুখ্যু সাজতে লাগলুম ওরা ততই আমাকে আরো জ্ঞান দিতে লাগলো—

সেন-সাহেব বলতেন—ভেরি গুড্‌, ভেরি ভেরি গুড্‌। তুমি ওদের কাছে একেবারে ইনোসেণ্ট সেজে থাকবে, বুঝলে ? তা আর টাকা লাগবে তোমার ?

সোহম্‌ বলতো—না—

—না না, আরো টাকা নাও—

বলে প্রায়ই সেন-সাহেব তাকে জোর করে টাকা দিতেন। সোহম্‌ না চাইলেও

দিতেন। সেই টাকা দিয়ে সোহম্ ওদের খাওয়াতো। ওই ইব্রাহিম বিভূতি পোদ্দার আর কেশব মাইতিদের।

এইরকম ভাবে টাকা খরচ করে, আনাড়ি আর বোকা সেজে সোহম্ 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্' কোম্পানির লেবার-ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হয়ে গেল একদিন।

সেন সাহেব বলতেন—তুমি লেকচার দিতে পারবে তো ?

সোহম্ বলতো—ওরা আমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছে—

সেন সাহেব বলতেন—লেকচার দিতে দিতে আমার নাম করে তুমি খুব গালাগালি দেবে, বুঝলে ?

—আপনাকে গালাগালি দেব ? তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না তো ?

সেন সাহেব বলতেন আরে না, তাতে কোম্পানিরও আরো ভালো হবে আর তোমারও আরো ভালো হবে। তুমি আমাকে যত গালাগালি দেবে তত তুমি ওদের বিশ্বাসভাজন হবে। তাতে কেউ আর সন্দেহ করবে না যে তুমি কোম্পানির স্পাই।

এমনি করেই একদিন সোহম্ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর এই কায়দাতেই সেদিন কোম্পানির চল্লিশ লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছিল। আর তার পুরস্কার হিসেবেই সোহম্ বোম্বাই-অফিসে বদলি হয়ে গিয়েছিল। আর তার পর যখন কলকাতার অফিসে ওয়েলফেয়ার অফিসারের পোস্টটা খালি হলো, তখন সে পোস্টটা পেলে সোহম্। সেটাই তার চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরমতম প্রাপ্তি!

আজ সোহম্ যখন আরামের শিখরের ওপর উঠেছে, আর আরো ওপরে ওঠবার প্রতিশ্রুতি তার সুনিশ্চিত হয়েছে তখনই লেবার ইউনিয়নের তিন লীডার ইব্রাহিম কেশব মাইতি আর বিভূতি পোদ্দার তাকে হেনস্থা করবার জন্যে এই চিঠি দিয়েছে।

গাড়িটা শোঁ-শোঁ করে গড়িয়ে চলছিল।

ইব্রাহিম হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—কী ভাবছিস ?

সোহম্ বললে—আমি ভাবছি তোদের কথা। তোর কথা, বিভূতির কথা, আর কেশবের কথা। তোরাও কিনা শেষকালে আমাকে ভুল বুঝলি ভাই ? তোদের সঙ্গে এতদিন এত মেলামেশা করেও আজ তোদের চেয়ে আমি একটু বেশি মাইনে পাচ্ছি বলে তোদের শত্রু হয়ে গেলুম—এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে ?

ইব্রাহিম বললে—আমরা যে চিঠিখানা দিয়েছি সেটা কি সেন-সাহেব পেয়েছে ?

সোহম্ বললে—সেন-সাহেবের কাছে এখনও পৌঁছোয়নি। তবে আমার হাতে সেটা এসেছে। এই দ্যাখ্, এই তোদের সেই চিঠি। এই চিঠি পেয়েই তোদের কাছে চলে এসেছি—

ইব্রাহিম চিঠিটা দেখলে। ইব্রাহিমই হলো এখন ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট। সোহমের বোম্বাই বদলি হওয়ার পরেই ইব্রাহিম প্রেসিডেণ্ট হয়েছিল। ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হতে গেলে মানুষের যা-যা গুণ থাকা দরকার ইব্রাহিমের চরিত্রে সেই

সমস্ত গুণেই ছিল। ইব্রাহিমের পয়সার অভাব ছিল না। পৈতৃক টাকা তো ছিলই, নিজেদের বিরাট বাড়িও ছিল কলকাতার বুকের ওপর। তবু যে সে টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্‌ অফিসে চাকরি করতো সে শুধু লীডার হওয়ার লোভে। হাতে ওয়ার্কার থাকলে কালক্রমে একদিন বড় নেতা হওয়া যাবে। তারপর একদিন বিধানসভায় এম-এল-এ। আর তারপর একদিন এম-পি। তারপর চাকরি ছেড়ে দেওয়া। তারপর চাকরি দিয়ে আবুল-কালাম-আজাদের মত একজন সেন্‌ট্রাল মিনিস্টার হওয়া।

ইব্রাহিমের জীবনের এই-ই ছিল চরম লক্ষ্য।

ইব্রাহিম বলতো—আমি সর্বহারাদের সেবা করতে চাই। কারণ আমি নিজেও সর্বহারা ; তাই সর্বহারাদের কষ্ট আমি যেমন বুঝবো অন্য কেউ তেমন করে বুঝতে পারবে না—

হঠাৎ ইব্রাহিম বললে—তুই কোথায় যাচ্ছিস ?

সোহম্‌ বললে - বিভূতি আর কেশবের বাড়িতে—এই চিঠিটা দেখাতে !

ইব্রাহিম বললে – ওদের বাড়িতে গিয়ে কী হবে ? প্রেসিডেণ্ট তো আমি—। আমি যা বলবো তাতেই ওরা রাজি হবে। তুই আমাকেই বল্‌ না, কী বলতে চাস তুই —

সোহম্‌ বললে—তাহলে চল্‌, কোথাও গিয়ে বসি ! নিরিবিলিতে বসে বলতে হবে। গাড়িতে বসে ঠিক জমবে না—

ইব্রাহিম বললে—আচ্ছা, তাই চল্‌—

রাত আটটা বাজলো, ন'টা বাজলো। সুমিত্রা সমস্ত বিকেলটা অপেক্ষা করেছে সোহমের জন্য। তারপর একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটা গল্পের বই তুলে নিলে।

হঠাৎ বাইরে থেকে শব্দ হলো—বউমা !

সুমিত্রা বললে—কে ? পিসীমা ?

এতক্ষণে পিসীমা পর্দা সরিয়ে বললে—ভেতরে আসবো বউমা ?

—হ্যাঁ, আসুন না।

এবার নির্ভয়ে পিসীমা ভেতরে ঢুকে একেবারে সুমিত্রার পায়ের কাছে বসে পড়লো।

সুমিত্রা বললে—আপনি মেজের ওপর বসলেন কেন পিসীমা, ওই চেয়ারটার ওপরে বসুন না।

পিসীমা বললে—না বউমা, আমরা গেরস্থ লোক, আমাদের মেঝের ওপর বসার অভ্যেস আছে। আজ আমার ভাই-পো অফিস থেকে ফিরতে এত দেরি

করছে কেন বলো তো ?

সুমিত্রা বললে —কী জানি পিসীমা, এত দেরি তো কখনও হয় না ওঁর—

এমন সময় নিচের রাস্তায় গাড়ির হর্নের শব্দ হলো।

সুমিত্রা বললে —ওই উনি এসেছেন—

আর খানিক পরেই সোহম্ ঢুকলো। ততক্ষণে পিসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। সোহম্ তখন মদ খেয়ে নেশায় টলছে।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে—কী হলো ? এত দেরি ?

সোহম্ বললে—আজ ইব্রাহিমের কাছে গিয়েছিলাম। ইব্রাহিম বিভূতি পোদ্দার আর কেশব মাইতি—

কেন ? ওদের কাছে গিয়েছিলে কেন ?

সোহম্ বললে—মিস্টার সেন-এর অর্ডার। ওদের সঙ্গে এতক্ষণ মদ খাচ্ছিলাম। দিশী মদ—

—দিশী মদ ? কেন ?

সোহম্ বললে—ওরা আবার স্ট্রাইকের নোটিশ দিয়েছে—

সুমিত্রাও ভাবনায় পড়ল।

বললে—ওরা স্ট্রাইকের নোটিশ দিলে, তাতে তোমাকে মদ খেতে হবে কেন ?

সোহম্ তখন মদের নেশায় টলছে। টল্‌তে টল্‌তে কথা বলতে গিয়ে কথাগুলো মুখে জড়িয়ে যাচ্ছে।

সুমিত্রা বললে—তা তুমি তো আগেও কত মদ খেয়েছ, কখনও তো এমন অবস্থা হয়নি তোমার। বরং আমিই টলেছি, তুমি তো কখনও টলোনি আগে! বসো বসো, এই ইজি-চেয়ারটাতে বসো।

সুমিত্রা সোহম্‌কে নিজের হাতে ধরে ইজি-চেয়ারটাতে বসিয়ে দিলে।

জিজ্ঞেস করলে—কিছু খাবে ? না খেয়ে এসেছ—?

ইজি-চেয়ারটার ভেতরে ডুবে গিয়ে সোহম্ কথা বল্‌তে চেষ্টা করলে। কিন্তু সহজে কথা বেরোল না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ঠোঁটে ঠেকালে। তারপর হাত দিয়ে ইঙ্গিতে সুমিত্রাকে সেটা দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিতে বললে।

সুমিত্রা সিগারেটে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বললে—খুব বোধ হয় নেশা হয়ে গেছে তোমার। একটু তেঁতুল গোলা জল আনতে বলব বদ্যিনাথকে ?

সোহম্ মাথা নাড়লে। অর্থাৎ—না।

সুমিত্রা বললে—খাও না। দেখবে নেশা কেটে গেছে। আমার তো তেঁতুল গোলা জল খেলে বরাবর উপকার হয়। ডাকি না বদ্যিনাথকে—

সোহম্ কোনও রকমে বললে—না, আমার কেমন বমি-বমি ভাব হচ্ছে—

সুমিত্রা বললে—তাহলে আলো নিভিয়ে দেব ? একটু চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করবে ?

সোহম্ মাথা নাড়লে। অর্থাৎ - না।

এতদিন ধরে সোহম্ সুমিত্রাকে নিয়ে গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবে যাচ্ছে, কখনও এমন

কাণ্ড হয়নি। সুমিত্রা একটু ভয় পেয়ে গেল। লেবার-ইউনিয়নের লীডারদের নিয়ে কোথায় গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে কী খেয়ে এসেছে, তারা তাকে কী খাইয়ে দিয়েছে, কে জানে ?

হঠাৎ সোহম্ দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর কিছু কথা না বলে সোজা বাথরুমের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। বাইরে থেকে সুমিত্রার কানে এল সোহমের বমি করার শব্দ। প্রায় দশ মিনিট এমনি করে কাটলো সুমিত্রার। তারপর সোহম্ যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন বেশ সুস্থ সে।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে – এখন একটু আরাম হল ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, কী রকম একটু ব্যথা হচ্ছিল গলার কাছে, এখন আরাম হচ্ছে—

—তুমি কিছু খাবে ?

—না। খেয়ে এসেছি। তুমি খেয়ে নাও—

—কী খেয়েছ ?

সোহম্ বললে—আর বোল না। ওই ওদের সঙ্গে মিশে কিছু খেতে আর বাকি রাখিনি। ব্যাটারা স্ট্রাইকের চিঠি দিয়েছিল। আমাকে চিঠিতে কী বলেছিল জানো ? বলেছিল আমি মালিকের দালাল। মালিকের দালালি করে নিজের মাইনে বাড়িয়ে নিয়েছি, আর ইউনিয়নের মেম্বারদের ডুবিয়েছি। ইউনিয়নের মেম্বারদের রক্ত চোষা টাকা নিয়ে আমি নাকি মালিকের মুনাফা বাড়িয়েছি।

সুমিত্রা শুনছিল। বললে—তারপর ?

—চিঠিটা লিখেছিল সেন-সাহেবকে। সেন সাহেব আমাকে চিঠিটা দিলেন। চিঠিটা পড়ে আমি সেন সাহেবকে বললাম, 'লিভ্ ইট্ টু মি।' তারপর সোজা চলে গেলাম ওদের প্রেসিডেণ্ট ইব্রাহিমের বাড়ি। ইব্রাহিমকে নিয়ে গেলাম খালাসীটোলায়—

—খালাসীটোলা ? সে আবার কোথায় ? ও নাম তো কখনও শুনিনি—

সোহম্ বললে—খালাসীটোলার নাম তুমি কী করে শুনবে ? কেবল ছোটলোকরা সেখানে যায়। সেখানে শুধু দিশি মদ কিনতে পাওয়া যায়।

সুমিত্রা বললে—তা সেখানে কেন গেলে ? ভাল জায়গাতে গেলেই পারতে, যেখানে ভদ্রলোকেরা যায় !

সোহম্ বললে—সেখানে গেলে তো আমার কার্যসিদ্ধি হবে না। ভদ্রলোকেরা যেখানে যায় সেখানে গেলে তো আমাকে 'বুর্জোয়া' বলবে। আমি ওদের সঙ্গে মিশে ওদের মতন হবার জন্যেই তো খালাসীটোলায় গেলুম।—

—তা আগেও তো ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলে, তখন তো খালাসীটোলায় গিয়ে দিশি মদ খেতে হয়নি তোমাকে !

সোহম্ বললে—তখনকার কথা আলাদা। তখন তো আমার এত টাকা ছিল না, আর তখন চাকরিতে মাইনেটাও কম পেতুম। আমার তখনকার আর এখনকার অবস্থার মধ্যে যে অনেক তফাৎ। এখন যদি অফিসার হয়ে ওদের সঙ্গে গলাগলি

করে দিশি মদ না গিলি তো ওরা ভাববে আমি ওদের ছোট নজরে দেখছি, তাই···

সুমিত্রা বললে—আমার একটা কথা শুনবে ?

—কী ?

—বলব ? তুমি রাগ করবে না বলো !

—কেন, রাগ করব কেন ? কী বলতে চাইছিলে বলো ?

সুমিত্রা বললে—বলছিলাম কী, কেন আর ওসব ঝামেলার মধ্যে যাচ্ছো ? এই তো বেশ আছি আমরা। এখন তুমি পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছ, এর চেয়ে আরও বেশি টাকা নিয়ে কী হবে ? আর কেনই বা তুমি অত 'টাকা টাকা' করো ? বেশি টাকা হলেই তো বেশি ঝামেলা—।

সোহম্ বললে—তুমি বলছো কী ? জানো, এমন লোকও আছে কলকাতায় যারা দিনে পাঁচ হাজার টাকা উপায় করে—আর শুধু কি তাই ? দিনে এক লাখ টাকা উপায় করে এ রকম লোকও অনেক আছে—

সুমিত্রা বললে—আমার বাবা বলতেন বেশি টাকা হওয়া ভাল নয় !

—কেন ? বেশি টাকা হলে ক্ষতি কী ?

সুমিত্রা বললে—তা জানি না। বাবা যা বলতেন তা-ই বলছি। বেশি টাকা হলে কি আমরা সোনার রুটি খাবো ? খাবো তো সেই একই ভাত-রুটি যা গরীব লোক বড়লোক সবাই খায়।

—তা খাওয়া-পরাটাই কি সব ? আর কিছু খরচ নেই ?

সুমিত্রা বললে—আমি তো তোমাকে কখনও কিছু কিনে দিতে বলিনি। সেকালে লোকে সোনার গয়না পরতো, হীরের গয়না পরতো, এখন তো চোর-ডাকাতের ভয়ে সে-সব পরা উঠে গেছে—তাহলে আর খরচ কী আছে আমাদের ?

সোহম্ বললে—টাকা হল বুকের বল, তা জানো ? টাকা পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়। আমার তো মনে হয় টাকাই হলো ভগবান !

—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই। ও-কথা মুখে বলাও পাপ !

সোহম্ বললে—এই যে আমার এত মাইনে বেড়েছে, তুমি কি বলতে চাও এ-ও ভগবান দিয়েছে ? এই ফ্ল্যাট, এই গাড়ি, এই এত টাকা, সব ভগবান দিয়েছে ?

—ভগবান দেননি তো কে দিয়েছে ?

—কে আবার দিয়েছে ? সেন-সাহেব দিয়েছে।

সুমিত্রা বললে—ও-কথা বোলো না গো, বলো ভগবান সেন-সাহেবের হাত দিয়ে দিয়েছেন !

—কিন্তু আমার অফিসে তো আরও কত লোক চাকরি করছে, কই, তোমার ভগবান তো সেন-সাহেবের হাত দিয়ে তাদের কিছু দিচ্ছে না। শুধু বেছে বেছে আমাকেই বা দিচ্ছে কেন ?

সুমিত্রা কিছু বলবার আগেই সোহম্ আবার জিজ্ঞেস করলে—কেন আমাকে দিচ্ছে বলবো ?

—বলো ?

সোহম্ সুমিত্রার আরও কাছে সরে এল। বললে—তোমার জন্যে—

—আমার জন্যে? সে কী?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, শুধু তোমার জন্যে। তোমার জন্যেই আমার এত উন্নতি। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল বলেই আমি আজ টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানির ওয়েলফেয়ার অফিসার। আজকে সব মিলিয়ে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দেয় কোম্পানি—

সুমিত্রা বললে—বলছো কী তুমি?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, যেদিন থেকে তোমার ছবিটা সেন-সাহেব দেখেছে সেই দিন থেকেই আমার মাইনে বাড়তে আরম্ভ করেছে—

সুমিত্রা রাগ করলে। বললে—তোমার সেন-সাহেব তো ভারি খারাপ লোক দেখছি। আমি আর কখনও কোনও পার্টিতে যাব না—

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বদ্যিনাথ বাইরে থেকে ডাকলো—মেমসাহেব, আপনাদের খানা দেব?

সোহম্ বললে—আমি খাবো না, মেমসাহেবের খানা এ-ঘরে দিয়ে যা—

বদ্যিনাথ চলে গেল। সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে—এখানে খাবার আনতে বললে কেন?

সোহম্ বললে—আজকে তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—

—কী কথা?

সোহম্ বললে—একদিন ইব্রাহিমকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করব খেতে। তুমি যদি রাজি হও তাহলে আমার পথের কাঁটা দূর হয়।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে—কেন? ইব্রাহিম কি তোমার মনিব যে তাকে খুশী করতে হবে? একবার ভানুভাই প্যাটেলকে খুশী করতে হবে, আর একবার তোমাদের ইব্রাহিমকে খুশী করতে হবে, এ কী জ্বালা হলো বলো তো আমার! তার চেয়ে তুমি একটা হোটেলে তাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াও না।

সোহম্ বললে—সে তো আজকেই খাওয়ালাম। দেখ, হোটেলে খাওয়ানো আর বাড়িতে খাওয়ানো দু'টোর মধ্যে অনেক তফাৎ। আরও দেখ, ইব্রাহিম হলো মুসলমান আর আমরা হলুম হিন্দু। আমার বাড়িতে তাকে যদি খাওয়াই তাহলে সে আর আমার শত্রুতা করবে না। বড় হওয়ার অনেক জ্বালা। বড় হলে যেমন বন্ধুও জোটে তেমনি আবার বড় বড় শত্রুও জোটে—তাই ভাবলাম তোমার মতটা একবার নেব, তারপরে তাকে বাড়িতে খেতে নেমন্তন্ন করব—

সুমিত্রা বললে—তার চেয়ে কিছু টাকা দিয়ে দাও না তাকে, তাহলেই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে—

—আরে, সে কি আমি জানি না ভাবছো? এ-যুগে টাকা নেওয়াও যেমন শক্ত, টাকা দেওয়াও তেমনি শক্ত। টাকা দিতে গেলেই ভাববে আমি তাকে ঘুষ দিচ্ছি—

—ঘুষ দিচ্ছ ভাবলে ক্ষতি কী? ইব্রাহিম কি ঘুষ খায় না!

সোহম্ বললে—ঘুষ কেন খাবে না? বাইরে সর্বহারা সেজে থাকে কিন্তু তার বাড়িটা দেখলে তুমি চমকে যাবে। টি-ভি থেকে আরম্ভ করে বাড়ির ভেতরে

ভি-ডি-ও ক্যাসেট রেকর্ড-প্লেয়ার সমস্ত আছে। ঘুষ না নিলে কি ও-সব হয়? বাইরে শুধু সর্বহারা সেজে থাকে—

—তাহলে তো ব্যাপারটা খুব সহজ। টাকা দিলেই যদি কাউকে বশ করা যায় তাহলে তো তার চেয়ে সহজ কাজ আর কিছু নেই—

সোহম্ বললে—না, অত সহজ নয়, শুধু টাকা দিলেই যদি কাজ হাঁসিল হয়ে যেত তাহলে তো সোজা ইব্রাহিমের হাতে টাকাটা গুঁজে দিতুম। কিন্তু এমনভাবে টাকাটা দিতে হবে যাতে সে বুঝতে না পারে যে আমি তাকে ঘুষ দিচ্ছি। ঘুষ নেওয়া যেমন একটা আর্ট ঘুষ দেওয়াও তো তেমনি একটা আর্ট—সেই জন্যেই তোমার পারমিশন্ নিয়ে ওকে একদিন আমার বাড়িতে খেতে নেমন্তন্ন করবো—তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?

সুমিত্রা বললে—তাতে কি তোমার মাইনে বাড়বে?

—যতবার আমি এই রকম করেছি ততবার আমার মাইনে বেড়েছে। এবারও মাইনে বাড়বে—

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে—কত টাকার ঘুষ ইব্রাহিমকে দেবে?

সোহম্ তার নিজের প্যাণ্টের পকেটে হাত গুঁজে দিয়ে একতাড়া টাকা বার করলে। একটা মোটা নোটের বাণ্ডিল—

সুমিত্রা বাণ্ডিলটার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। এত মোটা বাণ্ডিল! নিশ্চয় ওর ভেতরে অনেক টাকা আছে! জিজ্ঞেস করলে—এর ভেতর কত টাকা আছে?

সোহম্ বললে—কে জানে?

—তবু শুনি কত টাকা! পনেরো না কুড়ি হাজার?

সোহম্ বললে—তা আমি জানি না। সেন-সাহেব বাণ্ডিলটা আমাকে দিলে ওদের দেবার জন্যে আর আমিও নিয়ে নিলুম।

—এই টাকাগুলো কি ওই তিনজনকেই ভাগ করে দেবে?

—না, শুধু ইব্রাহিমকে দেব। যদিও কেশব মাইতি বিভূতি পোদ্দার আর ইব্রাহিম, এই তিনজনই ইউনিয়নের লীডার, তবু টাকার ব্যাপারে কে কত টাকা পাচ্ছে সেটা একজন অন্যজনকে জানায় না। ওদের নিজেদের মধ্যেও টাকার জন্যে রেষারেষি আছে কিনা। ও-সব ব্যাপার তুমি বুঝবে না। আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্য যে চলছে তা শুধু এই ঘুষের জন্যে। ঘুষ বন্ধ হোক, দেখবে সব জিনিসের দাম হুড়-হুড় করে পড়ে যাবে!

সুমিত্রা বললে—যাক গে, তোমার যা খুশি তাই করো গে, আমি ওসব বুঝি না, বুঝতে চাইও না। আমায় কী করতে হবে তা-ই শুধু বল—

—তা হলে যেদিন আমি ইব্রাহিমকে খেতে নেমন্তন্ন করব, সেদিন তুমি ওকে যত্ন-টত্ন করবে তো?

—তা করব, কিন্তু সেদিনও কি আমাকে মদ খেতে হবে?

—নিশ্চয়। নইলে কী করে সে বুঝবে যে আমি তার দলে!

সুমিত্রা একটু ভেবে নিয়ে বললে—ঠিক আছে, তাতে তোমার চাকরির যদি

সুবিধে হয় তো আমি তাও করব! মদই খাব। তবে একটা কথা…

সোহম্ বললে—কী?

—বাড়িতে এখন তো পিসীমা রয়েছে, আর তোমার পিসতুতো দাদাও রয়েছে, ওরা থাকতে তুমি ইব্রাহিমকে নেমন্তন্ন করবে কী করে? ওরা তো সব দেখতে পাবে, সব শুনতে পাবে—

—ওরা যাবে কবে?

সুমিত্রা বললে—তা আমি জানব কী করে?

সোহম্ রেগে গিয়ে বললে—তুমি ওদের চলে যেতে বলতে পারো না? ওরা তো বড় জ্বালাচ্ছে দেখছি!

—জানো, তোমার পিসতুতো দাদা পাড়াময় বলে বেড়াচ্ছে যে তোমাকে বলে তাদের সকলকে তোমার অফিসে চাকরি করে দেবে। এই কথা বলে পাড়ার যত চা-ওয়ালা, তেলেভাজাওয়ালা, সকলের কাছে গিয়ে বিনা-পয়সায় চা-বিস্কুট তেলে-ভাজা খাচ্ছে—

সোহম্ রেগে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বললে—আমি এখুনি যাচ্ছি, গিয়ে কাশী দত্তর কান ধরে বাড়ি থেকে বার করে দিচ্ছি—

সুমিত্রা সোহম্‌কে ধরে ফেললে—ছিঃ, মদের নেশায় একটা কেলেঙ্কারি করে বসো না। যা বলবার তা কাল সকালে সুস্থ হয়ে বোল—

সোহম্ সুমিত্রার কথায় আবার চেয়ারটার ওপর বসে পড়লো।

বললে—ঠিক আছে, তুমি বলছো তাই আজ আর কিছু বলছি না। কিন্তু তাহলে তুমি কাল বলে দিও যেন ওরা কালকেই বাড়ি ছেড়ে যেখান থেকে এসেছে সেখানে চলে যায়—

সুমিত্রা বললে—আমি তো পরের বাড়ির মেয়ে, আমি কী করে সে-কথা বলি ওদের, বলো? আমি বললে সেটা কি ভালো দেখাবে? তার চেয়ে তুমিই বলো—তবে একটু ভদ্রভাবে বোল—

সোহম্ বললে—ভদ্রভাবে বলতে আমার বয়ে গেছে। যেদিন ঐ কাশী দত্ত আমাকে বাড়ি থেকে রাত দশটার সময় বার করে দিয়েছিল, সেদিন মনে ছিল না? আমার একমাত্র অপরাধ হয়েছিল যে আমি একটু বেশি ভাত খেতুম। আর আজকে? মায়ে-পোয়ে দুজন এতদিন ধরে গাণ্ডে-পিণ্ডে খাচ্ছে আর পাড়ার লোকের কাছে আমার বদনাম করে বেড়াচ্ছে! আমি কালকে কাশী দত্তকে তাড়াবোই তাড়াবো। আর কতদিন এ-অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করবো—

হঠাৎ বদ্যিনাথ খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকলো। খাবারের প্লেটটা সুমিত্রার সামনের টিপয়ের ওপর রাখতেই সোহম্ বললে—এই বদ্যিনাথ—

—হুজুর!

বদ্যিনাথ সাহেবের গলার গম্ভীর আওয়াজে বুঝতে পারলে সাহেব রেগে আছে।

সোহম্ বললে—এই, আমার হুকুম রইল, কাল তুই ওদের বাড়ি থেকে বার করে দিবি। বুঝলি?

বদ্যিনাথ জিজ্ঞেস করলে—কাদের হুজুর ?

সোহম্ বললে—ওই যে ভুপাল থেকে যে-বাবুটা ও যে-বুড়িটা এসে আমার বাড়িতে বসে বসে ভাত গিলছে, তাদের কাল দূর করে তাড়িয়ে দিবি, বুঝলি ?

বদ্যিনাথ বললে—ঠিক আছে হুজুর—

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, ভুলে যাসনি যেন বলতে ! এটা কি ধর্মশালা পেয়েছে যে যে-সে আসবে আর আমার বাড়িতে বসে বসে ভাত গিলবে আর পাড়ায় আমার বদনাম করে বেড়াবে ! বলতে ভুলে যাসনি যেন, বুঝলি ?

বদ্যিনাথ বললে—হ্যাঁ, হুজুর, ভুলবো না। আমি কাল সকালবেলাই বলে দেব ওদের—

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দীর্ঘ ইতিহাসে সব সময়েই সব জিনিসের সব রকম চিন্তারই বিবর্তন হয়ে চলেছে। সক্রেটিস-এর আগে পিথাগোরাসের যুগ থেকেই যদি এর ইতিহাস ধরা যায় তো আমাদের দোষী বলা যায় না। পৃথিবীর অস্তিত্ব তো পাঁচ লক্ষ বছর মাত্র। পিথাগোরাসের আগে কি পৃথিবী ছিল না ? ছিল হয়ত, কিম্বা হয়ত ছিল না। উপনিষদ লিখেছেন কারা ? বেদ লিখেছেন কে বা কারা ? সে-সব পণ্ডিত-মশাইরা বলতে পারেন। আমরা গল্প লিখি, আমাদের তাই মাত্র এইটুকু জেনে রাখাই ভালো যে এই পৃথিবীতে অনেক মহাপুরুষই তো জন্মে গেছেন, বুদ্ধ আর মহাবীর থেকে আরম্ভ করে জেনোফোন, পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টোটল—এমনি কত যে দার্শনিক জন্মেছেন তার কি হিসেব আছে ? সক্রেটিসকে তো বিষ খাইয়েই মারা হলো ! কেন বিষ খাওয়ানো হলো ? কারণ তিনি এই পাহাড়, এই সূর্য, এই চাঁদকে ভগবান বলতেন না। তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল এই যে তিনি বলতেন নিজেকে জানাই হলো ভগবানকে জানা। বলতেন—তোমরা নিজেকে জানো, তা হলেই ভগবানকে জানতে পারবে। তার পর যুগ-পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো ফ্রান্সের রুশো। জাঁ-জ্যাক্ রুশো। এ সেই রুশো, যাঁর লেখা পড়ে ফ্রান্সে অতবড় রিভোলিউশনটা হলো ১৭৮৯ সালে। শেষ পর্যন্ত যার ফলে সম্রাটের গলা কেটে ফেললে সে দেশের প্রজারা। ইতিহাসে দেশের রাজার গলা কাটা সেই-ই প্রথম। কিন্তু জানো, তিনি বেঁচে থাকতেই তাঁর লেখা বই পড়া বিপজ্জনক বলে তা আগুনে পোড়ানোও হয়েছিল। যা সত্য তা কি আগুনে পোড়ালে নষ্ট হয় ?

—তারপর ?

ক্ষেত্রবাবু বলতেন—তারপর ? তারপর রুশো ইংলণ্ডে পালিয়ে গেলেন। বহুদিন পরে তিনি যখন দেশে ফিরে এলেন তখন হাতে একটা পয়সা নেই। না

খেতে পেয়ে মারা গেলেন। কেউ তাঁকে দেখলে না, কেউ তাঁর খোঁজ নিলে না। তিনি একদিন নিঃশব্দে মারা গেলেন। কিন্তু তাঁর মারা যাবার কিছুদিন বাদেই আগুন জ্বলে উঠলো দেশে। যে-আগুন একদিন তাঁর বইগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল সেই আগুনে একদিন রাজারাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাশিয়ার লেখক টলস্টয় যে অত বড় লেখক হলেন তা কার বই পড়ে ' রুশোর বই পড়ে। টলস্টয়ের গলায় একটা মালা ঝুলতো সব সময়। সেই মালার তলায় একটা লকেট ছিল। লকেটে লাগানো থাকতো রুশোর ছবি। এই যে আমাদের দেশের মহাত্মা গান্ধী, ইনিও টলস্টয়ের বই পড়েই মহাত্মা গান্ধী হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি যে আশ্রম করেছিলেন, তার নামও তিনি দিয়েছিলেন 'টলস্টয় আশ্রম'। এত নাম থাকতে ওই নাম দিলেন কেন? সব কিছুর মূলে ছিলেন রুশো। রুশো না জন্মালে টলস্টয় জন্মাতেন না, টলস্টয় না জন্মালে মহাত্মা গান্ধীকেও আমরা পেতাম না—।

সোহম্ জিজ্ঞেস করতো—তারপর? তারপর কী হলো স্যার?

—সেই রুশোর পরে আর একজন দার্শনিক জন্মালেন। তাঁর নাম কাণ্ট! কাণ্টের চলা-ফেরা দেখে লোকে তাদের ঘড়ি মিলিয়ে নিত। এত নিয়মে বাঁধা ছিল তাঁর জীবন। তিনি নিয়ম করে ঘুমোতে যেতেন, নিয়ম করে ঘুম থেকে উঠতেন। কিন্তু রুশোর বই পড়তে গিয়ে তাঁর আর সময়ের কোন জ্ঞান রইল না। সেই-ই প্রথম তিনি সময়ের হিসেব ভুলে গেলেন। ১৭৮৯ সালে যেদিন প্রজারা প্যারিসের জেলখানা ভেঙে চুরমার করে গুঁড়িয়ে দিলে, জেলখানার ভেতর থেকে কয়েদীদের ছাড়িয়ে দিয়ে রাস্তায় বার করে দিলে, সেদিন খবরটা পৌঁছুলো গিয়ে কাণ্টের কানে। সেই-ই প্রথম প্রাতঃভ্রমণ করতে গিয়ে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল কাণ্টের, এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে তা তিনি কখনও কল্পনাও করতে পারেন নি—

সোহম্ এই সব কথা যখন শুনতো তখন তার বুকটা দশ হাত চওড়া হয়ে যেত। সে ভাবতো কেমন করে বড় হবে, কেমন করে তার নামও বিখ্যাত হয়ে যাবে। তার মৃত্যুর পরেও কেমন করে তার নাম করবে সবাই। অন্য লোকেরা তার জীবনী পড়বে, পড়ে কেউ হবে আর একজন টলস্টয়, কেউ হবে আর একজন গান্ধী! কিন্তু শুধু ইচ্ছে থাকলেই কি হয়? তা হওয়ার জন্যে লেখাপড়াও তো করতে হয়, তা হওয়ার জন্যে নিজেকে তো তৈরিও করতে হয়! কিন্তু সে কী করে তা হবে! কে তাকে সাহায্য করবে! হ্যাঁ, অতীতই তো মানুষের বড় শিক্ষক। ওই কথাটা ক্ষেত্রবাবুই তাকে শিখিয়েছিলেন, বলেছিলেন—অতীতের চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ নেই। অতীতের কাছ থেকে শিক্ষার পাঠ নিতে জানলে তবেই মানুষ জীবনে বড় হতে পারে। যে অতীত জানে না সে বর্তমানও জানে না, ভবিষ্যৎও জানে না। অতীতই মানুষকে চরিত্রবান হতে শেখায়। অতীতই বহু বিখ্যাত মানুষের জীবনের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে যার চরিত্র আছে সে জীবন-যুদ্ধে জিতবেই। অতীতই আমাদের শেখায় যে যার চরিত্র নেই তার কিছুই নেই। অতীতই বর্তমানের একমাত্র মহাপুরুষ। সেই মহাপুরুষের

কাছে যে শিক্ষাগ্রহণ করেছে সে কখনও ঠকে নি, সে বরাবরই জিতেছে।

বলে খানিকক্ষণ থামতেন। তারপর আবার বলতেন—অথচ দেখ, মজা এই যে ইতিহাস পড়েই আমরা এই শিক্ষা পাই যে অতীত থেকে আমরা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করি না। এই-ই হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। লুই দ্য সিক্স্‌টিনথ জীবনে যে ভুল করেছিল, নেপোলিয়নও সেই একই ভুল করলো। ইতিহাস থেকে যদি স্ট্যালিন আর হিট্‌লার কিংবা মুসোলিনী শিক্ষাগ্রহণ করতো তো শেষকালে তাঁদেরও অমন দুর্দশা হতো না—

এ-সব কথা ভাবলে এখন সোহমের হাসি পায়। কিন্তু সেদিন সেই ছোট-বেলায় সোহম্‌ ক্ষেত্রবাবুর সব কথা মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করলে ওই কাশী দত্তর যা দশা হয়েছে সোহমেরও সেই দশাই হতো। কিন্তু ভাগ্যিস সেদিন তার পিসতুতো দাদা সেই রাত দশটার সময় সোহম্‌কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। নইলে সে জানতেই পারতো না যে চালাকি দিয়েও জীবনে মহৎ কাজ করা যায়। টুকে পরীক্ষা দিয়েও বি. এ. পাস করা যায়, আর চালাকি করেও পাঁচ হাজার টাকা মাইনের চাকরি পাওয়া যায়!

তা ছাড়া এই আজকের পৃথিবীতে টাকাটাই তো সব! তার মাইনে যদি পাঁচ হাজার টাকা না হতো তো সেই পিসতুতো দাদাই কি আজ তার মা'কে নিয়ে সোহমের বাড়িতে আসতো! সত্যিই, টাকাই হলো সব কিছু। ক্ষেত্রবাবু যা-ই বলুন, বিড়লার টাকা না পেলে গান্ধীজী মহাত্মা গান্ধী হতো কী করে? গান্ধীজী নিজে তো চরকা কাটতো, নিজের হাতে চরকা কাটা সুতো দিয়ে তৈরি কাপড় নিজে পরতো। কিন্তু গাড়ি? মটর-কার? সে গাড়ি তো বিড়লারই দেওয়া। বিড়লার দেওয়া শেভ্‌রোলেট্‌ গাড়িতে চড়তে তো আপত্তি করতো না গান্ধীজী। বিড়লাও তো কটন্‌-মিলের মালিক ছিল। তার জন্যে তো বিড়লাকে কোনও দিন বকুনি খেতে হয় নি গান্ধীজীর কাছে। বিড়লাকে তো চরকা কাটতে বলে নি গান্ধীজী!

আসলে ক্ষেত্রবাবুরা আদর্শবান মানুষ। ওই আদর্শবান মানুষরাই হচ্ছে সংসারে সব চেয়ে বোকা, সব চেয়ে নির্বোধ। সেইজন্যেই ক্ষেত্রবাবুর জীবনে কিছুই হয় নি। ক্ষেত্রবাবু হেড-মাস্টার হয়ে কী পেয়েছেন? কিছুই পান নি। সারা জীবন পায়ে হেঁটে স্কুলে গিয়েছেন। অথচ তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফার্স্ট ডিভিশন শুধু নয়, তিনটে সাবজেক্টে লেটারও পেয়েছিলেন। বি এ পরীক্ষায় অনার্স নিয়ে ফার্স্ট হয়েছিলেন পর্যন্ত। তারপর এম. এ পরীক্ষাতেও তাই। এত ভাল ছাত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর কী হলো? একটা মধ্যবিত্ত স্কুলের হেড-মাস্টার হয়ে আর কত টাকাই বা মাইনে হলো তাঁর?

রাস্তায় যেতে যেতে একদিন হঠাৎ সেই ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। দেখা হতেই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললে সোহম্‌। সোহম্‌ গাড়ি থেকে নেমেই ঝুপ্‌ করে হেড-মাস্টার মশাইএর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে তাঁর সামনে মুখোমুখি দাঁড়ালো।

—কে?

চমকে উঠেছেন ক্ষেত্রবাবু। যে পায়ের ধুলো নিয়েছে সে যে তাঁর কোনও ছাত্র তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ অনেক ছাত্রই তাঁর স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়েছে। তিনি ভেবেছিলেন সেই রকমই কোনও একজন ছাত্র হবে হয়ত।

আবার জিজ্ঞেস করলেন—কে তুমি বাবা ? আমি তো ঠিক চিনতে···

সোহম্ বললে—আমি সোহম্ স্যার। সোহম্সুন্দর রায়—

ক্ষেত্রবাবুই তাকে এই চাকরি করে দিয়েছিলেন। ক্ষেত্রবাবুরই ছাত্র মিস্টার সেন। ক্ষেত্রবাবু তাঁর নিজের ছাত্রকে চিঠি লিখে না দিলে 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানি'র এই চাকরি হতো না।

—ও, তুমি সেই সোহম্ ? তুমি সেই নীহারবিন্দুর অফিসেই এখনও আছো তো ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, এখনও সেই অফিসেই চাকরি করছি। এই যে গাড়িটা দেখছেন, এটা সেই অফিসেরই গাড়ি। আমার ড্রাইভারের মাইনেটাও ওই অফিসই দেয়। আপনার আশীর্বাদে আমি স্যার এখন পাঁচ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছি। পরে ডাইরেক্টর হলে মাইনে আরো বাড়বে। এখন আমি 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানি'র ওয়েলফেয়ার অফিসার। এ সব কিছুই স্যার আপনারই আশীর্বাদে—

ক্ষেত্রবাবু বললেন—না না সোহম্, আমার আশীর্বাদ-টাদ কিছু নয়, এ সব কিছু তোমার চরিত্রের গুণেই হয়েছে। তোমার নিজের চরিত্রটা ভালো রেখেছ তাই তোমার এত উন্নতি হয়েছে, তাই তোমার মাইনে এত বেড়েছে, তাই কোম্পানি তোমাকে এই গাড়ি দিয়েছে। সমস্ত কিছু তোমার নিজের চরিত্রের গুণেই—

কথাগুলো শুনে সোহম্ যেন কেমন হতবাক হয়ে গেল। এই সরল সৎ সাদাসিধে মানুষটিকে সে যে কত ভাবে প্রতারণা করেছে, কত ভাবে ধাপ্পা দিয়েছে, ধাপ্পা দিয়ে যে কত ভাবে নিজের কার্যসিদ্ধি করেছে তা তো ইনি জানতে পারলেন না। সোহমের একবার মনে হলো সে প্রাণখুলে তার মাস্টার মশাই-এর কাছে নিজের অপরাধের কথা অকপটে স্বীকার করে। স্বীকার করে নিয়ে মাস্টার মশাই এর পায়ে হাত দিয়ে বলে—না মাস্টার মশাই, আপনি যা কিছু দেখছেন এ সমস্ত মিথ্যে। আমার এই পাঁচ হাজার টাকা মাইনের চাকরি, এই গাড়ি, আমি যে-ফ্ল্যাটে থাকি সেই ফ্ল্যাট, এর সব কিছুর পেছনে কোনও সততা নেই, সচ্চরিত্রতাও নেই, কেবল আছে প্রতারণা, কেবল আছে বিশ্বাসঘাতকতা—আজকের পৃথিবীর সব বড় মানুষরাই তাই—সবাই চরিত্রহীন—

ক্ষেত্রবাবুর কথায় সোহমের যেন ধ্যান ভাঙলো।

ক্ষেত্রবাবু বললেন—তোমার হয়ত অফিসে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে সোহম্, তোমাকে আর দেরি করিয়ে দেব না, তুমি এখন এসো—অন্য একদিন তোমার বাড়িতে যাবো—

সোহম্ ততক্ষণে আবার বাস্তবতার জগতে ফিরে এসেছে। বললে—স্যার, আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন, চলুন না আপনাকে গাড়িতে করে সেখানে পৌঁছিয়ে

দিয়ে আসি—

—না না সোহম্, আমি হেঁটেই যেতে পারবো ; আমার হাঁটতে কোনও কষ্ট হয় না—তুমি এখন অফিসে যাচ্ছিলে, যাও—

সোহমের মনের গ্লানি তখন অনেকটা কেটে গেছে। সে আবার মাস্টার মশাই এর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললে—আচ্ছা স্যার আমি তাহলে আসি—

বলে তার গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল ড্রাইভার। হঠাৎ পেছন থেকে ক্ষেত্রবাবুর গলা শোনা গেল। ক্ষেত্রবাবু ডাকছেন—সোহম্, সোহম্, আর একটা কথা শোন—

সোহম্ ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে বারণ করে আবার রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

ক্ষেত্রবাবু বললেন—একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি সোহম্। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে বাবা।

সোহম্ বললে—বলুন স্যার, কী কাজ ?

ক্ষেত্রবাবু বললেন—এখন কি কথা শোনবার সময় আছে তোমার ? এখন তুমি অফিসে যাচ্ছো তো, পরে না-হয় তোমাকে বলবো একদিন—

—না না, আপনি বলুন না স্যার। এখন আমার সময় আছে—

ক্ষেত্রবাবু বললেন—সামনে সরস্বতী পুজোর দিন তোমার কি সময় হবে একবার ?

সোহম্ বললে—আপনি যেদিন যখনই বলবেন সেদিন তখনই আমার সময় হবে স্যার। কিন্তু কেন স্যার ? ও-দিন কী হবে ?

ক্ষেত্রবাবু বললেন—সেদিন, ঠিক করেছি, একটা 'গুণীজন-সম্বর্ধনা'র অনুষ্ঠান করবো—

সোহম্ বললে—কোন্-কোন্ গুণীদের সম্বর্ধনা জানাবেন ?

ক্ষেত্রবাবু বললেন—অন্য কোনও গুণীজন কেউ নেই। শুধু একলা তোমাকেই আমরা সম্বর্ধনা জানাবো ভাবছি। আমাদের স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে নীহারকেও একবার সম্বর্ধনা জানিয়েছিলাম। সে-ও তোমার মত আমাদের স্কুল থেকে পাস করেছে! পাস করে কত বড় হয়েছে। তার পরে আর কেউ অত বড় হতে পারে নি, এক তুমি ছাড়া। তাই ভাবছি তোমার মত গুণীজনকেও আমরা সেদিন সম্বর্ধনা দেব ; যাতে এখনকার স্কুলের ছেলেরা তোমাকে দেখে সৎ শিক্ষা পেতে পারে—। যাতে তারাও একদিন তোমাদের মত গুণী হতে পারে। তারাও যেন একদিন বড় হয়ে তোমাদের মত মানুষ হয়—

সোহম্ ক্ষেত্রবাবুর কথা শুনে অভিভূত হয়ে গেল।

বললে—না স্যার, আপনি জানেন না। আপনি জানেন না বলেই আজ এই কথা বলছেন। আপনি হয়ত জানেন না যে আমি মানুষ হই নি, আমি আসলে একটা অমানুষ হয়েছি। আমি আমার চাকরিতে উন্নতির জন্যে এমন কোনও পাপ নেই যা করি নি। আমি চাকরিতে উন্নতি করেছি শুধু ঘুষ খেয়ে। চাকরিতে উন্নতির জন্যে আমাকে মদও খেতে হয়েছে। এখনও রোজ মদ খাই। শুধু আমি

নিজেই যে মদ খাই তা নয়, আমার স্ত্রীকেও মদ খেতে শিখিয়েছি। আমি নিজেও যেমন মাতাল হয়েছি চাকরিতে উন্নতি করবার জন্যে, তেমনি আমার স্ত্রীকেও মদ খেতে শিখিয়েছি মিস্টার সেনকে খুশী করবার জন্যে, আমার চাকরিতে উন্নতি করবার জন্যে। আর শুধু তাই-ই নয় স্যার, আপনি জানেন না স্যার, আমি যে বি. এ পাস করেছি তা লেখাপড়া শিখে নয়, টুকে—

ক্ষেত্রবাবু যেন চমকে উঠলেন। বললেন—সে কি? তুমি টুকে বি. এ পাস করেছ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, আপনি বিশ্বাস করুন, টুকে। আজকাল টুকে বি এ পাস করা শুধু নয়, টুকে এম. এ-ও পাস করা যায়। আর শুধু বি এ এম. এ-ই নয়, ডাক্তারি, ওকালতি সব কিছুর পরীক্ষাতেই টুকে পাস করা যায়। আপনি সৎ সরল মানুষ বলেই এ-সবের কিছু খবর রাখেন না। আপনি শুনে হয়ত অবাক হবেন স্যার, আজকাল পি এইচ-ডি, ডি-লিট্, ডি-ফিল্ ডিগ্রীগুলোও ভেজাল। আজকাল টাকা খরচ করলে পৃথিবীর সব ডিগ্রীই কিনতে পাওয়া যায়। আপনাদের পৃথিবী আর আগেকার সে পৃথিবী নেই স্যার। পাপ তো বরাবর সস্তাই ছিল, এখন পুণ্যও সস্তা হয়ে গেছে—।

ক্ষেত্রবাবু যেন তখন আকাশ থেকে পড়েছেন। বললেন—সত্যিই বলছো?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয় তো আপনি মিস্টার সেনকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, তিনি সব জানেন। চাকরির উন্নতির জন্যে আজকাল মানুষ সব কিছু করছে, এমন কি নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত পরকে ভোগ করতে দিচ্ছে—

ক্ষেত্রবাবু নির্বোধের মত বললেন—এই সব কাণ্ড হচ্ছে? তা হলে তো মানুষের বড় দুর্দিন!

সোহম্ বললে—না, আমার তো মোটেই দুর্দিন নয় স্যার। আমি তো খুব আরামেই আছি—

ক্ষেত্রবাবু বললেন—তোমার একলার কথা ভাবলে তো চলবে না সোহম্। পৃথিবীর সমস্ত লোকের কথা ভাবতে হবে। সমস্ত মানুষের কথা যদি না ভাবো তাহলে তাদের কথা কে ভাববে? অন্য মানুষেরা খারাপ থাকবে আর তুমি একলা ভালো থাকবে, তা তো হতে পারে না—। তাহলে একদিন-না-একদিন তারাও তো বিদ্রোহ করে বসবে, তারাও তো তোমাদের আগুনে পুড়িয়ে মারবে? তখন? তখন কী হবে? রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো মনে নেই তোমাদের? "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান……।" রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো কি তাহলে এখন আর কেউ পড়ে না?

সোহম্ বললে—কেন পড়বে স্যার? কখন পড়বে স্যার? কী করতে পড়বে? আজকাল কি কারো সময় আছে? সবাই তো বাড়িতে বসে টি. ভি-তে বোম্বাই-এর সিনেমা দেখে। ডিস্কো নাচ দেখে আর থিয়েটার দেখে—

ক্ষেত্রবাবু বললেন—কিন্তু শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথের বই নাকি লক্ষ লক্ষ বিক্রি হয়। সে-বইগুলো তাহলে কা'রা পড়ে?

—সে-সব ঘরের বুক-কেসে বাহার করে সাজানো থাকে—

ক্ষেত্রবাবু বললেন—সত্যি ?

সেই ক্ষেত্রবাবুর ছোট্ট কথাটা যেন আকাশে বাতাসে অন্তরীক্ষে ইথারে হাজারগুণ বড় হয়ে সব কিছু কাঁপিয়ে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলো। সত্যি! সত্যি!! সত্যি!!! সোহমের কানে যেন তালা ধরে যাওয়ার মত অবস্থা হলো। সে তার দুই হাতে নিজের কান দুটো চাপা দেবার চেষ্টা করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গেল।

সোহম্ চোখ দুটো খুলে চারপাশে চেয়ে দেখলে! সে কি তাহলে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল? ক্ষেত্রবাবুকে কি তাহলে স্বপ্নের মধ্যে দেখছিল এতক্ষণ? হয়ত তাই। নাহলে সে এখন বিছানায় শুয়ে আছে কেন? আগের দিন রাত্রে সে ইব্রাহিম-এর সঙ্গে খালাসিটোলায় গিয়ে অনেক বোতল দিশি মদ খেয়েছে। এ স্বপ্ন কি তারই প্রতিক্রিয়া? ওই তো পাশের খাটেই সুমিত্রা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সমস্তই তো ঠিক আছে, অন্য দিনের মত। তবে?

হঠাৎ বাইরের কথা-কাটাকাটির কথা কানে এল তার। মনে হলো তার পিসতুতো দাদা চেঁচাচ্ছে। জিজ্ঞেস করছে—সত্যি?

—হ্যাঁ বাবু, সত্যি।

এবার বদ্যিনাথের চড়া গলা। সোহম্ চিনতে পারলে গলার আওয়াজটাকে।

এর পর পিসীমা জিজ্ঞেস করলে—তা হ্যাঁ বাবা বদ্যিনাথ, তোমার বাবু কি নিজের মুখে বলেছে আমাদের চলে যেতে?

বদ্যিনাথ বললে—হ্যাঁ পিসীমা, কাল যখন রাত্তিরে সাহেবকে আমি ঘরের ভেতর ডিনার দিতে গিয়েছিলুম তখনই সাহেব আমাকে বললেন—

কাশী দত্ত বললে—কী বললে তোমার সাহেব? সত্যি সত্যি কী কথা বলেছে বলো তো?

বদ্যিনাথ বললে—সাহেব বললে—ওরা আর কতদিন এখানে বসে বসে ভাত গলবে? তুই ওদের চলে যেতে বলতে পারিস না?

—তা সে-কথা শুনে তুমি কী বললে?

বদ্যিনাথ বললে—আমি আর কী বলবো পিসীমা! আমি তো চাকর মানুষ, আমি সাহেবের নুন খাই, আমি কি সাহেবের মুখের ওপর কথা বলতে পারি? তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গে আমার জবাব হয়ে যাবে! আপনারা হলেন সাহেবের নিজের লোক, আপনারা যা বলতে পারেন তা কি আমার বলা সাজে? বলুন?

কাশী দত্ত বললে—তোমার সাহেব যা বলে বলুকগে, তা বলে আমরা এ-বাড়ি ছেড়ে বেরোচ্ছি না। আমরা এই এখেনে গ্যাঁট হয়ে বসলুম। যদি কিছু বলবার থাকে তো তোমার সাহেব নিজের মুখে সরাসরি আমাদের বেরিয়ে যেতে বলুক, তবে বেরোব। তার আগে নয়। তার এক মিনিট আগে নয়। দেখি তোমার সাহেব আমাদের কী করে তাড়ায় এ-বাড়ি থেকে!

তারপর একটু থেমে কাশী দত্ত আবার বললে—দাও, চা দাও। সকাল থেকে ঝগড়া করতে করতে আমার শালার মাথা ধরে গেছে। এখন এক কাপ গরম চা না

খেলে আর মাথা ধরা ছাড়বে না। দাও, এক কাপ চা করে দাও তো শিগ্‌গির—

বদ্যিনাথ বললে—এখন চা হবে না বাবু, এই এখ্খুনি সাহেব ঘুম থেকে উঠেছে। ঘুম থেকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে একবার সাহেবকে বেড্-টি দিয়ে এসেছি। এবার সাহেবের ব্রেকফাস্ট বানাবো—

—সাহেবকে চা দিয়ে এসেছ তুমি? কই, কখন চা দিলে?

বদ্যিনাথ বললে—কলিং-বেল বাজল, শুনতে পেলেন না? সাহেব রোজ চোখ খুলে বিছানায় শুয়ে শুয়েই ঘণ্টা বাজিয়ে দেন, আর আমি তখনই বুঝতে পারি যে সাহেবের চা চাই। তখন আমার চা ফুটছিল, আমি চুপি চুপি গিয়ে ঘরে ঢুকে সাহেবকে বেড্-টি দিয়ে এসেছি—

—তা সেই সঙ্গে আমাকেও এক কাপ চা দিলে না কেন তুমি? তুমি তো জানো যে সকালবেলা দু'তিন কাপ চা না হলে আমার পেট সাফ হয় না। এত দিন ধরে তো তুমি আমাকে দেখে আসছো, আর আজকেই সেই কথাটা একেবারে ভুলে মেরে দিলে? সাহেবকে চা দিলে আর আমাকে চা দেবার কথাটাই কিনা একেবারে বেমালুম ভুলে গেলে? তোমার এ কী-রকম ভুল বলো তো? এত ভুলো মন নিয়ে তুমি সাহেবের কাজ কী করে চালাও আমি বুঝতে পারছি না। আমার নিজের চাকর হলে তো কবে আমি তাকে তখ্খুনি লাথি মেরে বাড়িছাড়া করতুম।...যাক্ গে, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। এখন বেশ কড়া করে এক কাপ চা বানাও দিকিনি, তারপরে জল-খাবার যা হয় তা পরে দিও—

বদ্যিনাথ বললে—এখন আপনার চা হবে না বাবু। এখন আমার সাহেব গোসল্ করছে, এখ্খুনি সাহেবের ব্রেকফাস্ট্ বানিয়ে নিয়ে যেতে হবে—। আপিসে যেতে সাহেবের দেরি হলে সাহেব আমার নোক্রি খেয়ে নেবে—

—কী বললে? শুনলে তো মা, বদ্যিনাথ কী বললে? তুমি নিজের কানেই শুনলে তো, কী রকম বেআদপ্ লোক রেখেছে তোমার ভাই-পো?

শাওয়ার থেকে ছড়্-ছড়্ শব্দ করে তার মাথার ওপর জল পড়ছে তখন, বাইরের ওদের কথাগুলো আর তখন সোহমের কানে এল না। রাত্রে ভালোই ঘুম হয়েছিল। স্নান করে আরো জুড়িয়ে গেল তার শরীরটা। এখন কারোর ওপর আর রাগ নেই তার। সে সুখী। ব্যাঙ্কে টাকা রয়েছে তার অনেক। অনেক টাকা আবার ব্যাঙ্কের বাইরেও রয়েছে। সে সমস্ত বেহিসেবী টাকা। এখন কাকে আর ভয় করবে সে। ওরা বাড়িতে এসেছে, আসুক। হাজার হোক, অভাবী লোক। কখনও জীবনে এত স্বাচ্ছন্দ্য দেখে নি। এত কাছ থেকে কখনও কোনও টাকাওয়ালা লোককেও দেখে নি। মদ খাওয়ার পয়সাও কখনও যোগাড় করতে পারে নি, এত খারাপ অবস্থা কাশী দত্তর। তাই আমার বাড়িতে এসে লোভ লেগে গেছে, তাই এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। ওদের ওপর আর রাগ হলো না সোহমের। দয়া হতে লাগলো। বাড়িতে দুটো বাড়তি লোক থাকলে কী আর এমন ক্ষতি তার। ওরা চুরিও করছে না, বাটপাড়িও করছে না। তার চেয়ে ওরা থাকুক, ওরা দেখুক। একদিন বেশি ভাত খেতো বলে বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এই কাশী দত্ত। এখন তাড়িয়ে দেওয়ার

বদলে আজ যদি তাদের আদর করে বাড়িতে রাখা হয় সেইটেই তো সব চেয়ে আরো বড় প্রতিশোধ হবে! এর চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কী হতে পারে?

আশ্চর্য, মানুষের মতিগতি যে কার কখন কেমন থাকে তা বোঝা দেবতারও বোধ করি অসাধ্য। কাল রাত্রে সোহম্ বদ্যিনাথকে পিসীমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু এখন নেশা কেটে যাবার পর মনে হচ্ছে তার অন্যায় হয়েছিল। থাক, ওরা থাক! কয়েকটা টাকাই না-হয় তার বেশি খরচ হচ্ছে। তাতে তার কী এমন ক্ষতি হচ্ছে। তা এও তো আর এক রকমের প্রতিশোধ।

বাথ-টাব থেকে উঠে ড্রেসিং গাউনটা পরে সোহম্ যেন অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

হঠাৎ ভিজে মাথাটা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে তার মনে পড়তে লাগলো রাত্রে দেখা স্বপ্নটার কথা। অমন স্বপ্ন দেখতে গেলই বা সে কেন? স্বপ্নে সে এত লোক থাকতে ক্ষেত্রবাবুকেই বা কেন দেখতে পেলে? কেন নিজের সমস্ত অন্যায় আর পাপের কথা নিজের মুখ ফুটে বলতে গেল? তবে কি সোহম্ জানে যে সে অন্যায় করছে? তবে কি সে জানে যে সে জ্ঞানপাপী?

যখন সোহম্ বাথ-রুম থেকে বেরিয়ে এল সে দেখলে পাশের বিছানায় সুমিত্রা তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আহা, সোহমের চাকরিতে উন্নতির জন্যে ও অনেক কষ্ট করছে। ঘুমোক ও, আরাম করে ঘুমোক।

বদ্যিনাথ তখন ডাইনিং-রুমের পাশ থেকে কাশী দত্তকে লক্ষ্য করে বললে—দাদাবাবু, আপনি এখান থেকে সরে যান—

কাশী দত্ত বললে—কেন? সরবো কেন? আমি কী করেছি?

বদ্যিনাথ বললে—এখন আমার সাহেব এখানে ব্রেক্‌ফাস্ট খেতে আসছেন—

কাশী দত্ত বললে—তা তোমার সাহেব ব্রেক্‌ফাস্ট খেতে আসছে তো আমার কী? আমি কেন সরে যাবো এখান থেকে?

বদ্যিনাথ বললে—ব্রেকফাস্টের সময় সাহেব গোলমাল ভালোবাসেন না—

—গোলমাল? আমি গোলমাল করি? খবরদার বলছি বদ্যিনাথ, আমায় তুমি চেনো না, আমি রেগে গেলে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারি—। তা তুমি নতুন লোক, তুমি আমাকে চিনবেই বা কী করে। আমি তোমার সাহেবকে এইটুকু বেলা থেকে চিনি, তা জানো? তুমি তখন জন্মাওই নি। তোমার সাহেব আমাদের বাড়িতেই মানুষ। আমাকে তোমার সাহেবকে চেনাতে এসো না—

ততক্ষণে সোহম্ অফিসে যাবার পোশাকে স্যুট পরে এসে হাজির। ব্রেক্‌-ফাস্টের সামনে বসে সোহম্ যেন নিজের মনেই বলতে লাগলো—কী রে, এত গোলমাল কীসের এখানে?

কাশী দত্ত তৈরিই ছিল। বললে—হ্যাঁ রে সোহম্, তুই নাকি আমাদের এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছিস ?

সোহম্ কাঁটা চামচ হাতে নিয়ে মনে মনে রাগে গরগর করছিল। কিন্তু আণ্ডা-ফ্রাইটা মুখে পুরে দিয়ে মনের রাগটা এক মুহূর্তের জন্যে চাপা দিয়ে দিলে। তারপর বললে—কে বললে ?

কাশী দত্ত বললে—কে আবার বলবে, বললে তোর ওই গুণধর বদ্যিনাথ—

ওট্স্-এর পরিজে একটু চিনি ছড়িয়ে এক চামচ ওট্স্ মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বললে—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, না তো কি আমি মিছে কথা বলছি ? আমি তোর দাদা হই, আমার চেয়ে তোর ওই বদ্যিনাথই আপন হলো রে ? তুই যদি তোর বাড়ি থেকে আমাদের তাড়িয়েই দিতে চাস তো সে-কথা তুই সোজাসুজি আমাদের বলবি, তোর চাকরকে দিয়ে আমাদের অপমান করলি কেন ?

এতক্ষণে পিসীমাও সেই ঘরে এসে হাজির হলো। পিসীমাও ছেলের গলার সুরে সুর মিলিয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা সোহম্, কাশী তো ঠিক কথাই বলেছে। তুমি যদি আমাদের তোমার বাড়ি থেকে চলে যেতেই বলবে তো তুমি সে-কথা মুখোমুখি আমাদের বললেই পারতে। চাকর দিয়ে ও-কথা বলানোটা তোমার কি উচিত হয়েছে ?

সোহম্ তখনও একমনে খেতেই ব্যস্ত। একবার এক-এক চামচ ওট্স্-পরিজ খাচ্ছে আর দেরি করে করে চিবোচ্ছে। দু'জনের সাঁড়াশী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার পক্ষে আর কী উপায়ই বা তখন ছিল তার !

শুধু একটা কথা বলতে হয় তাই বললে—বদ্যিনাথ এই কথা বলেছে ?

পিসীমা বললে—বদ্যিনাথ না বললে কি আমরা বানিয়ে বানিয়ে বলছি ?

কাশী দত্ত বললে—অত কথার দরকার কী, তুই আমাদের কথা বিশ্বাস না করিস তো বদ্যিনাথকে কাছে ডেকে তুই জিজ্ঞেস করেই দ্যাখ্ না ও ও-কথা বলেছে কি না আমাদের—

হঠাৎ সদরের কলিং-বেল্টা বেজে উঠতেই সোহম্ যেন অকুল সমুদ্রে একটা কুল পেলে। বদ্যিনাথ দৌড়ে ভেতরে এল। সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—কে এল রে এত সকালে ?

বদ্যিনাথ বললে—মেহের আলি সাহেব—

সোহমের ততক্ষণে ব্রেক্ফাস্ট্ খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। এবার উঠে দাঁড়ালো। বললে—বসতে বল্, আমি যাচ্ছি—

কাশী দত্ত যেই দেখলে যে হাতের মাছ পালিয়ে যাচ্ছে, তখুনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—এই তো বদ্যিনাথ এসেছে, এখুনি জিজ্ঞেস কর্ না তুই ও ও-কথা বলেছে কি না—ভজাভজি হয়ে যাক্—

সোহম্ বললে—আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আসছি—

বলে ডাইনিং-রুমের চার দেয়াল পেরিয়ে বাইরে চলে গেল। বদ্যিনাথও তার আরো আগে আগে চলতে লাগলো। ড্রয়িং-রুমে যাওয়ার মাঝখানে কোরিডোরে

পৌঁছতেই সোহম্ ডাকলে—এই বদ্যিনাথ—

বদ্যিনাথ পেছন ফিরলো। সোহম্ পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে বদ্যিনাথকে দিলে। বললে—এইটে নে, ওরা যা বলে বলুক, তুই কিছু মনে করিসনি—

বদ্যিনাথও নোটটা নিয়ে ফতুয়ার পকেটে পুরে ফেললে।

আর ডাইনিং-রুমের ভেতরে মা আর ছেলে তখন দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে নির্বোধের মত হাঁ করে রইল।

খানিকক্ষণ পরে কাশী দত্ত বললে—ঠিক আছে, আমিও ছেড়ে কথা কইবো না. একদিন এর শোধ তুলবো, দেখে নিও—

মেহের আলি সাহেবের আসা যাওয়ার কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকতো না কোনও দিন। জরুরী কাজ পড়লেই খাঁ সাহেব এমনি হঠাৎ এসে পড়তো। আবার হয়ত অনেকদিন অনেক মাস তার কোনও পাত্তাই নেই। কাজ ছাড়া মেহের আলি সাহেব বিশ্ব-সংসারে আর কিছু বুঝতো না। মেহের আলি সাহেবের কাজ মানেই টাকা। টাকা ছাড়াও যে সংসারে মানুষের আরো অনেক কাজ থাকতে পারে তা কল্পনাও করতে পারতো না মেহের আলি সাহেব।

সোহম্ জানতো যে মেহের আলি সাহেব যখন সকালবেলাই এসে হাজির হয়েছে তখন নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ কাজের কথা আছে। বিশেষ কাজ বলতে মেহের আলি সাহেব টাকাটাকেই বুঝতো—

মেহের আলি সোহমের জীবনে অনেক বার অনেক উপকারে এসেছে। আর মাইনের বাইরের টাকাগুলো যে সোহমের হাতে এসেছে তা কেবল ওই মেহের আলি সাহেবের জন্যেই। তাতে সোহমেরই যে কেবল উপকার হয়েছে তাই-ই নয়, মেহের আলির নিজেরও উপকার হয়েছে।

মেহের আলি সাহেব বলতো—আপনি আমার লাকি ক্লায়েন্ট মিস্টার রায়—

সোহম্ বলতো—কেন, আমার মত লাকি ক্লায়েন্ট আপনার আর কেউ নেই—?

মেহের আলি বলতো—না, মিস্টার রায়, না। যেদিন থেকে আপনি আমার ক্লায়েন্ট হয়েছেন সেই দিন থেকেই আমার বিজ্‌নেস্ বেড়েছে, আমার ক্লায়েন্ট বেড়েছে, আপনি শুধু 'লাকি'ই নয়, আপনি আমার লক্ষ্মীও বটে।

বাঙালীদের সঙ্গে মিশে মিশে মেহের আলি সাহেব 'লক্ষ্মী' কথাটাও শিখে ফেলেছিল। বাঙালীরা সবাই-ই অন্য কোনও দেব-দেবীকে মানুক আর না মানুক 'লক্ষ্মী'কে মানবেই। অন্য সব দেব-দেবীর চেয়ে বেশি মানবে। এইটেই ছিল মেহের আলি সাহেবের অভিজ্ঞতা।

সেই মেহের আলি সাহেব তখন সোহমের ড্রয়িং-রুমে এসে বসে অপেক্ষা

করছিল। অনেক উদ্বেগ তার, অনেক আকাঙ্ক্ষা, অনেক প্রত্যাশা। সমস্ত উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশার মূলে কথাটা ছিল টাকা। টাকা শুধু উপায় করলেই চলবে না। উপায় করবার পর সেই টাকাকে আবার পাখীদের মত ডিম পেড়ে তাতে 'তা' দিয়ে টাকার বাচ্ছা পাড়তে হবে। কী করলে টাকার বাচ্ছা পাড়া যাবে তার চিন্তাতেই মেহের আলি সাহেব দিন-রাত বিভোর হয়ে থাকতো। শুধু নিজের টাকার চিন্তা নিয়েই যে বিভোর হয়ে থাকতো তাই-ই নয়, তার ক্লায়েণ্টদের স্বার্থের কথাও তাকে দিন-রাত ভাবতে হতো। আসলে তার ক্লায়েণ্টরাই হলো তার লক্ষ্মী। মেহের আলি সাহেব একদিন খুব গরীব লোক ছিল। তখন শেয়ার কেনা-বেচার মত টাকাও ছিল না তার। তখন তার শুধু একমাত্র লক্ষ্য ছিল কী করে টাকাওয়ালা লোকদের ভাঁজিয়ে তাদের দিয়ে শেয়ার কেনানো-বেচানো যায়। শেয়ার-বাজারের ব্রোকারদের যা আসল কাজ। শেয়ার কি কেউ ওম্‌নি-ওম্‌নি কিনতে চায়? তাদের মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে মুখে হাসি ফুটিয়ে টাকার লোভ দেখাতে হয়। এ বড় শক্ত কাজ। কোন্ শেয়ারের কত দাম, কোন শেয়ারের কী আসল দর আর কীই-বা তার বর্তমান বাজার-দর তা সব সময়ে কণ্ঠস্থ রাখতে হয়। কত বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মেহের আলি আজ টাকার জগতের অধীশ্বর হয়ে উঠেছে। তার অতীত জীবনের সমস্ত পরিশ্রমের ইন্‌ভেস্টমেণ্ট আজ মোটা ডিভিডেণ্ড্ দিচ্ছে। অনেক লোকের অনেক রকম কামনা-বাসনা থাকে। কেউ কামনা করে ভগবানকে, কেউ চায় শান্তি, কেউ চায় সুখ। কিন্তু মেহের আলি সাহেব কেবল একটা মাত্র জিনিসই চেয়েছিল জীবনে—তা হলো টাকা। সে কেবল বলেছিল—আল্লা, আমি আর কিছু চাই না, শুধু তোমার কাছে আমার একটাই আর্জি, তুমি আমাকে অনেক টাকা দাও। টাকা ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না তোমার কাছে।

আল্লা বোধহয় মেহের আলি সাহেবের আর্জি মঞ্জুর করেছিল। তাই মেহের আলি সাহেব আজ অনেক টাকার মালিক। কিন্তু টাকা চাওয়ার আশার কি শেষ আছে মানুষের? পেট ভরে খেলে খাওয়ার আশা মিটে যায়, কিন্তু টাকা? সিন্দুক-ভরা টাকা পেয়েও কি কখনও মানুষের টাকা পাওয়ার আশা মেটে?

মেহের আলি সাহেব সোহম্ রায়ের ড্রয়িং-রুমে বসে বসে একমনে এই টাকার অঙ্কই কষে চলেছিল। হঠাৎ সোহম্ রায় ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালো।

বললে—আসুন আসুন রায় সাহেব—

সোহম্ বসলো। জিজ্ঞেস করলে—কী হলো? এত সকালে যে?

মেহের আলি সাহেব পকেটে হাত দিয়ে বললে—টাকার কি সকাল-সন্ধ্যে আছে রায় সাহেব? হঠাৎ টাকা ডিম পাড়লো তাই আপনাকে দিতে এলাম—

—টাকা ডিম পাড়লো?

মেহের আলি সাহেব হো-হো করে হেসে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে পকেট থেকে একটা বাণ্ডিল বার করে সোহমের সামনে রেখে দিয়ে বললে—এই নিন ডিম, হিসেব করে গুনে নিন দশ হাজার ডিম ঠিক আছে কি না—

সোহম্ কিছুক্ষণ ধরে অবাক হয়ে চেয়ে রইল বাণ্ডিলটার দিকে। বললে—

ডিমই বটে, কিন্তু মুরগীর ডিম না হাঁসের ডিম বুঝতে পারছি না—

মেহের আলি সাহেব বললে—মুরগীর ডিমও নয়, হাঁসের ডিমও নয়, শেয়ারের ডিম—আপনি শেয়ার কিনেছিলেন, সেই শেয়ারের ডিম! মনে নেই?

এবার মনে পড়লো সোহমের। সোহম্ কত দিক সামলাবে। অফিসের সমস্যা, লেবার-ইউনিয়নের সমস্যা, তারপর ভানুভাই প্যাটেলের সমস্যা, তার ওপর সমস্যা আছে সুমিত্রাকে নিয়ে। কিন্তু সমস্ত সমস্যার মূল কথাটা তো হলো সেই একই। অর্থাৎ সেই টাকা। যে টাকা এই মেহের আলি সাহেব তার সামনে মেলে ধরেছে।

সোহম্ টাকার বাণ্ডিলটা হাতে তুলে নিয়ে পকেটে পুরতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেহের আলি সাহেব বললে—না না, টাকা গুনে নিন—সব সময় টাকা গুনে নেবেন—

সোহম্ বললে—আপনি কি আর আমাকে ঠকাবেন মেহের আলি সাহেব?

মেহের আলি সাহেব বললে—না রায় সাহেব, টাকার মত হারামী জিনিস আর নেই রায় সাহেব। টাকার জন্যে ছেলেও যেমন বাপকে খুন করতে পারে, তেমনি আবার বাপও টাকার জন্যে ছেলেকে খুন করতে পারে। এই শালা টাকা হলো এক নম্বরের হারামী! একে কখনও বিশ্বাস করবেন না রায় সাহেব—

শেষ পর্যন্ত সোহম্‌কে টাকাগুলো গুনতেই হলো। দশ হাজার টাকাই আছে। একটা পয়সাও কম নেই—

টাকাগুলো গুনে নিজের হেফাজতে রেখে সোহম্ বললে—কোথায় সই করবো, বলুন?

—সই?

যেন আকাশ থেকে পড়লো মেহের আলি। বললে—সই? সই করতে যাবেন কোন্ দুঃখে? এ তো শেয়ার কেনা-বেচার টাকা! এই টাকাগুলো যে আপনি পেলেন এ কাক-পক্ষীরাও জানতে পারবে না।

—তাহলে এ-টাকা আমি কোথায় রাখবো?

মেহের আলি বললে—যেমন করে সবাই টাকা রাখে তেমনি করে রাখুন—

—সবাই কেমন করে টাকা রাখে?

মেহের আলি বললে—মাটিতে পুঁতে রাখুন। আর যদি মাটি কোথাও না পান তো সোনা কিনে মিসেসের গয়না তৈরি করে ফেলুন। চুকে যাবে ল্যাটা।

—যদি কোনও দিন ইনকাম ট্যাক্সের কেউ জিজ্ঞেস করে কোথায় এত গয়না পেলাম? তখন?

—বলবেন বিয়ের সময় মিসেসের বাবা এ-সব গয়না যৌতুক দিয়েছিলেন। সোজা কথা, এর মধ্যে কোনও ঘোর-প্যাঁচ নেই। কোনও শালার ক্ষমতা নেই এ নিয়ে আপনাকে কেউ ধরে। আমরা রায় সাহেব সারা জীবন এই সব করছি, কত লোককে আমরা ফকির থেকে রাজা করে দিলুম, গভর্মেণ্ট কিছুছু টের পেলে না। নইলে আমারই বা চলছে কী করে বলুন! আমি তো আপনাদের দয়াতেই গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছি! সে-টাকার ওপর যদি ট্যাক্সো দিতে হতো তো এ-সব কিছু হতো? গভর্মেণ্টকে ফালতু টাকা দিয়ে কী লাভ বলুন

তো ? আমাদের বিপদের দিনে কি গভর্মেন্ট আমাদের দেখবে ?

কথাগুলো যুক্তি-সঙ্গত। এ-সব কথার জবাব দেবার মত কিছু নেই। সোহমের অফিসে যাবার দেরি হয়ে যাচ্ছিল। মেহের আলি বললে—আপনার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে অফিস যেতে—

সোহম্‌ বললে—তা তো হচ্ছেই, কিন্তু এটাও তো একটা কাজ! আপনি এত সকালে এলেন, আপনাকে এক কাপ চাও দিতে পারলাম না—

মেহের আলি কথাটা শুনেই চেয়ার ছেড়ে উঠলো।

বললে—এ-সব কথা বললে আমি আর আপনার এখানে আসবো না রায় সাহেব। আপনার সঙ্গে কি আমার ফরম্যালিটির সম্পর্ক? এতদিন বাদে আপনি আমাকে আজ এই কথা বললেন? আপনার কাছ থেকে আমি কত উপকার পেয়েছি তা কি আমি ভুলে গেছি রায় সাহেব? আমি কি নিমক-হারাম!

সোহম্‌ এ-কথার হয়ত কোনও জবাব দিতে যাচ্ছিল কিন্তু মেহের আলি সাহেব তার আগেই বললে—জীবনে আপনিও অনেক লোক দেখেছেন আমিও অনেক লোক দেখেছি, কিন্তু একটা কথা বলুন তো, কখনও কি সোজা আঙুলে ঘি উঠতে দেখেছেন?

সোহম্‌ এবারও কিছু জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই মেহের আলি বলে উঠলো—না রায় সাহেব, সোজা আঙুলে কভি ঘি ওঠে না। আর একটা কথা শুনে রাখুন রায় সাহেব, এই দুনিয়াতে কত দামী-দামী কিম্‌তি-কিম্‌তি চিজ্‌ আছে। গাড়ি আছে, কোঠি আছে, জেবর-ওবর সবই কিম্‌তি চিজ্‌। লেকিন টাকা? টাকা হলো মানুষের কলিজা। কলিজা যদি মজ্‌বুত থাকে তো মানুষের জিন্দ্‌গী ভি মজ্‌বুত থাকে—

তারপর একটু থেমে বললে—আচ্ছা, চলি রায় সাহেব, রাম রাম—

সোহম্‌ও বললে—রাম—রাম—

বলে নিচেয় চলে গেল মেহের আলি। তারপর নিজের গাড়ির স্টিয়ারিং এ হাত দিয়ে এ্যাক্‌সিলেটারে পা দিয়ে চাপ দিলে। গোঁ-গোঁ করে গাড়ি চলতে শুরু করলো। গাড়ির আওয়াজ সোহমের কানে এল। সোহম্‌ টাকার বাণ্ডিলটা আবার হাতে তুলে নিলে। দশ হাজার টাকা! দশ হাজার টাকা! ফালতু পাঁচশো টাকার শেয়ার কিনে রাতারাতি দশ হাজার করকরে নোট তার হাতের মুঠোয় এসে গেল। এটাও ফালতু টাকা। এ-টাকার ভাগ কাউকে দিতে হবে না, এই ফাল্‌তু টাকার জন্যে কারো কাছে কোনও জবাবদিহিও দিতে হবে না। কোনও ট্যাক্সও দিতে হবে না। এর চেয়ে বড় সুখ আর কী হতে পারে?

আজ এত কাল এত যুগ পরে নিউ আলিপুর থেকে ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে গাড়ি চালাতে চালাতে সোহমের মনে হলো আসলে সব মানুষই বোধহয় এক একজন মূর্তিমান মেহের আলি। তাদের নামগুলোই শুধু আলাদা আলাদা। কারোর নাম রকফেলার, কারো নাম ফোর্ড, কারোর নাম বিড়লা, কারোর নাম টাটা আবার কারো নাম রাম শ্যাম যদু মধু কিংবা হরি। অথবা কারো নাম সোহম্। এই সোহম্ রায়, যে মানুষটা নিউ আলিপুর থেকে লোয়ার সার্কুলার রোড এর দিকে ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

আশ্চর্য, সেদিন সোহম্ রায় মেহের আলি সাহেবের সব কথাই সত্যি বলে বিশ্বাস করেছিল। বিশ্বাস করেছিল মন-প্রাণ দিয়ে যে এই দুনিয়াতে মানুষের সব চেয়ে মজবুত জিনিস হচ্ছে কলিজা। টাকাই মানুষের সেই কলিজা। কলিজা যদি মজবুত থাকে তো মানুষের জিন্দগীও মজবুত থাকে।

হায় রে মেহের আলি সাহেব আর হায় রে মেহের আলি সাহেবের কপাল! কোথায় গেল সেই শেয়ার মার্কেটের ব্রোকার। আর কোথায় গেল সেই মেহের আলি সাহেব নিজে। টি-আয়রন স্টীল-কটন সব কিছুর বাজার তখন ডাউন্ হয়ে গেছে। তখন মেহের আলি সাহেবকে দেখলে মায়া হতো। তার সেই বিলিতি ইমপোর্টেড্ কার, তার সেই ফরেন টেরিলিনের দামী স্যুট আর কুমীরের চামড়ার জুতো! তার বদলে তখন ময়লা-ছেঁড়া শার্ট-প্যাণ্ট আর পায়ে রঙ-ছুট কাবুলি-শু। আর মুখে একমাত্র বুলি - সব ঝুট্ হ্যায় রায় সাহেব, সব ঝুট্ হ্যায়—

হায় রে, তখন যদি সোহম্ রায় জানতো যে মেহের আলি সাহেবের ওই ক'টা কথার মত খাঁটি কথা সংসারে আর দু'টি নেই। সত্যিই, তখন সোহম্ রায় মেহের আলি সাহেবের সেই কথাগুলোর মানে বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল টাকাই হলো মানুষের কলিজা। আর ক্ষেত্রবাবু যে-কথাগুলো শিখিয়েছিলেন সে-সব মিথ্যে।

কিন্তু যেদিন মেহের আলি সাহেব পাগল হয়ে গেল সেদিন সোহম্ হুকুম দিয়ে দিয়েছিল অফিসে-বাড়িতে কোথাও যেন মেহের আলিকে ঢুকতে না দেওয়া হয়। কারণ ওই 'সব-ঝুট্-হ্যায়' কথাগুলো শুনতে তার তখন আর ভালো লাগতো না। কেবল মনে হতো—'সব ঠিক হ্যায়' 'সব ঠিক হ্যায়'। এই মিস্টার সেন, এই 'টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাকসন্' কোম্পানি, এই ওয়েলফেয়ার অফিসারের মাসে পাঁচ হাজার টাকা মাইনের চাকরি, এই সুমিত্রা, এই ইব্রাহিম, এই বিভূতি পোদ্দার, এই কেশব মাইতি—সব কিছু মিলিয়ে এই সমস্তই হচ্ছে ঠিক। সব ঠিক হ্যায়। আর সব কিছু ঝুট্।

আর আজ?

কিন্তু সে-কথা এখন থাক।

সেদিন মেহের আলি সাহেব টাকাগুলো দিয়ে চলে যাওয়ার পর সোহম্ নিজের বেড-রুমে এসে গডরেজের আলমারির একটা লুকোনো চেম্বারের মধ্যে টাকাগুলো রেখে দিলে। তারপর নিঃশব্দে আলমারির দরজায় চাবি দিয়ে টিপি টিপি পায়ে বাইরে চলে এল। পাশের বিছানাটার ওপর তখনও সুমিত্রা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। ঘুমোলে শরীর ভাল হয়। দ্যাটস্ গুড্।

তারপর নিচেয় এসে গাড়িতে উঠলো। একেবারে সোজা এসে ওঠা 'টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাক্সন্' কোম্পানির অফিস। গাড়িটায় চাবি লাগিয়ে সোহম্ অফিসের ভেতরে ঢুকলো।

সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে যেতেই দেখলে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিস্টার সেন আগেই এসে গেছেন।

নিজের চেম্বারে হাতের পোর্টফোলিওটা রেখে পাশের মিস্টার সেনের চেম্বারে ঢুকলো।

মিস্টার সেন কাজ করতে করতে মুখ তুলে চাইলেন।

—ইউ আর লেট্ টো-ডে। আজকে তোমার দেরি হলো অফিসে আসতে!

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, ঠিক অফিসে বেরোব, এমন সময় মেহের আলি বাড়িতে এসে হাজির। তাকে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারি না। তাই চা অফার করলাম। তাতেই আমার দেরি হয়ে গেল—

—তোমাকেও কি শেয়ার গছাতে চাইছে নাকি?

—হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আমি কেন ওর কথায় ভুলতে যাবো? আমি ওকে বলে দিয়েছি যে-শেয়ার-টেয়ারের ওপর আমার বিশ্বাস নেই।

—ভালো করেছো। বোস, অনেক কথা আছে—

বলে টেব্‌লের তলায় হাত দিয়ে একটা সুইচ টিপে বাইরের লাল বাল্‌বটা জেবলে দিলেন। তার মানে যতক্ষণ লাল বাল্‌বটা জ্বলবে ততক্ষণ মিস্টার সেন 'ভেরি বিজি'। বড় ব্যস্ত। ওই লাল আলোটা দেখে কেউ আর মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না। ওটা অনেকটা 'নিষেধ-বাণী'র মত। তোমরা যখন-তখন আমাকে বিরক্ত করতে আসবে, সেটি হবে না। আমি এখন অফিসের কাজে ব্যস্ত!

এবার একটু হাল্‌কা হলেন মিস্টার সেন। চেয়ারটায় হেলান দিয়ে মনটাকেও হাল্‌কা করে নিলেন। বললেন—ইজ্ এভরিথিং অলরাইট? যা-যা বলেছিলুম তা করেছিলে তো?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার। অফিস থেকে বেরিয়েই আমি সোজা ইব্রাহিমের বাড়িতে গিয়েছিলুম।

—দেখা হলো?

—দেখা হয়েছে। আপনি যা-যা আমাকে বলতে বলেছিলেন, সব বললাম।

—সঙ্গে আর কে ছিল?

সোহম্ বললে—সঙ্গে আর কাউকে নিইনি। শুধু ইব্রাহিমকে দিয়েই

খালাসীটোলায় গিয়েছিলাম।

—খালাসীটোলা? সেটা আবার কোথায়?

—সে আপনি চিনবেন না স্যার। আমি যখন ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ছিলাম তখন আমরা ওখানে গিয়ে মদ খেতাম। ওটা একটা ডেমোক্র্যাটিক বার। ওখানে গরীব ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালরা গিয়ে দেশী মদ খায়।

—তারপর? টাকাটা নিলে?

সোহম্‌ বললে—নেবে না? কী বলছেন আপনি? মুফত্‌ টাকা কেউ নিতে ছাড়ে? আমি যখন ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ছিলাম তখন আমিও তো নিয়েছি। এ আর নতুন কথা কী?

মিস্টার সেন বললেন—কিন্তু টাকাও নেবে আবার নিমক-হারামী করবে, ও সে-রকম করবে না তো?

সোহম্‌ বললে—না, কোম্পানির সঙ্গে কোনও নিমক-হারামী করবে না। নিমক-হারামী করবে লেবারদের সঙ্গে। আসলে লীডারদের কোনও কালে কোনও রকম লোকসান হয় না। লোকসান যত হয় সব গরীব বেচারী মজুরদের। কোম্পানিও তাদের ঠকায়, ইউনিয়নের লীডাররাও ঠকায় তাদের।

কথাগুলো বোধহয় মিস্টার সেনের ভালো লাগছিল না। বললেন—যাক্‌-গে ও-সব কথা, শেষ পর্যন্ত কী হলো?

সোহম্‌ বললে—একসঙ্গে ইব্রাহিমের সঙ্গে দিশী মদ খেয়ে আমি দেখিয়ে দিলাম যে আমি ওদেরই দলে, আমি মালিকের দালাল নই।

—এটা কি সে বিশ্বাস করলে?

সোহম্‌ বললে—বিশ্বাস করলে কি করলে না তা আমাদের জানার দরকার কী? টাকাটা যখন সে নিয়েছে তখন বুঝতে হবে মাছে টোপ গিলেছে। আমরা তো সেইটেই চাইছিলুম। তা এর পরে আমি আর একটা কাজ করবো ঠিক করেছি—

—কী কাজ?

সোহম্‌ বললে—ভাবছি ইব্রাহিমকে এবার একদিন বাড়িতে ইন্‌ভাইট্‌ করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো। খালাসীটোলায় খাওয়ালে ঠিকমত কাজ হয় না।

—ভেরি গুড্‌ আইডিয়া, ওই ইব্রাহিমটাই সব চেয়ে পাজি। এই স্ট্রাইক্‌ করার মূল পাণ্ডাই হচ্ছে ও।

সোহম্‌ বললে—তা কি আমি জানি না ভেবেছেন? আমার তো মনে হয় যদি কোনও দিন ওদের পার্টি পাওয়ারে আসে, ও ক্যাবিনেটে একটা পোর্টফলিও পেয়ে যাবে। মদের নেশায় সেই কথাই ও বলে ফেললে আমাকে—

—তাই নাকি?

সোহম্‌ বললে—আরো সব অনেক কথা শুনলুম।

—কী রকম?

—ইব্রাহিম বললে যে 'টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্‌' কোম্পানির ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হয়ে জীবন কাটাবে এমন আহাম্মক ও নয়, আর এত ছোট নজরও ওর

নয়। ও এখন থেকে টাকা জমাচ্ছে আরো বড় ফিল্ডে ও নামতে চায় বলে। এখন এখানে শুধু হাত পাকাচ্ছে—

মিস্টার সেন সবটা শুনলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—তা শেষ পর্যন্ত কী করবে কিছু বললে ?

সোহম্ বললে—এখনও পর্যন্ত তো স্ট্রাইক নোটিশের ব্যাপারে ওরা অটল। স্ট্রাইক ওরা করবেই।

—তাহলে আমার কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া তাহলে একেবারে নষ্ট হলো ?

সোহম্ বললে—না, এখনও আশা ছাড়িনি—

—তাহলে কি ও-ও চাকরিতে প্রমোশন চায় ?

—না।

মিস্টার সেন বললেন—তাহলে ?

সোহম্ বললে—এখন দেখি কী করতে পারি। আমি বাড়িতে ফিরে আমার স্ত্রীকে গিয়ে সব বললুম—

—তারপর ?

সোহম্ বললে—ভাবছি ওকে একবার আমার বাড়িতে ডেকে দামী মদ খাওয়াবো। সেখানে আমার মিসেসও থাকবে।

—তোমার মিসেস তাতে রাজি হয়েছেন ?

—আমি তাকে রাজি করিয়েছি—

—ভেরি গুড্—আমার মনে হয় তাতেই কাজ হবে।

সোহম্ বললে—কিন্তু একটা মুশকিল আছে স্যার আমার বাড়িতে—

—কীসের মুশকিল ?

সোহম্ সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে বললে। হঠাৎ ভুপাল থেকে তার পিসিমা আর পিসতুতো দাদা তার বাড়িতে এসে উঠেছে। তাদের কাছে ছোটবেলায় সোহম্ মানুষ হয়েছে। তার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর পিসীমাই তাকে মানুষ করেছে। কিন্তু ওই পিসতুতো দাদাই একদিন তাকে রাত দশটার সময়ে বাড়ি থেকে এক-কাপড়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তার পরে কত কষ্ট করে কত দুঃখে সে যে লেখা-পড়া শিখেছে তা একমাত্র সে-ই জানে। তারপর ক্ষেত্রবাবু মিস্টার সেনকে চিঠি না দিলে হয়ত সে চিরকাল রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতো। এখন সে ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের ধারণা হয়েছে তার অনেক টাকা হয়েছে। তাই তারা আবার নতুন করে তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতে এসেছে—

মিস্টার সেন কিছু কিছু কথা আগেই জানতেন, এবার সোহমের মুখ থেকে আরো অনেক কথা জানতে পারলেন। বললেন—এর পরও তুমি তোমার বাড়িতে ওদের থাকতে দিয়েছ ? এখখুনি তুমি তাদের তোমার বাড়ি থেকে দূর করে দাও—। যারা তোমার বিপদের দিনে তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আজকে তোমার সুখের দিনে তুমি তার উপযুক্ত জবাব দাও, সেই অপমানের প্রতিশোধ নাও—

সোহম বললে—আমিও তাই ভাবছি, ওরা বাড়িতে থাকলে তো ইব্রাহিমকে বাড়িতে ডেকে পার্টি দিতে পারবো না—

মিস্টার সেন বললেন—যদি তাদের অপমান করতে তোমার বিবেকে বাধে তাহলে টাকা দাও তাদের। এই দুনিয়ায় টাকাতেই সবাই জব্দ। অনেক টাকা দিয়ে তাদের বিদায় করো। কোম্পানি সে-টাকা দেবে, তোমার পকেট থেকে কিছু খরচ করতে হবে না—

সোহম্ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

মিস্টার সেন বললেন—কী ভাবছো? আত্মীয়দের অপমান করতে তোমার মায়া হচ্ছে? দেখ, একটা কথা আমার কাছে শিখে নাও। সেটা হচ্ছে এই যে জীবনে উন্নতি করতে গেলে দয়া-মায়া করলে চলবে না—। 'দয়া' 'মায়া' কথাগুলো স্কুল-কলেজের টেক্স্ট্ বুকে লেখা থাকে। ওটা জীবনে অ্যাপ্লাই করতে নেই। তুমি যদি নিজের উন্নতি চাও তো কারোর ওপর কোনও দয়া-মায়া কোর না। ওতে তোমার ক্ষতি হবে—

সোহম্ বললে—আচ্ছা, তা-ই করি স্যার। আপনি যা বলছেন সেইটেই আমি ফলো করবো। দেখি—

বলে মিস্টার সেনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল।

মিস্টার সেন দরজার বাইরের লাল রংএর বালবের আলোটা সুইচ টিপে নিভিয়ে দিলেন। যারা অফিসের কাজে মিস্টার সেনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা এখন একে একে ভেতরে ঢুকতে লাগলো। সবাই জানলো এতক্ষণ মিস্টার সেন বন্ধ-দরজার ভেতর মিস্টার রায়ের সঙ্গে জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এবার তাঁর হাত খালি হয়েছে—এখন তোমরা আমার ঘরে এসো। আমি এখন ফ্রী—

অফিসের পরে সেদিন সোহম্ যখন আবার রাস্তায় বেরোল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অফিসের বাইরে এসে চারদিকের ভিড়ের দিকে চেয়ে তার মনটা যেন হাল্কা হলো। অথচ জীবনের এতগুলো ধাপ পেরিয়ে যখন সে এতটা ওপরে উঠতে পেরেছে, যখন সামান্য কেরানীর চেয়ার থেকে একেবারে ওয়েলফেয়ার অফিসারের চেয়ারে বসতে পেরেছে, তাহলে আর তার দুঃখ কীসের?

সে নিজের মনের কাছে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলো—কেন তার দুঃখ? কীসের দুঃখ? কার জন্যে দুঃখ? একদিন সে যা কল্পনাও করতে পারেনি তাই-ই সে আজ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে, টাকা পেয়ে গেছে, বাড়ি পেয়ে গেছে, গাড়ি পেয়ে গেছে, সকলের সম্মান-শ্রদ্ধাও পেয়ে গেছে। অফিসে যারা নতুন এসেছে তারা রায় সাহেবকে দেখলে ভয়ও পায়। তারা জানে যে রায় সাহেব রেগে গেলে

তাদের চাকরির উন্নতিতে বাধা পড়বে। সবাই রায় সাহেবকে খুশী করবার চেষ্টা করে, যাতে তাদের উন্নতির পথে বাধা না পড়ে, যাতে তাদের পদোন্নতি সহজ হয়। আর তাছাড়া, ঈর্ষা ?

প্রশংসা পয়সা ফেললেই তো কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঈর্ষা ? ঈর্ষা তো উপার্জন না করলে পাওয়া যায় না। সেই দুর্লভ ঈর্ষাও তো সে পেয়েছে ! ইব্রাহিম, বিভূতি পোদ্দার, কেশব মাইতিরা তো তার চাকরির উন্নতির জন্যে তাকে ঈর্ষাই করে। 'আহা' না বলে 'হারামজাদা' বা 'মালিকের দালাল' কথাগুলো তো ঈর্ষারই। তাহলে ? তাহলে তার দুঃখ কী জন্যে ? কেন তার এই 'মেলানু-'কোলিয়া ?'

এটা নতুন নয় সোহম্ রায়ের জীবনে। ছোটবেলা থেকেই এই রোগ তার ছিল। বাবা-মা মারা যাবার পরও এই রোগটা ছিল তার। তারপর পিসীমার বাড়িতে আসবার পর কিছুদিনের জন্যে শুধু সে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু কাশী দত্ত ? কাশী দত্তই তো সবচেয়ে আঘাত দিয়েছিল তার মনে। কাশী দত্ত যখনই তাকে বেশি খেতে দেখতো তখনই রাগের মুখে যা নয় তাই বলতো।

বলতো—তোর লজ্জা করে না অত ভাত খেতে ?

রাত্রে অনেক দিন বিছানায় শুয়ে সোহম্ লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে। সে তখনই বাবার কথা ভেবে কেঁদেছে, মা'র কথা ভেবে কেঁদেছে। আর ভগবানকে ডেকে বলেছে—আমার ক্ষিদে কমিয়ে দাও ঠাকুর, এমন করে দাও যাতে আমার আর ক্ষিদে না পায় !

কিন্তু এখন তো আর তা নেই। এখন তার নিজের ফ্ল্যাট হয়েছে, এখন তার নিজের গাড়ি হয়েছে। এখন তার তাঁবে অনেক লোক রয়েছে। এখন যখনই যা খেতে ইচ্ছে হয় তা একবার হুকুম দিয়ে দিলেই হলো। তারা তা তামিল করে দিতে পারলেই ধন্য হয়ে যাবে।

তাহলে এখন এই সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে তার মনে এমন দুঃখ হচ্ছে কেন ? এমন মেলানকোলিয়া হচ্ছে কীসের জন্যে ? কী সে পায়নি ? কী তার পেতে বাকি আছে !

হঠাৎ মনে পড়ে গেল আগের রাত্রের দেখা স্বপ্নটার কথা ! স্বপ্ন অবশ্য সত্যি নয়। স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না।

তবু যাঁকে সে স্বপ্নে দেখেছিল সেই ক্ষেত্রবাবুর কথা হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল।

ওই ক্ষেত্রবাবুই তো বলেছিলেন—সেই পাওয়াতেই মানুষের চরম আনন্দ যে পাওয়ার মধ্যে কিছু না-পাওয়া থেকে যায়—

—সেটা কী স্যার ?

ক্ষেত্রবাবু বলেছিলেন—তোমরা বই-টই তো পড়ো না,এই-ই তোমাদের দোষ ! বই পড়ো, বই পড়ো। শুধু স্কুলের বই নয়, স্কুলের বাইরের বইও পড়তে হবে। তা না হলে মানুষ হবে না, জানোয়ার হবে।

তবু সোহম্ ছাড়েনি। বলেছিল—বলুন না স্যার, ওটা কার কথা ? কে

লিখেছে ? কোন্ বইতে লেখা আছে ?

তবুও ক্ষেত্রবাবু কথাটার জবাব দেননি।

সোহম্ আবার জিজ্ঞেস করেছিল—বলুন না স্যার, ও-কথাগুলোর মানে কী?

ক্ষেত্রবাবু তবুও বলেননি উত্তরটা ! এমন কী জিনিস আছে পৃথিবীতে যা পেলেও মনে হবে কিছু পাওয়া যেন তখনও বাকি রয়ে গেল !

এতদিন পরে সোহমের আবার ক্ষেত্রবাবুর সেই কথাগুলো মনে পড়লো। তার নিজেরও তো এখন অনেক টাকা হয়েছে, কিন্তু এখনও কি টাকা পাওয়া শেষ হয়েছে ? তবে কেন মেহের আলির কাছ থেকে সে শেয়ার কিনছে ?

কিন্তু আনন্দের বদলে তার তো কেবল দুঃখই হচ্ছে। কেবল আরো কষ্টই হচ্ছে। তাই তো এখন তাকে 'মেলানকোলিয়া' রোগে ধরেছে।

—বলুন না স্যার, ওটা কার কথা ? কে লিখেছে ?

অনেক পীড়াপীড়ির পর ক্ষেত্রবাবু জবাব দিয়েছিলেন—কথাটা রবি ঠাকুরের। যাঁকে সবাই এখন 'রবীন্দ্রনাথ' বলে ডাকে—

—সেটা কী জিনিস স্যার যেটা পেলেও মনে হয় সবটুকু পাইনি ? আর যা না-পাওয়ার জন্যে আনন্দ হয় ?

ক্ষেত্রবাবু বলেছিলেন—তোমরাই বলো না, কী জিনিস সেটা ?

সোহম্ বলেছিল - টাকা স্যার।

কথাটা শুনেই ক্ষেত্রবাবু রেগে গিয়ে চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। এ-কথার পর আর কোনও জবাব দেননি। অনেক করে বলাবলিতেও চুপ থেকে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—বাজে কথা, টাকাতে কেবল দুঃখই বাড়ে—

সেই ক্ষেত্রবাবু এত দিন পরে কাল রাত্রে হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে কেন দেখা দিয়েছিলেন ?

এখন সেই ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হলে বড় ভালো হতো। কিন্তু তার আর দরকার নেই। দরকারও নেই, আর সোহমের দেখা করবার সময়ও নেই। সোহমের মনে হলো যখন তার টাকা ছিল না, যখন তার মাইনে এত বাড়েনি, তখন যেন এখনকার চেয়ে মনে অনেক শান্তি ছিল। যত টাকা হচ্ছে ততই যেন তার সমস্যা বাড়ছে। কোথাকার কে এক ভানুভাই প্যাটেল, তাকে হাত করতে হবে। লোফার ইব্রাহিমকে বাড়িতে ডেকে এনে মদ খাওয়াতে হবে ! সুমিত্রাকে দিয়ে মদ ঢেলে খাওয়াতে হবে !

আর শুধু কি তাই ?

এখন কোথা থেকে আবার সেই পুরোনো ঝামেলা তার জীবনে এসে জুটেছে। একদিন যাদের হাত থেকে সে মুক্তি চেয়েছিল সেই মুক্তিই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পেয়েছিল আর তার জন্যে সে তার ভাগ্যবিধাতার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়েও থেকে-ছিল। কিন্তু এতদিন পরে কেন আবার তারা এসে জুটলো তার বাড়িতে? সোহম্ যে তার বাড়িতে ইব্রাহিমকে ডেকে এনে আরাম করে নিজের খুশিমত একটু তোয়াজ করবে তার পথও তারা বন্ধ করে দিলে ! এখন তাদের সে তাড়াবে কী করে ? গালাগালি দিয়ে ? অপমান করে ? তার কাছে তার আত্মীয় বড়, না তার চাকরি

বড় ? আত্মীয়রা চলে গেলে সে তো শুধু ইব্রাহিম নয়, খোদ্ ভানুভাই প্যাটেলকেও বাড়িতে ডেকে কক্‌টেল পার্টি দিতে পারে।

কিন্তু কাশী দত্ত আর তার মাকে কী করে তাড়ানো যায় ? লাঠি মেরে ?

হঠাৎ রাস্তার মোড়ে ট্র্যাফিক-সিগন্যালে লাল রং-এর আলো জ্বলে উঠলো। সোহম্ গাড়ির ব্রেকটা পা দিয়ে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের গাড়িগুলোও একে একে থেমে গেল। সোহম্ চাবি ঘুরিয়ে গাড়ির ইঞ্জিনটা থামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

বাড়িতে তখন সুমিত্রা নিজের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল। একান্ত নিরিবিলি দেখে পিসীমা ঘরে ঢুকল।

পিসীমা বললে—চা খাচ্ছো ছোট-বউমা ?

সুমিত্রা বললে—হ্যাঁ, আপনি চা খেয়েছেন ?

পিসীমা সামনের চেয়ারটার ওপর বসে বললে—না বউমা, আমি তো চা খাই না। আমার ও-সব নেশা নেই। কিন্তু আমার কাশীর ওই বদ্ রোগ আছে। বড্ড চায়ের নেশা ওর—

সুমিত্রা আর কিছু বললে না দেখে পিসীমা আবার বললে—আমার বাড়িতে যখন সোহম্ ছিল তখন কিন্তু ও কোনও দিনের জন্যেও চা খায়নি। তখন কাশীও চা খেত না। এখন ভুপালে গিয়ে কাশী চা ধরেছে। আমার বড়-বউমাও চা খায়। আমি কত বারণ করি ওদের। বলি—ওরে, ওগুলো খাস্‌নি, ওটা বিষ ! কিন্তু ওরা আমার মত বুড়ো মানুষের কথা শুনবে কেন ? এককালে বলে বলে হার মেনেচি, তারপর এখন আর বলি না। ভাবি চা খাচ্ছে খাক, যে যা ইচ্ছে করে করুক গে ! আমার তো এখন গঙ্গামুখো পা তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেচে, যে-কটা দিন আছি চোখ বুজে থাকি, এর পর যখন চোখ বুজবো তখন ঠ্যালা বুঝবে। সেই যে কথায় আছে না, কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে, তখন তাই-ই হবে। আমি কেন বকে বকে নিজের শরীর খারাপ করি। তুমি তো দেখছো ছোট-বউমা, আমি এতদিন তোমার কাছে আছি, তোমাদের সংসারের কথার মধ্যে কখনও নাক গলিয়েচি ? বল বউমা, নাক গলিয়েচি ?

সুমিত্রা কী আর বলবে, শুধু শুনতে লাগলো কথাগুলো, আর চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলো।

পিসীমা আবার বললে—হ্যাঁ বউমা, একটা কথা রোজ বলি-বলি করেও বলা হয় না।

সুমিত্রা বললে—বলুন না, কী কথা ?

পিসীমা বললে—তুমি কিছু মনে করবে না তো ছোট-বউমা ?

সুমিত্রা বললে—না, মনে করবো কেন ? আপনি তো গুরুজন। গুরুজনের কথায় কি কিছু মনে করতে আছে ?

—এই তো ছোট-বউমা, এই তো একজন বুদ্ধিমতী মেয়ের মত কথা বলেছ। সংসারে কে এ-কথার দাম দেয় বলো তো মা। তুমি বুদ্ধিমতী বলেই আমার কথাটা টক্ করে ধরে ফেলেছ। একেই বলে বুদ্ধি। বেঁচে থাকো মা, আশীর্বাদ করি তুমি এয়োস্ত্রী হয়ে অনেক দিন বেঁচে থাকো। সোহম্ আগের জন্মে অনেক পুণ্য করে এসেছিল তাই তোমার মত বুদ্ধিমতী বউ পেয়েচে।

সুমিত্রা এ-কথার কোনও উত্তর দিলে না। বদ্যিনাথ এসে চায়ের কাপ-ডিশ নিয়ে চলে গেল।

তারপরেও অনেকক্ষণ কোনও কথা নেই।

এক সময়ে পিসীমা আবার বললে—তোমাকে আমি বিরক্ত করছি না তো বউমা ?

সুমিত্রা বললে—না না, বিরক্ত করবেন কেন ?

পিসীমা বললে—না, অন্য সময় তো তোমাকে একলা পাই না, এখন দেখলুম কিনা তুমি জেগে আছো, তাই ঘরে ঢুকলুম। সকালেও তোমার ঘরে এসে উঁকি দিয়েছিলুম। দেখলুম তুমি ঘুমুচ্ছো, তাই আর ডাকিনি।

তারপর একটু থেমে পিসীমা আবার বললে—আচ্ছা বউমা, আজকে সোহমের অফিস থেকে আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন, বলো তো ?

সুমিত্রা বললে—হয়ত অফিসের কাজে আটকে গেছে। সব দিন তো সমান কাজ থাকে না। কাজ বেশি থাকলে বাড়ি ফিরতে দেরিই হয়—

এর পরে পিসীমা বললে—অফিসের কাজ করে সন্ধ্যেবেলা বাড়িতে ফিরে একটু বিশ্রাম করলেই হয়। তা নয়, অফিস থেকে ফিরে সোহম্ আবার বাইরে যায় কেন ?

সুমিত্রা কোনও উত্তর দিলে না এ-কথার।

এবার পিসীমা আসল কথাটা বললে—আচ্ছা ছোট-বউমা, তোমরা রোজ কোথায় যাও বলো তো ?

সুমিত্রা বললে—ক্লাবে।

—ক্লাব ? তার মানে ?

সুমিত্রা বললে—আমরা সবাই ক্লাবে গিয়ে মেলা-মেশা গল্প-গুজব এই সব করি। কখনও কখনও খাওয়া-দাওয়াও হয়—

—আর কী করো ?

—আর কিছু না।

—কী খাও সেখানে ?

—এই মাংস-বিরিয়ানী, পোলাউ, যা হুকুম করা হয় তাই-ই রান্না করে দেয় তারা।

—কারা রান্না করে ? তোমরা নিজেরা ?

সুমিত্রা বললে—না, আমরা নিজেরা রান্না করতে যাবো কেন ? মাইনে করা

রান্নার লোক আছে সেখানে।

—কে খরচার টাকা দেয় ?

—আমরা সবাই চাঁদা দিয়ে রান্নার লোক রেখেছি, তারাই রান্না-বান্না করে।

—রান্না না-হয় তারা করে, কিন্তু বাজার-টাজার করে কে ?

সুমিত্রা বললে—বাজার-টাজার করবার জন্যেও আলাদা লোক রাখা হয়েছে—

পিসীমা এত কথার পরেও যেন কিছু বুঝতে পারলে না।

বললে—তা ওখানে গল্প-টল্প করে বাড়িতে এসে খেলে দোষ কী ? তোমাদের বাড়িতে তো রান্না করা বাজার করার লোকজন রয়েছে। বাইরে খাওয়া কি ভালো বউমা ? সেখানে তারা কী রান্না করছে, ভেজাল দিচ্ছে কি না তা তো আর তোমরা নিজের চোখে দেখতেও পাচ্ছো না—

সুমিত্রা বললে—তা আর কী করা যাবে। আমরা তো একলা খাই না সেখানে। আরো অনেক লোক যায়, আপনার ভাইপো বলে এইটেই নাকি এই সভ্য-সমাজের রেওয়াজ···

পিসীমা বললে—তা যেখানকার যা রেওয়াজ তা তো মেনে চলতে হবেই। তা কত লোক সেখানে রোজ খায় ?

সুমিত্রা বললে—তা একশো-দেড়শো তো হবেই।

—ওমা, অত লোক যায় ?

সুমিত্রা বললে—আরও লোক তো যেতে চায়, কিন্তু টাকা দিলেও তো কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না—

—ঢুকতে পারে না ?

—না !

—অনেক টাকা লাগে বুঝি ?

সুমিত্রা বললে—হ্যাঁ, অনেক টাকা !

—কত টাকা লাগে ঢুকতে ?

—দশ হাজার টাকার মতন চাঁদা ঢোকবার সময় দিতে হয়, তারপর মাসে মাসে—

পিসীমা চমকে উঠলো—দশ হাজার !!!

সুমিত্রা বললে—কুড়ি হাজার টাকা দেবার ক্ষমতাও আছে অনেকের, কিন্তু সবাইকে তো নেওয়া হয় না—

—কেন ? নেওয়া হয় না কেন ?

সুমিত্রা বললে—সবাই যদি ভোট দেয় তাহলেই তাকে মেম্বার করা হয়। সকলের মত চাই, সকলে মিলে মত দিলে তবে ক্লাব তাকে মেম্বার করবে—

—মেম্বার ? মেম্বার মানে কী ?

—মেম্বার মানে সভ্য, তার মানে ক্লাবের খাতায় তার নাম উঠবে।

পিসীমা বললে—খাতায় নাম উঠলে কী হবে ?

—ইজ্জত বাড়বে, সম্মান বাড়বে। সমাজের দশজন নাম করবে।

—যারা যায় সেখানে তারা কি সবাই নিজেদের বউ-টউকে নিয়ে যায় ?

সুমিত্রা বললে—হ্যাঁ, শরীর ভালো থাকলে বউরাও যায়, সেইটেই মোটমাট নিয়ম—

পিসীমা বউমার কথাগুলো শুনছিল আর অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এও এক অদ্ভুত জগৎ! এত কাণ্ড যে কলকাতায় হয় তা পিসীমা কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ পিসীমা কলকাতাতেই ছোটবেলায় কাটিয়েছে। বিয়েও হয়েছে কলকাতাতেই। এখন এই ক'টা বছর ছেলের চাকরি হওয়াতে ভুপালে চলে গেছে। এই ক'বছরের মধ্যে কলকাতাটা কি এতই বদলে গেল! তা হলে সত্যি সোহমের এত টাকা হয়েছে! টাকা যে হয়েছে তা তার গাড়ি-বাড়ি-চাকর-ঠাকুর দেখেই পিসীমা বুঝেছিল। কিন্তু তা বলে এত টাকা? এত টাকা তো পিসীমা কল্পনাও করতে পারেনি। দশ হাজার টাকা দিয়ে ক্লাবের মেম্বার হয়েছে! দরকার হলে নাকি কুড়ি হাজার টাকাও দিতে পারতো!

সমস্তই অবাক কাণ্ড বলে মনে হলো পিসীমার। অথচ পিসীমা যখন দাদার মা-বাপ মরা-সোহমকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিল তখন কি জানতো যে সে একদিন এত বড় হবে! তা জানলে কি সেদিন সোহমকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে দিত!

অথচ পিসীমার নিজের ছেলে কাশী; সে তো দুটো পরীক্ষায় পাস করেছে। এখনও মাসে তিনশো টাকা করে মাত্র মাইনে পায়। তার নুন আনতে পান্তাই ফুরিয়ে যায়। কী করে কত কষ্টে যে পিসীমার সংসার চালাতে হয় তা কেবল পিসীমাই জানে। কাশীও জানে। সবই ভাগ্য!

পিসীমা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো—আচ্ছা বউমা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? তুমি কিছু মনে করবে না তো?

'সুমিত্রা বললে—বলুন না পিসীমা, কী বলবেন বলুন না—

—সত্যি বলো, তুমি কিছু মনে করবে না গো?

সুমিত্রা বললে আমি কিচ্ছু মনে করবো না—বলুন না—

পিসীমা কথাটা বলেই ফেললে। বললে—অনেক রাত্তিরে যখন তোমরা ফেরো তখন তোমরা দুজনে অত টলতে টলতে আসো কেন? বদ্যিনাথ তোমাদের ধরে ধরে ওপরে নিয়ে আসে! তোমাদের কি তখন ঘুম পায়?

সুমিত্রা চমকে উঠলো। পিসীমার দিকে চেয়ে সে কিছু বলতেও গেল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না।

পিসীমা বললে—না বলতে ইচ্ছে করে তো তোমাকে বলতে হবে না বউমা। তোমাদের সংসার, আমি আর ক'দিন, তার পরেই তো আবার কত দূরে চলে যাবো, হয়ত কলকাতায় আর আসাই হবে না কত দিন। কাশী তো আসতেই চায়নি প্রথমে, আমিই ওকে বললুম যে চল্ একবার সোহমকে দেখে আসি। বুড়ো হয়েছি তো, কবে আছি কবে নেই···

পিসীমার কথা শেষ হবার আগেই সুমিত্রা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—সত্যিই আপনারা কবে যাবেন বলুন তো?

এবার পিসীমা'রই চমকে ওঠবার পালা।

খানিকক্ষণ সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে—এ-কথা বলছো কেন বউমা ?

সুমিত্রা বললে—না, তা নয়, কিছু ভেবে বলিনি⋯এমনিই⋯

পিসীমা বললে—না বউমা, যা বলবার তুমি খোলাখুলিই বলো। আমরা তোমার গলার কাঁটা হয়ে থাকতে চাইনে—বহুকাল ভাই-পো'কে দেখিনি তাই ভাবলুম একবার কলকাতায় গিয়ে দেখে আসি। ভাই-পো'র এত উন্নতি হয়েছে শুনে আমার যে কী আনন্দ হয়েছে তা তুমি বুঝবে না, তোমার নিজের ভাই-পো থাকলে বুঝতে পারতে⋯আমি যদি কিছু অন্যায় কথা বলে থাকি তো তুমি আমাকে ক্ষমা⋯

কথা শেষ হলো না। নিচে থেকে কাশীর গলা শোনা গেল—মা, মা, মা কোথায় গেলে ? ওমা, মা⋯

কাশী দত্ত সংসারের সেই জাতীয় লোক যারা সব সময়ে চেঁচিয়ে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে বেঁচে থাকে।

চেঁচাতে চেঁচাতে কাশী দত্ত মাকে কোথাও না পেয়ে সুমিত্রার ঘরের দিকেই আসছিল, সঙ্গে সঙ্গে পিসীমা ঘরের বাইরে এসে বললেন—কই রে, কই কাশী ? এই তো আমি এখানে—

কাশী বললে—তুমি ও-ঘরে কী করছিলে ? আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেললুম, তুমি কি কালা হয়ে গেলে নাকি ?

—কী বলবি, বল্ না !

বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে যেতে গিয়েই কাশীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

কাশী বললে—কোথায় ছিলে তুমি ? আমি যে তোমাকে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছি এদিকে—

—কী বলবি তাই বল্ না। আমি কি তোর জন্যে একটু গল্পও করতেও পারবো না—

কাশী বললে—কীসের গল্প ? কা'র সঙ্গে এত গল্প হচ্ছিল তোমার ?

—ছোট-বউমা'র সঙ্গে। কেন ?

কাশী দত্ত বললে—যারা আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইছে, তাদের সঙ্গে কীসের এত গল্প ? কীসের এত ভাব ?

· ওরে, চুপ কর্, চুপ কর্, সবাই শুনতে পাবে যে—

কাশী গলা নামালো না। তেমনি চেঁচিয়েই বলতে লাগলো—কেন, শুনতে পেলে কী হবে ? আমি কি ভয় পাই কাউকে ? আমি কি কারো খাই, না পরি ? আমি কা'র পরোয়া করি ?

মা আর থাকতে পারলে না। কাশীর মুখটা এক হাত দিয়ে জোরে চেপে ধরে আর এক হাত দিয়ে টানতে টানতে বাড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল।

সুমিত্রা আর কিছু শুনতে পেলে না। ওদিক থেকে তার কানে আর কোনও আওয়াজ এল না।

সেদিন সোহমের একটু দেরি হলো বাড়িতে ফিরতে। খুব বেশি দেরি নয়, মাত্র ঘণ্টাখানেকের দেরি। কিন্তু সেইটুকু সময়েই সুমিত্রা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। এত দেরি হচ্ছে কেন ?

সোহমের অফিস থেকে বেরোতেই একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর রাস্তার জ্যাম্। ট্র্যাফিকের জটে সব গাড়ি আট্‌কে গিয়েছিল। এ কিছু নতুন ঘটনা নয় কলকাতার। এখানে মিটিং আছে, মিছিল আছে, কী নেই ? সারা ইণ্ডিয়ায় যত শহর আছে, সব চেয়ে নোংরা শহর এই কলকাতা। অথচ এখানে যত ভিড় অত ভিড় কোনও শহরে নেই। এখানে যত সমস্যা কোথাও তত সমস্যা নেই। এখানকার রাস্তা যত খারাপ, তত খারাপ রাস্তা মাদ্রাজ, বম্বে, দিল্লী কোথাও নেই। তবু এখানে এসে জুটছে মাদ্রাজ বোম্বাই দিল্লীর লোক। আর যে একবার এখানকার মাটির রস পেয়েছে সে আর ফিরে যাচ্ছে না। সোহম্ যখন বোম্বাইয়ে ছিল তখন কলকাতার জন্যে তার মন-কেমন করতো। এখন কলকাতায় এসে তার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। এর যে কী আকর্ষণ তা কেউ বুঝতে পারে না। এখানে ধুলো ধোঁয়া ময়লা রাস্তায় জঞ্জাল যেমন আছে, তেমনি আছে মিটিং-মিছিল-খুন জখম-মারামারি। এখানে কেউ কারোর মুখ দেখতে চায় না, অথচ কাউকে অনেক দিন না দেখতে পেলে মন খারাপ করে। এ এক আজব শহর। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন আরো আজব হয়ে উঠছে।

সুমিত্রা বললে—এ কী, এত দেরি হলো যে তোমার ?

সোহম্ বললে—রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়, সব গাড়ি আটকে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কী করবো বলো। কেন যে মিটিং, কেন যে মিছিল, কাদের মিছিল, কোন্ পার্টির মিছিল তা জানবার চেষ্টাও করছে না কেউ, আমার এত খারাপ লাগছিল যে···

তারপর বললে—চলো, আমি পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে নিচ্ছি—

তা সত্যিই খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলে সোহম্। সুমিত্রারও দেরি হলো না তৈরি হয়ে নিতে।

সোহম্ বললে—তুমি যে আজ ক্লাবে যাওয়ার জন্যে ছটফট্ করছো একেবারে ! কী হলো হঠাৎ ?

সুমিত্রা বললে—তুমি এত দেরি করে আসো যে কী বলবো। মনে হচ্ছিল কোথাও বেরোলে হয়—

গাড়িতে উঠেও সে-প্রসঙ্গ চলতে লাগলো। সোহম্ বললে—হঠাৎ তোমার এ-রকম হলো কেন ?

সুমিত্রা বললে—আচ্ছা, তুমি ছুটি পাও না কেন ? সবাই তো অফিস থেকে

ছুটি নেয়, ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্যে বাইরে গিয়ে বেড়িয়ে আসে। সত্যি আমার আর কলকাতায় থাকতে মোটে ভালো লাগছে না—

সোহম্ বললে—হঠাৎ তোমার এমন হলো কেন বলো তো? কী, হলো কী তোমার?

সুমিত্রা আবার বললে—সত্যি চলো না এক মাসের জন্য কোথাও চলে যাই—

—কোথায় যাবে?

—এই ধরো কাশী কি মধুপুর, কিংবা পুরী বা ভুবনেশ্বর। দেখ তো কত দিন বাড়ি থেকে বেরোইনি—সেই এক ক্লাব আর বাড়ি, বাড়ি আর ক্লাব। এ একেবারে একঘেয়ে লেগে গেছে আমার—আর ভালো লাগছে না—

সোহম্ সুমিত্রার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। এমন কথা তো সুমিত্রা আগে কখনও বলেনি। আগে ক্লাবে যেতে আপত্তি করেছে। প্রথম প্রথম অনেক সময় মদ খেতেও আপত্তি করেছে। সোহমের চাকরির উন্নতির খাতিরে মদ খেয়ে বমিও করেছে বাড়িতে এসে। একবার টলতে টলতে সিঁড়িতে পড়েও গিয়েছে। মাথা ফেটে রক্তও পড়েছে একবার। তারপর ডাক্তার ডেকে ওষুধ দিয়ে তা সারাতেও হয়েছে। এখন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে অনেকটা। কিন্তু কখনও কলকাতা ছেড়ে বাইরে তো যেতে বলেনি এমন করে। অথচ সুমিত্রা তো জানে যে এখন সোহম্ চাকরির ব্যাপারে অনেক ঝামেলাতে রয়েছে। ইব্রাহিমরা যে স্ট্রাইক করবার নোটিশ দিয়েছে তাও জানে সে। তার ওপর ভানুভাই প্যাটেল যে-কোনও দিন কলকাতায় এসে পড়তে পারে—এই সময়ে হঠাৎ সে এত করে কলকাতার বাইরে যেতে বলছে কেন? এ সময়ে কলকাতার বাইরে কি যাওয়া চলে?

সোহম্ বললে—হঠাৎ আজ এ-কথা বলছো কেন বলো তো? তুমি তো সবই জানো। তুমি তো জানো এ সময়ে আমার কলকাতা ছেড়ে যাওয়া চলে না—

—তা বলে কি এই রকম সারা জীবন ধরে ভুগতে হবে?

সোহম্ বড় ভাবনায় পড়লো। বললে—চলো, ক্লাবে গিয়ে এক পেগ্ খেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার সব ভুলে যাবে

সুমিত্রা বললে—তাহলে তুমি আগে তোমার পিসীমা আর তোমার ওই পিসতুতো দাদাকে বাড়ি থেকে তাড়াও—

—কেন বলো তো? ঠিক করে বলো তো কী হয়েছে?

সুমিত্রা বললে—আজকে তোমার পিসীমা আমার ঘরে এসেছিল। এসে বললে রোজ সন্ধ্যেবেলা আমরা কোথায় যাই—

—তারপর? তুমি কী বললে?

—আমি সব বললুম। বললুম আমরা ক্লাবে যাই—

—তারপর? শুনে পিসীমা কী বললে?

সুমিত্রা বললে—শুনে পিসীমা আবার জিজ্ঞেস করলে রাত্তিরে আমরা বাইরে খাই কেন?

—জবাবে তুমি কী বললে?

—বললাম যে ক্লাবে সব মেম্বাররাই খাই। তারপর জিজ্ঞেস করলে কী কী

রান্না হয় ক্লাবে। তারপর হঠাৎ পিসীমা জিজ্ঞেস করলে আমরা রাত্তিরে বাড়ি ফেরবার সময় অত টলি কেন—

—তাই নাকি ? ওই কথা জিজ্ঞেস করলে ?

—হ্যাঁ।

—তুমি কী বললে ?

সুমিত্রা বললে—আমি আর কী বলবো ! তবু আমি বললুম আপনারা কবে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন ? আর কতদিন থাকবেন আমাদের বাড়িতে ?

সোহম্ গাড়ি চালাতে চালাতে রাস্তার এক পাশে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করালে। রাগে তখন তার মাথা গরম হয়ে গেছে। মনের ওই অবস্থায় গাড়ি চালালে একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হতে পারে—

বললে—তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলতে পারলে ?

—হ্যাঁ, তখন আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেছে। রাগের মাথায় তখন আমার মনে হচ্ছিল বদ্যিনাথকে ডেকে ওদের ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই—

—তারপর ?

সুমিত্রা বললে—তারপর ঠিক সেই সময়ে বাড়িতে এসে তোমার পিসতুতো দাদা যাচ্ছেতাই করে আমাদের গালাগালি দিতে লাগলো—একেবারে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। বদ্যিনাথ-টাথ সকলের সামনে। সবাই শুনতে পেয়েছে। এর পরও ওই বাড়িতে থাকা যায় ? তুমি তো সারাদিন অফিসের মধ্যে কাজে ডুবে থাকো, কিন্তু আমার সারাদিন একলা একলা কী রকম লাগে বলো তো ? আমাদের বাড়িতেই থাকবে আর আমাদেরই গালাগালি দেবে, এ আর কতদিন সহ্য করবো বলো তো ? আমিও তো মানুষ, আমার সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে—

সোহম্ বললে—ঠিক আছে, আজকেই আমি এর একটা বিহিত করছি। আজ রাত্তিরেই এর একটা হেস্তনেস্ত করছি। আমারই খাবে আর আমার বুকে বসে আমারই দাড়ি ওপড়াবে···চলো বাড়ি ফিরি। আজ একটা দিন না-হয় ক্লাবে না-ই গেলুম—

বলে সোহম্ গাড়িটা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে চলতে লাগলো।

বললে—একে আমি অফিসের ঝামেলায় জ্বলছি, তার ওপর আবার আর একটা উট্কো ঝামেলা—

সুমিত্রা বললে—না না, তুমি ক্লাবে চলো। রাগের মাথায় তুমি শেষকালে কী এক কাণ্ড বাধিয়ে বসবে, তখন পাড়ার লোকদের কাছে আর মুখ দেখাতে পারবো না। কাল সকালে যা মনে করবে কোর,ঠাণ্ডা মাথায় ভালো করে ভেবেচিন্তে কোর, এখন বাড়ি যেতে হবে না। আর তা ছাড়া বাড়ির চাকর-ঠাকুর আছে, তারাই বা কী ভাববে। তাদের মুখ থেকে পাড়ার সকলের কানে কানে কথাটা ছড়াবে—

সোহম্ তবু শুনলে না। গাড়িটার স্পীড্ বাড়িয়ে দিয়ে জোরে জোরে চালাতে লাগলো বাড়ির দিকে।

বললে—আমি ওদের এই রাত্তিরেই বাড়িছাড়া করে ছাড়বো, তবে আমার নাম—

সুমিত্রা বললে—ওগো, শোন শোন, চলো ক্লাবে চলো। এখন বাড়ি ফিরো না, চলো—

সুমিত্রা বুঝতে পারলে যে সোহম্ রেগে রয়েছে। রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সে তবু আর একবার বোঝাবার চেষ্টা করলে।

বললে—কেন তুমি রাগ করছো বলো তো মিছিমিছি। এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তুমি যদি ওদের তাড়িয়ে দাও তাহলে তার সঙ্গে যে আরো ঝঞ্ঝাট আরম্ভ হবে।

সোহম্ বললে—তা আমার চাকরি বড়, না আমার আত্মীয়-স্বজন বড়ো? তুমি কি বলতে চাও আমি নিজের স্বার্থ না দেখে ওদের স্বার্থ দেখবো? ওরা আমারই খাবে আর আমারই বাড়িতে বসে আমারই নিন্দে করবে?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—মিস্টার সেন তো তা-ই বললেন আমাকে। বললেন—চাকরিতে যদি উন্নতি চাও তো আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও—

সুমিত্রা বললে—তবু বলছি, যা করবে একটু ভেবেচিন্তে কোর। এখন ক্লাবে যাচ্ছি, ক্লাবেই চলো। কাল ঠাণ্ডা মাথায় যা করবার তা কোর—

এবার সোহমের মনটা একটু বোধ হয় নরম হলো। সে গাড়িটা আবার ঘুরিয়ে নিয়ে ক্লাবের দিকেই চলতে লাগলো। বললে—ঠিক আছে, সেই ভালো, তুমি যখন বলছো তখন ক্লাবেই চলো—

মানুষের মধ্যে যে-প্রাণীটা আছে তার সবটাই মনুষ্যত্ব নয়। তার মধ্যে আরো একটা প্রাণী আছে যে দিন-রাত তার দাবি মেটানোর জন্যে প্রচণ্ড তাগিদ দেয়। সে প্রয়োজনের-চার দেওয়ালের মধ্যে শৃঙ্খলাবন্ধ থাকে বলে মনে করে এই দেওয়াল চারটের বাইরে বুঝি আর কিছু নেই। এ অনেকটা রেলগাড়ির ভেতরে শুয়ে থাকার মতো। রেলগাড়িতে বসে থাকলে জানালার বাইরে আর একটা জগৎ দেখা যায় যার পরিধি অনেক বড়। তখন বুঝতে পারা যায় না এ-পৃথিবীতে গাছপালা পাহাড়-পর্বত আকাশ-পাথার আরো অনেক কিছুই আছে। যুগ-যুগ ধরে যে-ইতিহাস চলে আসছে এবং যে-ইতিহাস আমার পূর্ব-পুরুষরা গড়ে এসেছেন তা আমার জন্মের সময়েই যেমন আরম্ভ হয়নি, তেমনি আমার তিরোধানের পরও তা থেমে যাবে না। এই বৃহতের এই প্রয়োজনের বাইরের জগতের কথা কি সোহম্ কখনো ভেবেছে? কখনো কল্পনা করেছে? তার নিজের নামের মানে কি কখনো সে বোঝবার চেষ্টা করেছে?

অথচ এতদিন পরেই বা সে-কথাটা তার মনে এল কেন? কেন এই রাত বারোটার সময় এত বড় একটা কথা তার মনে পড়ে গেল? এও তো একটা অঘটন। এমন অঘটন কেন সোহমের জীবনে ঘটে গেল?

সেও তো ছিল একজন মেহের আলির মতো। সেও তো জানতো যে 'সব ঠিক হ্যায়'। 'ইণ্ডিয়ান আয়রন'ই হোক আর 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ'ই হোক, যা-কিছু তার পকেট ভারি করবে সেইটেই সত্যি। আর তার বাইরের জগৎটা হলো 'সব ঝুট্ হ্যায়'। অর্থাৎ সব মিথ্যে।

অথচ মনে আছে ছোটবেলায় যখন সে স্কুলে পড়ে, স্কুলের সভাতেই কার একটা কবিতা আবৃত্তি করে একটা প্রাইজ পেয়েছিল। কবিতাটা আজও মনে আছে :

এখনও মনে আছে চারদিকে সকলের হাততালির শব্দ—

তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি, শুধু জানি যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
সংকট-আবর্তমাঝে দিয়েছে সে সর্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তার লাগি জেলেছে সে হোমহুতাশন
···· শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর···

সোহমের মনে পড়ে গেল সেই কতকাল আগের সম্বর্ধনার কথা। ক্ষেত্রবাবু নিজে এসে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছিলেন। বলেছিলেন—কী অপূর্ব আবৃত্তি করেছিস তুই সোহম্। দেখিস, একদিন তুই অনেক বড় হবি। তুই আমাদের স্কুলের মুখোজ্জ্বল করবি একদিন, এই তোকে আজ বলে রাখলুম—

কিন্তু সেদিন কি সোহম্ সে-কবিতার মানে বুঝতে পেরেছিল? যদি মানে বুঝতে পারতো তাহলে আজ এত বছর পরে কেন তার এই দুর্দশা হলো? কেন সেই মেহের আলির মুখ থেকে শোনা "সব ঝুট্ হ্যায়" কথাটা তার জীবনে সত্যি হলো?

ক্লাব থেকে সেদিন ফিরে আসতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। ক্লাবে গিয়ে এক পেগ হুইস্কি খেলেই এক-একদিন সোহম্ সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষে পরিণত হয়ে যেত। হুইস্কির অনেক গুণ। অতো গুণ যদি না থাকতো তো কেন ভানুভাই প্যাটেল ক্লাবে আসতো? আর শুধু কি একলা ভানুভাই প্যাটেল? এই কলকাতা শহরের কোন্ বিখ্যাত মানুষ ক্লাবে না আসতো? সবাই কি মদ খাওয়ার নেশাতেই আসতো? তাহলে এখানকার চীফ্ মিনিস্টার কেন আসতো?

কেন আসতো কলকাতার শেরিফ ? কেন আসতো কলকাতার বড় বড় নিউজপেপার ম্যাগ্‌নেটরা ? কলকাতার কালচার্ড সমাজের লোক বলতে যাদের বোঝায় তারা সবাই-ই কি আসতো নেশা করতে, না স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে ? যারা জীবনে সাকসেসফুল, যারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত, যাদের জীবন সব দিকে সার্থক তারা কোন্‌ চতুর্বর্গ ফলের আশায় ক্লাবে আসতো ? তাদের আবার কীসের স্বার্থ ? তবে কি মানুষের টাকার কামনার শেষ থাকতে নেই ?

আর সোহম্‌ ? সোহম্‌ তো ক্লাবে যেত চাকরির খাতিরে। যাতে চাকরিতে তার আরো উন্নতি হয় সেই জন্যে। ক্লাবে গেলে শহরের গণ্যমান্য খ্যাতিপ্রাপ্ত লোকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ পাওয়া যায়। তার ক্লাবে যাওয়া কেবল সেই জন্যে।

সুমিত্রাকেও সোহম্‌ সেই কথা বুঝিয়েছিল।

কিন্তু সুমিত্রারও কি ক্লাবে যেতে ভালো লাগতো না ? প্রথমে ভালো না লাগলেও শেষকালে তো ভালো লাগতো। শেষকালে এক পেগ দু' পেগ থেকে শুরু করে তিন পেগ চার পেগ পাঁচ পেগ পর্যন্ত উঠেছিল সে।

তখন বলতো—এখন বাড়ির কথা ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়—

সোহম্‌ও তখন অনেক নেশা করে ফেলেছে।

জিজ্ঞেস করতো—কেন ? বাড়ির কথা ভাবলে তোমার মন খারাপ হয়ে যায় কেন ?

—কেন জানো না ?

ওই আমার পিসীমা আর পিসতুতো দাদার জন্যে ?

সুমিত্রা বলতো—হ্যাঁ, বাড়িতে গেলেই তো তারা দেখতে পাবে। কাল তুমি অফিসে চলে যাবার পর আবার পিসীমা আমার ঘরে আসবে আর জিজ্ঞেস করবে আমরা আজ কোথায় গিয়েছি, কী কী খেয়েছি, এই সব—

সোহম বললো—ও-সব কথার জবাব না দিলেই পারো—

এই রকম কথার মধ্যেই সেদিন হঠাৎ মিস্‌ সুরিটা এসে হাজির হয়েছিল। সুরিটাকে দেখেই সোহম্‌ দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করে উঠলো—কী হলো, আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, আপনি এতদিন আসেননি কেন ? কী হয়েছিল মিস্‌ সুরিটা ?

তারপর বললে—বসুন বসুন, টেক্‌ ইওর সীট্‌ মিস্‌ সুরিটা ! টেক্‌ ইওর সীট প্লিজ্‌—

তারপর চিৎকার করে ডাকলে—বয়—

বয় সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে দাঁড়াতেই সোহম্‌ মিস্‌ সুরিটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—বলুন আপনি কী নেবেন, হুইস্কি না রাম ?

সুরিটা বললে—রাম—

—হট্‌ অর কোল্ড ?

—হট্‌—

বয় হট্‌ রাম আনতে ছুটলো। সোহম জিজ্ঞেস করলে—বলুন এতদিন

কোথায় গিয়েছিলেন ? আমি অনেকবার আপনার অফিসে টেলিফোন করেছি। সেই একই উত্তর—আপনি কলকাতায় নেই। কিন্তু কোথায় গিয়েছিলেন তা কেউ বলতে পারেনি—

ততক্ষণে হট্ রাম এসে গিয়েছিল।

সুরিটা সুমিত্রার দিকে চেয়ে বললে—হাউ নাইস্ ইউ লুক টো-ডে, মিসেস্ রায়!

সোহম্ বললে—রিয়্যালি ?

সুমিত্রা বললে—থ্যাঙ্কিউ মিস্ সুরিটা—

বলে একটু সলজ্জ হাসি হাসলো—

মিস্ সুরিটা হট্ রামের গেলাসে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরালে।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—এখন বলুন কোথায় গিয়েছিলেন আপনি এতদিন ? আমি রোজ সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে এসে আপনার আশা-পথের দিকে চেয়ে থাকি, আর দিনের বেলা অফিসে গিয়ে আপনাকে টেলিফোন করি। রোজ একই কথা শুনতে হয়। শুনি আপনি ইণ্ডিয়ায় নেই। তা কোথায় গিয়েছিলেন ? আর কবেই বা এলেন ?

মিস্ সুরিটা বললে—গিয়েছিলাম ব্যাংককে—

—সঙ্গে কে ছিল ?

—মিস্টার প্যাটেল।

সোহম্ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বললে—মিস্টার প্যাটেলও আপনার সঙ্গে ফিরেছেন নাকি ?

সুরিটা বললে—না, তিনি ওখান থেকে চলে গেলেন ঈজিপ্টে।

—ঈজিপ্টে ? কায়রোতে ?

—হ্যাঁ, ওখানে হঠাৎ ওঁর একটা কাজ পড়ে গেল। আর আমি ইণ্ডিয়াতে চলে এলুম।

—তা আপনিই বা কায়রোতে গেলেন না কেন ?

মিস্ সুরিটা বললে—এখানে যে আমার অফিসে অনেক কাজ পড়ে আছে—

মিস্ সুরিটার গেলাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। সোহম্ সেটা লক্ষ্য করে বললে—আর একটা নিন মিস্ সুরিটা—

বলে তার সম্মতির অপেক্ষা না করেই ডাকলে—বয়—

বয় কাছে আসতেই সোহম্ বললে—আর একটা রাম—

মিস্ সুরিটা বললে—শুধু আমি কেন ? আপনারা ?

সুমিত্রা বললে—আমি আর নেব না, অলরেডি চারটে নিয়েছি—

—আর আপনি ?

সোহম্ বললে—আমার ছ'টা হয়ে গেছে—

—তা হোক, আপনারা আমার অনারে আর একটা করে নিন্—নইলে আমি নেব না—

শেষ পর্যন্ত তাই-ই হলো। সোহম্ আর সুমিত্রার জন্যে আরো দু'টো

হুইস্কি এল। সোহম্ গেলাসটা উঁচু করে ওপরে তুলে বললে—ইন্ অনার অব্ মিস্ সুরিটা—

সুমিত্রাও তার গেলাসটা উঁচু করে তুললো। তারপর সোডা মিশিয়ে সকলের সঙ্গে গেলাসে চুমুক দিলে।

এর পর খাবার। কে কী খাবে তার হিসেব জিজ্ঞেস করলে সোহম্। সোহম্ যা খাবে মিস্ সুরিটা আর সুমিত্রা তাই-ই খাবে। চিকেন-বিরিয়ানি আর তন্দুরি চিকেন আর তার এক পিস্ করে ফিসফ্রাই।

—আর কিছু নেবেন ?

—নো, থ্যাংকস্—

খেতে খেতে সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—মিস্টার প্যাটেল তাহলে কলকাতায় কবে আসছেন মিস্ সুরিটা ?

মিস্ সুরিটা বললে—আর্লি নেক্সট মান্থ্ ! পরের মাসের ফার্স্ট্ উইকেই আসছেন। অবশ্য তার আগে আমাকে খবর দেবেন, আমি এয়ার-পোর্টে যাবো—

সুমিত্রা তার হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে। একবার মনে হলো রাত একটা, আবার মনে হলো—না, দশটা, আবার ভালো করে দেখলে। ক'টা বেজেছে ঠিক বোঝা গেল না। মনে হলো রাত দুটো। কিম্বা এও হতে পারে হয়ত তার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। কিম্বা তার নেশা হয়েছে। খুব নেশা হয়েছে। হাত দুটো টলছে। তাহলে সে গাড়িতে গিয়ে উঠবে কী করে ?

সোহম্ দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—শ্যাল উই গো—

—ইয়েস, লেট্স্—

—সুমিত্রা, চলো—

সুমিত্রা বললে—তুমি আমার হাতটা একটু ধরো —

সোহম্ বললে—ডোন্ট্ সে ইউ আর টিপ্সি—

কোনও রকমে সোহম্-এর হাতটা ধরে ধরে সুমিত্রা বাইরের রাস্তায় গাড়ির দিকে চলতে লাগলো। তার মনে হতে লাগলো যেন কলকাতায় ভূমিকম্প হতে আরম্ভ করেছে। আগেও অনেক দিন এ-রকম হয়েছে। কিন্তু আজ যেন একটু বেশি নেশা হয়েছে। তা হোক, নেশা হোক, তাতে ক্ষতি নেই কিছু তার। বরং ভালোই তো। কারণ তাতে সোহমের চাকরিতে উন্নতি হবে। আর সোহমের চাকরিতে উন্নতি হওয়া মানেই তো তার নিজেরও উন্নতি। সোহমের টাকা হলে এবার একটা বিলিতি গাড়ি হবে তাদের। বিলিতি গাড়ি না হলে তো সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায় না।

রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে দু'জনেরই কোনও জ্ঞান ছিল না। মিস্ সুরিটাকে খাতির করিতে গিয়ে অনেক বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই জ্ঞান না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সকাল হতে-না-হতেই সোহমের বিছানা ছেড়ে উঠতেই হয়। কারণ তাকে অফিস যেতে হবে ঠিক কাঁটায় কাঁটায়। অফিসের কাজে কেউ তাকে কখনও গাফিলতি করতে দেখেনি। তাকে চিরকাল দু'কুল বজায় রাখতে হয়। বদ্যিনাথ ঠিক খেয়াল রাখে। ঘুম থেকে কখন সাহেব উঠছে তা দেখাটা তার কর্তব্য। ঠিক সময়ে সাহেবকে এক কাপ গরম চা দিয়ে যেতে হবে তাই সাহেব ঘুম থেকে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বিছানার সঙ্গে লাগানো কলিংবেলের বোতামটা টিপে দেয়। সেই বোতামটা টিপলেই প্যান্ট্রিতে একটা ঘণ্টা বেজে ওঠে। বদ্যিনাথ সেখানে তৈরি হয়ে থাকে। এক মিনিটও লাগে না তার চা করতে। জলটা গরমই থাকে। তাতে এক চামচ চা-পাতা ছেড়ে দেয়। তারপরে সেটা নামিয়ে তাতে গরম দুধ আর এক চামচ চিনি ঢেলে দিলেই চা তৈরি। সেটা কাপে ঢেলে সাহেবের ঘরের দিকে দৌড়োয়। হ্যাঁ, দৌড়োয় বললেই ঠিক বলা হয়।

সেই চা পেটে পড়ার যা অপেক্ষা। তারপরেই বাথরুম।

এ বহু বছরের অভ্যেস।

সেদিনও সোহম্ বাথরুমে দাড়ি কামাতে কামাতে আগের রাত্রের ঘটনাগুলো ভাবছিল। আর বেশি দেরি নেই। মিস্টার প্যাটেল কায়রো থেকে দুদিন বাদেই কলকাতায় ফিরবে। তাকে একটা পার্টি দিতে হবে। মানে কক্‌টেল পার্টি। আসলে এ-লাইনে পার্টি মানেই কক্‌টেল পার্টি। তারপর ইব্রাহিম আছে। তাকেও তারই মধ্যে বাড়িতে ডেকে মদ খাওয়াতে হবে। নইলে স্ট্রাইক-নোটিশ সে তুলে নেবে না। কাজ কি একটা সোহমের ?

যখন শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে সোহম্ স্নান করছে তখন হঠাৎ বাইরে পিসীমা আর দাদার গলা শোনা গেল। কথাগুলো স্পষ্ট শোনা গেল না, কিন্তু ওদের কথা আবার মনে পড়ে গেল তার। ওরাই তার জীবনের সব চেয়ে বড় প্রবলেম! ওদের আজই বাড়ি থেকে তাড়াতে হবে। যদি সোজা-পথে না যায় তো লাথি মেরে তাড়াতে হবে।

সোহম্ যখন বাথরুম থেকে বেরোল তখনও সুমিত্রা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আহা, ঘুমোক ও। সারা জীবন সুমিত্রাও সোহমের জন্যে কম সাহায্য করেনি। মদ খেতে চায়নি, তবু বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছে। শুধু স্বামীর মুখের দিকে চেয়েই খেয়েছে। সেই মুহূর্তে ওর জন্যেও মায়া হতে লাগলো তার। এ-রকম স্ত্রী ক'জন স্বামী পায়!

হঠাৎ বদ্যিনাথ এল ভেতরে। সে খালি চায়ের কাপ-ডিশ্ নিয়ে যাবে।

সোহম্ বললে—দ্যাখ্, তুই বাজারে যাবি আজকে ?

বদ্যিনাথ বললে—হ্যাঁ, বাজারে আজকে কী আনবো, বলুন ?

সোহম্ বললে—গরুর মাংস।

বদ্যিনাথ অবাক হয়ে গেল শুনে। সে কি ভুল শুনেছে ?

আবার জিজ্ঞেস করলে—কী বললেন ?

সোহম্ বললে—গরুর মাংস! তুই কি আজকাল কানে কম শুনছিস্ নাকি ?

বদ্যিনাথ বললে—না, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

—বুঝতে না-পারার কী আছে ? গরুর মাংস বলতে কী বোঝায় তা জানিস না ? এ বাজারে গরুর মাংস বিক্রী হয় না ?

বদ্যিনাথ তবু বুঝতে পারলে না।

আবার জিজ্ঞেস করলে—গরুর মাংস কে খাবে ?

—কে আবার খাবে ? আমি খাবো, তোরা খাবি, আমরা সবাই খাবো !

বদ্যিনাথ জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু গরুর মাংস রান্না করবে কে ?

সোহম্ বললে—কে আবার রান্না করবে, যে বাড়িতে রান্না করে আসছে এতদিন সে-ই রান্না করবে ! কেন, গরুর মাংস তোরা খাস্ না ?

বদ্যিনাথ চুপ করে রইল।

—কী রে, কথা বলছিস না কেন ?

বদ্যিনাথ তবু জিজ্ঞেস করলে—কে খাবে ?

সোহম্ বললে—কেন, সবাই খাবে। খেলে কিছু দোষ আছে ? সাহেব-মেম্‌রা তো খায়। বড় বড় হোটেলে তো বীফ্ খেতে দেয়। তার বেলায় কিছু দোষ নেই আর বাড়িতে আমরা খেলেই যত দোষ ?

বদ্যিনাথ বললে—না, তা বলছি না

সোহম্ বললে—না, তুই তো তাই ই বলছিস…

· আমাদের ঠাকুর যদি না রাঁধে ?

সোহম্ বললে—না রাঁধে তো না রাঁধবে ! ঠাকুরকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেব। এমন বাবুর্চি রাখবো যে বীফ্ রাঁধতে রাজি হবে ! ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব হয় ? টাকা দিলে হাজার-গণ্ডা গরুর মাংস রাঁধবার লোক দৌড়ে আসবে। এখন একটা কথা বল্, গরুর মাংস পাড়ার বাজারে পাওয়া যায় কি না।

বদ্যিনাথ বললে—আমি তো দেখিনি। লোকদের জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে—

সোহম্ বললে—পাড়ার বাজারে মাংস যদি না পাওয়া যায় তো নিউ-মার্কেটে যাবি। নিউ-মার্কেটে গেলে পাওয়া যাবে। নিউ-মার্কেটে গরু-ভ্যাড়া-পাঁঠা-পাঁঠি-শুয়োর-কচ্ছপ—সব রকমের মাংস বিক্রি হয়—

কথাটা শেষ হবার আগেই বাইরের সদর-দরজার কলিং-বেল বেজে উঠলো।

সোহম্ ভাবলে এত সকালে আবার কে এল ? এই অফিস যাবার সময়ে ? ও, এতক্ষণে মনে পড়লো। ও নিশ্চয়ই মেহের আলি সাহেব। মেহের আলি সাহেব ছাড়া এত সকালে ঠিক অফিসে যাবার আগে আর কে আসবে ? হয়ত শেয়ার-মার্কেটের কোনও ভালো খবর আছে। হয় নতুন কোনও শেয়ার কিনতে

বলবে, কিম্বা কিছু টাকা দেবে হাতে। কোনও ভালো খবর থাকলেই মেহের আলি সাহেব সেটা সাত-সকালে বলতে আসে।

সোহম্ বদ্যিনাথকে বললে—দ্যাখ্ তো, কে এল। বলবি আমি এখনই তৈরি হয়ে আসছি। তুই দরজা খুলে দিয়ে বসতে বল্, আমি এখ্খুনি যাচ্ছি—

বদ্যিনাথ চলে যাওয়ার পর সোহম্ অফিসে যাবার প্যাণ্ট-শার্ট পরে টাইটা গলায় বেঁধে নিলে। সুমিত্রা তখনও পাশের ঘরে নিজের বিছানার ওপর আরাম করে অঘোরে ঘুমোচ্ছে—

বদ্যিনাথ ঘরে ঢুকে যে-খবরটা দিলে তাতে সোহম্ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

ক্ষেত্রবাবু! ক্ষেত্রবাবু তো কখনও এ-বাড়িতে আসেন না! তিনি সোহমের ঠিকানা পেলেন কী করে? তাড়াতাড়ি পোর্টফোলিও ব্যাগটার ভেতরে দরকারী কাগজপত্রগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে চাবি লাগিয়ে দিলে। তারপর ব্যাগটা নিয়ে সোজা সদরের পার্লারে গিয়ে ঢুকলো। ক্ষেত্রবাবু একটা সোফার ওপরে বসে ছিলেন চুপ করে।

—স্যার, আপনি?

সোহম্ সোজা গিয়ে মাস্টার-মশাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

ক্ষেত্রবাবু সসংকোচে পা দুটো পেছনে টেনে নিয়ে সোহমের হাত দু'টো ধরে ফেললেন।

বললেন—করো কী, করো কী? এ কী করছো? তোমার অফিসে যাবার সময়ে এসে দেরি করিয়ে দিলুম—

—না না স্যার, আপনি আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এ কি আমার কম সৌভাগ্য! আপনি সেদিন চাকরি করে দিয়েছিলেন বলেই তো আমি আজ যা-হোক দু'টো খেতে পাচ্ছি। এই যা-কিছু দেখছেন এ সমস্তই আপনার দয়ায়—

ক্ষেত্রবাবু বললেন—না না, তোমার চরিত্রের গুণের জন্যেই তুমি এত বড় হয়েছ। আমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র! আমি তোমাকে চিনি না বলতে চাও?

তারপর একটু হেসে বললেন—যাক্ গে, আমি যে-কথা তোমাকে বলতে এসেছি তাই বলি—

—কিন্তু আপনি আমার এ-বাড়ির ঠিকানা পেলেন কোথা থেকে?

ক্ষেত্রবাবু বললেন—নীহার দিলে। নীহারের কাছ থেকেই তো এখন আসছি।

নীহার মানে মিস্টার সেন। টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। যার কাছে ক্ষেত্রবাবু চিঠি লিখে দিয়েছিলেন বলেই সোহম্ এই চাকরি পেয়েছিল।

ক্ষেত্রবাবু বললেন—একটা কাজের জন্যে তোমার কাছে এসেছি। তোমাকে কিন্তু রাজী হতে হবে সোহম্। তুমি 'না' বলতে পারবে না, এই বলে দিলুম—

—বলুন না স্যার, কী কাজ। আমি প্রাণ দিয়ে সে-কথা রাখবার চেষ্টা করবো—

ক্ষেত্রবাবু বললেন—আসছে সপ্তাহে শনিবার বিকেল চারটের সময় তোমাকে আমাদের স্কুলে যেতে হবে, ঘণ্টা-দুয়েকের জন্যে—

—কেন স্যার, শনিবার স্কুলে কি আছে ?

—তোমাদের স্কুলের তরফ থেকে সম্বর্ধনা দেব !

—সম্বর্ধনা ?

সোহম্ অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—আমাকে সম্বর্ধনা দেবেন কেন স্যার ?

—দেব তোমার গুণের জন্যে ! নীহার আর তুমি, দুজনেই আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ; আমাদের স্কুলের গর্ব তোমরা। তোমাদের দু'জন আমাদের স্কুলের ছাত্রদের সামনে উজ্জ্বল উদাহরণ। স্কুলের ছেলেরা জানুক মানুষ সচ্চরিত্র হলে কত বড় হতে পারে ! চরিত্রটাই যে সংসারে মানুষের আসল জিনিস সে আজকাল-কার ছাত্রদের জানা উচিত। আমি চাই তোমরা দুজনে যেমন জীবনে উন্নতি করেছ, আমার অন্য ছাত্ররাও তেমনি উন্নতি করুক। জানো সোহম্, আজকাল কেউ আর সততাকে বিশ্বাস করে না। তারা পরীক্ষার সময় বই দেখে টুকে পাস করে। মাস্টার-মশাইরাও আর তেমন নেই। তাঁরা সবাই কোচিং-স্কুল খুলেছেন। সেখানে তাঁরা আগে থেকে কোশ্চেন বলে দেন। দেখে শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। আমাদের দেশ কত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে দিন-দিন—

সোহমের মুখে তখন আর কোনও কথা বেরোচ্ছে না—

ক্ষেত্রবাবু বলতে লাগলেন—আরো একটা ভয়ের কথা তোমাকে বলি। তুমি বোধ হয় খবর রাখবার সময় পাও না। কী ব্যাপার জানো ? আমি তো শুনে চম্‌কে উঠেছি—স্কুলের ছেলেরা নাকি টিফিনের সময়ে মদের দোকানে গিয়ে মদ খায়—

সোহমের মুখে তখনও কোনও কথা বেরোচ্ছে না।

ক্ষেত্রবাবু বলতে লাগলেন—শুধু ছাত্রদের দোষ দিয়ে কী হবে বলো, ছাত্রদের যারা গার্জিয়ান, শুনলাম তারাও নাকি ক্লাবে গিয়ে আজকাল মদ খায়। তুমি হয়ত কথাটা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু আমি খুব ভালো লোকের কাছ থেকে এ-কথা শুনেছি। ছাত্রদের বাপ-মা সবাই নাকি ক্লাবে একসঙ্গে গিয়ে মদ খায় ! তুমি বিশ্বাস করছো না তো ? বিশ্বাস তো না-হবারই কথা ! আরো শুনেছি মিনিস্টাররাও নাকি সবাই পিপে পিপে মদ খায়। তার নাম নাকি কক্‌টেল-পার্টি ! ভাবতে পারো তুমি এমন কাণ্ড ? দেশের যারা কর্ণধার, দেশের যারা নেতা, তারাই যদি এই কাণ্ড করে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের কী দোষ বলো ! শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ দিয়ে কী হবে ? মাঝে মাঝে ভাবি এই স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেশে এসব কী অনাচার !

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন ক্ষেত্রবাবু। বললেন—যাক্ গে, এসব কথা বলে তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না ! তুমি কাজের লোক, তোমার অনেক কাজ। তাই এখন চলি। আসছে শনিবার ঠিক বিকেল চারটের সময়, মনে থাকবে তো ? তুমি তোমার ডায়েরিতে নোট করে নাও—নইলে ভুলে যাবে—

সোহম্ বললে—কিন্তু স্যার···

ক্ষেত্রবাবু বাধা দিয়ে বললেন—না, তোমার আপত্তি আমি শুনবো না। ছোটবেলায় তোমার সেই আবৃত্তির কথা মনে আছে তো? তোমার মনে না থাক, আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে—

······তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।······শুনিয়াছি তার লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
প্রত্যহের কুশাংকুর······

আহা, কী অপূর্ব আবৃত্তি করেছিলে তুমি সোহম্। এখনও সেই আবৃত্তি যেন আমার কানে বাজছে। আমি চাই তুমি আসছে শনিবার আবার সেই কবিতাটা আমার ছাত্রদের সামনে আবৃত্তি করবে।

সোহম্ বলতে গেল—কিন্তু

ক্ষেত্রবাবু বললেন—তোমার কিন্তু-টিন্তু আমি শুনবো না। তোমাকে যেতেই হবে সেদিন, সেদিন নীহারও আসবে। তোমরাই হচ্ছো আজকালকার বিপথ-গামী ছেলে-মেয়েদের আদর্শ···

সোহমের একবার ইচ্ছে হলো ক্ষেত্রবাবুর কাছে সব খুলে বলে। কিন্তু বলতে গিয়েও কেমন যেন জিভটা আটকে গেল। সত্য কথা বলার নিয়মই এই। এ সহজে কারো মুখ দিয়ে বেরোয় না। এ বলতে গেলে অনেক লোকের কাছে অপ্রিয় হতে হয়। সংসারে কোন্ মানুষটা পরের অপ্রিয় হতে চায়? আসলে সবাই তো আপোষ করেই বেঁচে আছে। রামও ভালো, শ্যামও ভালো, যদুও ভালো, মধুও ভালো। যে বলে রাম ভালো কিন্তু শ্যাম খারাপ, সে সকলের কাছে অপ্রিয়। যদি কালো লোককে ফর্সা বললে অন্যের প্রিয় হওয়া যায় তো তাই-ই বলবো: তাতে সত্যের মূল্য যদি খোয়াও যায়, জনপ্রিয়তার মূল্যে তো আমি শীর্ষস্থান অধিকার করবো।

ইংরেজ খুব চালাক জাত। সে তার ভাষায় একটা নতুন শব্দ আবিষ্কার করেছিল। শব্দটা হলো ডিপ্লোমেসি (Diplomacy) অর্থাৎ না-সত্য না-মিথ্যে। এ শব্দটার বাংলা তর্জমা হয় না। তবু আমরা এটার তর্জমা করে নতুন শব্দ তৈরি করেছি 'কুটনীতি'। এতকাল এই 'কুটনীতি' শব্দটা রাজনীতিরই অন্তর্গত ছিল। রাজনৈতিক দল বা নেতাদেরই এটা একচেটিয়া ছিল। কিন্তু এটা এখন

অর্থনীতি সমাজনীতি চরিত্রনীতিরও অন্তর্গত হয়ে গেছে।

ক্ষেত্রবাবু কথাটা বলে চলে যাবার পরও সোহম্ অনেকক্ষণ ধরে ভেবেছিল। সে কি সত্যিই চরিত্রবান? ক্ষেত্রবাবুর এমন ধারণা কেমন করে হলো? তার মাইনের অংক, তার ফ্ল্যাট আর তার গাড়ি দেখে?

অফিসে যাবার আগে সুমিত্রার সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি তার। প্রায় কোন দিনই হয় না। এ একরকম যান্ত্রিক সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। স্ত্রী স্বামীর পদোন্নতির যন্ত্র। শুধু পদোন্নতি হয়, অর্থ উপার্জনেরও যন্ত্র। দুজনের মধ্যে আর কোনও রকম সম্পর্কের কথা দুজনের কেউই কল্পনা করে না। এ প্রীতি নয়, প্রয়োজন। প্রীতির তাগিদের বদলে প্রয়োজনের প্রচণ্ড তাগিদই যেন তাদের দুজনকে এত নিবিড় করেছে, এত ঘনিষ্ঠ করেছে।

কিন্তু কেন এমন হলো?

এর কারণ খুঁজতে গেলে সোহম্‌কে যেতে হবে তার সুদূর অতীতে। যেতে হবে তার বাল্যকালের অর্থাভাবের দিনগুলোতে, যখন এই কঠোর বাস্তব পৃথিবী তাকে পদে পদে পদাঘাত করেছে। সেদিন যারা তাকে আঘাত করেছিল তাদের কেন সে ক্ষমা করতে পারেনি?

ক্ষেত্রবাবু একদিন বলেছিলেন—তোমরা সোক্রেটিসের জীবনী তো পড়েছ?

ক্লাসের ছেলেরা সবাই বলেছিলে—হ্যাঁ স্যার, পড়েছি—

—তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, জানো তো?

—জানি স্যার।

ক্ষেত্রবাবু বলেছিলেন—তাঁর বন্ধুরা, যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেত, তারা সবাই বলেছিল—আপনি পালিয়ে যান প্রভু, আমরা আপনার পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেব। তখন সোক্রেটিস বললেন—আমি পালাবো না। আমি মৃত্যুই বরণ করবো। সত্যের জন্য মৃত্যু বরণ করাও তো এক রকমের সত্য-রক্ষা—

ক্ষেত্রবাবু সেদিন আরো অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—অসংখ্য বিরুদ্ধবাদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে বলতে পেরেছে আমি সত্য-রক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জন দেব, সে-ই হতে পেরেছে সোক্রেটিস, সে-ই হতে পেরেছে গ্যালিলিও, সে-ই হতে পেরেছে যীশুখ্রীষ্ট, সে-ই হতে পেরেছে মহাত্মা গান্ধী। সোক্রেটিস গ্যালিলিও যীশুখ্রীষ্ট, মহাত্মা গান্ধী সবাই-ই এক সুরে বলে গেছেন ছুরি দিয়ে আগুনের শিখাকে যেমন কাটা যায় না, তেমনি কাটা যায় না সত্যকেও। ছুরি দিয়ে কাটা যায় মানুষকে। কিন্তু তবু সেই চারিদিকের বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়েই মানুষকে বলতে হবে—সোহ্‌হম্—

ক্ষেত্রবাবু সেদিন ক্লাসের সকলের সামনেই আঙুল দিয়ে সোহম্‌কে দেখিয়ে বলেছিলেন—এই তোমার যা নাম, সেই সোহ্‌হং—বুঝলে?

ক্ষেত্রবাবু চলে যাবার পর কখন সে অফিসে এসেছে, কখন সে নিজের চেয়ারে বসেছে, কিছুই তার মনে ছিল না। অন্যদিন সে কেবল ফ্যাক্টরির ইব্রাহিম, বিভূতি পোদ্দার, কেশব মাইতি তাদের কথাই ভাবতো। তাদের কী করে জব্দ করা যায় সেই চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকতো। কিন্তু আজ ক্ষেত্রবাবু এসে সব লণ্ডভণ্ড

করে দিয়ে গেলেন—

ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিস্টার সেন টেলিফোন করলেন তাঁকে। বললেন—রায়, আজকে ক্ষেত্রবাবু তোমার বাড়িতে গিয়েছিলেন ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, গিয়েছিলেন। আপনার কাছ থেকেই আমার ঠিকানা জেনে নিয়েছিলেন বললেন।

মিস্টার সেন বললেন—ওই এক পাগল মানুষ, বুঝলে রায়। একেবারে আস্ত পাগল—তোমাকেও নিশ্চয়ই বলেছেন আমাদের সম্বর্ধনা দেওয়ার কথা ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, বলছিলেন তো।

—তুমি রাজি হয়েছ ?

সোহম্ বললে—আপনি রাজি হয়েছেন ?

মিস্টার সেন বললেন—রাজি না হয়ে কী করি বলো ? উনি এখনও সেই সোক্রেটিসের যুগেই পড়ে আছেন। কী সব ব্যাক-ডেটেড্ আইডিয়া। ওঁকে রিফিউজ তো করা যায় না। বলেছি—যাবো—

সোহম্ বললে—আমিও বলেছি—যাবো—

মিস্টার সেন বললেন—বুড়ো মানুষ, ও'র মনে কষ্ট দিতেও কষ্ট হয়। আমাদের যে কত জ্বালা উনি তো তা বুঝবেন না। লাইফ্ যে কত কমপ্লেক্স হয়ে গেছে তা যদি উনি জানতেন! যাক গে, শনিবার বিকেলবেলাটা একটু না-হয় নষ্টই হবে, কী আর করা যাবে! এদিকে বম্বে থেকে হাফ্-ইয়ার্লি স্টেট্‌মেণ্ট চেয়ে বসেছে, আমি তাই নিয়ে ভাববো, না পাগলের বক্‌বকানি শুনবো বলো ? ঠিক আছে, পরে একবার এসো আমার চেম্বারে, আর আমার সেই কথাটা মনে আছে তো ?

—কোন্ কথাটা স্যার ?

—সেই ইব্রাহিমের দেওয়া স্ট্রাইকের নোটিশের কথা ?

সোহম্ বললে—আমি সব প্ল্যান করে ফেলেছি—

—তার চিঠিরও তো একটা জবাব দিতে হবে। আর সেই ভানুভাই প্যাটেল ? সে কেসটার কী হলো ?

সোহম্ বললে—আমি খবর নিয়েছি। তার জন্যে তো রোজই ক্লাবে যাচ্ছি, মিস্টার প্যাটেল এখন কায়রোতে। খবরটা পেলাম মিস্ সুরিটার কাছে, তাঁর পার্সোন্যাল এ্যাসিস্‌টেণ্ট—তিনি নাকি কয়েকদিনের মধ্যেই ক্যালকাটায় আসছেন—

—ভেরি গুড্, ভেরি গুড্—তাহলে এখন ছাড়ি—

মিস্টার সেন রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন। সোহম্‌ও তার রিসিভার নামিয়ে দিলে। একদিন সোহম্ নিজে এই টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানির মজুর ছিল। মজুরই বটে। তাদের ফ্যাক্টরিতে ওই ইব্রাহিম, কেশব মাইতি আর বিভূতি পোদ্দারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে শিফ্‌ট্-ডিউটি করেছে। নাইট-ডিউটি করেছে, মর্নিং-ডিউটি করেছে, ইভনিং-ডিউটি করেছে। মেহনত্ করেছে আর সকলের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ডিউটি করেছে। সকলের সঙ্গে গলা

মিলিয়ে চেঁচিয়েছে—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'। সে-সমস্তই করেছে মিস্টার সেনের পরামর্শে। আর ইউনিয়নের ভেতরের গোপন কথাগুলো ফাঁস করে দিয়ে এসেছে মিস্টার সেনের কাছে। সে-সব কেউ জানতে পারেনি। তখন তার খুব আর্থিক অভাব চলেছে। একে মাইনে কম, তার ওপর মেসে থেকে খাওয়া। সে-সব করেছিল বলেই আজ বোম্বে অফিস ঘুরে আজকের এই ওয়েলফেয়ার অফিসারের চেয়ারে উঠে বসেছে।

কিন্তু যদি সে সৎ থাকতো, যদি সে অনেস্ট থাকতো তাহলে তো আজও তাকে সেই শিফ্ট্-ডিউটিই করতে হতো। এখনও পড়ে থাকতে হতো সেই নিচের তলায়, সকলের পায়ের নিচে। তার সঙ্গে যারা একই সঙ্গে চাকরিতে ঢুকেছিল তারা সবাই আজও সেই নিচের তলাতেই পড়ে আছে।

আর সে ?

আজ যে সে এত বড় হয়েছে, আজ যে সে তাদের সকলের মাথায় উঠেছে তা কী জন্যে ? কারণ সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সে মিথ্যে কথা বলেছিল। সে অকৃতজ্ঞতা করেছিল। ক্ষেত্রবাবু এখনও সেই সোক্রেটিসের যুগেই পড়ে আছেন। তাঁর মতে সততাই উন্নতির মূল। তাই ক্ষেত্রবাবুরা ব্যাক্-ডেটেড। সোক্রেটিস বোকা, তাই তিনি বিশ্বাস করতেন যারা সৎ লোক তাদের কখনও খারাপ হয় না। তাঁর শিষ্যরা যারা তাঁকে জেলখানা থেকে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিল তাদের কথা তিনি শোনেননি। শোনেননি বলেই তিনি মারা গেলেন। তাতে তাঁর কী লাভ হলো ? যখন রাজার দরবারে তাঁর বিচার হয়েছিল তখন তিনি বড় গলায় বলেছিলেন—'তোমরা ভালো হও, তোমরা সৎ হও'। বলেছিলেন —'Be good to yourselves and be good and just to others' তিনি আরো বলেছিলেন—'আপনারা আমাকে দয়া করে ছেড়ে দেবেন না, কারণ আপনারা যদি আমাকে ছেড়ে দেন তো আমি এখন যা করছি আমি তখনও আবার তাই-ই করবো। তার জন্যে যদি আমাকে বার বার মরতে হয় তাতেও আমি রাজি।' তিনি বলেছিলেন—'Acquit me not, for I will do nothing else than what I do now, even if I have to die many deaths for it'

এর চেয়ে বড় বোকামি আর কী হতে পারে ! আর এই বোকামির জন্যেই ক্ষেত্রবাবু এখনও একটা ভাড়া বাড়িতেই রয়ে গিয়েছেন। এতদিন চাকরি করেও নিজের একটা বাড়ি করতে পারলেন না কলকাতা শহরে। বাড়ি করা দূরের কথা, একটা গাড়িও করতে পারলেন না। ফ্যাটাস্ ফ্যাটাস্ করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যান আর স্কুল থেকে আসেন। সোক্রেটিসের মত ক্ষেত্রবাবুরও মত এই যে, "We should use all our diligence to live a life of goodness and piety." এত সৎ থেকে ক্ষেত্রবাবুর কী লাভটা হলো শেষ পর্যন্ত ? টাকাই যদি না হলো তো এ পৃথিবীতে বেঁচে কী লাভ ? সোহম্ যদি ক্ষেত্রবাবুর কথা শুনতো তাহলে তার নিজেরও এই দশাই তো হতো। এই গাড়ি, এই সম্মান, এই দামী ফ্ল্যাট, এই সুখ, এ-সব কোত্থেকে আসতো ?

হঠাৎ টেলিফোনটা আবার বেজে উঠলো।

সোহম্ রিসিভারটা তুলে বললে—ইয়েস্ ?

কিন্তু ও-পাশ থেকে গলার আওয়াজটা শুনেই বুঝতে পারলে সুমিত্রা ডাকছে।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো, সুমিত্রা, তুমি হঠাৎ ?

সুমিত্রা বললে—তুমি কি বদ্যিনাথকে আজকে বীফ্ আনতে বলেছ ? বদ্যিনাথ বলছে—

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে বদ্যিনাথ। আমি ওকে গরুর মাংস আনতে বলেছি—

—কেন ? হঠাৎ ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, গরুর মাংস না আনলে তোমার পিসশাশুড়ী আর ওই কাশী দত্ত আমাদের বাড়ি থেকে যাবে না। ওদের বিদেয় করবার জন্যেই ওই প্ল্যান করেছি।

—কিন্তু বদ্যিনাথ কী খাবে ? ঠাকুর কী খাবে ?

—যদি না খায় তো চাকরি ছেড়ে চলে যাক। টাকা ছড়ালে কি লোকের অভাব হয় ? আর এক দিন মাছ-মাংস না খেলে কি চলবে না ? দেখবে গরুর মাংস আনবার কথা শুনলেই ওরা বাড়ি ছেড়ে পালাবার পথ পাবে না।

তারপর একটু থেমে বললে—ওরা কী বলছে— ?

সুমিত্রা গলার আওয়াজটা একটু নামিয়ে বললে—ওরা বলছে ওরা আর এখানে থাকবে না, চলে যাবে—

—তাহলেই তো দেখছো ওষুধ ধরেছে। আমি বাড়ি যাবার আগে যদি চলে যায় তো তাহলে গরুর মাংস কিনতে বদ্যিনাথকে বারণ করে দিও—আর কী হয় আমাকে জানিও। এক ঘণ্টা পরে আবার তোমাকে আমি টেলিফোন করবো। এখন ছাড়লুম—

সত্যিই তখন বাড়ির ভেতরে তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল। কাশী দত্ত যেমন সকালবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে চা খেতে যায়, তেমনি সেদিনও বেরিয়েছিল: ততদিনে পাড়ায় খুব নাম হয়ে গেছে কাশী দত্তর। কাশী দত্তর নিজের চা খেতে আর পয়সা লাগতো না। সবাই ডেকে ডেকে চা খাওয়াতো।

বলতো—আসুন কাশীবাবু, চা খান—

শুধু যে চা তা নয়। তার সঙ্গে বেগুনি-ফুলুরি আলুরচপও খেতে দিত বিনা পয়সায়। এতদিন ধরে কাশী দত্ত এমনই হাওয়া গরম করে রেখেছিল যে কাশী দত্তর কাছে পয়সা চাইতেও তাদের লজ্জা হতো। তার বদলে শুধু একটা আশা ছিল যে কাশী দত্ত তাদের কিংবা তাদের বেকার ছেলেদের চাকরি করে

দেবে। টার্নবুল এ্যান্ড্ জ্যাকসন্ কোম্পানি অফিসে বা ফ্যাক্টরিতে একটা সাধারণ পিওনের চাকরি পেলেও তারা ধন্য হয়ে যেত। পিওনের চাকরিতে কম করে সাতশো-আটশো-নশো টাকা মাইনে পাওয়া যায় আজকাল।

চা-ওয়ালারা মাঝে মাঝে কাশী দত্তকে জিজ্ঞেস করতো—কী হলো কাশীবাবু, আপনার ভাইকে কথাটা বলেছেন? অনেক দিন হয়ে গেল…

কাশী দত্ত গরম আলুরচপ কামড়াতে কামড়াতে বলতো—আরে, চাকরি কি আর গাছের ফল যে পাড়লুম আর খেলুম! হবে হবে! আমি যখন বলেছি চাকরি হবে, তখন হবেই—। শুধু একটা ভেকেন্সি হতে যা দেরি। আমার ভাই-এর আপিস আরও বড় হতে চলেছে। তখন আরো লোক, আরো অফিসার, আরো পিওন নিতেই তো হবে। আর তোমাদের একটা স্পষ্ট কথা বলি। কাউকে যেন তোমরা বলো না আবার! আমার ভাই-ই তো হলো ওয়েলফেয়ার অফিসার। তার মানে চাকরি দেবার আসল মালিক। তার সই না হলে তো কারো চাকরি হবে না।

পাশ থেকে আর একজন বললে—তা দাদা, আমার কথাটাও মনে রেখেছেন তো?

কাশী দত্ত বলতো—আরে, বলছো কি তুমি? আমার মেমারি অত খারাপ নয়। আমি তোমাদের সকলের চাকরি না করে দিয়ে নড়ছি না এখান থেকে। আমার নিজের তো চাকরির কোনও দরকার নেই ভাই, আমি নিজে তো ভুপালে চাকরি করি। সেখানে তোমরা যদি চাকরি নিতে চাও তো তা আমি এখ্খুনি করে দিতে পারি। করবে সেখানে চাকরি?

ভুপালে চাকরি নিতে কেউই চায় না।

বলে—ভুপাল? সে কোথায়? কত দূরে?

কাশী দত্ত ভয় দেখাতো। বলতো—ওরে বাবা, সে কি এখানে? সে একেবারে যার নাম ধাপ্ধাড়া-গোবিন্দপুর! এই কলকাতা থেকে সে প্রায় তিন-দিন তিন-রাতের রাস্তা। সেখানে আমিই আপিসের বড়কর্তা। সেখানে যদি চাকরি চাও তো গাদা গাদা চাকরি আমার হাতে রয়েছে। সেখানে কি তোমরা যাবে?

তিন-দিন তিন-রাতের রাস্তা শুনে সবাই একটু কিন্তু-কিন্তু করে। সবাই কলকাতাতে চাকরি চায়। কলকাতাতেই সবাই জন্মেছে, তাই কলকাতাতেই সবাই বাঁচতে চায় আর কলকাতাতেই সবাই মরতে চায়।

কাশী দত্ত বলতো—ওই তো! ওই তো তোমাদের বাঙালীদের দোষ। কলকাতা কি আর সেই আগেকার কলকাতা আছে হে! এখন তো দেশের লীডাররা দেশখানাকে ভেঙে দু'ভাগ করেছে, এখনও তোমাদের কলকাতার ওপর এত মায়া? এই জন্যেই তো বাঙালীদের কিস্সু হচ্ছে না, কেবল পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। তবু বাঙালীদের শিক্ষা হয় না—

যারা কাশী দত্তর শ্রোতা তারা যে সবাই বাঙালী তা নয়। বেহারী আছে, দক্ষিণ ভারতীয় আছে, ওড়িষ্যা-ভাষী আছে, কিন্তু কাশী দত্তর যত রাগ বাঙালীর ওপর। তার একমাত্র কারণ তার মামাতো ভাই চাকরিতে তার চেয়ে বেশি

মাইনে পায়।

সকালবেলার দৈনন্দিন আড্ডা আর জলযোগ সেরে যখন কাশী দত্ত সেদিন মনের আনন্দে রোজকার মত বাড়ি ফিরেছে তখনি মা'র কাছে খবরটা শুনলে।

মা বললে—শুনেছিস সোহমের কাণ্ড ?

—কী ?

মা বললে—আমি আর এ-বাড়িতে এক দণ্ডও থাকবো না। আজকেই চলে চল্ ভোপালে—

—কেন ? কী হয়েছে ?

মায়ের চোখ দিয়ে তখন ঝর-ঝর করে জল পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতেই মা বলতে লাগলো—আমি জীবনে কত পাপ করেছিলাম যে আজকে সেই জন্যে আমাকে জাত-ধম্মো সব দিতে হলো—

কাশী রেগে গেল। বললে—তাহলে তুমি কাঁদতেই থাকো, আমাকে আর কিছু বোলো না। আমি আবার বাইরে চলে যাই—

মা বললে—না রে, শোন্ কাশী শোন্। তুইও যদি আমার দিক থেকে এমনি করে মুখ ফিরিয়ে নিস তাহলে আমি কী নিয়ে থাকবো বল্ ? আমি কী নিয়ে বাঁচব বল্ ?

—তা হলে তুমি কাঁদতে থাকো, আমি চলি—

বলে কাশী বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু মা তাড়াতাড়ি কাছে এসে কাশীর একখানা হাত ধরে ফেললে। বললে—তুই যাস নে বাবা, যাস নে। আমাকে একলা ফেলে তুই কোথাও যাস নে। আর যদি তুই চলে যেতেই চাস তো আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যা বাবা—আমিও আর এ-বাড়িতে একদণ্ড থাকতে চাইনে। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যা—

কাশী দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে—কী হয়েছে তাও বলবে না, আবার আমাকে যেতেও দেবে না, তাহলে আমি কী করবো তাই বলবে তো—

এতক্ষণে মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে—বাবা, আমি যে বিধবা মানুষ, যে-বাড়িতে গরুর মাংস রান্না হবে সেখানে আমি কী করে থাকবো তা তুই বলতে পারিস ?

—গরুর মাংস ? গরুর মাংস রান্না হবে ? কোথায় ? কী বলছো তুমি ?

মা বললে—তবে আর বলছি কী তোকে ? যদি বিশ্বাস না হয় তো তুই বদ্যিনাথকে জিজ্ঞেস কর ! ওই তো বদ্যিনাথ দাঁড়িয়ে আছে, জিজ্ঞেস কর না ওকে—

কাশী দত্ত ডাকলে—বদ্যিনাথ, ও বদ্যিনাথ, শোন ইদিকে—

বদ্যিনাথ এতক্ষণ সব কথাই শুনেছে। মা-ছেলের সমস্ত কথাই তার কানে গেছে। সে কাছে এসে দাঁড়ালো।

কাশী দত্ত বললে—এ-সব কী শুনছি বদ্যিনাথ ? গরুর মাংস রান্না করছো তুমি ?

বদ্যিনাথ বললে—হ্যাঁ বাবু, সাহেব বাজার থেকে গরুর মাংস কিনে আনতে বলেছে—

—গর্‌র মাংস ? তুমি কিনে আনবে ?

বদ্যিনাথ বললে—সাহেব বললে আমি কি 'না' বলতে পারি বাব্‌ ? আমি হ্‌কুমের চাকর বই তো নয়—সাহেব যেমন হ্‌কুম করবে আমাকে তো তেমনই করতে হবে—

কাশী দত্ত বললে—কিন্তু আমরা ? আমাদের কথা তোমার সাহেব একবার ভাববে না ? আমরা কি কেউ নই ? যে-বাড়িতে গর্‌র মাংস রান্না হবে, যে-বাড়িতে গর্‌র মাংস খাওয়া হবে, আমরা সে-বাড়িতে থাকি কী করে বলো ?

বদ্যিনাথ বললে—সে-কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে কী হবে বাব্‌, আমি কে ? এতক্ষণে মা কাশীর দিকে চেয়ে বললে—তুই বদ্যিনাথকে ও-কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন ? বদ্যিনাথ কী করবে বল্‌ দিকিনি—আমি বউমাকে তো জিজ্ঞেস করেছিলাম—

—তা বউমা কী বললে ?

মা বললে—কী আবার বলবে। বউমা টেলিফোন করলে সোহমের আপিসে, বদ্যিনাথ যা বলছে সোহম্‌ও বউমাকে তাই-ই বললে।

কাশী দত্ত কী যেন একটু ভাবলে খানিকক্ষণ। তারপর বদ্যিনাথকে জিজ্ঞেস করলে—বদ্যিনাথ, তুমি কখন গর্‌র মাংস কিনতে যাবে বাজারে ?

বদ্যিনাথ বললে—আমি এখ্‌নি যাবো—

কাশী জিজ্ঞেস করলে—কোথায় সে-মাংস রান্না হবে ?

—কেন, আমাদের রান্নাঘরে।

—আর তোমাদের রান্না ?

বদ্যিনাথ বললে—আমাদের রান্নাও ওই একই উন্‌নে রান্না হবে !

কাশী বললে—তোমরাও ওই ছোঁওয়া খাবে ?

—কেন খাব না বাব্‌ ?

—তোমাদের জাত যাবে না ?

বদ্যিনাথ বললে—আমরা চাকর মান্‌ষ, আমাদের অত ছোঁয়া-ছ্‌ঁয়ি মানলে চলে না বাব্‌। সাহেব যা হ্‌কুম করবে, তাই ই করতে হবে ম্‌খ ব্‌জে—

মা দ্‌'জনের কথার মাঝখানে বললে—শ্‌নলি তো ? শ্‌নলি তো তুই সব ? চল্‌ বাবা, আমরা ভালোয়-ভালোয় এ বাড়ি থেকে বিদেয় হই। আর দেরি নয়—চল্‌ বাবা, চল্‌। উঃ, কী কুক্ষণে যে এ-বাড়িতে এসেছিল্‌ম ! তুই-ই তো জোর-জবরদস্তি করে আমাকে এ-বাড়িতে আনলি। তোর কথা শ্‌নেই তো আমি মরতে এখানে এসেছিল্‌ম। এখন চল্‌, আর এখানে দাঁড়াবো না, এখ্‌খ্‌নি এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই চল্‌—

কাশী দত্ত তখনও বোধ হয় একটু দ্বিধা করছিল। বড় আশা নিয়ে সে কলকাতায় এসেছিল কত বছর পরে। ভেবেছিল তার ভাই যখন এত বড় একটা কোম্পানির অফিসার তখন তার একটা হিল্লে হয়েই যাবে। নিজেরও হিল্লে হবে, তার পরিবারেরও হিল্লে হবে। আর কত দিনই বা সে ভুপালে পড়ে থাকবে। বিদেশ-বিভুঁই-এ আর কত দিন কাটাবে ?

আর তা ছাড়া এখানে এই পাড়ায় কত লোককে সে আশ্বাস দিয়েছে তাদের চাকরি দেবে। সেই আশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এখানকার কত লোক তাকে বিনা পয়সায় চা-বিস্কুট-ঘুগ্‌নি কত কী খাইয়েছে। তারা এখন কী ভাববে? ভবিষ্যতে যদি আবার কখনও তাদের সঙ্গে দেখা হয় তো তখন সে তাদের কাছে কী জবাবদিহি দেবে?

মা বললে—কী রে, কী ভাবছিস? চল্‌ বেরিয়ে পড়ি—

তা 'বেরিয়ে পড়ি' বললেই কি আর বেরিয়ে পড়া যায়? বেরোতে গেলেও তো সময় লাগে! বিছানা বাঁধা, বাক্স-প্যাটরা গোছানো, তা করতেও তো সময় লাগে!

কাশী দত্তর চেয়ে কাশী দত্তর মা'রই যেন বেশি আগ্রহ। বহুদিন আগে কাশী দত্ত লম্বা দু'মাসের ছুটি নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল ভাই-এর অফিসে একটা চাকরি যোগাড় করেই ভূপাল থেকে বউ-ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সেখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকি ভাবে এই বাড়িতে এসে উঠবে। তাতে চাকরি তো হবেই, তার ওপরে বাড়িভাড়া খাইখরচা কিছুই লাগবে না। পরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে তার সব কিছু চলবে। মাঝখান থেকে তার মাসকাবারি মাইনের টাকাগুলো ব্যাংকে জমবে।

কাশী দত্তর ইচ্ছে ছিল সকালবেলার খাওয়াটা এখানে সেরে তবে ভূপালে চলে যাবে। কিন্তু তা হলো না। মা বললে—এ-বাড়ি থেকে আমি এখুনি চলে যাবো। তুই ট্যাক্সি ডেকে আন্‌—যা—

মা যখন বেঁকে বসেছে তখন কাশী দত্ত আর আপত্তি করতে পারলে না। সে ট্যাক্সি ডাকতে রাস্তায় বেরোল। আর খানিকক্ষণ পরেই বাড়িতে এসে বললে—মা, চলো—

মাও তখন তৈরি। বাক্স-বিছানা আগে থেকেই গোছানো হয়ে গিয়েছিল। কাশীই মালপত্র নিয়ে নিচে গেল।

মা সুমিত্রার কাছে গিয়ে বললে—বউমা, আমরা যাচ্ছি।

সুমিত্রা আর কী-ই বা বলবে! শুধু বললে—চলে যাচ্ছেন?

পিসীমা বললে—এ ক'দিন তোমাদের খুব কষ্ট দিয়ে গেলাম।

সুমিত্রা শুধু ভদ্রতার খাতিরে বললে—আবার আসবেন—

পিসীমা বললে—না বউমা, আমি আর আসবো না—তোমাদের এখানে মরতেও আর আমি আসবো না। কাশীর যদি ইচ্ছে হয় তো সে আসলে আসবে। কিন্তু যে-বাড়িতে গরুর মাংস রান্না হয় সে-বাড়িতে আসতে আমাকে বোল না তুমি বউমা। আমি যে ক'টা দিন বাঁচি ভগবানের নাম করেই বাঁচবো। আমি আর সব দিতে পারি কিন্তু হিন্দু-বিধবা হয়ে ধম্মো দিতে পারবো না। আমাকে তুমি আর আসতে বোল না বউমা, আমি আর জীবন থাকতে আসবো না—

হঠাৎ কথার মাঝখানে কাশীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

—মা, ওমা, শিগ্‌গির এসো, ট্যাক্সি এসে গেছে—

—তাহলে যাই বউমা, আশীর্বাদ করি তুমি চির-আয়তী হও, তোমার সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না পিসীমা। সোজা কাশী দত্তর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নিচের রাস্তায় নেমে ট্যাক্সিতে উঠলো। উঠতেই ট্যাক্সিটা হাওড়া স্টেশনের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলো।

সেই চলন্ত ট্যাক্সিতে বসেই কাশী দত্ত বললে—তুমি দেখে নিও মা, এই আমি বলে রাখলুম, যে লোক এমন নেমকহারাম তার সর্বনাশ একদিন হবেই—হবেই—হবেই—। আর এও আমি বলে রাখলুম, সে সর্বনাশ আমি নিজের চোখে দেখে তবে আমি মরবো, তার আগে নয়—হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখে তবে মরবো।

ট্যাক্সিটা তখন মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তা করে নিয়ে সামনের দিকে ছুটে চলেছে। গাড়ি সেই রাত্রে। তবু সোহমের বাড়ি থেকে সকাল-সকালই বেরিয়ে পড়তে হলো। কারণ না বেরোলে জাত-ধর্ম সবই খোয়া যেত।

ইব্রাহিম আলি হোসেন। টার্নবুল এ্যাণ্ড্ জ্যাক্সন্ কোম্পানির ইউনিয়নের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট। খুব খানদানি বংশ। এঁদের বংশে আগে অনেকে মিনিস্টার হয়েছেন। এঁদের অনেকে ব্যবসা করে বড়লোক হয়েছেন। এঁদের বংশের অনেকে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের যুগে জেল খেটেছেন। আলি হোসেন ভাইদের এদিক থেকে একটা পুরনো ঐতিহ্য আছে। দেশবাসীরা এক বাক্যে এঁদের প্রশংসা করে। সেই বংশের সন্তান ইব্রাহিম আলি হোসেন। তিনি যথারীতি আই-এ বি-এ এম-এ পাস করার পর ল' পাস করেছেন। কিন্তু তারপর কোনও দিন কোর্টে প্র্যাকটিস করেননি। সেই সময় ঘটনাচক্রে রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছিলেন। কিছুদিন জেলও খেটেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে পুরোপুরি শ্রমিক-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছেন। সেই শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রেই এই টার্নবুল এ্যাণ্ড্ জ্যাক্সন্ কোম্পানির লেবার ইউনিয়নের লীডার হয়ে গিয়েছিলেন।

তারপরে কী করে যে কী হলো মনে নেই। ইব্রাহিম আলি হোসেন বড় ভালোবেসে ফেলেছিলেন সোহম্‌কে। তাঁর মনে হয়েছিল এই ছেলেটাকে দিয়ে তাঁদের পার্টির কাজ হবে। তখন থেকেই ভালোবাসার শুরু। তখনই তিনি সোহম্‌কে টার্নবুল এ্যাণ্ড্ জ্যাক্সন্ কোম্পানির লেবার ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট করে দিয়েছিলেন। তার পর কী থেকে কী হয়ে গেল—সোহম্ কোম্পানির হেড অফিস বোম্বাইতে বদলি হয়ে গেল। আর কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে এক লাফে ওয়েলফেয়ার অফিসার। From log cabin to Whit[illegible]t use. প্রথম দিনেই ইব্রাহিম বুঝতে পেরেছিল যে সোহম্ তাকে ল্যাঙ্ মেরেছে। কিন্তু উপায় কী। যে-ভুল ইব্রাহিম করে ফেলেছে তার আর তখন চারা নেই।

চাকরিতে কোনও রকমে উঁচু চেয়ারে উঠতে পারলে আর তাকে টেনে নামাবার উপায় নেই। সোহম্ সেখানেই উঠে গেছে।

ইব্রাহিম একদিন সোহম্‌কে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—ঠিক করে বলবি সোহম্, কত টাকা পেলি তুই ?

সোহম্ বললে—টাকা ? টাকা কেন পাবো ?

ইব্রাহিম বললে—যাক গে, এখন আমি আর তোকে কিছু বলতে চাই না—। কিন্তু সাবধান, একদিন আমি এর বদ্‌লা নেব, দেখে নিস্ তুই—

সেদিনকার সেই সাবধান-বাণীই আজকের এই স্ট্রাইকের নোটিশ। এটা সোহম্ বুঝেছিল। বুঝেছিল বলেই সেই ইব্রাহিমকে হাতের মুঠোয় পোরার জন্যে এত চেষ্টা।

সোহম্ আবার বাড়িতে একটা টেলিফোন করলে।

—সুমিত্রা ? কী খবর ?

ওধার থেকে সুমিত্রা বললে—খবর ভালো !

—খবর ভালো মানে ?

সুমিত্রা বললে—ভালো মানে তোমার পিসতুতো দাদা আর পিসীমা দুজনেই বাড়ি ছেড়ে বাক্স-বিছানা নিয়ে চলে গিয়েছে—

—সত্যিই চলে গিয়েছে ? মানে, আর আসবে না তো ?

—না, আর আসবে না। পিসীমা নিজে আমাকে বলে গিয়েছে আর আসবে না।

সোহম্ বললে—বদ্যিনাথ কি বাজার থেকে মাংস এনেছে ?

সুমিত্রা বললে—না আনেনি, আমি ওকে আনতে বারণ করেছি। যাদের জন্যে আনতে বলা তারাই যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তখন আর এনে কী হবে ?

—ঠিকই করেছ। একটা কথা শোন, আজকে সন্ধ্যে ছ'টার সময় ইব্রাহিম্‌কে নিয়ে আমি বাড়িতে যাচ্ছি। আজকে আমাদের বাড়িতেই সে ডিনার খাবে। যা বন্দোবস্ত করার সব করে রেখো। তুমি রান্নাবান্না সব দেখো। আর আমি ড্রিংকের ব্যবস্থাটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবো—

রিসিভারটা রেখে সোহম্ মিস্টার সেনের চেম্বারে গেল।

—কী খবর রায় ? এনিথিং ইম্‌পর্ট্যান্ট ?

সোহম্ বললে—একটা ভালো খবর আছে। আমার বাড়িতে যে পুওর রিলেটিভ্‌সরা এসেছিল, তারা আজকে চলে গেছে। এখুনি মিসেসের কাছ থেকে খবরটা পেলাম—

মিস্টার সেনও যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

—থ্যাঙ্ক গড্ ! তোমাদেরও শান্তি হলো !

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, আর একটা কথা, আজকেই আমি ইব্রাহিমকে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটা ডিনার-পার্টি দিচ্ছি—

—ভেরি গুড্। ভেরি গুড্ আইডিয়া। কত টাকা দরকার ?

সোহম্ বললে—দিলে ভালো হতো—এই হাজার ত্রিশের মত হলেই চলবে।

তারপর বেশি লাগলে আমি চেয়ে নেব—

মিস্টার সেন বললেন—ঠিক আছে, আমার ইম্‌প্রেশ্‌ড্‌ থেকে তোমাকে দিয়ে দেব।

সোহম্‌ বললে—একটা কাজ আপনি করতে পারবেন স্যার? রাত ঠিক আটটার সময় আপনি আমার বাড়ির টেলিফোনে একটা রিং করবেন? অর্থাৎ ইব্রাহিম যখন পাঁচ পেগ খেয়ে একটু বেহুঁশ হয়ে পড়বে—ঠিক সেই সময়ে—

—কেন?

সোহম্‌ বললে—আপনার রিং পেলেই আমি আসর থেকে উঠে পড়বো আর কি। আমি বলবো—মিস্টার সেন আমাকে ডাকছেন—। তার মানে আমি চাই আমার মিসেস আর ইব্রাহিম দু'জনে একটু ঘনিষ্ঠ হোক—। তাতে দেখবেন ইব্রাহিম স্ট্রাইক-নোটিশ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করবে না—আপনি কী বলেন?

মিস্টার সেন বললেন—ইব্রাহিম কি অত বোকা? লেবার-লীডাররা বড় শয়তান হয়—

সোহম্‌ বললে—আমিই কি বোকা? আমিও তো এককালে লেবার-লীডার ছিলাম। এতদিন তো ওদের সব চেষ্টাই আমি পণ্ড করে দিয়েছি।

মিস্টার সেন বললেন—তা দেখ চেষ্টা করে। যদি পারো তো ওয়েল এ্যাণ্ড গুড্‌। চেষ্টা করতে দোষ কী? আমি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত আটটায় তোমাকে রিং করবো, তুমি তোমার টেলিফোনের পাশেই বসে থেকো—

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—টাকাটা এখন দেব?

সোহম্‌ বললে—তা দিন—

মিস্টার সেন পাশে রাখা আয়রন চেস্টটা খুলে তাড়া-তাড়া নোট বার করতে লাগলেন। তার থেকে তিরিশটা বাণ্ডিল সোহমের দিকে এগিয়ে দিলেন। তিরিশটা বাণ্ডিলই ব্যাঙ্ক থেকে গালা দিয়ে সিল করা।

সোহম্‌ নিজের চেম্বার থেকে পোর্টফোলিও ব্যাগটা নিয়ে এসে তার ভেতরে টাকাগুলো রেখে চাবি বন্ধ করে দিলে।

ইব্রাহিম আলি হোসেন সাহেব এত বোকা নয় যে সে বুঝতে পারবে না সোহমের ওই ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রই বটে! শ্রমিকদের যারা নেতা তারা সবই বোঝে, কিন্তু বুঝেও না-বোঝার ভান করতে তাদের কোনও জুড়ি নেই। বহু লোকই চায় পৃথিবীর তালের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে। এইটেই স্বাভাবিক এবং সাধারণ। সবাই যে-রকম সেই রকম হওয়ার মধ্যে যে মানসিক সন্তোষ জন্মায় সেই রকম সন্তোষ ছিল ইব্রাহিমের মধ্যে। তার মানে সে টাকা উপার্জন করতে চাইতো, ক্ষমতার শিখরে উঠে দণ্ডদাতা হতে চাইতো। সেই টাকা সেই ক্ষমতা আসে যা

থেকে তার নাম টাকা। বৈধভাবে টাকা উপায় করতে গেলে পরিশ্রম নিষ্ঠা একাগ্রতা অনিবার্য। কিন্তু তাতে অনেক ল্যাটা। অবৈধভাবে টাকা উপায় করতে গেলে অত পরিশ্রম নিষ্ঠা বা একাগ্রতা কিছুরই দরকার নেই। ইব্রাহিম তাই লেবার-লীডার হয়েছিল। এই লেবার-লীডার হতে গেলে মাত্র একটা জিনিসই দরকার, সেটা হচ্ছে ভালো গরম গরম লেক্‌চার দেবার ক্ষমতা। ঘুষি পাকিয়ে গরম গরম লেকচার দেবার ক্ষমতা ছিল ইব্রাহিম আলি হোসেনের। সে যখন শহীদ মিনারের তলায় দাঁড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে বলতো—দুনিয়াকা মজদুর এক হো—সমস্ত মজ্‌দুররা সকলের গলা মিশিয়ে চেঁচাতো—দুনিয়াকা মজ্‌দুর এক হো—

টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাক্‌সন্‌ কোম্পানির মজুরদের মিছিল করে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় ইব্রাহিম প্রথমে একলা চেঁচাত—ইন্‌—ক্লাব—জিন্দাবাদ —

মিছিলের সব লোকেরা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাতো—ইন্‌—ক্লাব—জিন্দাবাদ—

একবার আরো একটা অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল।

তখন টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাক্‌সন্‌ কোম্পানির ফ্যাক্টরির কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছিল। ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে রয়েছে, কোন প্রোডাক্‌শন হচ্ছে না। কোম্পানির কোটি কোটি টাকা লোকশান হচ্ছে। বোম্বাই-এর হেড্‌ অফিসের টনক নড়লো। সেখানকার বড়কর্তা তাড়াতাড়ি কলকাতায় উড়ে এলেন। সব কাজই হলো গোপনে। গোপনেই পরামর্শ চললো। শলা-পরামর্শ চলতে লাগলো বড়কর্তাদের মধ্যে। এমন সময়ে গোপনেই ডাক পড়লো মিস্টার রায়ের। মানে সোহমের। সোহম্‌ও ভাবছিল সে কী করবে।

একদিন সেও রাতদুপুরে গিয়ে হাজির হলো মিস্টার সেনের বাড়িতে। খুব লুকিয়ে যেতে হলো তাকে। কারণ তখন চারদিকে ইউনিয়নের স্পাই ঘুরছে। মিস্টার সেনের বাড়ির সামনে তখন পুলিস পাহারা দিচ্ছে। ভেতরে ঢোকবার উপায় নেই। কারণ পুলিসও ইউনিয়নের দলে। সোহম্‌ তাই দেখে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে এল। এসেই টেলিফোন করলে মিস্টার সেনকে। কোনও উত্তর নেই। পরের দিন সকালবেলা হতেই সোহম্‌ দেখলে তার ঘরের বাইরের দেওয়ালে টেলিফোনের তার কাটা। ইউনিয়নের পাণ্ডারা তার টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে। এখন কী উপায়? অফিস-ফ্যাক্টরি সবই তালাবন্ধ, টেলিফোনের তারও কাটা, সে কী করে মিস্টার সেনের সদে যোগাযোগ করবে?

উপায় নেই। কোনও উপায় নেই মিস্টার সেনের সঙ্গে যোগাযোগের।

ঠিক সেই সময়ে এই ইব্রাহিম এক কাণ্ড করলে। একদিন হঠাৎ সবাই দেখলে ভোরবেলা টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাক্‌সন্‌ কোম্পানির অফিসের মেন্‌ গেটের সামনে আরো অনেক কর্মচারীর সঙ্গে ইব্রাহিম শুয়ে আছে। বিছানা নেই, বালিশ নেই, পিচের রাস্তার ওপর খালিগায়ে শুয়ে আছে। যদি কারো অফিসের ভেতরে যাবার ইচ্ছে থাকে তো আমাদের মাড়িয়ে যাও।

আর অসংখ্য ইউনিয়ন কর্মী সার সার দাঁড়িয়ে আছে সামনের দিকে চেয়ে।

তাদের হাতে অসংখ্য প্ল্যাকার্ড। তাতে বড় বড় করে লেখা আছে—

"কমরেড্ ইব্রাহিম আলি হোসেনের
শ্রমিক কল্যাণে
আমরণ অনশন ব্রত"

খবরের কাগজে এ খবর প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়ে শহরে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছিল। এতে কোম্পানির ইজ্জৎ যেমন চলে গিয়েছিল তেমনি ইব্রাহিম আলি হোসেনের ইজ্জৎ বেড়ে গিয়েছিল। এ এমন এক ত্যাগ যা ইব্রাহিমকে মহাপুরুষের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। এক হিসেবে বলা যায় এই কুটনীতির আবিষ্কারক আর প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধী। শুধু আমরণ অনশন নয়, পদযাত্রাও গান্ধীজীর দান। মহাত্মাজীর এই দু'টি অস্ত্র এককালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেও সমূলে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এ-যুগে বহু-ব্যবহারে ও-অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে। তবু ইউনিয়নের চোখে ইব্রাহিম যেন কমরেড লেনিনে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

সেই সময়ে হঠাৎ একদিন একটা চিঠি এল সোহমের কাছে। চিঠিটা একটা লোককে দিয়ে পাঠিয়েছেন মিস্টার সেন। তাতে লেখা ছিল—'আসছে শনিবার এই চিঠি পাওয়া মাত্র রাত দশটার সময় ছ'নম্বর বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের হোটেলে দোতলার ওপর আমার সঙ্গে দেখা করবে। গাড়ি নিয়ে এসো না, ট্যাক্সি করে এসো। ইতি—'

চিঠিটা যথেষ্টই ইঙ্গিতবহ। গাড়ি নিয়ে গেলে সবাই চিনতে পারবে, সেই জন্যেই ট্যাক্সি নিয়ে যেতে বলেছিলেন মিস্টার সেন। সেই দিনই সোহম্ ট্যাক্সি নিয়ে গিয়েছিল সেই ছ'নম্বর বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের হোটেলে। চীনেপাড়ার ভেতরে যে অমন একটা হোটেল আছে তা সোহম্ জানতো না। জীবনে সেই-ই প্রথম সেই-ই শেষ সেই হোটেলে যাওয়া।

সেখানে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় গিয়ে একটা মাত্র কেবিন, কেবিনটার সামনে একটা ছিটের কাপড়ের পর্দা ঝুলছে।

পর্দাটা সরাতেই সোহম্ অবাক হয়ে গেছে। মিস্টার সেনের সামনে একটা অচেনা দাড়িওয়ালা লোক বসে আছে। সোহম্ চিনতে পারলে। কমরেড্ ইব্রাহিমের দাদা।

সোহম্ যেতেই মিস্টার সেন পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন—ইনি হচ্ছেন…

কিন্তু সোহম্ বললে—আমি এঁকে চিনি—

—তুমি চেনো?

সোহম্ বললে—চিনবো না? ইনি তো ইব্রাহিমের দাদা—সাদাত্ আলি হোসেন—

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন—হ্যাঁ—

সাদাত্ আলিকে এই পোশাকে এখানে দেখবে এ-কথা সোহম্ কল্পনাও করতে পারেনি।

মিস্টার সেন বললেন—এই মিস্টার সাদাত্ আলি আজকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

তারপর সাদাত্ আলির দিকে চেয়ে বললেন—বলুন না মিস্টার আলি, কী বলছেন আমাকে, সেটা মিস্টার রায়ের সামনে বলুন—

সাদাত্ আলি সোহমের দিকে চেয়ে বললেন—জানেন মিস্টার রায়, আমার ভাই ইব্রাহিম বরাবর বড় মাথা-গরমের লোক। তা ছাড়া ওর বরাবরের ইচ্ছে যে ও পলিটিক্স করবে।

মিস্টার সেন বললেন—তা পলিটিক্স করা কি খারাপ ?

সাদাত্ আলি বললেন—না, খারাপ নয়, আমার গ্র্যান্ডফাদারও পলিটিক্স করতেন। তিনি ছিলেন শহিদ সুরাবর্দির বন্ধু। তখন থেকেই পলিটিক্স আমাদের রক্তে। আমরা তিন পুরুষ ধরে মুসলিম লীগের মেম্বার। তারপর যখন দেশ পার্টিশান করা হলো, আমরা থেকে গেলাম ইন্ডিয়ায়, আর আমাদের রিলেটিভরা সবাই চলে গেল নতুন স্টেট পাকিস্তানে।

গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সাদাত্ আলি সাহেব একবারে বাচাল হয়ে উঠলেন। তিনি বলতে লাগলেন তাঁদের বংশের ইতিহাস। পাঁচশো কি হাজার বছর আগে এই ইন্ডিয়ায় এসে তাঁরা ইন্ডিয়ান হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ কোথা থেকে সব গোলমাল হয়ে গেল। সবাই প্রচার করতে লাগলো তাঁরা মুসলমান। সেই প্রচারে আমরা ভুলিনি, কিন্তু কিছু লোক সে-প্রচারে ভুললো। কিন্তু একবারও তারা এ-কথা ভাবলো না যে জিন্না সাহেবও একদিন কংগ্রেসের মেম্বার ছিলেন। আর আবদুল গফুর খাঁ কি মুসলমান নয় ? তাহলে তিনি কেন জিন্নার কথায় ভুললেন না—

ওদিকে সাদাত্ আলি সাহেবের গেলাসও খালি হয়ে গিয়েছিল।

মিস্টার সেন আর এক পেগ দেবার অর্ডার দিলেন।

নতুন গেলাসে চুমুক দিলেন সাদাত্ আলি সাহেব।

সাদাত্ আলি সাহেব খাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে সোহমও খাচ্ছে, আর মিস্টার সেনও খাচ্ছেন। খাওয়া আর কথা একসঙ্গে দুটো কাজই চলছে তখন। চীনেদের হোটেলে যত রকম দামী খাবার আছে সবই পরিবেশন হচ্ছে একে একে। এ পাড়ার হোটেলে এমন কোনও নিয়ম নেই যে একটা বাঁধা সময়ে মদ পরিবেশন বন্ধ হবে। এখানে যতক্ষণ ইচ্ছে মদ খাও কেউ কিছু বলবে না।

সাদাত্ আলি সাহেবেরও সেদিকে কোন হুঁশ নেই। তিনি খেয়েই চলেছেন।

মিস্টার সেন হঠাৎ এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা সাদাত্ সাহেব, আপনার ভাই কেন পলিটিক্স করছে বলুন তো ?

সাদাত্ আলি বললেন—ইব্রাহিমের বড় টাকার লোভ, জানেন মিস্টার সেন ! ও সব কিছু জেনে দেখে বুঝেছে, সংসারে টাকাটাই আসল—

—তা আমরা কি বলছি যে টাকাটা আসল নয় ? মানুষ যা-কিছু করে সবই তো টাকার জন্যেই করে—কিন্তু তারও তো একটা লিমিট্ আছে ?

সাদাত্ আলি বললেন—না মিস্টার সেন, টাকা চাওয়ার কোনও লিমিট্ নেই। পলিটিক্স যারা করে তাদের মতে টাকার কোনও লিমিট্ নেই। এক-একটা

ইলেকশানে দাঁড়াতে গেলে পাঁচ থেকে দশ লক্ষ টাকা করে লাগে, সে টাকাটা কোত্থেকে আসে? সেই জন্যেই ইব্রাহিম ইউনিয়ন-বাজি করছে। ওকে কিছু টাকা দিয়ে দিন ও হাঙ্গার-স্ট্রাইক্ তুলে নেবে!

—কত টাকা দিতে হবে?

সাদাত্ আলি মাতাল হলেও তালে ঠিক আছেন। বললেন—দু' লাখের কমে রাজি হবে বলে তো মনে হয় না—

—দু' লাখ !!!

মিস্টার সেন চম্‌কে উঠলেন।

সাদাত্ আলি সাহেব বললেন—আজকাল দু'লাখ টাকার দাম কী বলুন? কলকাতা শহরে দু'লাখ টাকা দিলেও একটা ছোট্ট বাড়ি পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যাবে না। আর তা ছাড়া ও টাকা তো ও একলা নেবে না। বিভূতি পোদ্দার, কেশব মাইতি—তাদেরও তো কিছু ভাগ দিতে হবে! আর তার ওপর ওদের পার্টি-ফাণ্ড আছে, আর টাকা না হলে পার্টিই বা চলবে কী করে বলুন—! দশ জনের টাকা নিয়েই তো পার্টি!

মিস্টার সেন বললেন—সাদাত্ সাহেব, ইব্রাহিম আলি পার্টি করছেন করুন, কিন্তু আমাদের দেশ যে গোল্লায় যাচ্ছে—আগে পার্টি না আগে দেশ?

সাদাত্ সাহেব বললেন—আগে পার্টি—

—সে কী? কী বলছেন আপনি?

সাদাত্ সাহেব বললেন—হ্যাঁ, পার্টি বাঁচলে দেশ বাঁচুক আর না বাঁচুক পার্টির লীডাররা তো বাচবে! ওড়িষ্যার পট্‌নায়কের বাড়িতে একবার পুলিস রেইড্ হলো। পাওয়া গেল নগদ এক কোটি টাকা। তাতে কি পট্‌নায়কের কিছু শাস্তি হয়েছে? হয় নি। কারণ পটনায়ক বললেন, ওই এক কোটি টাকা আমার নিজের নয়, ওটা পার্টির ফাণ্ডের টাকা—ব্যাস্। ইনকাম ট্যাক্স অফিসাররা কিছুই করতে পারলে না। আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের যত পার্টি-লীডার আছে, যত মিনিস্টার আছে, তারা যেদিন থেকে পাওয়ারে এসেছে সেই দিন থেকেই তাদের ব্যাঙ্কে কোটি-কোটি টাকা জমেছে। সে টাকাগুলো কি তাদের নিজের টাকা? না, সব পার্টির টাকা। তাই তাদের ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট কিছুই করতে পারেনি। তাঁরা ইনকাম ট্যাক্স দেন না, দিলেও যা ট্যাক্স দেওয়া উচিত তার চেয়েও কম দেন—

সোহম্ শুনছিল। মিস্টার সেনও শুনছিলেন।

মিস্টার সেন বললেন—কিন্তু একটা কথা—

—বলুন, কী?

মিস্টার সেন বললেন—আমাদের কোম্পানির প্রায় নব্বুই লাখ টাকা লোকশান হয়েছে ওই স্ট্রাইকের জন্যে। স্ট্রাইক মিটে গেলে আমরা কিন্তু কম বোনাস্ দেব। আগে আমরা কুড়ি পার্সেণ্ট পর্যন্ত বোনাস্ দিতুম, এখন কিন্তু আট পার্সেণ্টের বেশি বোনাস্ দেব না—

সাদাত্ আলি বললেন—সে আপনি যা ইচ্ছে করেন করুন, ইব্রাহিম কিছু

বলবে না—

—আর স্ট্রাইক-পিরিয়ডের মাইনেও কেউ পাবে না—

—ইব্রাহিম তাতেও রাজি।

মিস্টার সেন আবার বললেন—আর লোড্ শেডিং-এর জন্যে জেনারেটার চালাবার খরচও আজকাল বাড়ছে, সে খরচ কে যোগাবে? ওয়ার্কারদের ওভার-টাইম দিয়ে আমার কত প্রফিট্ থাকবে?

সাদাত্ সাহেব বললেন—ওভারটাইম কেন দেবেন? দেবেন না!

মিস্টার সেন বললেন—ওভারটাইম না দিলে ওরা তো আবার স্ট্রাইক করবে।

সাদাত্ সাহেব বললেন—ও-শালারা যা বলবে তাই-ই শুনতে হবে নাকি? এখন তো ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলুন, তার পরে যা হয় তা দেখা যাবে'খন—

মিস্টার সেন বললেন—আপনি কথা দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি—

মিস্টার সেন আবার বললেন—কিন্তু ইব্রাহিমের সঙ্গে যদি একটা কন্‌ট্রাক্ট হয়, তা কিন্তু তিন বছরের জন্যে মেনে চলতে হবে। তিন বছরের মধ্যে যেন আর স্ট্রাইক না হয়। ইব্রাহিম তাতে রাজি হবে তো?

—হবে, আমি কথা দিচ্ছি। ইব্রাহিমও কন্‌ট্রাক্ট-এ সই দেবে। ওই কেশব মাইতি, বিভূতি পোদ্দারও তাতে সই দেবে। আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন টাকাটা দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন—

—তাহলে ওই কথাগুলো রইল কিন্তু সাদাত্ সাহেব। দেখবেন পরে যেন গোলমাল না হয়।

সাদাত্ সাহেব বললেন—ইব্রাহিম বলেছে ওদের পার্টি কখনও কথার খেলাপ করে না।

মিস্টার সেন বললেন—একটা কথা মনে রাখবেন, এর পরে তিন বছরের মধ্যে যদি আবার কোনও গোলমাল হয় তখন কিন্তু কোম্পানি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তাদের কারবার গুটিয়ে নিয়ে বোম্বাই চলে যাবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে অনেক কোম্পানিই চলে গেছে, এবার আমরাও চলে যাবো—। মাঝখান থেকে হাজার হাজার বাঙালী বেকার হয়ে পড়বে!

সাদাত্ সাহেব বললেন—বাঙালীরা মরলেই ভালো।

—কেন? বাঙালীরা মরলেই ভালো কেন?

সাদাত্ সাহেবের বোধ হয় তখন নেশা আরো চড়ে গিয়েছিল। বললেন—ইব্রাহিম আমাকে বলেছে যে মারোয়াড়ী কোম্পানিরা লেবার-লীডারদের বেশি মদত দেয়, বেশি টাকা দেয়। বাঙালীরা চলে গেলে সে জায়গায় যদি মারোয়াড়ী কোম্পানি আসে তা হলে লেবার-লীডারদের আরো লাভ। অল্‌রেডি তো কলকাতাটা বাইরের ব্যবসাদারদের হাতে চলে গেছে। দেখছেন না বাঙালীরা তাদের সব ঘর-বাড়ি বেচে দিয়ে বাইরে নৈহাটি, কল্যাণী, সন্তোষপুর, যাদবপুর চলে যাচ্ছে—

—কিন্তু তাতে কি ভালো হচ্ছে?

সাদাত্ সাহেব বললেন—নিশ্চয়ই ভালো হচ্ছে, লেবার-লীডারদের খুবই ভালো হচ্ছে। ভালো হওয়া মানেই তো টাকা হওয়া। আপনি ইব্রাহিমকে দু'লাখ টাকা দিতেই 'কিন্তু কিন্তু' করছেন, মারোয়াড়ী কোম্পানি হলে ইব্রাহিম পাঁচ লাখ টাকা চেয়ে বসতো, আর তারা তা দিতও—

মিস্টার সেন আর এ নিয়ে বেশি কথা বলতে চাইছিলেন না। কারণ রাত ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। এর পর বেশি দেরি হলে শহরে আর ট্যাক্সিই পাওয়া যাবে না।

তিনি উঠলেন। হোটেলের চীনে বয়কে তিনটে ট্যাক্সি ডাকতে বললেন। তিনজনে তিনটে ট্যাক্সিতে তিন দিকে যাবে।

মিস্টার সেন বললেন—কালকে এই রাত দশটার সময় একবার এখানে আপনি দয়া করে আসবেন?

সাদাত্ আলি বললেন—কাল? তার মানে আরো টোয়েন্‌টি-ফোর আওয়ার্স পরে? তার মানে ইব্রাহিম আরো টোয়েন্‌টি-ফোর আওয়ার্স উপোস করবে?

মিস্টার সেন বললেন—যখন খুব রাত অন্ধকার হবে, কেউ কাছে থাকবে না, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু খেয়ে নিলে দোষ কী? কিছু খাইয়ে দেবেন আপনার ভাইকে—

সাদাত্ আলি বললেন—মিস্টার সেন, আপনি বলছেন কী?

—কেন, লুকিয়ে খেলে দোষ কী? সেই রকম করেই তো সবাই হাঙ্গার-স্ট্রাইক করে। এ তো সবাই জানে। আর নয়তো বাথরুমে গিয়ে কিছু মুখে পুরে দেবে! কেউ জানতেও পারবে না, সন্দেহও করতে পারবে না—

সাদাত্ আলি সাহেবের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

বললেন—আপনার সঙ্গে আমি টাকার কথা বলতে এসেছি, ইয়ার্কি মারতে আসিনি—

মিস্টার সেন সাদাত্ আলি সাহেবের হাতটা নিজের হাত দিয়ে ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন—আপনি ঠাট্টাও বুঝতে পারলেন না সাদাত্ আলি সাহেব? যাক্ গে, আপনি দু'লাখ টাকাই পাবেন, কাল ঠিক রাত দশটার সময় এখানে আসবেন, আমার এই ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার রায় সেই সময় আপনার হাতে দু'লাখ টাকা দিয়ে দেবেন। নগদ টাকা, দয়া করে টাকাগুলো গুনে নেবেন—

সোহমের মনে আছে সাদাত্ আলি সাহেব ঠিক তার পরের দিন হোটেলে এসে টাকাগুলো নিয়ে গিয়েছিল। টাকাগুলো গুনে-গুনেই নিয়েছিল। একবার নয়, দু'বার গুনে যখন দেখলে যে ঠিক দু'লাখ টাকাই আছে তখন বলেছিল—ঠিক আছে—

আর তার পরদিনই ইব্রাহিম অনশন ভেঙেছিল। আর সে কী আওয়াজ! সমস্ত কলকাতাময় জীপে চড়ে ইউনিয়নের লোকেরা চিৎকার করে বলেছিল—"কম্‌রেড ইব্রাহিমকে লাল সেলাম—"

সবাই সেই সুরে সুর মিলিয়ে চিৎকার করেছিল—"লাল সেলাম—লাল সেলাম—"

প্রায় দু'হাজার বছর আগে রাজা ভর্তৃহরি বলে গিয়েছিলেন—

"বারাঙ্গনেব নৃপনীতি রনেকরূপাঃ"

অর্থাৎ—"রাজনীতি বেশ্যাদের মতই বহুরূপী।"

অথচ দুঃখী গরীব কর্মচারীরা জানতেও পারেনি যে ইব্রাহিম তাদের কী সর্বনাশ করলে। বিশ পার্সেণ্ট বোনাসের জায়গায় আট পার্সেণ্ট বোনাসের অঙ্কেই তাদের খুশী থাকতে হয়েছিল। তার পরদিনই ইউনিয়নের তরফ থেকে খবরের কাগজে বিবৃতি বেরিয়েছিল—"টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্‌ কোম্পানির শ্রমিকদের অভাবনীয় জয়, কমরেড্‌ ইব্রাহিমের আমরণ অনশন ত্যাগ। তাঁকে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছে টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্‌ কোম্পানি ইউনিয়নের সেন্‌ট্রাল কমিটি ··"

কিন্তু তিন বছরও কাটলো না সেই চুক্তির। তার আগেই সেই ইব্রাহিম আবার স্ট্রাইক নোটিশ দিয়েছে।

তা দিক। আজকে সেই ইব্রাহিমই সোহমের বাড়ি আসছে। সেই সোহমের ওপরেই ভার পড়েছে ইব্রাহিমকে মদ খাইয়ে তাকে খুশী করবার জন্যে। আর সমস্ত ব্যাপারটাই সামলাবে সুমিত্রা।

সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাদের মুখটা আয়নার মত। তাদের মনের ছবিটা বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। সে-মানুষকে সহজে বোঝা যায়।

কিন্তু আবার এমন অনেক লোকও আছে, যাদের এক-কথায় বলা যায় বর্ণ-চোরা। তাদের বাইরের চেহারা দেখে বিচার করলে ভুল হয়। গায়ে গেরুয়া-বসন থাকলেই যেমন কেউ সাধু-পুরুষ হয় না, তেমনি দামী ফরসা কাপড়-জামা-প্যাণ্ট-টাই পরলেই কেউ ভদ্রলোক হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর কলেজের ছাত্রের কাঠের কারবার দেখতে নিমতলায় গিয়েছিলেন। লেখা-পড়া শিখে কাঠের ব্যবসা করছে শুনে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন। ছাত্রটিও শিক্ষককে দেখে খুবই খুশী।

কথায় কথায় বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কেমন ব্যবসা চলছে রে তোর?

ছাত্রটি হেসে বললে—খুব ভালো স্যার—

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—নগদে কারবার করিস, না ধারে?

ছাত্রটি বললে—নগদেই করি, তবে ধারও দিই মাঝে মাঝে—ভদ্রলোক দেখলে তাকে ধারে দিই—

—ভদ্রলোক চিনিস কী করে?

ছাত্রটি বললে—ফরসা জামা-কাপড় দেখলে বুঝি লোকটা ভদ্র, তখন তাকে ধার দিই—

বিদ্যাসাগর বললেন—দূর বোকা, জামা-কাপড় দেখে কি ভদ্র-অভদ্র চেনা যায় ?

এ-সব অতীত কালের কথা। অতীত কালের কথা হলেও এ বোধ হয় সর্ব-কালেরই কথা। ইব্রাহিম আলি হোসেনই এর উদাহরণ। আর শুধু একলা ইব্রাহিমকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী। ওই কমরেড কেশব মাইতি, বিভূতি পোদ্দারই কি কিছু কম ?

আর সোহম্ নিজে ? সোহম্ নিজেও তো তাই। সোহম্ নিজেও তো একদিন কমরেড ছিল। কমরেড সোহম্ রায়। তার ভেতরের আর বাইরের চেহারাটাই কি এক ? সে নিজে তো কমরেড হয়েও অন্য কমরেডদের ঠকিয়েছে। আর ঠকিয়েছে বলেই তো সে আজ 'টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাকসন' কোং-এর ওয়েল-ফেয়ার অফিসার হয়েছে !

আর তা ছাড়া আপনি বাঁচলেই তো বাপের নাম !

আর তখন অত ভাববার সময় ছিল না। দেরি হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমেই সে একটা বড় 'প্রভিসনে'র দোকানে ঢুকলো। এখান থেকেই সে বরাবর নিজের 'প্রভিসন' কেনে। এরা ঠকায় না।

দোকানের লোকটা চিনতে পেরেছে।

হেসে বললে—আসুন স্যার। অনেকদিন আপনি আসেননি।

সোহম্ মিথ্যে কথাই বললে।

বললে—কিছুদিন আউটডোরে গিয়েছিলুম। আপনার ফ্রেশ্ স্টক্ কী এসেছে ?

দোকানের লোকটা বললে—যা চাইবেন আপনি সবই পাবেন—

তারপর সোহম্ পকেট থেকে ওয়ালেট্টা বার করলে।

বললে—কিনবো তো অনেক, এখন দেখি পকেটে কত আছে—

দোকানের লোকটা বললে—টাকা না থাকে তো আপনি পরে দেবেন—

সোহম্ বললে—না, আমার একটা পলিসি আছে, আমি কখনও ধার নেবও না, কাউকে ধার দেবও না—মাতাল মানুষ, কবে আছি কবে নেই, জীবনের কথা কিছু বলা যায় না তো ! শেষকালে কি ধার রেখে মরবো—

দোকানের লোকটা হাসলে।

বললে—কী যে আপনি বলেন স্যার ! কলকাতায় কত বড়-বড় লোক আমাদের খদ্দের, যারা রেগুলার আমাদের স্টোরস্ থেকে স্টক্ কেনে, সে-রকম লোক আমাদের অনেক আছে। আর আমরা তো আপনাদের ক্লাবেও সাপ্লাই করি। যারা মদ খায় তাদের হার্ট খুব দিল-দরাজ। তারা কখনও খারাপ লোক হয় না—

সোহম্ যেন খুশী হবার ভান করলে।

বললে—তাই নাকি ! কিন্তু আমি তো আমাকে চিনি। আমার মতে আমি তো খুব খারাপ লোক—

দোকানের লোকটাও হাসলে।

বললে—না স্যার, আপনি নিজেকে চেনেন না। নিজেকে চেনা অত সহজ

নয়। সোক্রেটিস সেই কথাই তো বলতেন। সকলকে বলতেন—নিজেকে চেনো, know thyself। আমাদের শাস্ত্রেও তো তাই লেখা আছে। 'আত্মানং বিদ্ধি' মানেই তো তাই—

আশ্চর্য। সোহম্ লোকটার বিদ্যের পরিধি দেখে অবাক হয়ে গেল। এত-দিন ধরে সোহম্ এখানকার খদ্দের, এর মধ্যে যে এত বিদ্যে আছে তা তো জানা যায়নি এতদিন—

দোকানের একজন কর্মচারী বান্ডিলটা নিয়ে তার গাড়ির ভেতরে পৌঁছিয়ে দিলে। সোহম্ তাকে একটা টাকা বখশিশও দিয়ে দিলে। লোকটা বখশিশ পেয়ে খুব খুশী। আর ফালতু টাকা পেলে কে না খুশী হয়?

সত্যি, পৃথিবীতে টাকার কত মহিমা! টাকার যে কত মহিমা তা সাধারণ লোকরা কী-ই বা জানে! এই যে এতগুলো দেশ আমেরিকার বন্ধু, তা ওই টাকা পায় বলেই তো। আবার যারা রাশিয়ার কাছ থেকে টাকা পায় তারা রাশিয়ার বন্ধু হয়। এই যে পৃথিবীতে 'মার্শাল-এইড্' প্ল্যান চালান করেছিল আমেরিকা', তা কিসের জন্যে? নিজের ব্যবসা করে টাকা উপায় করাও হবে আবার বন্ধুত্বও পাতানো যাবে! যেমন এখন 'International Moneteary Fund' হয়েছে, এর উদ্দেশ্যও তো তাই। তোমাদের দেশ গরীব, তোমাদের টাকা নেই, তাতে কোনও ক্ষতি নেই। তুমি এই ফান্ড্ থেকে টাকা নাও, যত ইচ্ছে টাকা নাও। এখন এ-টাকা শোধ করতে হবে না। কুড়ি বছর, কিংবা পঁচিশ বছর—আর তা না হয় তো তিরিশ বছর পরে এ-টাকার সুদ দিও। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে টাকা নিলে তুমি আমাদের বন্ধু থাকবে। আমরা তো তোমাদের বিপদের দিনে টাকা দিচ্ছি, যাতে তুমি খেতে পরতে পাও। আর কোনও স্বার্থ নেই আমাদের। বিপদের দিনে যে দেখে সে-ই তো সত্যিকারের বন্ধু। আমি তোমাদের বন্ধু বলে ভাবি বলেই তোমাদের বিপদের দিনে টাকা দিচ্ছি!

আর ধরো এই কলকাতার কথা! কলকাতার রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার না করলে আর চলছে না। এখানকার বস্তিবাসীরা বড় গরীব! আহা, ওদের জন্যে আমরা আমেরিকানরা বড় ভাবি! ওদের অবস্থা কি ভালো করা যায় না? ওদের অবস্থা ভালো করবার জন্যে তোমাদের ভাঁড়ারে যদি টাকা না থাকে তো আমাদের একটু বলো না। এই জন্যেই তো আমরা 'World Bank' করেছি। সকলের সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই তো আমরা আছি। আমরা আমেরিকানরা আরামে থাকবো আর তৃতীয় দুনিয়ার লোকেরা খেতে পাবে না, তেষ্টার জল পাবে না, থাকবার জন্যে একটা ঘর পাবে না, ড্রেন পায়খানা পাবে না, এটা যে আমাদের সহ্য হয় না। World Bank থেকে কত কোটি টাকা ধার নেবে তা মুখ ফুটে একটু বলতেও তোমাদের এত লজ্জা? তোমরা বললেই সে-টাকা ব্যাংক দিয়ে দেবে। আর সুদ? সুদের কথা বলছো? সে কী? আমরা কি কাবলিওলা বলতে চাও? সুদের টাকার জন্যে কি আমরা তোমাদের গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করবো বলতে চাও? আমরা অত সুদখোর নই গো, আমরা অত সুদখোর নই। আমরাও মানুষ। আমাদেরও মায়া-দয়া আছে গো, আমাদেরও মায়া-

দয়া আছে। আমরা খ্রীষ্টান, যীশুখ্রীষ্টের মত আমরাও এক গালে চড় খেলে অন্য গালটা পেতে দিই। আমাদের তোমরা অত নেমক-হারাম ভেবো না। রাশিয়ার মত নেমক-হারাম নই আমরা। আমেরিকাও তোমাদের মত ডেমোক্রেটিক দেশ। আমরা শিল্পীর স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছি আমাদের সংবিধানে। কত টাকা তোমাদের চাই? এক কোটি, দু'কোটি, তিন কোটি, চার কোটি, পাঁচ কোটি? আর সুদ? সুদের কথা এখন তুলে কী হবে? যেদিন পারো যেদিন তোমাদের সামর্থ্যে কুলোবে সেদিন দিও!

মনে আছে গাড়ি চালাতে চালাতে সোহমু কথা-মত ইব্রাহিমকে তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে যখন এসেছিল, তখন হঠাৎ ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে সোহমু, ব্যাপারটা কী বল্ তো?

—ব্যাপারটা কী, মানে? তোকে বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়াবো, এ আমার অনেক দিনের শখ, তা জানিস?

ইব্রাহিম বললে—সে তো আমাকে তুই খাওয়াসই! খালাসীটোলায় নিয়ে গিয়ে তুই তো আমাকে অনেকবার খাইয়েছিস! হঠাৎ এবার তোর বাড়িতে কেন?

সোহমু—এবার আমার স্ত্রী বললে, তাই…

—তোর স্ত্রী?

—হ্যাঁ।

বলে একটু থামলো। তারপর গাড়ি চালাতে চালাতে বললে—আসলে এটা একটা অন্য ব্যাপার…

ইব্রাহিম বললে—অন্য ব্যাপার? তার মানে? অন্য ব্যাপার কী?

—অন্য ব্যাপার মানে একটা স্পেশ্যাল ব্যাপার। আমাদের আজ ম্যারেজ অ্যানিভর্সারি—

ইব্রাহিম বললে—তাই নাকি? তা আগে বলিলি না কেন? আমি এখন কী করি? আমি খালিহাতে যাচ্ছি, এটা তো ভালো দেখায় না—

সোহমু বললে—সেই জন্যেই তো আগে বলিনি! আগে বললে তো তোর ক'টা টাকা খরচ হয়ে যেত—

—তাতে কী হয়েছে! তোদের আজকে ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, আর এই আনন্দের দিনে আমি কিছু উপহার দিতে পারলুম না, এটা আমার ভালো লাগছে না—

—তা হোক, তুই কিছু ভাবিস নি। আমার সঙ্গে কি তোর ফরম্যালিটির সম্পর্ক? সে-সব দিনের কথা কি তুই ভুলে গেলি?

ইব্রাহিম বললে—আমি ভুলবো কেন? বরং তুই-ই ভুলে গেছিস—

সোহমু বললে—ভুলে গেলে কি আজ তোকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাই? তুই-ই বল্—

—তা আর আর কাকে কাকে বলেছিস?

—আর কাউকে বলিনি। কেবল তোকে একলা—আর কেউ জানেও না—

—কেন? কেশব মাইতি, বিভূতি পোদ্দার? ওরাও তো তোর বন্ধু—

সোহম্ বললে—কী যে বলিস তুই ? তারা আর তুই ?
বলতে বলতে সোহম্ গাড়িটা বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করালো—
তারপর বললে—চল্ এখানে নামি। বাড়ি এসে গিয়েছি—
ইব্রাহিম গাড়ি থেকে নামলো। সোহম্ও গাড়িটা গ্যারেজে তুলে দিলে।

এতদিনকার আগের ঘটনাগুলো সোহম্ যেন নিজের চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলে। আজকের তার এই চরম দুঃখ চরম বিপর্যয়ের দিনে সে-সব দিনের কথা ভাবতে তার ভালো লাগলো। ভালো লাগলো এই জন্যেই যে এই দুঃখ এই বিপর্যয়ের জন্যে নিজেকে ছাড়া আর কাকে দায়ী করবে সে ? কেন সে সেই মেহের আলির কথায় ভুলেছিল ? কেন মেহের আলির কথা সে বিশ্বাস করেছিল ? মেহের আলি যখন তাকে বলেছিল যে টাকাই দুনিয়ায় সব চেয়ে কাম্য জিনিস, তখন তো সোহম্ প্রতিবাদ করেনি ! তখন তো মেহের আলির কথা বেদ-বাক্য বলে মেনে নিয়েছিল ! যখন মেহের আলি তার কাছে শেয়ার কেনবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতো, তখন কেন সে তার হাতে হাজার হাজার টাকা তুলে দিত ? আবার সেই টাকা যখন আটগুণ দশগুণ হয়ে কাঁচা টাকায় আবার তার হাতেই ফিরে আসতো তখন সে কেন মেহের আলির হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে খুশী হতো ?

মেহের আলি তাকে অনেকবার বলেছে—আজকাল কি আর শুধু মাইনের টাকায় ভদ্রভাবে সংসার করা চলে ?

সোহম্ বলেছে—তাহলে আমি কী করবো ?

মেহের আলি বলেছে—আজকাল সবাই যা করে আপনিও তাই করুন—

—সবাই কী করে ?

মেহের আলি বলেছে—আপনি বাজারের শেয়ার কেনা-বেচা করুন—বাজারে হাজার রকমের শেয়ার আছে—

—তাতে আমার লাভ ?

—তাতে আপনার সবটাই লাভ ! নইলে বাজারে কোটি-কোটি টাকার লেন-দেন হচ্ছে কেন ? লাভ হচ্ছে বলেই তো বাজারে এত কেনা-বেচা। আপনি কি বলতে চান তারা সবাই বোকা ? আমি তাদের সকলের নাম করবো ? আপনি বলেন তো একে-একে সকলের নাম করতে পারি ! করবো ? একটা কথা জেনে রাখুন মিস্টার রায়, চাকরি করে কখনও কেউ বড়লোক হতে পারেনি—

—কেন ?

মেহের আলি বলেছে—চাকরি করে যে-টাকা আপনি পান সে তো বাঁধা টাকা। সে-টাকার ওপর তো আপনার ইনকাম ট্যাক্স্ কেটে নেয়—

সোহম্ বলেছে—সে তো নেবেই ! তাই-ই তো নিয়ম—

মেহের আলি বলেছে—কিন্তু বাজারে যে লোকটা চল্লিশ টাকা পঁয়তাল্লিশ টাকা কিলো দরে মাছ বিক্রি করে, সে কি ভেবেছেন ইন্‌কাম-ট্যাক্স দেয় ? নইলে আলাপ করে দেখবেন বেনামিতে তাদের বাড়ি আছে, দেখবেন তাদের বিবিদের গায়ে কত জেবর, কত গয়না। কত সোনা, চাঁদি, হীরে জহরৎ। সে-সব কোথা থেকে আসে ?

—কোথা থেকে ?

—ইন্‌কাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার টাকা থেকে —

একটু থেমে মেহের আলি সাহেব বলেছে—আর আপনি একদিন বলেছিলেন যে বেঙ্গলে এক পোয়েট ছিল টেগোর—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যাঁর একটা গল্পতে আপনার নাম ছিল। তার নামও ছিল মেহের আলি—'ক্ষুধিত পাষাণ', মানে 'হাঙরি স্টোন'। তাতে একটা পাগলের ক্যারেকটার ছিল—নাম মেহের আলি। সে কেবল বলতো—সব ঝুট্‌ হ্যায়—

মেহের আলি বলেছে—হ্যাঁ, আমি পাস্তা নিয়েছি। আরে তিনি তো গরীব লোক ছিল স্যার। লেকিন তার গ্রাণ্ড-ফাদার প্রিন্স ছিল, তিনি তো শেয়ার বেচতেন কিনতেন। লন্‌ডন্‌ ভি গিয়েছিল। লন্‌ডনের রাণীর সঙ্গে মোলাকাত্‌ করে কিম্‌তি ভেট্‌ ভি দিয়েছিল। সে কীসের টাকায় স্যার ? শেয়ার বেচা-কেনার টাকায়। নোকরি করে অত রোপিয়া কি হয় স্যার ? হয় না।

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করেছে—আমি শেয়ার বেচে যদি লাভ করি আমাকে ইন্‌কাম-ট্যাক্স দিতে হবে না সে লাভের ওপর ?

মেহের আলি বলেছে—আপনি ক্ষেপেছেন রায় সাহেব ? আজ শেয়ার কিনে কাল বেচুন, কোথাও কেউ জানবে না, আপনি কত টাকায় শেয়ার কিনলেন আর কত টাকায় বেচলেন।

আশ্চর্য, সেদিন মেহের আলি সাহেবের কথায় কেন তিনি বিশ্বাস করেছিলেন ?

মেহের আলি সাহেব বলেছে—আর স্যার, আপনি আমাকে ভি দেখুন। আমার তো বোম্বাইমে দো-মঞ্জিলা কোঠি আছে, আর আপনি তো আমার গাড়ি ভি দেখেছেন ! লেকিন আমিই কি ইন্‌কাম-ট্যাক্স দিই ? আর আমার কথা ছুলিয়ে যান। ক'টা ভকিল সাহেব, ক'টা ডাক্‌দার ঠিক-ঠিক ইন্‌কাম-ট্যাক্স দেয় বলুন তো স্যার ? না, কেউ দেয় না। সির্ফ ও লোক্‌ দেয় যারা চাকরি করে আর ঘুষ নেয় না, তারা ছাড়া আর কেউ ট্যাক্স দেয় না স্যার—

তখন প্রথম-প্রথম সোহমের চাকরিতে সবে উন্নতি হয়েছে। তখন এ-সব কথা তাকে বার-বার বলে যেত মেহের আলি সাহেব। কিন্তু তখন তার কথায় সোহম্‌ বেশি গুরুত্ব দিত না। কিন্তু যখন তার মাইনে একটু একটু করে বাড়তে লাগলো তখন সোহম্‌ দেখলে তার মাইনে থেকে অনেক টাকা মাসে মাসে ইন্‌কাম-ট্যাক্স কেটে নিচ্ছে। তখন আফসোস হতে লাগলো।

সেই সময়ে মেহের আলি সাহেব একদিন এসে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা স্যার,

একটা কথা আপনাকে পুছি—আপনার বাল-বাচ্ছা কিছু আছে ? মানে বাঙলায় যাকে বলে বেটা-বেটি ?

সোহম্ হাসলো। বললে—ও-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন আলি সাহেব ?

মেহের আলি সাহেব বললে—বলুন না। কারণ আছে—

সোহম্ বললে—না—

মেহের আলি সাহেব বললে—আভি ভি হয়নি ? লেকিন এক রোজ তো হোনেওয়ালা হ্যায় ?

সোহম্ বললে - হলে হবে !

—লেকিন তাদের লিয়ে তো আপনার কুছ খরচা হবে !

—তা যদি হয় তাহলে খরচা তো হবেই—

মেহের আলি সাহেব বললে—লেকিন জানেন কি রায় সাহেব, এক-একটা লেড়কা-লেড়কীর জন্যে কত খরচা হবে এই জমানায় ?

সোহম্ বললে—কত আর খরচ হবে, মাসে একশো দুশো টাকা খরচ হবে মাথা পিছু—

—হাসালেন রায় সাহেব ! আপনি আমাকে হাসালেন ! আমার কাছে শুনে নিন রায় সাহেব, এক লেড়কা কা পিছে সাতশো রুপিয়া কম-সে-কম। আর এক লেড়কী কা পিছে দো হাজার সে কম নেহি—

—কেন ? লেড়কীর পেছনে অত খরচ হবে কেন ?

মেহের আলি সাহেব বললে—আপনি বাঙালী আছেন কিনা তাই জানেন না। আপনারা খালি নোক্রি করতেই জানেন ! লেড়কী হলে তার শাদি দিতে হবে না ? শাদিমে কেত্না দহেজ দিতে হয় জানেন ? এক লাখ দো লাখ সে কম নেহি ! তখন টাকা কোথা থেকে পাবেন ?

কথাটার জবাব সেদিন হুট্ করে দিতে পারেনি সোহম্ ! কিন্তু প্রশ্নটা তাকে অনেকদিন ধরে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। সত্যিই তো, তার যা মাইনের আয় তার যা সঞ্চয় তাতে তো কোনও সামঞ্জস্য নেই। অথচ দিন দিন দাম বাড়ছিল জিনিস-পত্তোরের। সেই দাম বাড়ার সঙ্গে তাল রেখে তার মাইনে তো আর বাড়ছে না। তা যদি না বাড়ে তাহলে তো মেহের আলি যা বলেছে তাই ই তো ঠিক। বাজারের শেয়ার কেনা বেচাই তো ভালো। তাতে তার হাতে তো অনেক টাকাই বেঁচে যাবে ! তখন আর খরচের কথা ভাবতেই হবে না !

তাই মেহের আলি সাহেব কিছুদিন পরে যেদিন আবার এসেছিল সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কী হলো রায় সাহেব, আপনি ভেবে কিছু ঠিক করেছেন ?

সোহম্ কী করবে তখনও তা ভেবে উঠতে পারেনি।

বলেছিল—আপনিই বলুন মেহের আলি সাহেব, আমি কী করবো ?

মেহের আলি বলেছিল—আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি একবার লাক্ ট্রাই করে দেখুন—মাত্র একবার ! আপনি এক হাজার টাকা আমাকে বিশোয়াস করে দিন—

শেষ পর্যন্ত এক হাজার টাকাই দিয়েছিল সোহম্। আর আশ্চর্য মেহের

আলি সাহেবের ক্ষমতা। এক মাস পরে এক হাজার টাকার অংকটা দেড় হাজার টাকা হয়ে ফিরে এসেছিল। আর তারপর থেকেই শুরু হয়েছিল টাকার মৃগয়া। সে মৃগয়া আর কোনও দিন শেষ হয়নি। হয়ত সেই মৃগয়া তার জীবনের শেষ দিন শেষ মুহূর্ত পর্যন্তই চলতো, কিন্তু আজকেই হঠাৎ তা বন্ধ হয়ে গেল। আর আজই হঠাৎ সোহম্ বুঝলো যে এতদিন যে-সব কথা মেহের আলি সাহেবের কাছে শুনেছে সব মিথ্যে। শুধু মেহের আলি সাহেবই নয়, আশেপাশের যত লোকের কাছে যা-কিছু সে শুনেছে সব মিথ্যে। এতদিন যা-কিছু সোহম্ ভেবেছে, জেনেছে, বুঝেছে তা সবই মিথ্যে! শুধু 'ক্ষুধিত-পাষাণে'র পাগলা মেহের আলি যা বলেছিল তাই-ই সত্যি! একমাত্র সত্যি 'সব ঝুট্ হ্যায়'।

কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক। এ-সব পরে ভাবলেও চলবে। তার আগে সেই দিনের কথা সেই ইব্রাহিমের কথা এখানে না তুললে চলবে না।

ইব্রাহিম আলি সোহমের বাড়ির আয়োজন দেখে সেদিন সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ইব্রাহিম বললে—জানেন মিসেস রয়, আমি জানতামই না যে আজকে আপনাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। আপনার হাজব্যাণ্ড আমাকে এ সম্বন্ধে আগে কিছুই বলেননি—

সুমিত্রা বললে—তাতে কী হয়েছে? আপনি আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এটাই যথেষ্ট—

—না না, আমি আগে জানলে খালিহাতে আসতুম না···

সুমিত্রা হাসলো। বললে—ওই জন্যেই তো আগে আপনাকে জানানো হয়নি।

তারপর একটু ভেবে সুমিত্রা আবার বললে—বলুন, ডিনারের আগে অ্যাপিটাইজার কী খাবেন? জিন না রাম না ওয়াইন—যা আপনার পছন্দ হয় বলুন—

ইব্রাহিম বললে—সবই বাড়িতে আছে?

সুমিত্রা বললে—না রাখলে তো চলে না আজকাল। আগেকার মত আজকাল চা কফি, ও-সব তো কেউই খেতে চায় না—

ইব্রাহিম যেন খুশী হলো। বললে—আপনি কী খাবেন?

সুমিত্রা বললে—আপনি যা খাবেন, আমরাও তাই-ই খাবো।

ইব্রাহিম বললে—রায়্ তুমি কী খাবে?

সোহম্ বললে—এক যাত্রায় পৃথক ফল ভালো নয়। তোমরা যা খাবে, আমিও তাই খাবো। আই হ্যাভ নো চয়েস। আমার সবই চলে—

তারপরেই শুরু হলো মদ্য পর্ব। সুমিত্রাই গেলাসের ভেতরে ঢেলে দিতে লাগলো। এক পেগ শেষ হয় তো আবার আর এক পেগ। এই রকম চার পাঁচ পেগ একে একে শেষ হলো। তার সঙ্গে স্ন্যাক্স্। ইব্রাহিম আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছিল। চুমুক দিতে দিতে বললে—মিসেস রায়, আই উইশ ইউ মেনি হ্যাপি রিটার্নস্—এ-দিনটা যেন আপনাদের জীবনে বার বার ফিরে আসে। এর পরের

বছরেও কিন্তু আমাকে ডাকা চাই—

তখন সামান্য নেশা হয়েছে ইব্রাহিমের। তার মেজাজে তখন খুব ফুর্তির আমেজ।

বললে—আপনাদের বাড়ির ভেতরে যে এই সব আয়োজন আছে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। জানেন মিসেস রায়, আমাদের ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টও হয়েছে সেই রকম। মোরারজী দেশাই যখন প্রাইম মিনিস্টার হলো তখন বললে কিনা যে দেশ থেকে মদ খাওয়া উঠিয়ে দিতে হবে। কত বড় অডাসিটি। মদ না হলে ভদ্রলোকরা কী খাবে বলুন তো? র‍্যাশনের চাল? সে তো অখাদ্য! আপনারা বাড়িতে কী চাল খান? রেশনের চাল?

সুমিত্রা বললে—পাগল হয়েছেন! জীবনে কখনও রেশনের চাল খাইনি। কলকাতার ছোটলোকরাই ও-চাল খায়। আমাদের চাকর-বাকরদের জন্যেই বাড়িতে রেশনের চাল আসে—আমরা বরাবর দেরাদুনের চালের ভাত খাই—

ইব্রাহিম বললে—তাই বলি, সেই জন্যেই আপনাদের হেলথ এত ভালো আছে—

সোহম্ বললে—দেখ ইব্রাহিম, জিন রাম হুইস্কি সব আমি হজম করতে পারি কিন্তু রেশনের চাল খেলেই আমার পেট আপ্‌সেট হয়ে যায়—

ইব্রাহিম বললে—আর দেখ, মোরারজী দেশাইটা এত বড় পাগল, বলে কি না মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে। আর তাই করতে গিয়েই তো সিংহাসনটা ছাড়তে হলো। আমি চায়নাতে গেছি, রাশিয়াতেও গেছি। ও দু'টো তো সভ্য দেশ! সেখানে তো কই গভর্নমেণ্ট মদ খাওয়া বন্ধ করে দেয়নি!

সুমিত্রা সামনে মুখটা বাড়িয়ে বললে—আর একটা দিই মিস্টার ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম যেন একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো।

বললে—আপনারাও নেবেন তো?

—নিশ্চয়! এখন তো সবে সন্ধ্যে। নাইট ইজ্ স্টীল ইয়াং। ডিনার পরে হলে চলবে! আগে অ্যাপিটাইজারটা খেয়ে ক্ষিধে বাড়িয়ে নিই—

—ঠিক আছে, দিন—

সোহম্ নিজেও জিন্ খাচ্ছিল বটে, কিন্তু নজর রাখছিল দু'জনের দিকে। ইব্রাহিমের ঠিক মুখোমুখি সুমিত্রা বসেছে। সুমিত্রাকে সোহম্ যেমন করতে বলেছিল ঠিক তেমনিই করছে। গায়ে কী একটা সেণ্ট্ মেখেছে। বোধ হয় সেই সোহমের পছন্দ করা সেণ্ট। সেণ্টটার নামটা বেশ। 'আই লাভ ইউ'। নিউ মার্কেটে ওই স্মাগলড্ সেণ্টটা কিনেছিল সোহম্। প্যারিসে তৈরি। নিউ মার্কেটে সোহমের একটা চেনা দোকান আছে, তাদের বলা আছে কোনও বিলিতি স্মাগলড্ জিনিস দোকানে এলেই যেন টেলিফোনে তাকে একবার খবরটা দেয়। সুমিত্রার ওই শাড়িটাও আমেরিকান সিল্ক। আঙুলের নখে ফ্রেঞ্চ নেল-পালিশ। কোনও জিনিসটাই ইণ্ডিয়ায় তৈরি নয়। আজকে ইব্রাহিম আসবে বলে সুমিত্রা তার বেস্ট শাড়ি পরেছে, বেস্ট্ নেল-পালিশ নখে লাগিয়েছে, বেস্ট্ পাউডার, বেস্ট কোল্ড্ ক্রীম মেখেছে। হীরে লাগানো কানের ইয়ারিং, গলায়

প্ল্যাটিনামের লকেট লাগানো খাঁটি মুক্তোর মালা। সব মিলিয়ে সুমিত্রাকে অন্য দিনের চেয়ে বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে।

আর ইব্রাহিমের পেটে তখন দু' পেগ জিন পড়েছে। তার চোখেও নেশা লেগেছে।

সোহম্ বেশী খায়নি। বেশী খাওয়ার ভান করেছে। সে ইব্রাহিমের চোখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। নেশার অনেক গুণ। নেশার ঝোঁকে মানুষ নিজের অনিচ্ছাতেও অনেক কথা বলে ফেলে। আবার অনেক বেফাঁস কথাও বলে ফেলে। ইব্রাহিম সত্যিই তখন কথা বলে চলেছে।

সুমিত্রা বললে—এবার কি খানা দিতে বলবো ইব্রাহিম সাহেব?

ইব্রাহিমের মুখে তখন কথা আটকে যাচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে। বললে—আপনি যা খুশী করুন, আমার আপত্তি নেই—আমি তো আপনারই···

সুতরাং বদ্যিনাথ এসে এক-এক করে প্লেট সাজিয়ে দিলে। তারপর এল সুপ। ইব্রাহিমের হাতের চামচ তখন কাঁপছে। সোহম্ দেখে খুশী হলো। ওষুধ তাহলে ধরেছে।

খাওয়া তখন পুরোদমে চলছে।

সোহম্ ইব্রাহিমের পাশেই বসেছিল। সোহম্ বললে—ইব্রাহিম—ইব্রাহিম—

ইব্রাহিম অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেলে।

বললে—কী?

সোহম্ বললে—একটা কথা বলবি?

ইব্রাহিম আবার বললে—কী বলবো—?

সোহম্ বললে—সেদিন তুই নটবরের অসুখের কথা বলছিলি না? সে এখন কেমন আছে রে?

ইব্রাহিম বললে—তুই এখন অফিসার হয়ে গেছিস, এখন আর ওদের কথা ভেবে তোর কী হবে?

সোহম্ বললে—না না, সত্যি বলছি। শুনেছি ওর নাকি টি. বি হয়েছে। ওর একটা ছেলেও নাকি মরো মরো—

ইব্রাহিম বললে—ওদের কথা তোকে আর ভাবতে হবে না—

সোহম্ বললে—কথাটা সত্যি কি না তাই বল্ না—

ইব্রাহিম বললে—সত্যি! ইউনিয়ন থেকে যতটা সাহায্য করা সম্ভব তা করছি। কোম্পানি তো কিছু করলে না—গরীবদের দেখবার কেউ নেই এ দেশে—

বলতে বলতে ইব্রাহিমের মুখটা নেশার ঝোঁকেও কেমন করুণ হয়ে উঠলো। যেন সত্যিই কোম্পানির গরীব স্টাফদের কথা সে ভাবে। লেবার-লীডারদের এই অভিনয় সে জীবনে অনেকবার দেখেছে। সে নিজেও আগে এবং এখনও অভিনয় করে থাকে। আর লেবার-লীডারদের তো এইটেই আসল মূলধন। এই মূলধন ইন্‌ভেস্ট করেই তো ইব্রাহিম এখন গাড়ি বাড়ি ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স সব কিছু করেছে। এই মূলধনটা ভাঙিয়েই তো এখন সে এম এল এ. এবং শেষকালে মিনিস্টার হবার স্বপ্ন দেখছে। মিস্টার সেন তো সেই জন্যেই এই ইব্রাহিমের ভাই-এর হাতে

একবার দু' লাখ টাকা দিয়েছিল। আর সে-টাকাটা তো সোহমের হাত দিয়েই দেওয়ানো হয়েছিল। এ-কথা ইব্রাহিম ভুললেও সোহম্ তো ভুলতে পারেনি।

সোহম্ হঠাৎ বললে—আমি যদি তোকে কিছু টাকা দিই, তুই নিবি ?

—টাকা ?

ইব্রাহিম ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠলো। বললে—টাকা ? তুই আমাকে টাকা দিবি ? কেন ?

সোহম্ বললে—দ্যাখ্, এককালে ওই নটবর আমার সঙ্গে কাজ করেছে। লোকটা বড় ভালো রে। তার অসুখের খবর শোনবার পর থেকেই আমার মনটা কেমন ভারি হয়ে গেছে। মিস্টার সেনকেও নটবরের কথা বলেছিলুম। কিন্তু তুই তো পুঁজিপতিদের জানিস ! ওরা শুধু শোষণ করতেই জানে ! ওই ক্যাপিট্যালিস্টরা—

ইব্রাহিম এক নম্বরের ধড়িবাজ।

বললে—এ যে ভূতের মুখে রামনাম দেখছি রে—

সোহম্ বললে—ঠিকই বলেছিস. কিন্তু আমিও তো মানুষ ! আমিও তো একদিন গরীব ছিলুম রে ! একদিন বেশী ভাত খেতুম বলে আমার পিসতুতো ভাই রাত দশটার সময় আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ! সে-সব দিনের কথা কি আমি ভুলে যেতে পারি—

ইব্রাহিম তখন নেশার ঘোরে বলে উঠলো—শালা—

সোহম্ বললে—তুই আমাকে গালাগালি দিস আর যা-ই করিস, আমিও যে মানুষ, তা তুই ভুলিসনি। আমি জানি তোদের মতে আমি পুঁজিপতির দালাল, কিন্তু ভুলে যাসনি আমিও একজন মানুষ। আর আমারও দয়া মায়া আছে—

ইব্রাহিম তখন নেশার ঘোরে ঢুলছে।

বললে—তুই ভাবছিস তোর কথাগুলো আমি বিশ্বাস করছি ?

—বিশ্বাস করা না করা সে তোর ব্যাপার। কিন্তু তুইও তো একজন ভদ্রলোক !

ইব্রাহিম বললে—আমি ভদ্রলোক নই, আমি কমিউনিস্ট্—

বলে আবার হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিলে।

তারপর গেলাসটা টেবিলের ওপর রেখে বললে—যাক্ গে, নটবরকে তুই টাকা দিবি কেন ? কোম্পানিকে বললে কোম্পানিই তো নটবরকে টাকা দিতে পারে !

সোহম্ বললে—কোম্পানিকে বলেছিলাম, কিন্তু কোম্পানি তা দিতে রাজি হয়নি। তাই আমার নিজের টাকা থেকে তাকে কিছু দিতে চাই—

—কত টাকা ? নটবরের কিন্তু অনেক টাকা চাই—

সোহম্ বললে—আমার কাছে এখন কত টাকা আছে জানি না। দেখি আমার বাড়িতে কত টাকা আছে—

বলে সোহম্ চেয়ার ছেড়ে উঠলো। তারপর টলতে টলতে পাশের ঘরে চলে গেল। মিস্টার সেনের কাছ থেকে নেওয়া তিরিশ হাজার টাকার তিরিশটা বাণ্ডিল ব্যাগের মধ্যেই ছিল। সেই বাণ্ডিলগুলো নিয়ে আবার ইব্রাহিমের

কাছে এল।

বললে—এই নে ভাই, এই সামান্য ক'টা টাকাই এখন আমার কাছে ছিল। বাড়িতে আমার কাছে আর কিছু নেই। এখন এই তিরিশ হাজার টাকাই নে। পরে দরকার হলে আরো দেব, নটবরকে বলিস যেন দরকার হলে আমাকে বলে।

ইব্রাহিম টাকার বাণ্ডিলগুলো হাতে নিয়ে গুনে দেখলে। তারপর নিজের দু'পকেটে সেগুলো পুরে ফেললে।

তারপর বললে—খুব উপকার হলো নটবরের। এই টাকাগুলো পেলে ওর ওষুধ-ডাক্তার খরচটা চলে যাবে। তুই যা বললি তা ওকে গিয়ে বলবো। কিন্তু আসলে এটা দেওয়া উচিত ছিল কোম্পানির। কোম্পানির হয়ে যে-লোকটা এতদিন প্রাণ দিয়ে খেটেছে, তার জন্যে কি কোম্পানির কিছুই করবার নেই ?

সোহমের আজও মনে আছে বহুদিন আগের কথা। হঠাৎ একদিন নটবরের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। সোহম্ গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় নটবরকে দেখতে পেয়েই গাড়ি থামিয়ে ডাকলে।

—নটবর—ও নটবর—

নটবর পেছন ফিরে তাকালো।

নটবর প্রথমে চিনতে পারেনি। কাছে আসতেই সোহম্‌কে দেখে চিনতে পারলে।

সোহম জিজ্ঞেস করলে—কী নটবর ? আমায় চিনতে পারছো না ?

এতক্ষণে চিনতে পেরেছে নটবর। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভরে সেলাম করলে সে।

বললে—স্যার, আপনি ? আপনাকে আমি চিনতে পারিনি স্যার—

—কেমন আছো তুমি নটবর ?

নটবরের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

বললে—স্যার, খুব অসুখে ভুগলুম ক'বছর। বড় কষ্ট গেছে আমার। প্রায় মারাই গিয়েছিলুম। ইউনিয়নকে কত বললুম, আপিসের সাহেবের কাছেও কত দরখাস্ত করলুম, কেউ আমার একটা চিঠিরও জবাব দিলে না। আমার একটা ছেলেও মারা গেল সেই সময়ে। আমি যে আর-জন্মে কত পাপ করেছিলুম কে জানে! শেষকালে ডাক্তার বললে, এই অবস্থায় চাকরি করলে আমি আর বাঁচবো না—

বলতে বলতে নটবর ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললে।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—এদিকে কোথায় যাচ্ছো ?

নটবর বললে—হাসপাতালে—

—হস্‌পিট্যালে ? কেন ?

নটবর বললে—আমার বউ-এর অসুখ, তাকে দেখতে যাচ্ছি—

—কী হয়েছে তোমার বউ-এর ?

—ডাক্তাররা তো বলেছে ক্যান্‌সার—

—ক্যান্‌সার ?

সোহমের গলায় কথাটা আটকে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—আর তোমার চাকরি ?

নটবর বললে—চাকরি তো আমার নেই ! আপনি জানেন না স্যার ?

—চাকরি নেই কেন ?

—চাকরি কী করে থাকবে ? ওই খারাপ শরীর নিয়ে কি চাকরি করা যায় ?

সোহম্ বললে—আচ্ছা, একটা কথা বলবে নটবর ?

—বলুন স্যার, কী কথা ?

সোহম্ বললে—বহুদিন আগে তোমাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ইব্রাহিম আলি হোসেন সাহেবকে আমি তিরিশ হাজার টাকা দিয়েছিলুম, তোমাকে দেবার জন্যে ! সে-টাকা তুমি পেয়েছিলে ?

—টাকা ? তিরিশ হাজার টাকা ? আপনি দিয়েছিলেন ? ইব্রাহিম সাহেবকে ?

নটবর সোহমের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো ।

সোহম্ সবই বুঝলো । আর সত্যিই তো, সেই তিরিশ হাজার টাকা সোহম্ তো নিজের পকেট থেকে দেয়নি । দিয়েছিল মিস্টার সেন । মানে টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানি ওটা ঘুষ দিয়েছিল ইব্রাহিমকে । দিয়েছিল—যাতে ইব্রাহিম স্ট্রাইকের নোটিশটা উইথ্ড্র করে নেয় ।

আজ এতদিন পরে মনে হচ্ছে—তাহলে সে নিজেও তো মালিকের একজন দালাল ! তাহলে ইব্রাহিমকে দালাল বলে কেন সে তার বদনাম দিচ্ছে ? আসলে এ সংসারে তো আমরা সবাই-ই দালাল । অর্থাৎ এই কলকাতা শহরের আমরা যারা বাস করছি তারা সবাই । অর্থাৎ এই নগর-সভ্যতার আমরা সবাই-ই তো আসলে দালাল ।

কিন্তু সে-সব কাহিনী পরে বলা যাবে । এখন ইব্রাহিমের সেই দিনের ডিনার খাওয়ার প্রসঙ্গে আসা যাক ।

সেদিন ইব্রাহিম তিরিশ হাজার টাকার বাণ্ডিলগুলো দু' পকেটে গুঁজে আবার খাওয়ার দিকে মন দিয়েছিল । সত্যিই ইব্রাহিম খেতে পারে বটে । মদ তো অনেকেই খায় । মদ খাওয়া হয়ত এমন কিছু দোষেরও নয় । কিন্তু তা বলে এই রকম মদ খাওয়া ? মাছ যেমন করে জল খায়, ইব্রাহিমও ঠিক তেমনি করেই মদ খাচ্ছে আর তার প্লেটে যত খাবার বদ্যিনাথ দিচ্ছে সবই সে নিঃশেষে উড়িয়ে দিচ্ছে, সবই সে গোগ্রাসে গিলছে । হ্যাঁ, এ তো খাওয়া নয়, একে বলে গেলা ।

সোহম্ নিজের হাতের ঘড়িটার দিকে একবার দেখলে । আটটা বাজতে আরো পনেরো মিনিট বাকি । আর পনেরো মিনিট পরেই মিস্টার সেনের টেলিফোন আসবে । মিস্টার সেনও নিশ্চয় এখন ঘড়ির দিকে চেয়ে বসে আছেন ।

সোহম্ সুমিত্রার দিকে চেয়ে দেখলে । হঠাৎ একবার চোখোচোখিও হয়ে গেল তার সঙ্গে । সুমিত্রাকে সবই আগে থেকে শেখানো আছে । এক পলকের দৃষ্টি দিয়ে সে বুঝিয়ে দিলে—সব ঠিক আছে, কিছু ভয় নেই—তুমি কিছু ভেবো না—

কিন্তু ইব্রাহিম তখন তিরিশ হাজার টাকা পেয়ে, তিরিশ পেগ বিলিতি মদ খেয়ে নেশাতেই মত্ত । সুমিত্রা ছাড়া তখন আর কোনও দিকেই তার খেয়াল

নেই। সে জানেও না সে কত পেগ খেয়েছে, বোঝেও না সে কত নেশা করেছে—

হঠাৎ কোণের টিপয়ের ওপর টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠলো। ঘড়িতে ঠিক আটটা বাজলো।

এক মুহূর্তের জন্যে ইব্রাহিমের একটু ধ্যান-ভঙ্গ হলো বটে, কিন্তু তারপর আবার যে-কে-সেই।

সোহম্ টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বললে—ইয়েস, হ্যাঁ রায় বলছি—

তারপর বললে—হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার, আমি এখুনি যাচ্ছি স্যার, না স্যার, কোনও অসুবিধে হবে না স্যার, ঠিক আছে স্যার—আচ্ছা স্যার—

বলে সোহম্ রিসিভারটা রেখে দিলে। তারপর ইব্রাহিমের কাছে এল।

ইব্রাহিম বললে—কী রে, অত 'স্যার' 'স্যার' করছিলি কেন? কোন্ শালা টেলিফোন করছিল?

—আরে, মিস্টার সেন রে। হঠাৎ বোম্বে থেকে একটা আর্জেণ্ট মেসেজ এসেছে। আমাকে এখুনি যেতে হবে মিস্টার সেনের বাড়ি। আমি যাচ্ছি তাই—খুব আর্জেণ্ট বিজনেস্—

ইব্রাহিম বললে—তাহলে আমিও উঠি—

সুমিত্রা বললে—আপনি কেন উঠবেন? আপনি বসুন না। আপনি আর কী নেবেন বলুন? আর একটা তন্দুরী চিকেন দিতে বলবো?

সোহম্ বলে উঠলো—তুই উঠবি কেন? তুই খা না। সুমিত্রা, তুমি ওকে একটু দেখো—

বলে আর দাঁড়ালো না। সে যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি ভাবেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে নিচেয় চলে গেল। মনে হলো আজ তার সব প্ল্যান সার্থক—সোহম্ বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা সামনের দিকে চলতে লাগলো। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। শুধু ইব্রাহিমকে সুমিত্রার সঙ্গে এক ঘরে একলা কয়েক ঘণ্টা ধরে বসিয়ে রাখবার জন্যেই এই ছলনা। টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাকসন্ কোম্পানির স্টাফদের ধর্মঘটের ডাক যাতে সে তুলে নেয় সেই জন্যেই এই ছলনার আশ্রয় তাকে নিতে হলো।

আর টাকা? তিরিশ হাজার টাকা?

সেটা তো সে ইব্রাহিমকে গছিয়েই দিয়েছে। অবশ্য শুধু টাকা দিলেই কাজটা হাসিল হতো। কিন্তু তার সঙ্গে সুমিত্রার সান্নিধ্য। পকেটে কয়েক হাজার বেওয়ারিশ টাকা ইব্রাহিমের রয়েছেই, কিন্তু সুমিত্রার সান্নিধ্যটা ফাউ! রাজকন্যার সঙ্গে যেমন অর্ধেক রাজত্ব। এ-যুগের ভাষায় যেমন সোনার সঙ্গে সোহাগা!

যাক, এতক্ষণে বোধ হয় ইব্রাহিম নেশার ঝোঁকে সুমিত্রা গায়ে হাত দিচ্ছে। সোহম্ যখন বাড়িতে নেই তখন সুমিত্রার গায়ে হাত দিতে আর কোনও বাধা থাকবার কথা নয়। ইব্রাহিম এখন নিশ্চয় বেপরোয়া। পকেটে টাকা, পেটে মদ,

সামনে পরের বিয়ে করা নিঃসন্তান বউ, এর চেয়ে পৃথিবীতে মানুষের আর কী কাম্য থাকতে পারে? জীবন তো একটা, সুতরাং যৌবনটা থাকতে থাকতে ভোগ করে নাও—

অনেক দিন আগের একটা অতি তুচ্ছ ঘটনা মনে পড়ে গেল সোহমের। সেদিন অফিসের ছুটি ছিল, সুমিত্রা রেডিওটা খুলে দিয়েছিল। কে যেন তখন একটা গান গাইছিল। গানের একটা দুটো লাইন গাইতেই সোহম রেগে গেল। সুমিত্রাকে বললে—আবার রেডিওটা খুলে দিলে কেন?

সুমিত্রা বললে—গান শুনছিলাম—

সোহম বললে—যত সব বাজে গান। না আছে মানে না আছে সুর না আছে তাল। একে কি গান বলে? বন্ধ করে দাও, রেডিও বন্ধ করে দাও। আজকাল রেডিওর লোকরাও কেউ কাজকর্ম করে না। বোম্বাই-এর হিন্দী সিনেমার গান দেয় না কেন? আজকাল কোনও অফিসে কোনও শালা আর কাজ করে না—

গানটা তখনও বেজে চলেছে—

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে—

সোহম শেষকালে নিজেই উঠে রেডিওর সুইচটা বন্ধ করে দিলে। বললে—এসব গান কারা লেখে বলো তো? আজেবাজে সব লোককে দিয়ে গান লেখালে এই রকমই হয়! কই, আমিও তো হুইস্কি খাই, রাম খাই, জিন খাই, আমার তো কই প্রাণ কাঁদে না?

সত্যিই, তখন সোহম ভাবতো যেমন করে হোক টাকা উপায় করাটাই হচ্ছে জীবনের মহানতম ব্রত। যার টাকা নেই সে যেন তার কাছে মানুষ নামেরও অযোগ্য ছিল। মানুষ আছে অথচ টাকা নেই, এ-অবস্থাটা সোহম তখন ভাবতেই পারতো না। এই যে এত বড় বড় সব ইনডাস্ট্রি দেশে রয়েছে, এ সমস্তই তো চলছে টাকার জন্যে। এরা টাকা উপায় করছে বলেই তো এত সব লোক খেতে পাচ্ছে! এই যে ইব্রাহিম। ইব্রাহিম অত বড় বংশের ছেলে হয়েও সামান্য ওয়ার্কার হয়ে টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাকসন কোম্পানিতে যে ঢুকেছিল সে কীসের জন্যে? সে চিরকাল কারখানার মধ্যে একজন সাধারণ ওয়ার্কার হয়ে থাকলেই পারতো। তাতে তার খাওয়া-পরার কোনও অসুবিধেই হতো না। কিন্তু কেন সে লেবার-ইউনিয়ন করতে গেল? লেবার-ইউনিয়ন করার পেছনে তার কী উদ্দেশ্য ছিল? কুলী-মজুরদের ভালো করা? গরীবদের স্বার্থ রক্ষা করা? মালিকের শোষণ থেকে কর্মীদের বাঁচানো?

মুখে অবশ্য ইব্রাহিমরা তাই-ই বলতো। কলকাতার 'শহীদ-মিনারে' কর্মীদের যখন মিছিল করে নিয়ে যেত তখন অবশ্য ইব্রাহিম সেই কথাগুলোই স্লোগান দিত। বলতো—"দুনিয়ার মজদুর এক হো।" বলতো—"মালিকের শোষণ থেকে মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।" আরো বলতো—"সর্বহারা শ্রমিকদের বাঁচাবে কারা?" "আমরা —আমরা।"

আর যখন ইব্রাহিম শহীদ-মিনারে লেকচার দিত, তখন ডান হাতে ঘুঁষি পাকিয়ে বলতো—"কমরেড ভাই সব, আমরা সর্বহারারা আজ মন খুলে কথা বলবো বলে এখানে জমায়েত হয়েছি। সারা পৃথিবী জুড়ে পুঁজিপতিরা আমাদের গলার টুঁটি টিপে ধরেছে। তারা বলছে তারা আমাদের মুক্তি দেবে। আজ আপনারা যেদিকে তাকাবেন দেখবেন শুধু শোষণ আর শোষণ। তা সে আমেরিকাতেই বলুন আর ইংলণ্ড ফ্রান্স আর জার্মানীতেই বলুন, সব দেশেই সেই একই ব্যাপার।...কমরেড্স্, আজ আপনারা বলুন আপনারা কাকে চান? আমাদের চান, না সেই সব পুঁজিপতিদের স্বার্থে গড়া পুঁজিপতিদের পার্টিগুলোর নেতাদের চান? চেঁচিয়ে বলুন আপনারা কাদের চান?"

লক্ষ লক্ষ সর্বহারা মানুষদের গলায় সমস্বরে আওয়াজ উঠলো—"আপনাদের—আপনাদের—আপনাদের চাই—"

এর পরেই কারখানার শ্রমিকদের 'দাবী দিবসে'র হরতাল ডাকা হলো। 'টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্সন' কোম্পানির কারখানায় লাগাতার ধর্মঘট শুরু হলো। আর কোম্পানির হেড্ অফিসের সামনের সিং দরজায় ইব্রাহিম ধুলো-কাদার ওপর শুয়ে পড়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করে দিল। একেবারে আমরণ অনশন।

কিন্তু সেই আমরণ অনশন ধর্মঘটের ফলে ইব্রাহিম পেয়ে গেল দু' লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ব্ল্যাক টাকা। যাকে খবরের ভাষায় বলা হয় কালো টাকা। অর্থাৎ সেই টাকার লেন্-দেনের হিসেব কোম্পানির খাতাতেও রইলো না, রইলো না ইব্রাহিমের ব্যাঙ্কের অ্যাকাউণ্টের পাস-বইতেও।

হঠাৎ যেন একট ম্যাজিকের মত ঘটনা ঘটে গেল। ইব্রাহিম, বিভূতি পোদ্দার, কেশব মাইতিদের সঙ্গে কোম্পানির ডিরেক্টরদের একটা মীটিংও হলো। মাঝখানে রইলো লেবার কমিশ্নার। কোম্পানির ডিরেক্টররা যা-যা শর্ত দিলে ইব্রাহিমরা তা সমস্তই মেনে নিলে। একশো পঞ্চাশজন শ্রমিকের চাকরি গেল। বলা হলো ভবিষ্যতে যখন কোম্পানিতে আবার লোক নিয়োগ করা হবে তখন তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর আগে আগে পুজোর সময় যে ঊনত্রিশ পার্সেণ্ট বোনাস দেওয়া হতো তা কমিয়ে আট পার্সেণ্ট করা হবে। তাতেও ইব্রাহিমরা সই মেরে দিলে। কোনও আপত্তি করবার মত সাহস হলো না কারো। দু' লক্ষ টাকার মলম দিতেই সব ঘা কেমন যেন ম্যাজিকের মতন শুকিয়ে গেল।

আর তারপরেই শুরু হলো আসল মজা।

কোম্পানির হাজার হাজার কর্মীরা বার করলো বিজয় মিছিল। 'টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্সন কোম্পানির এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ'! বলে রাস্তা জুড়ে কর্মীরা চেঁচাতে চেঁচাতে চললো। তাদের দেখে রাস্তার দু'পাশে লোক জমে গেল। মিছিলের বাধা পেয়ে বাস-ট্রাম-লরি-ট্যাক্সি সব ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার একটা পাশ ছেড়ে দিয়ে চললেই সব অসুবিধে দূর হয়। কিন্তু না, তারা তা করবে না। লোকের যদি অসুবিধেই না হলো তো তাদের কীসের বিজয়-মিছিল? অথচ তারা জানতেও পারলে না যে তাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট কত লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছে। জানতেও পারলে

না যে এই ক'দিনের ধর্মঘটে কোম্পানির কত লোকসান হলো, সাধারণ মানুষের কত ক্ষতি হলো আর সব চেয়ে যেটা বড় কথা কর্মচারীদের নিজেদেরও কত টাকা লোকসান হলো। এ-সব কিছুই জানতে পারলে না তারা। তারা একটা কথাই শুধু বুঝলো যে তাদের জয় হয়েছে। কীসের জয় হয়েছে, কেন জয় হয়েছে, কত টাকা তাদের লাভ হয়েছে তাও কিছু হিসেব করে দেখলে না তারা। কলকাতার কোন্ অঞ্চল থেকে তারা এসেছে আর কোথায় তারা কাজ করছে, সেইটেই শুধু জানে তারা।

ইব্রাহিম বলতো—আরে ইয়ার, ওরা তো মানুষ নয়, জানোয়ার, জানোয়ার—

কর্মীদের সম্বন্ধে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টেরই যদি এই ধারণা তবে তারা ইব্রাহিমকে ভোট দিয়ে তাদের লীডার করে রেখেছে কেন, এইটেই সোহম্ ভাবতো। কিন্তু কর্মীরা যদি মানুষই হবে তাহলে কি আর এত দৌরাত্ম্য চলতো দেশে? হয়ত সেই জন্যেই তাদের পার্টি চায় না যে এই সব মজুররা লেখাপড়া শিখুক। এরা লেখাপড়া শিখলে তো আর ইব্রাহিম বিভূতি পোদ্দার আর কেশব মাইতিদের এত প্রতিপত্তি থাকবে না। তাহলে তো আর তারা দু'হাতে এত টাকা লুঠতে পারবে না—

সোহম্ সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে ঘুরতে লাগলো। বাড়িতে সুমিত্রাকে ইব্রাহিমের কাছে রেখে এসেছে এই সত্যটা সোহম্ মন থেকে দূর করতে পারছিল না। এ যেন অনেকটা আগুনের পাশে ঘি'কে রাখা!

কিন্তু চাকরি? স্ত্রীর সতীত্বের চেয়ে কি তার চাকরিটাই বড়?

সোহম্ প্রশ্নটা নিজেকেই করলে। নিজেকে প্রশ্ন করে আবার নিজেই তার উত্তরটা দিলে। টাকা যদি বড় না হয়, তাহলে কারবারীরা ঘি'তে গরুর চর্বি মেশায় কেন? কেন সরষের তেলে তারা শেয়াল-কাঁটার রস মেশায়? কেন ভেজাল ওষুধ বেচে তারা মানুষ মারে? আর শুধু কি তারা? সংসারে আজকাল তো সবাই ফাঁকি দিয়ে পয়সা উপায় করতে চায়। কেন লোকে পলিটিকস্ করতে যায়? অত সহজে আর কোন্ কারবারে লাখ লাখ টাকা আসে?

আর শুধু রাজনীতিই বা কেন? রাজনীতিকে দোষ দিয়ে লাভ কী? এই যে চারদিকে এত লটারির প্রচলন হয়েছে এ কীসের জন্যে? কারো ভালো করবার জন্যে? শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি করার কথা তো সব পার্টিই মুখে বলে। কিন্তু বছরে-বছরে এত লাখপতি কোটিপতি আগে কখনো জন্মেছিল? আগে লাখ টাকার লটারি চালু ছিল। কিন্তু কোটিপতি? এখন এক কোটি টাকার লটারি পুরোন হয়ে গেছে। এবার এসেছে দু'কোটি টাকার ফার্স্ট প্রাইজ। কিন্তু এর পরে? এর পরে একদিন যদি ফার্স্ট প্রাইজের অঙ্ক হয় দশ কোটি টাকা তাতেও বোধ হয় কেউ অবাক হবে না।

তাহলে সোহম্ যে সুমিত্রাকে নিজের বাড়িতে ইব্রাহিমের সঙ্গে বসিয়ে রেখে এসে থাকে, তাহলে কি সে অন্যায় করেছে?

আস্তে আস্তে কলকাতার রাস্তায় রাত আরো গভীর হলো।

রাত আরো নিঃসঙ্গ হয়ে এলো।

রাত আরো নিঝুম হয়ে গেল।

তাহলে এবার কি সোহম্‌ বাড়ি ফিরবে?

হঠাৎ সোহম্‌ দেখলে রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে মেহের আলি সাহেব হেঁটে হেঁটে চলেছে। পাগল হয়ে গেছে মানুষটা। আহা, মেহের আলি সাহেবের জন্যে সোহমের বড় দুঃখ হতে লাগলো।

এই কিছুদিন আগেও সোহমের কাছে এসে শেয়ার বিক্রি করে গেছে। তখন শেয়ার সম্বন্ধে কত বড় বড় কথা বলে গেছে। কতবার বলেছে—রায় সাহাব, দুনিয়ামে সব সে বড়া চিজ্‌ হ্যায় রুপাইয়া। রুপাইয়া সে বড়া চিজ্‌ ঔর কুছ্‌ নেহি হ্যায়। যব তক্‌ জিন্দা হ্যায় জীভরকে রুপাইয়া কামা লিজিয়ে, খোদা সে বড়া চিজ্‌ হ্যায় রুপাইয়া—

কথাগুলো তখন মন দিয়ে শুনেছিল সোহম্‌। শুধু মন দিয়ে শোনেইনি, তার কথায় অনেক টাকার শেয়ারও কিনেছিল। মেহের আলি সোহম্‌কে কত হাজার টাকা পাইয়ে দিয়েছে? তা পনেরো লাখ টাকার কম তো নয় বটেই, তার বেশিও হতে পারে। সে-সব টাকার কোনও হিসেব দিতে হয়নি তাকে। তাই গভমেণ্টকে কোনও ট্যাক্সও দিতে হয়নি তাকে। এর জন্যে মেহের আলি সাহেবের কাছে সত্যিই সোহম্‌ ঋণী, সত্যিই সোহম্‌ কৃতজ্ঞ।

কিন্তু তারপর?

সেই বোম্বাই শহর থেকে মেহের আলি সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয়। তার পরে সোহম্‌ বদলি হয়ে এসেছে কলকাতায়। বদ্‌লি হয়ে এসেছে কলকাতার অফিসে প্রমোশন নিয়ে। তখন তার মাইনে বেড়েছে।

আর তার কয়েক বছর পরেই মেহের আলি সাহেবও কলকাতায় এসে পেঁছেছে। এসেই দেখা করেছে সোহমের সঙ্গে।

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করেছে—এ কী? মেহের আলি সাহেব, আপনি?

মেহের আলি সাহেব বলেছে—আমি চলে এলাম রায় সাহেব—

—কেন?

—এমনি!

সোহম্‌ তবু বুঝতে পারেনি। বলেছে—এমনি মানে? বোম্বাইএর চেয়ে কি কলকাতায় বেশি টাকা?

মেহের আলি বলেছে—জী হাঁ। বোম্বাইএর চেয়ে কলকাতায় বেশি টাকা।

—কী করে?

মেহের আলি বলেছে—এখানে পাতাল রেল বসাচ্ছে, এখানে সেকেণ্ড্‌ হুগলি ব্রিজ বানাচ্ছে, সারা ভারতের লোক জানে যে এখানকার মত ব্ল্যাক টাকা কাঁহি ভি নেহি হ্যায়—ইসি লিয়ে তো ইঁহা কে লোগ্‌ জ্যায়দা শেয়ার খরিদতে হ্যায় ঔর বেচতে হ্যায়, ঔর ইঁহা কে লোগ্‌ জ্যায়দা কামাতা ভি হ্যায়—

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করেছে—তা কী রকম বিজনেস হচ্ছে আপনার?

মেহের আলি বলেছে—ম্যয় ইঁহা বহোত রুপেয়া কামাতা হুঁ। আপ ভি শেয়ার খরিদিয়ে না রায় সাহাব? আপনিও কিছু শেয়ার কিনুন না রায় সাহেব!

সোহম্‌ তারপর মেহের আলি সাহেবকে দিয়ে আরো অনেক শেয়ার কিনেছিল। আর অনেক শেয়ার বেচেও ছিল। এই শেয়ার কেনা আর বেচার মধ্যে দিয়ে মেহের আলি সাহেবের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু তার পরেই হঠাৎ বিনা মেঘে একটা বজ্রপাত হলো।

আর সে এমন এক বজ্রপাত যা মেহের আলি সাহেব কিম্বা সোহম্‌ কেউই কল্পনা করতে পারেনি।

সে এক আজব ঘটনা।

মেহের আলি সাহেব সেবার বোম্বাইতে গিয়েছিল বোম্বাইএর বাসা খালি করে কলকাতায় ফ্যামিলি নিয়ে আসবে বলে। বোম্বাই যাবার আগে একটা চিঠিও দিয়েছিল বেগম সাহেবাকে। কিন্তু বেগম সাহেবার কাছ থেকে চিঠির কোনও জবাব না পাওয়ায় খুব ভাবনায় পড়েছিল। কী হলো? চিঠির কোনও জবাব আসছে না কেন? অথচ কলকাতায় মেহের আলি সাহেব একটা বাড়িও ভাড়া করে রেখেছিল। মেহের আলি সাহেবের নিজের আপন জন বলতে ছিল শুধু এক বেগম সাহেবা আর একমাত্র মেয়ে হাসনু। ইচ্ছে ছিল হাসনুকে কলকাতায় এনে স্কুলে ভর্তি করে দেবে। হাসনু লেখা-পড়া শিখবে, তারপর একটা ভালো পাত্র দেখে একদিন তার বিয়ে দেবে। বিয়েতে মেহের আলি সাহেব অনেক টাকা খরচ করবে। অনেক যৌতুক দেবে বরপক্ষকে। বরপক্ষ যত দহেজ চায় তত দহেজ দেবে। লাখ টাকা যদি চায় তো লাখ টাকাই দেবে। দেড় লাখ যদি চায় তাও দেবে মেহের আলি সাহেব। টাকার তো কম্‌তি নেই মেহের আলি সাহেবের। টাকা দিয়ে তো দুনিয়ার সব কিছু দৌলত কেনা যায়। সুতরাং টাকা দিয়েই মেহের আলি সাহেব সব কিছুই কিনতে চেয়েছিল।

কিন্তু বোম্বাইতে গিয়ে মেহের আলি সাহেব দেখলে সব খালি।

শুধু ঘর খালি নয়, তার জিন্দগীও খালি হয়ে গেল। একেবারে যাকে বলে তার জিন্দগী বরবাদ হয়ে গেল।

বাড়িওয়ালা সাহেব আদমী খুব ভালো।

বাড়িওয়ালা সাহেব বললে—আমি তো পহলে বুঝতে পারিনি মেহের আলি সাহেব! আমি ভেবেছি আপনি লোক পাঠিয়েছেন—কিন্তু এখন বুঝছি আপনি কিছুই জানেন না—

মেহের আলি সাহেব জিজ্ঞেস করলে—তারা কে?

বাড়িওয়ালা বললে—তা তো জানি না। শুনলাম আরব দেশ থেকে এসেছে—

—আরব দেশ? তার মতলোব?

—আরব দেশ মানে দুবাই, কি আবু-ধাবি, কি সৌদি আরব, কি কোয়ায়েত্‌—

এবার মেহের আলি সাহেব আতঙ্কে চম্‌কে উঠেছে! আরব দেশে তো শেখ সাহেবরা ইণ্ডিয়া থেকে অনেক আওরাৎ নিয়ে যায়। তবে কি তারা সবাই টাকার লোভে পড়ে আরবদের দেশে চলে গেছে? টাকাই কি সব চেয়ে বড় চিজ্‌?

তারপর ? তারপর সে অনেক কাণ্ড ! তারপর মেহের আলি সাহেব ব্যাঙ্কে যত টাকা ছিল তুলে নিলে। টাকা তুলে নিজের কাছে রেখে দিলে। তারপর বোম্বাই শহরে অনেক হুণ্ডিওয়ালা আছে তাদের কাছে গেল। তাদের বললে—ভাই সাহেব, আমি আরব দেশে যাবো, কিছু পেট্রো-ডলার দেবে ?

বোম্বাইতে এমন অনেক পার্টি আছে যারা ইণ্ডিয়ায় বসে ডলার পাইয়ে দেয়, বিদেশী ডলারের ব্যবসা করে। আমেরিকায় যেতে চাও তো সেখানকার ডলারও বোম্বাইতে বসেই পেয়ে যাবে। শুধু আমেরিকা নয়, তামাম দুনিয়ার যেখানেই যেতে চাও সব ব্যবস্থা তারাই করে দেবে। আর তারপর আছে পাসপোর্ট ভিসা। সে সব তো সামান্য ব্যাপার ! টাকা ফেললে সব পাওয়া যায় বোম্বাই শহরে। শুধু টাকা থাকাটাই আসল কথা ! তুমি টাকা ফেলো, তোমাকে আমি সব কিছু পাইয়ে দেব।

তারপর ? তারপর একদিন মেহের আলি সাহেব বোম্বাই ছেড়ে আরব দেশে পাড়ি দিলে। কতদিন সেখানে কাটালে কে জানে, বউ আর মেয়েকে খুঁজতে যেখানে যত জায়গা আছে সেখানেই ঘুরতে ঘুরতে হয়রান হয়ে গেল। যেখানেই যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই জিজ্ঞেস করে - এখানে হাসনু বলে কোনও ইণ্ডিয়ান মেয়ে আছে সাহাব ?

—কেন ? উও কোন্ হ্যায় ?

—হামারা লেড়কী, আর উনকি সাথ মেরা বিবি ভি আছে—উনকি নাম গুলশান—

সব জায়গাতেই একই জবাব। কোনও পাত্তা দিতে পারলে না কেউ।

মেহের আলি সাহেব শেষকালে পুলিসের থানায় গেল। তারাও কেউ কিছু সন্ধান দিতে পারলে না গুলশান আর হাসনুর। তারপর মেহের আলির সব টাকা একদিন ফুরিয়ে গেল দেখতে দেখতে। আর তারপর মেহের আলি সেখানে কী করবে ? খরচ চালাবে কী করে ? হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গেছে তখন।

সোহম্ একদিন তার অফিসের ঘরে বসে আছে এমন সময় মেহের আলি সাহেব এসে হাজির। তার চেহারা দেখে সোহম্ অবাক। ময়লা ছেঁড়া জামা !

জিজ্ঞেস করলে—এ কী মেহের আলি সাহেব ? এ আপনার কী চেহারা হয়েছে ? এতদিন কোথায় ছিলেন ?

মেহের আলি চেঁচিয়ে উঠলো—সব ঝুট্ হ্যায়—সব ঝুট্ হ্যায় রায় সাহাব ; সব ঝুট্ হ্যায়—

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—এ আপনি কী বলছেন মেহের আলি সাহেব ? কী বলছেন এসব ?

মেহের আলি আবার বললেন – হ্যাঁ, রায় সাহাব, সব ঝুট্ হ্যায়—

যতবার সোহম্ জিজ্ঞেস করে মেহের আলি সাহেবকে ব্যাপারটা কী, ততবারই সে ওই একই উত্তর দেয়—সব ঝুট্ হ্যায় রায় সাহাব, সব ঝুট্ হ্যায়—

সোহম্ বলে—কেন ? ইণ্ডিয়ান আয়রন ঝুট্ হ্যায় ? বিড়লা জুট্ও ঝুট্ হ্যায় ? ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম ? সব ঝুট্ হ্যায় ?

মেহের আলি বার বার ওই একই কথা বলে—বিল্‌কুল সব ঝুট্‌ হ্যায় রায় সাহাব, বিলকুল সব ঝুট্‌ হ্যায়—

তারপর ক্রমে ক্রমে সোহমের কানে খবরটা এল। বোম্বাই অফিসের লোকেরা এসে সব খবর বললে। বললে—তার বিবি গুলশান আর মেয়ে হাস্‌নু পালিয়ে যাবার পর থেকেই তার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছে।

একদিন মেহের আলি সাহেব সোহমের ঘরের ভেতরে এসে হাজির।

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে মেহের আলি সাহেব?

তার উত্তরে ওই একই কথা—সব ঝুট্‌ হ্যায়—সব ঝুট্‌ হ্যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন, বিড়লা জুট, ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম সব ঝুট্‌ হ্যায়—

তার পর থেকে সোহম্‌ তার চাপরাসীকে হুকুম দিয়ে দিয়েছিল, মেহের আলি সাহেব অফিসে এলে যেন তাকে তার ঘরে ঢুকতে না দেয়—

সেই মেহের আলি এত রাত্রে এই মাঠের মধ্যে কী করছে?

সোহম্‌ হাতের ঘড়িটা দেখলে—রাত দেড়টা বেজেছে। এতক্ষণ বোধ হয় আরো কয়েক পেগ্‌ হুইস্কি খেয়ে ইব্রাহিম একেবারে বেহুঁশ হয়ে গেছে। আরো কিছুক্ষণ ইব্রাহিম থাকুক সুমিত্রার কাছে—

হঠাৎ মেহের আলি তার গাড়ির সামনে—। আর একটু হলেই সে গাড়ি-চাপা পড়ে যেত।

সোহম্‌ গাড়িটায় ব্রেক করে দিলে। গাড়িটার ব্রেক না কষলে মেহের আলি সাহেব হয়তো চাপা পড়ে যেত।

—মেহের আলি সাহেব?

মেহের আলি হয়ত চিনতে পেরেছে সোহম্‌কে, কিম্বা হয়ত চিনতে পারেনি।

সোহম্‌ আবার চেঁচিয়ে উঠলো—মেহের আলি সাহেব, সরে যান—সরে যান—

মেহের আলি সাহেব চিৎকার করে উঠলো—তফাৎ যাও, সব ঝুট্‌ হ্যায়—সব ঝুট্‌ হ্যায়—

সোহম্‌ তার গাড়িটা ব্যাক্‌ করে নিয়ে, মেহের আলি সাহেবকে পাশ কাটিয়ে অন্য দিক দিয়ে আবার সামনে এগিয়ে চললো। না, মেহের আলি সাহেব ভুল বলেছে। সব ঝুট্‌ হ্যায় নয়, সব ঠিক হ্যায়—সব ঠিক হ্যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন ঝুট্‌ নেহি হ্যায়, বিড়লা জুট্‌ ঝুট্‌ নেহি হ্যায়, ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম ঝুট্‌ নেহি হ্যায়। সব ঠিক হ্যায়। সব ঠিক হ্যায়! যে লোক একদিন সব ঠিক হ্যায় বলে এসেছে, সে-ই আজ বিপাকে পড়েছে বলেই বলতে আরম্ভ করছে—সব ঝুট্‌ হ্যায়—

সোহম্‌ আবার গাড়ি নিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। এখন বাড়িতে তার কী হচ্ছে কে জানে? ইব্রাহিম কি আরো হুইস্কি খেয়েছে? ইব্রাহিম কি আরো মাতাল হয়েছে? ইব্রাহিম পকেটে তিরিশ হাজার টাকা পেয়েছে, সুমিত্রাকে পেয়েছে, আর কী চাইবে সে? টাকার সঙ্গে নারী, এ ছাড়া আর কিছু চাইবার নেই ইব্রাহিমের! এবার নিশ্চয়ই ইব্রাহিম স্ট্রাইকের নোটিশ তুলে নেবে।

তা যদি হয় তো মিস্টার সেন খুব খুশী হবে। তার সঙ্গে সোহমেরও মাইনে বাড়বে। শেষ পর্যন্ত হয়ত সোহম্ কোম্পানির ডাইরেক্টর হয়ে যাবে।

ঘড়িতে তখন রাত দুটোর সঙ্কেত!

এবার সোহম্ বাড়ি ফিরতে পারে নিশ্চিন্তে—

সোহম্ গাড়িটা নিয়ে বাড়ির দিকে চলতে লাগলো—

আজ এতদিন পরে রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে সেই সব দিনের কথা ভাবতে কেমন যেন রোমাঞ্চ লাগছিল তার। কীসের রোমাঞ্চ? আনন্দের, না বেদনার? আনন্দ আর বেদনা কি দুটো আলাদা জিনিস? আসলে ও দুটো তো একই। আনন্দের মধ্যেও কি বেদনা লুকিয়ে থাকে না? আবার বেদনার মধ্যেও কি আনন্দ লুকিয়ে থাকে না? তাই তো কতকাল আগে ক্ষেত্রবাবু একদিন ক্লাসে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিলেন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—আচ্ছা, তোমরা একটা কথার জবাব দাও তো! পৃথিবীতে সব চেয়ে দুঃখী মানুষ কে?

সোহম্‌রা সবাই প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ-প্রশ্নের কী যে জবাব হতে পারে তা সেদিন ক্লাসের কোনও ছেলেই বলতে পারেনি। সত্যিই তো, কী উত্তর দেবে তারা এ-প্রশ্নের? 'সুখী কে' জিজ্ঞেস করলে তবু তার উত্তর দেওয়া যায়। যে খুব টাকা উপায় করে তাকে সুখী বলা চলে। যে জীবনে নিজের উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট সিদ্ধ করেছে তাকেও সুখী বলা যায়। যে খুব ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী তাকেও সুখী বলতে রাজি আছি। সুখী মানুষের আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু দুঃখী? কাকে বলবো সব চেয়ে দুঃখী মানুষ?

ক্ষেত্রবাবু একে একে সকলকে প্রশ্নটা করলেন।

বললেন—অজিত, তুমি বলো?

অজিত বলতে পারলে না। শুধু অজিত নয়, ক্লাসের কেউই বলতে পারলে না। সাধন, নির্মল, ভবানী, অলক, তারাও কেউ বলতে পারলে না।

—সোহম্, তুমি? তুমি বলতে পারো?

সোহম্ বললে—যার অনেক টাকা সে-ই সুখী স্যার—

সেদিন কারোর উত্তরই ক্ষেত্রবাবুর পছন্দ হয়নি।

শেষকালে তিনি উত্তরটা বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—দেখ, আমাদের শাস্ত্রে আছে শিবের আর এক নাম নীলকণ্ঠ। সকলের দুঃখ-কষ্ট তিনি নিজে আত্মসাৎ করেছেন তাই তাঁর নাম নীলকণ্ঠ। কিন্তু শুধু তাই নয়, তাঁর কপালে স্বপ্নময় চন্দ্র আর মাথায়? মাথায় করুণাধারার মত জটা। তাঁর মাথা থেকেই আমাদের এই গঙ্গা সুদূর উত্তর থেকে দক্ষিণে এসে সারা দেশ করুণাধারায়

প্লাবিত করে স্নেহ-সিঞ্চিত করছে, শস্য-শ্যামল করছে, আমাদের পবিত্র করছে, পরিশুদ্ধ করছে—।

তারপর একটু থেমে আবার বলেছিলেন—সেই রকম আমাদের সমাজেও এমন দয়ালু এমন পরোপকারী মানুষ আছে যারা পরের কষ্ট পরের দুঃখ নিজের কষ্ট নিজের দুঃখ মনে করে নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে। সেই রকম একজন মানুষ ছিলেন সক্রেটিস, সেই রকম একজন মানুষ ছিলেন যীশুখৃষ্ট, সেই রকম একজন মানুষ ছিলেন তথাগত বুদ্ধদেব, সেই রকম একজন মানুষ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এঁরাই ছিলেন সব চেয়ে দুঃখী মানুষ!

আজ এই মাঝরাত্রে কলকাতার রাস্তায় তীরবেগে গাড়ি চালাতে চালাতে সেই সব দিনের কথা কেন মনে পড়ছে কে জানে! হয়ত এর কারণ আর কিছু নয়, কারণ এই তীব্র আঘাত। আঘাত তীব্র হলেই বোধ হয় মানুষ অতীত-চারণের মধ্যে শান্তি খোঁজে, মুক্তি খোঁজে। অথচ একদিন তো সে সারা মন-প্রাণ দিয়ে আর কিছুই চায়নি। কেবল দুই হাত ভরে চেয়েছিল অর্থ। অর্থাৎ টাকা।

যা চেয়েছিল তা তো সে পেয়েছিল!

হ্যাঁ, পেয়েছিল বই কি। অত্যন্ত বেশি পরিমাণেই সে পেয়েছিল। আর শুধু চাকরিতেই যে তার উন্নতি হয়েছিল তাই-ই নয়, লোকে যাকে বলে বৈভব, তা-ও সে পেয়েছিল।

কিন্তু কত বেশি পাওয়া হলে মানুষ খুশী হয়ে বলে—অনেক পাওয়া হয়েছে, এর চেয়ে আর বেশি পাওয়ার দরকার নেই? এই পাওয়ার পরিমাণের কি সীমা আছে? কেউ কি এর সীমা বেঁধে দিয়েছে?

তাই মানুষের পাওয়ার শেষ আছে কিনা তা কেউ জানে না, তবে চাওয়ার যে শেষ নেই তা সবাই জানে।

প্রথম প্রথম সোহমের মনে হতো—আর একটু মাইনে বাড়লেই সে খুশী হবে। তারপর শেষ পর্যন্ত সত্যিই তার মাইনে বাড়লো। তারপর থেকে কতবার তার প্রমোশন হয়েছে, কতবার তার মাইনে বেড়েছে, কতবার নানাভাবে কত উপরি টাকা সে পেয়েছে। সে-সমস্ত টাকার হিসেব তার অফিসের হিসেবের খাতায় লেখা আছে।

কিন্তু টাকার যে হিসেব অফিসের হিসেবের খাতায় লেখা নেই, সেই টাকাগুলো?

কখনও ইউনিয়নের নেতাদের ঘুষ দেওয়ার টাকা তো তার হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর আছে এন্টারটেনমেন্ট অ্যালাউয়েন্স-এর টাকা। অফিসের নানা কাজে কত লোককে হোটেলে-বারে-রেস্টুরেন্টে-বাড়িতে লাঞ্চ-ব্রেকফাস্ট-ডিনার-হুইস্কি খাইয়ে কার্য উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়েছে, তার হিসেব তো কোথাও কোনও কাগজপত্রে লেখা নেই। সেই টাকা অন্ধকারের কালোতে মিশে গিয়ে আরো কালো হয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

এত সত্ত্বেও কিন্তু সোহমের টাকার চাহিদা কখনও মেটেনি। আর বোধ হয় কারোর টাকার চাহিদা কিছুতেই মেটেও না।

আর ওই যে মেহের আলি সাহেব। মেহের আলি সাহেব যতবার টাকা এনে তার হাতে তুলে দিয়েছে ততবারই তার টাকার চাহিদা বেড়ে গিয়েছে।

সকালবেলা অফিসে যেতেই মিস্টার সেনের টেলিফোন এল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর মিস্টার রায়? ইজ্ এভ্রিথিং ও-কে.?

সোহম্ তখন সবে অফিসে এসেছে। সারারাত তার জেগে কেটেছে।

সে বললে হ্যাঁ স্যার, এভ্রিথিং ও কে.—

—ইব্রাহিম্ টাকা নিয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার, নেবে না কেন? অর্ধেক রাজত্বের সঙ্গে রাজকন্যা পেয়ে কে না খুশি হয়।—খুশি হয়েই টাকাটা নিয়েছে—

—আমি ঠিক সময়েই তোমায় টেলিফোন করেছিলুম তো?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, এক্জ্যাক্ট্লি ঠিক সময়ে—

—তারপর? তারপর কী করলে? তোমার মিসেসকে রেখে তুমি বেরিয়ে গেলে?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, আমি সারারাত গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালুম।

—সারারাত ঘুরে বেড়ালে?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ স্যার, হোল্ নাইট রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালুম।

—তারপর? তারপর কখন বাড়ি ফিরলে?

সোহম্ বললে—আজ ভোররাত্রে—

—বাড়ি ফিরে কী দেখলে? ইব্রাহিম তখনও বাড়িতে ছিল, না চলে গিয়েছিল?

—চলে গিয়েছিল।

মিস্টার সেন জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মিসেস কী বললেন?

—মিসেসের সঙ্গে, স্যার, আমার কথাই হয়নি—

—সে কী? কেন?

সোহম্ বললে—দেখা হলে তো তবে কথা হবে। আমি যখন শেষরাত্রে বাড়ি ফিরলুম আমার মিসেস তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে—

—কেন?

সোহম্ বললে—সারারাত তো ইব্রাহিমকে কম্প্যানি দিয়েছে, তার ওপর হুইস্কিটা হয়ত বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে—

—তারপর?

সোহম্ বললে—অবশ্য আমার মিসেসেরও কোনও দোষ নেই. আমিই সব ইন্স্ট্রাক্শন্ দিয়ে গিয়েছিলাম তাকে। বলে গিয়েছিলাম যে—তোমার ওপরেই আমাদের কোম্পানির অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রেস্টিজ নির্ভর করছে। আর শুধু প্রেস্টিজই নয়, প্রোডাকশন্ও নির্ভর করছে। আমার মিসেস কথা দিয়েছিল যে সে আমার কথা রাখবার জন্যে যা যা করা দরকার সব করবে। তারপরই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলুম—। আমি জানতুম দরকার হলে যত পেগ হুইস্কি

খেলে কাজ উম্ধার হবে তত পেগই খাবে—

মিস্টার সেন বললেন—সো মেনি থ্যাংকস্‌ টু মিসেস রায়। তুমি বলে দিও তোমার মিসেসকে যে কোম্পানি তোমার মিসেসের এই সেলফ্‌-স্যাক্রিফাইসের কথা কখনও ভুলবে না। এবারের ফ্রেশ্‌ বাজেটের সময় কোম্পানি উইল রিমেম্‌বার হার—

বলে একটু থেমে আবার বললেন এখন ইব্রাহিম স্ট্রাইক নোটিসটা উইথড্র করে নেয় কিনা এইটে দেখতে হবে—

সোহম্‌ বললে—তার জন্যে ভাববেন না স্যার। সে-সব খবর আমি ঠিক সময়ে নেব। এই স্ট্রাইক-নোটিসটা উইথড্র করতে গেলে আবার ওদের একটা লোক-দেখানো জেনারেল মিটিং ডাকতে হবে—

এরপর আর বেশি কথা হয়নি। যথাসময়ে জেনারেল মিটিং ডাকাও হয়েছিল। আর তাতে ইব্রাহিম বলেছিল—কম্‌রেড্‌স, আমি সব দিক ভেবেচিন্তে দেখেছি স্ট্রাইকের কল্‌ দিতে গেলে আমাদের আরো ভাবনা-চিন্তা করা দরকার। আমাদের মহান নেতা কার্ল মার্কসও তাঁর বইতে বলে গেছেন যে আমাদের মত বিরাট দেশে তাড়াতাড়ি কিছু ডিসিশন্‌ নেওয়া ঠিক নয়। ইণ্ডিয়ার বাইরের দেশের মধ্যে ক্যাপিট্যালিস্ট্‌ কাণ্ট্রিগুলোর কথাও ভাবতে হবে। ততক্ষণ তাদের মতামত পরীক্ষা না করে এই রকম মরণ-ঝাপ দেওয়া উচিত নয়—

এর পরে কী হলো কে জানে, শুধু এইটুকু জানা গেল যে ইব্রাহিম সেই তিরিশ হাজার কালো টাকার টোপ গিলেছে। স্ট্রাইকের নোটিসও তুলে নিয়েছে।

ঠিক এরই পরে মিস্টার সেন যে কথা দিয়েছিলেন তা রাখলেন। সোহমের আর এক দফা মাইনে এবং অ্যালাউয়েন্স বেড়ে গেল।

মিস্টার সেনের ঘরে সোহম্‌ যেতেই খবরটা জানা গেল।

মিস্টার সেন বোম্বাই হেড্‌-অফিস থেকে পাঠানো মিস্টার আয়েঙ্গারের চিঠিটা সোহম্‌কে দেখালেন।

মিস্টার সেন বললেন—এটা তোমার মিসেসের সেল্‌ফ্‌-স্যাক্রিফাইসের দাম—

সোহম্‌ বললে—মেনি থ্যাংকস্‌ স্যার—

টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন কোম্পানির সবাই জানলো মিস্টার রায়ের এই মাইনে বাড়ার পেছনে তাঁর সততা, তাঁর পরিশ্রম, তাঁর ইন্‌টিগ্রিটি, তাঁর সেবা, তাঁর ত্যাগ আর তাঁর অধ্যবসায়ই প্রধান। কিন্তু আর কেউ আসল কারণটা জানুক আর না-জানুক, ইব্রাহিম সবই জানতে পারলে। ইব্রাহিমের তাতে কোনও দুঃখ নেই। ইব্রাহিম জানতো—যুদ্ধে আর রাজনীতিতে অন্যায় বলে কোনও কথা নেই। ইব্রাহিম জানতো যে—Nothing is wrong in war and politics.

মিস্টার সেন একদিন বললেন—মিসেস রায় খুশি হয়েছেন তো মিস্টার রায়?

সোহম্‌ কী বলবে! তার মুখে তো কোনও বিরাগের ছাপও নেই। সুমিত্রা কতবার বাড়িতে, বাড়ির বাইরে সোহম্‌কে জিজ্ঞেস করেছে—তুমি তো কই জানতে চাইলে না সেদিন কী হলো?

সোহম্‌ যেন বুঝতে পারলে না এমনি ভাব মুখে নিয়ে বললে—কোন্‌ দিন?

—সেই যে যেদিন মিস্টার সেন তোমাকে রাত আটটার সময় বাড়ি থেকে টেলিফোন করে ডেকে নিয়ে গেলেন আর তোমাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ইব্রাহিম আলি সাহেব আমার কাছে বসে রইল আর গেলাসের পর গেলাস মদ খেতে লাগলো—

—ও ....

যেন একটা নতুন কোনও তুচ্ছ খবর শুনছে এমনি ভঙ্গিতে সোহম্ বললে—ও, এইবার মনে পড়েছে—

বলে আবার বললে—ও, এইবার মনে পড়েছে, মিস্টার সেনের বাড়ি থেকে আমি যখন বাড়িতে ফিরে এলুম তখন তো রাত ভোর হয়ে এসেছে। আমি তখন খুব টায়ার্ড, খুব ক্লান্ত। কারণ সারারাত জেগেছি কিনা! তা তুমি তো তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছ। বদ্যিনাথ আমাকে দরজা খুলে দিলে, আমি গাড়িটা গ্যারাজে রেখে যখন তোমার ঘরে এলুম তখন তুমি ঘুমোচ্ছ, তাই আর তোমাকে ডাকলুম না। বুঝলুম তোমারও সারারাত ঘুম হয়নি, আর তুমিও বোধ হয় ওই স্কাউণ্ড্রেলটার সঙ্গে সারারাত ড্রিংক করেছ। আমি তখনই তাড়াতাড়ি আবার অফিসে চলে গেলুম। অফিসেও তখন অনেকগুলো কাজ এরিয়ার পড়ে ছিল কি না!

সুমিত্রা বললে—তা পরে তো তোমার জানতে ইচ্ছে হওয়া উচিত কী হয়েছিল সেই রাত্রে—

সোহম্ হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে বললে—হ্যাঁ ভালো কথা, তুমি জানো সেই ব্যাপারের পর বোম্বের হেড্ অফিস থেকে একটা চিঠি লিখেছিলেন মিস্টার আয়েঙ্গার, প্রায় দেড় হাজার টাকার মত আমার মাইনে আর এ্যালাউন্স বেড়ে গেল—

—কিন্তু···

সোহম্ সুমিত্রার কথার মাঝখানেই বললে—হ্যাঁ ভালো কথা, আসল কথাটাই তোমায় বলা হয়নি। জানো, মিস্টার সেন তোমার খুব প্রশংসা করলেন—

—আমার প্রশংসা? কেন, হঠাৎ···

সোহম্ বললে—মিস্টার সেন বললেন, সো মেনি থ্যাংকস্ টু মিসেস রায়। কোম্পানি শ্যাল রিমেম্বার হার সেলফ-স্যাক্রিফাইস ফরএভার—

সোহমের মনে হলো কথাগুলো শুনে সুমিত্রার যতখানি খুশী হওয়ার কথা ততখানি খুশী যেন সে হলো না—

এর পর সোহম্ সুমিত্রাকে খুশী করার জন্যে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে আদর জানাবার আগ্রহ দেখালো। সুমিত্রাও তাতে যে অখুশী হয়েছে তার মুখের চেহারা দেখেও তা বোঝা গেল না।

সোহম্ সুমিত্রার মুখের কাছে মুখ এনে বললে—সুমিত্রা, তুমি কত সুন্দর···

সুমিত্রা হঠাৎ বলে উঠলো—আচ্ছা, একটা কথা বলবো?

সোহম্ বললে—বলো, কী কথা? বলো কী চাও তুমি? কত টাকা চাও?

সুমিত্রা বললে—টাকা চাই না, শুধু আমার একটা কথার জবাব দাও। দেবে? জবাব দেবে?

—শুধু একটা কথা কেন? দশটা বিশটা যত ইচ্ছে কথা বলো তুমি, আমি আজ তোমার সব কথার জবাব দেব, জানো তোমার জন্যেই আজ আমার প্রমোশন হয়েছে। মাইনে আর অ্যালাউয়েন্স্ মিলে আমার মাসে মাসে আরো দেড় হাজার টাকার ইন্‌কাম বেড়েছে—

সুমিত্রা বললে—কিন্তু আমার কথাটা তো তুমি বলতেই দিলে না—

—বলো বলো, তোমার কথাটা বলো—

সুমিত্রা বললে—বলতে পারো আর কত টাকা হলে তুমি খুশী হও?

কথাটা শুনে সোহমের যে-দুটো হাত দিয়ে সুমিত্রাকে জড়িয়ে ধরা ছিল তা একেবারে শিথিল হয়ে এল।

অনেকক্ষণ পরে তার মুখে কথা বেরোল। সোহম্ বললে—হঠাৎ এ-কথা বলছো কেন তুমি?

সুমিত্রা বললে—হঠাৎ নয়, আমার মাঝে মাঝে এ-কথা মনে আসে। এতদিন তোমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করিনি। তাই আজ বলছি—সত্যি তোমার আর কত টাকা হলে তুমি খুশী হও বলতে পারো?

সোহম্ সে-কথার জবাব দিতে পারলে না। চুপ করে রইল।

সুমিত্রা আবার বললে—সত্যিই বলো না গো, আরো কত টাকা হলে তুমি খুশী হও?

তবু সোহম্ চুপ।

সুমিত্রা আবার জিজ্ঞেস করলে—কই, আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে? চুপ করে রইলে কেন তুমি? দাও, জবাব দাও?

সোহম্ বললে—হঠাৎ এ-কথা তোমার মনে আজ উঠলো কেন?

সুমিত্রা বললে—না, তুমি তো আমার সব কথাই রেখেছ, আর আমিও তো এতদিন তোমার সব কথাই রেখে এসেছি। তুমি যা করতে বলেছ আমি তাই-ই করেছি। তোমার জন্যে তোমার চাকরিতে উন্নতির জন্যে তোমার সঙ্গে ক্লাবে-ক্লাবে গিয়ে যত পেগ মদ খেতে বলেছ আমি তত পেগ মদ খেয়েছি। তুমি ইব্রাহিম আলি সাহেবকে বাড়িতে এনে তার সঙ্গে আমাকে মদ খেতে বলেছ, তার সঙ্গে আমাকে রাত কাটাতে বলেছ, আমি হিন্দু মেয়ে হয়েও তোমার চাকরির খাতিরে তা করেছি। গেলাসের পর গেলাস বিষ গিলেছি। একদিন নয়, দুদিন নয়, তিনদিন নয়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিষ খেয়ে খেয়ে আমার বুক-গলা-পেট সমস্ত জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তবু তোমার মুখ চেয়ে আমি সব সহ্য করে এসেছি। কিন্তু বলতে পারো, আর কতদিন এই যন্ত্রণা সহ্য করবো? আর কত টাকা হলে তোমার টাকার নেশা কাটবে?

সোহমের মুখে তখনও কোনও জবাব নেই।

সুমিত্রা তখনও থামলে না, বললে—কই, কথা বলছো না কেন? জবাব দাও? তোমার টাকার নেশা কি কোনও দিন কাটবে না? এর চেয়ে তুমি যদি

বাজারের মেয়ের বাড়িতে রাত কাটাতে তো তাও আমার সহ্য হতো। কি এ কী, এ যে তার চেয়েও অধম! তোমার জন্যে কিনা আজ আমাকে সেই বাজারের মেয়ের বৃত্তিও করতে হচ্ছে? বলো তো, আমি আর কত নিচে নামবো তোমার জন্যে? আর কত নিচে একজন মেয়েমানুষ নামতে পারে?

সোহম্ কোনও জবাব দিচ্ছে না দেখে সুমিত্রা আরো কাছে এগিয়ে এল।

বললে—কই, জবাব দিচ্ছ না কেন আমার কথার? দাও, জবাব দাও—

সোহমের মুখ দিয়ে শেষ পর্যন্ত কথা বেরোল। বললে—আজকে তুমি কিনা এই কথা বলছো?

সুমিত্রা বললে—আমি বলবো না তো কে বলবে? তোমার নিজের চাকরির উন্নতির জন্যে আমার মত কে এত কষ্ট করেছে? কে এত ভুগেছে? কে এত দাম দিয়েছে? কে এমন করে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে? কে এত মদ খেয়েছে? বলো? বলো?

সোহম্ বললে—তার বদলে কি তুমি কিছুই পাওনি? এই যে তোমার এত গয়না, এই যে তোমার এই বাড়ি, গাড়ি, এই যে তোমার ফ্রিজ্, এ-সব কার আছে? ক'টা মেয়ের আছে? ক'টা বউয়ের আছে? ক'টা পরিবারের আছে? এই যে ক্লাবে যাই আমরা, কলকাতার ক'টা লোকের এই সৌভাগ্য হয়েছে? তোমার তো বাবা ছিল, সারাজীবন কেরানীর চাকরি করেই তিনি খতম্ হয়ে গেছেন, তিনিই কি সারাজীবন চাকরি করে এত সুখ পেয়েছিলেন? তিনি তোমার মাকে কি তোমাকে এত সুখে কখনও রাখতে পেরেছিলেন? আমি তোমাকে যত সুখে রেখেছি তিনি কি এমন সুখে রাখতে পেরেছিলেন তোমাকে? তোমার বাবার ক'টা বাড়ি ছিল? আর তোমার মা'রই বা ক'টা গয়না ছিল? বলো, আমার এই কথার জবাব দাও—

—তুমি আমার বাপ তুললে?

সোহম্ বললে—তুলবোই তো! কেন তুলবো না? তোমার বাবার চাইতে কি আমি বড়লোক নই? জানো আমি তোমার বাবার মত দশটা চাকর রাখতে পারি, জানো তোমার বাবার মত হাজারটা কেরানী আমার আন্ডারে চাকরি করে, আমার হুকুম তামিল করতে পারলে তারা ধন্য হয়ে যায়—

—কী? কী বললে? আমার বাবাকে তুমি চাকর বললে? তোমার এত বড় সাহস? টাকা হয়েছে বলে তোমার এত গর্ব? তোমার এত অহংকার? আচ্ছা, ঠিক আছে! তোমার টাকা হয়েছে বলে যদি তোমার এতই অহংকার, তাহলে এখুনি আমি তোমার বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি, দেখি তোমার টাকা কেমন করে তোমাকে বাঁচায়! আমাকে ভাঙিয়ে তুমি অনেক টাকা রোজগার করেছ,

কিন্তু আর এমন করে তুমি আমাকে এক্সপ্লয়েট করতে পারবে না—আমি এখনই চললুম—তোমার বাড়ি থেকে আমি এই এক-কাপড়েই চলে যাচ্ছি—

বলে সুমিত্রা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সোহম্ তাকে এক হাত দিয়ে ধরে ফেললে।

বললে—কোথায় যাচ্ছো ?

সুমিত্রা বললে—বলেছি তো কোথায় যাচ্ছি—

সোহম্ বললে—তুমি কি লোক হাসাতে চাও নাকি ? ভুলে যেও না, বাড়িতে বাবুর্চি-খানসামারাও আছে, তাদেরও কান আছে, তারাও সব শুনতে পাচ্ছে—

—শুনুক গে ! তারাও জানুক যে তাদের সাহেব মানুষ নয়, জানোয়ার ! তারা জানুক অনেক টাকা হলেই জানোয়ার কখনও মানুষ হয় না—ক্লাবে গিয়ে মদ খেলেও জানোয়ার জানোয়ারই থেকে যায়—

সোহম্ যেন একটু নরম হলো এবার। বললে কেন এত বাড়াবাড়ি করছো ?

সুমিত্রা কিন্তু সোহমের কথায় নরম হলো না। বললে—বাড়াবাড়ি করছি ? আমি বাড়াবাড়ি করছি ? আমি সত্যিই যদি বাড়াবাড়ি করতুম তাহলে তুমি কি এতদিন বেঁচে থাকতে পারতে ?

সোহম্ এবার অনুনয়ের সুরে কথা বললে। বললে—থাক্ না ও-সব পুরোন কথা ! কেন সে-সব পুরোন তেঁতুল ঘাঁটছো ? শোন, এবার এক পেগ্ হুইস্কি খাও, দেখবে মাথাটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

সুমিত্রা কেঁদে ফেললে। বললে—আমার মাথা ঠাণ্ডা হবে না গো,—আমার আর কোনও দিন মাথা ঠাণ্ডা হবে না—

সোহম্ সুমিত্রার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলে: টেনে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলো—মিছিমিছি তুমি নিজের মাথাটা গরম করে ফেললে। অথচ একটু ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারতে, সংসারে টাকাটা একেবারে ফ্যালনা জিনিস নয়। এই টাকা নিয়েই পৃথিবীর সমস্ত লোক মারামারি কাটাকাটি চালাচ্ছে ! টাকাটা যদি তুচ্ছ জিনিসই হতো, তাহলে কি ইণ্ডিয়ার সবাই দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে এত লাফালাফি করতো ? তুমিই বলো না দেশের মিনিস্টার হবার জন্যে কেন এত লোক লাখ লাখ টাকা খরচ করে ? মিনিস্টার হওয়ার জন্যে সকলের কেন এত লোভ ? টাকার জন্যেই তো ? অত কথা ছেড়ে দাও—এই যে ক্রিকেট খেলা, যারা ক্রিকেট খেলে তারা কি ভাবছো খেলার জন্যেই খেলে ? কোনও লেখাপড়া না শিখে ক্রিকেট খেলেও কোটিপতি হওয়া যায়। সেই কোটিপতি হওয়া যায় বলেই সবাই তো ওটা খেলে। ওঁ খেলায় যদি টাকা রোজগার না হতো তাহলে কি কেউ ক্রিকেট খেলতো ? আমরা যারা বোকা তারাই পাঁচশো ছ'শো টাকা দামের টিকিট কিনে খেলা দেখতে যাই। সবই টাকার খেলা, বুঝলে ! পৃথিবীর সেদিকে তাকাও সেদিকেই কেবল টাকার খেলা। ওই পলিটিক্সও যা ওই খেলাও তাই। সব কিছুই টাকার জন্যে—

সুমিত্রা যেন ততক্ষণে একটু নরম হয়েছে বলে মনে হলো।

সোহম্ বলতে লাগলো—মানুষ তো শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাকেই সুখ

বলে মনে করে না, খাওয়া-পরা ছাড়াও তার আরো অনেক জিনিস চাই। সেই আরও অনেক জিনিসটা হচ্ছে বিলাসিতা। কিন্তু বিলাসিতার তো শেষ নেই পৃথিবীতে। প্রথমে চাই তার বাড়ি। আর সে এমন একটা বাড়ি তার চাই যা দেখে সবাই চমকে উঠবে। যা দেখে লোকের হিংসে হবে। তারপরে আছে গাড়ি। আর সে এমন একটা গাড়ি চাই যা কারোর নেই। এই রকম করে দিনে দিনে অনেক বিলাসিতার জিনিস বাজারে বেরোচ্ছে, যার প্রত্যেকটা সকলের পাওয়া চাই-ই চাই। আর সেটা না পেলেই তুমি হেরে গেলে—কিন্তু সুমিত্রা, সংসারে কেউই তো হারতে চায় না—

সোহম্ আস্তে আস্তে একটা হুইস্কির বোতল বার করলে। তারপর দুটো গেলাসে তা ঢাললে। তারপর খানিকটা জল মেশালে। একটা গেলাস সুমিত্রাকে দিয়ে বললে—নাও, নাও, লক্ষ্মী মেয়ের মত এটা খেয়ে নাও—

সুমিত্রা গেলাসটায় চুমুক দিলে।

সোহম্‌ও নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলতে লাগলো—এই দেখ না, আমাদের বাড়িটা এবারে এয়ার-কণ্ডিশন করে নেব ভাবছি। তা না হলে আর মান-সম্মান থাকছে না। রামা-শ্যামা-যদু-মধুরাও আজকাল এয়ার-কণ্ডিশণ্ড ঘরে থাকছে। এতেও তো অনেক টাকা দরকার। আর ধরো আমাদের গাড়িটা। এটাও এয়ার-কণ্ডিশণ্ড কার হলে ভালো হয়। তাতেও তো টাকা লাগবে। ফ্রিজ্, রেডিও, ফোন ও-সব তো আছেই। রেকর্ড-চেঞ্জার, টেপ্‌রেকর্ডারও আছে। কিন্তু এখনও কতো জিনিসই কেনা হয়নি। সেগুলোও কেনা দরকার। সেটাও তো পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকার ব্যাপার। তুমি বলেছিলে আর কত টাকা আমার চাই। এখন তোমায় হিসেবটা দিলুম। আর আবার কবে কী একটা নতুন জিনিস বাজারে বেরোবে তা কেউ বলতে পারে না। সেটা যদি তখন কেনবার মতন পয়সা আমার না থাকে তাহলে তো সবাই আমাদের গরীব বলবে। সেটা তো অপমান। সেই তখনকার কথাটা ভেবেই তো এখন থেকে টাকা জমাচ্ছি। আর তা ছাড়া অসুখ-বিসুখ তো আছেই। অসুখ-বিসুখ হলে তো সাধারণ লোকের মত আমরা হাসপাতালে গিয়ে মরতে পারি না। তাতে ইজ্জৎ চলে যাবে। তাই টাকা থাকলেই তো তবে নার্সিং- হোমে গিয়ে থাকতে পারবো! আবার নার্সিং-হোমেরও তো আবার ক্লাসিফিকেশন্ আছে। যেটা বেশী দামী নার্সিং-হোম তাতে না গেলে তো আমাদের ইজ্জৎ চলে যাবে—

কথা বলছিল সোহম্ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হুইস্কির বোতলটাও আস্তে আস্তে খালি হয়ে যাচ্ছিল। খালি যে হয়ে যাচ্ছিল সেদিকে কারো নজর ছিল না। নেশা যে কত তীব্র হতে পারে তারও খেয়াল ছিল না দুজনের।

একসময়ে সুমিত্রা বললে—আর একটু দাও না আমার গেলাসে—

সোহম্ বললে—না, আর দেব না।

—কেন দেবে না? দাও, আর একটু দাও না গো—

সোহম্ বললে—না. আমিও আর খাবো না, তোমাকেও আর দেব না—

সুমিত্রা বললে—কেন দেবে না, আমি কী দোষ করেছি ?

সোহম্ বললে—তোমার নেশা হয়ে গেছে—

সুমিত্রা বললে—নেশা করাটাও কি দোষ হয়ে গেল ? নেশা করবার জন্যেই তো ওটা খাওয়া !

সোহম্ বললে—তা হোক, এটা আমাদের বাড়ি, এটা আমাদের ক্লাব নয়। বাড়িতে বাবুর্চি-খানসামা আছে, তারা কী ভাববে ? পরে ক্লাবে গিয়ে যা ইচ্ছে তাই কোর—

সুমিত্রা বললে—না, বোতলটা দাও—

—না, তুমি মাতাল হয়ে গেছ। আর তোমাকে খেতে দেব না—

সুমিত্রা খিল্-খিল্ করে হাসতে লাগলো। বললে—তুমি আমাকে হাসালে দেখছি—সত্যিই তুমি আমাকে হাসালে···

সোহম্ বললে—মাতাল হলে কি কাণ্ডজ্ঞানও হারাতে হয় ? তুমি নিজেই জানো না, তুমি কী বলছো ! আমিও তো মাতাল হয়েছি, কিন্তু তোমার মত তো কাণ্ডজ্ঞান হারাইনি—

সুমিত্রা বললে—তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা ? তুমি পুরুষ মানুষ আর আমি তো একজন গরীবের মেয়ে ! তুমি কত বড়লোক বলো তো ? তোমার কত টাকা !

সোহম্ বললে—তা আমার টাকা কি তোমার টাকা নয় ? তুমি আর আমি কি আলাদা ?

সুমিত্রা বললে—আলাদা নয় ? আলাদাই তো ! তুমি টাকা রোজগার করো আর আমি সেই রোজগার করা টাকায় খাই। তোমার বাড়ি, তোমার টাকা, তোমার গাড়ি, তোমার ফ্রিজ, তোমার সব কিছু। আমিও তেমনি তোমার। আমিও তেমনি তোমার আর একটা ফার্নিচার—

সোহম্ বললে—ও-কথা বলছো কেন ? তুমি আমার ফার্নিচার ?

সুমিত্রা বলে উঠলো—ওই দেখ ! অমনি রাগ করলে ! সত্যি কথা বললুম কিনা তাই অমনি তোমার রাগ হয়ে গেল—এতে তোমার রাগ করবার কী আছে ?

—তা বাজে কথা বললে রাগ হবে না ?

সুমিত্রা বললে—বাজে কথা ? কী বললে ? বাজে কথা ?

বলে আবার খিল্-খিল্ করে হাসতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে, তারপর বললে —বাজে কথা কেন হবে ? এর চেয়ে বড় সত্যি কথা তো আমি আর জানি না গো ! আমি ছিলুম বলেই তো তোমার এত টাকা হলো, এত বড় বাড়ি হলো, চাকরিতে তোমার এত প্রমোশন হলো। আমি যদি আরো অনেক দিন বাঁচি তাহলে তোমার আরও অনেক টাকা হবে, আরও অনেক প্রমোশন হবে, আমি যদি তোমার ফার্নিচার না হই তো ফার্নিচার আর কাকে বলে ?

তারপর হঠাৎ যেন অসুরের শক্তি এসে ঢুকলো সুমিত্রার শরীরে। সে হুইস্কির বোতলটা টেনে নিয়ে মুখের ভেতরে ঢালতে গেল। কিন্তু সোহম্ দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেটা সুমিত্রার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে—

সুমিত্রা এবার বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। বললে—দাও, দাও বোতল—

সোহম্ বললে—না, দেব না—

সুমিত্রা বললে—তুমি যদি বোতল না দাও তাহলে আমি কী করবো?

—কী আবার করবে, সব বাড়ির বউরা বাড়িতে বসে যা করে তুমিও তাই করবে! খাবে শোবে রেডিও শুনবে সিনেমা থিয়েটার দেখবে, গল্প করবে—

—গল্প? গল্প কার সঙ্গে করবো?

সোহম্ বললে—গল্প করবার লোক না থাকে তো গল্পের বই পড়বে। আমি দোকান থেকে গল্পের বই কিনে এনে দেব, তুমি তাই পড়বে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। আজকাল মোটা মোটা বই তো তোমার মত অকর্মণ্য বউদের জন্যেই লেখা হচ্ছে—

—না, তুমি আমার জন্যে একজন গল্প করবার লোক এনে দাও। দিনের বেলা আমার সময় মোটে কাটতেই চায় না। তুমি আমার মা'কে কেন কাশী পাঠিয়ে দিলে? তুমি তো বেশ দিনের বেলা অফিসে কাজের মধ্যে ডুবে থাকো, কিন্তু আমি? আমার কী করে সময় কাটে বলো তো? বাড়িতে একটা ছোট বাচ্ছা থাকলেও না-হয় তাকে নিয়ে পুতুল-পুতুল খেলতুম···

সোহম্ বললে—ঠিক আছে, কালকে অফিস থেকে ফেরবার সময় তোমার জন্যে না-হয় অনেকগুলো পুতুল কিনে নিয়ে আসবো'খন—

—দূর, তুমি একটা আস্ত বোকা, তুমি কিচ্ছু বোঝো না। জ্যান্ত পুতুল গো, জ্যান্ত পুতুল—আমি বেশ তার সঙ্গে সারাদিন খেলা করতুম—

সোহম্ সুমিত্রার আরো কাছে এগিয়ে গেল। তাকে আদর করতে করতে বললে—আবার তোমার সেই পুরোন পাগলামি শুরু হলো। আমি তোমাকে তো বলেইছি, এখন ও-সব ঝঞ্ঝাট আমাদের দরকার নেই। ও-সব হলেই তো তোমার শরীর বুড়িয়ে যাবে, তখন আর তোমার শরীর এমন আঁট-সাট থাকবে না। আগে আরো কিছু টাকা আমি কামিয়ে নিই, তখন ওসব নিয়ে ভাববো। তবু তোমার ওই এক কথা বরাবর! ততদিনে চাকরিতে আরো পাকা হয়ে বসতে দাও না—

সুমিত্রা বললে—তাহলে বোতলটা আর একবার আমাকে দাও, আমি আর একটু খাই—

সোহম্ বললে—কী আশ্চর্য, হঠাৎ তোমার এত খাবার ইচ্ছে হলো কেন বলো তো?

সুমিত্রা বললে—ওগো, তোমার পায়ে পড়ছি, আমি আর পারছি না, আর আমি সহ্য করতে পারছি না—ওটা না খেতে পেলে আমি মরে যাবো, আমাকে একটু দাও, প্লিজ্, আমাকে আর একটু দাও—

বলে বোতলটা কেড়ে নিতে গেল, কিন্তু সোহম্ সঙ্গে সঙ্গে সেটা টেনে নিলে। কিন্তু টেনে নিতে গিয়েও বোতলটা হাত থেকে মেঝের ওপর পড়ে গেল। আর মেঝের ওপর পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ঝন্ ঝন্ শব্দ করে চুরমার হয়ে কাচের টুকরোগুলো চারদিকে ছড়িয়ে গেল। কাচের টুকরো আর তরল হুইস্কি সব মিশে একাকার হয়ে ঘরময় এক বীভৎস নরক-কুণ্ডের সৃষ্টি করে তবে ক্ষান্ত হলো।

সোহম্ চিৎকার করে ডাকলে—বৈদ্যনাথ—

কিন্তু ডাকবার আগেই যে এসে হাজির হলো সে বদ্যিনাথ নয়, সুমিত্রার মা। সুমিত্রার মা ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেছে। বললে—এ কী রে, এসব কী? এ কিসের গন্ধ ঘরের ভেতর?

সুমিত্রাও চিৎকার করে উঠলো। বললে—মা, তুমি?

মা বললে—এসব কী রে সুমি? ঘরে তোদের এত কাচ ভাঙা কেন? গন্ধ কিসের?

সুমিত্রা বললে—ও মদের গন্ধ মা, মদের গন্ধ—

—মদের গন্ধ? মদের গন্ধ কোথা থেকে শোবার ঘরের মধ্যে এল? কে মদ খায়?

সুমিত্রা মাকে জড়িয়ে ধরে বললে—আমি মা আমি, আমি মদ খাই—

—সে কী রে? তুই মদ খাস?

—হ্যাঁ মা হ্যাঁ, আমি মদ খাই—

বলে মা'র বুকের ওপর মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগলো। মেয়ের কান্নায় মা আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—তুই মদ খাস? কেন রে? তুই কোন্ দুঃখে ওই ছাই-পাঁশগুলো খাস? কে তোকে মদ খেতে বলেছে? ডাক্তার?

সুমিত্রা বললে—না মা, ডাক্তার বলেনি, বলেছে তোমার ওই জামাই—

সুমিত্রার মা সোহম্-এর দিকে চেয়ে বললে—সে কী? তুমি সুমিকে মদ খেতে বলেছ?

সোহম্ সে-কথার কোনও জবাব দিলে না। বললে—আপনি হঠাৎ কাশী থেকে চলে এলেন কেন?

সুমিত্রা মা'র হয়ে জবাব দিলে—বেশ করেছে মা এসেছে—তাতে তোমার কী?

সোহম্ সে-কথায় কান না দিয়ে সুমিত্রার মাকে বললে—আমি তো আপনাকে মাসে মাসে নিয়ম করে টাকা পাঠাই, সে-টাকা আপনি পান না?

সুমিত্রার মা বললে—হ্যাঁ বাবা, ঠিক নিয়ম করেই পাই—

সোহম্ বললে—আমার ব্যাঙ্ককে বলা আছে তারা যেন ঠিক নিয়ম করে আপনাকে মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দেয়। তারপরেও কেন আপনি হঠাৎ না বলে-কয়ে চলে এলেন?

সুমিত্রার মা বললে—তা বাবা মাঝে মাঝে তোমাদের দেখতেও তো আমার ইচ্ছে করে। হাজার হলেও আমার নিজের পেটেরই তো মেয়ে, তার জন্যে মায়ের প্রাণ কাঁদবে না? তুমি বলছো কী?

সোহম্ বললে—তা সেখান থেকে মেয়েকে চিঠি লিখলেই পারতেন। তা হলেই জানতে পারতেন মেয়ে-জামাই কেমন আছে! মিছিমিছি টাকা-পয়সা নষ্ট করে আপনার কলকাতায় আসবার কী দরকার ছিল?

সুমিত্রার মা বললে—তা চিঠিতে কি আর প্রাণ ভরে বাবা? তুমি যখন আবার মেয়ের বাবা হবে তখন বুঝবে সন্তানের জন্যে বাপ-মায়ের মনে কী জ্বালা হয়—

কথার মাঝখানে সুমিত্রা মা'র বুক থেকে মাথা তুলে বললে—মা, তোমার কষ্ট তোমার জামাই বুঝবে না, বুঝতে চাইবেও না—

—কেন মা ? কেন তুই ও-কথা বলছিস ?

সুমিত্রা বললে—না মা, আমি ঠিকই বলছি, তোমার নাতি-নাতনী হোক এটা তোমার জামাই চায় না—

—সে কী রে ? কেন চায় না ? চায় না কেন ?

সুমিত্রা বললে—সে তুমি বুঝবে না মা, সে তুমি বুঝবে না। তোমার নাতি-নাতনী হলে তোমার জামাইয়ের চাকরিতে উন্নতি হবে না—

—তার মানে ?

সোহম্ বলে উঠলো—কী বলছো তুমি যা-তা ?

সুমিত্রা বললে—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।

—কী ঠিক বলছো ?

সুমিত্রা বললে—হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। তোমার চাকরির উন্নতির জন্যে তুমি আমাকে ভাড়া খাটাচ্ছো না ? তুমি আমাকে মদ খেতে বলছো না ? তোমার চাকরির উন্নতির জন্যে বাইরের লোককে তুমি রাত্তিরে আমার শোবার ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছ না ? ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টকে আমার ঘরে···

সোহম্ চিৎকার করে উঠলো—থামো !

সুমিত্রাও সমান তালে আরো জোর গলায় চিৎকার করে বললে—কেন থামবো ? তোমার ভয়ে ? তুমি কি মনে করেছ তোমায় আমি ভয় করবো ? তোমায় বিয়ে করেছি বলে আমি চিরকাল তোমার হুকুম মেনে চলবো ? আমি চিরকাল তোমার চাকর হয়ে থাকবো ? তুমি আমাকে বাজারের মেয়েমানুষের মত ব্যবহার করবে আর আমি তাই মুখ বুঝে সহ্য করবো ? আমার নিজের একটা ইজ্জৎ নেই ? আমার নিজের একটা মনুষ্যত্ব নেই ? তুমি কী মনে করেছ কী, আমি একটা গাছ, না একটা পাথর···

সুমিত্রার মা মেয়ে-জামাইয়ের কথা শুনে এতক্ষণ হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এবার তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল। সোহম্‌কে জিজ্ঞেস করলে—এসব কী শুনছি বাবা ? এসব কি সত্যি ?

সোহম্ বললে—না, মা, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না। ও মাতাল—

সুমিত্রা ফোঁস শব্দ করে ফণা তুলে দাঁড়ালো। বললে—মাতাল ? আমি মাতাল ? তুমি আমাকে মাতাল বলছো ? আমি যদি মাতালই হই তো কে আমাকে মাতাল করেছে, বলো ? বলো কে আমাকে মাতাল করেছে ? বলো, তোমাকে বলতেই হবে কে আমাকে মাতাল করেছে ?

সোহম্ বললে – চুপ করো !

—কেন চুপ করবো ? চুপ করবো কেন ? আমার কথার জবাব দাও। জবাব না দিলে আজ আমি তোমায় ছাড়বো না—বলো ? জবাব দাও—

সোহম্ বললে—আমি মাতালের কথার জবাব দিই না—

—শুনলে তো মা, শুনলে তো ? তোমার জামাইয়ের কথা তুমি নিজের কানেই শুনলে তো ? তুমি দেখে যাও কী মানুষের সঙ্গেই তুমি আমার বিয়ে দিয়েছ।—

তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লো আবার। মা'র বুকে মাথা রেখে সুমিত্রা বলতে লাগলো—আমি আর এখানে থাকবো না মা, আর একদণ্ডও এখানে আমি থাকবো না, তুমি আমাকে এই নরক থেকে সরিয়ে তোমার কাছে নিয়ে যাও। এখানে থাকলে আমি মরে যাবো। এখানে থাকলে আমি বাঁচবো না—

মা সুমিত্রাকে শান্ত করবার জন্য তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে—চুপ কর মা, চুপ কর—

তারপর সোহম্-এর দিকে চেয়ে বললে—শোন বাবা, আমি অনেক সাধ করে সুমির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম তোমার মত স্বামী পেয়ে আমার মেয়ে সুখী হবে। কিন্তু আর নয় বাবা, আমি আমার মেয়েকে আর তোমার কাছে রাখবো না। আমার অনেক শিক্ষা হয়ে গেছে। ও ঠিকই বলেছে এখানে থাকলে ও মারা যাবে। আমি মা হয়ে তা দেখতে পারবো না। আমি আমার মেয়েকে আজই এখান থেকে কাশী নিয়ে যাবো। তুমি আমাদের টাকা পাঠাও আর না-পাঠাও, তাতে আমার কিছু আসবে যাবে না। টাকা পাঠাও ভালো, আর না-পাঠাও তাতেও আমার কোনও ক্ষতি নেই। কাশীর গঙ্গার ঘাটে কত মেয়েমানুষ ভিক্ষে করে পেট চালায়। আমরা না হয় মায়ে-ঝিয়ে সেই ভিক্ষে করেই পেট চালাবো, ভাববো আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে, ভাববো আমার জামাই মারা গিয়েছে—তুমি শুধু একটা কাজ করো, তোমার চাকরকে বলো আমার তোরঙ্গটাকে যেন একটা ট্যাক্সিতে তুলে দেয় সে—

সোহম্ গম্ভীর গলায় বললে—না, আমি সুমিত্রাকে যেতে দেব না—

সুমিত্রার মা বললে—কেন বাবা, ও তো নিজের মুখেই বলেছে ও আর এখানে থাকবে না—

সোহম্ বললে—ও বলুক, মাতালে অনেক কিছুই বলে! মাতালের কথার কোনও দাম নেই! ওর কথায় কান দেবেন না আপনি। আপনার চলে যেতে ইচ্ছে হয় আপনি একলা চলে যান—সুমিত্রা এখানে থাকবে!

সুমিত্রা হঠাৎ কথার মাঝখানে বললে—না, আমি থাকবো না এখানে। মা, আমি তোমার সঙ্গেই যাবো। তুমি আমাকে এখানে একলা ফেলে যেও না মা—

সোহম্ চিৎকার করে বলে উঠলো—না, যাবে না তুমি, যেতে পারবে না—

সুমিত্রা বললে—এ কি তোমার হুকুম?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, আমার হুকুম—

সুমিত্রা বললে—তোমার হুকুম তুমি তোমার অফিসের কেরানীদের কাছে ফলাও গিয়ে, আমার ওপর ফলাতে এসো না।

সোহম্ বললে—তাহলে তুমি আমার কথা শুনবে না?

—কেন শুনবো? তুমি কি কখনও আমার কথা শুনেছ? এতদিন তুমি যা করতে বলে এসেছো আমি তো তাই-ই করেছি। তুমি যার সঙ্গে মদ খেতে বলেছ আমি তার সঙ্গেই মদ খেয়েছি। মদ খেতে গিয়ে আমার বুক যত জ্বলে গেছে, তোমার মুখ চেয়ে আমি মুখে তত হাসি এনেছি। কিন্তু তার দাম কি তুমি দিয়েছ?

—কী তোমাকে দিইনি তাই তুমি আমাকে আগে বলো ? আমি তোমাকে বাড়ি দিয়েছি, গাড়ি দিয়েছি, গয়না দিয়েছি, শাড়ি দিয়েছি। তবু তুমি বলছো আমি তোমাকে কিছু দিইনি ? তুমি তোমার মা'র সামনে আমার নামে এই দোষ দিতে পারলে ?

সুমিত্রা বললে— যা কিছু তুমি দিয়েছ সে-সব তো তোমার চাকরিতে উন্নতি হবে বলে ! আমাকে তুমি কী দিয়েছ বলো ? শুধু আমার ভালোর জন্যে আমাকে তুমি কী দিয়েছ শুনি ?

সোহম্ বললে—লোকে বউকে আর কী দেয় ?

সুমিত্রা বললে—এবার আমি বলবো ? বলবো তুমি আমায় কী দিয়েছ ?

—বলো !

সুমিত্রা বললে—তুমি আমার মাথার সিঁথিতে এক সিঁদুর ছাড়া আর কিছুই দাওনি, যা আমি আমার নিজের বলে মনে করতে পারি—

—সেটা কি বড় দেওয়া নয় ?

সুমিত্রা এবার আরো জোরে চিৎকার করে উঠলো। বললে—তা মাথার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছ বলে তুমি কি আমার মাথা একেবারে কিনে নিয়েছ বলতে চাও—

সোহমেরও রাগ হয়ে গিয়েছিল সুমিত্রার কথায়। বললে—হ্যাঁ, কিনে তো নিয়েছিই, এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই করো—

সুমিত্রা নিজের গলাটা আরো চড়িয়ে দিয়ে বললে—স্কাউন্ড্রেল আর কাকে বলে—

—কী বললে ? আবার বলো ?

—হ্যাঁ, বলেছি স্কাউন্ড্রেল। বেশ করেছি বলেছি। আবার বলবো স্কাউন্ড্রেল —কী করবে তুমি ? আমি কি তোমাকে ভয় করি ?

সোহম্ সামনের দিকে এগিয়ে এসে সুমিত্রার গালে জোরে এক চড় মারলে ! বললে—মাতাল হলে আর তোমার জ্ঞান থাকে না দেখছি···

সুমিত্রার মা'র গলা থেকে একটা বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। বললে— তুমি আমার মেয়ের গায়ে হাত তুললে ? তুমি···তোমার এত বড় আস্পর্দা···

কিন্তু বাকি শব্দগুলো আর মুখ থেকে বেরোল না তার। তার আগেই সুমিত্রার মা সেই ভাঙা কাচের টুকরো আর হুইস্কির পেছলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর সেই দৃশ্য দেখে সোহম্ আর সুমিত্রা দুজনেই কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর একটু সম্বিৎ ফিরতেই সুমিত্রা মায়ের মুখের কাছে নিজের মুখ নামিয়ে নিয়ে ডাকতে লাগলো—ও মা, মা—মা—মা—কথা বলো—

কিন্তু ততক্ষণে বোধ করি সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

তবু আশা ছাড়লে না সুমিত্রা। আবার মা'র মুখের কাছে নিজের মুখ নিয়ে গিয়ে জোরে জোরে ডাকতে লাগলো—মা, মা, ও মা, মা, ও মা···কথা বলো মা, কথা বলো—

কিন্তু সুমিত্রার মা বোধ করি তখন এত দূরে পৌঁছে গেছে যে যেখানে গেলে এই পৃথিবীর হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, মিলন-বিরহ কোনও কিছুর আবেদন-নিবেদনই কানে পৌঁছোয় না।

তবু সুমিত্রা বার বার গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগলো—মা—মা—ও মা, মা—ও মা—কথা বলো—কথা বলো—

তাতেও যখন মা'র তরফ থেকে কোনও সাড়া পাওয়ার সংকেত পাওয়া গেল না, তখন সুমিত্রা বাঘিনীর মত সোহমের গলার নেক্‌টাইটা ধরে টানতে টানতে বলতে লাগলো—তুমি আমার মাকে খুন করলে? দাও, মাকে বাঁচিয়ে দাও তুমি, বাঁচিয়ে দাও তুমি আমার মাকে, বাঁচিয়ে দাও, এখ্‌খুনি বাঁচিয়ে দাও—দাও বাঁচিয়ে,—স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার, তুমি আমার মাকে খুন করলে…

বলতে বলতে সোহমের বুকের মধ্যে মাথা রেখে সুমিত্রা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। সে কান্না যেন আর থামতেই চায় না তার…

এ-সব বহুদিন আগের ঘটনা। এর আগে পরে সোহমের জীবনে কত রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু তাতে সে আজকের মত এমন করে বিচলিত হয়নি। সোহম্‌ জানতো যে জন্ম থাকলেই মৃত্যু থাকবে। জানতো মিলন থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদও থাকবে। তেমনি হাসি থাকলেই কান্না থাকবে, সুখ থাকলেই দুঃখ থাকবে।

কিন্তু টাকা?

সোহম্‌ জানতো টাকা থাকলে আর কিছু না থাকলেও চলে। টাকা হলো লক্ষ্মী। সরস্বতী না থাকুক ক্ষতি নেই, লক্ষ্মী একলা থাকলেই যথেষ্ট! তাই টাকার পেছনেই সে সারা জীবন দৌড়িয়েছে। টাকাকেই সোহম্‌ তাই একমাত্র জেনে এসে তাকে আরাধ্য দেবী বলে ভেবেছে। তাই ভানুভাই প্যাটেলকে খাতির করবার ভার যখন পেলে তখন যে-কোনও উপায়ে তাকে তুষ্ট করবার জন্যে সেই ক্লাবের মেম্বার হয়ে গেল। ভানুভাই প্যাটেলও সেই একই ক্লাবের মেম্বার। আর মিস্‌ সুরিটা ভানুভাই প্যাটেলের পি-এ বলে তাকে খুশী করতে চাইলে।

সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ভানুভাই প্যাটেল একদিন সত্যি-সত্যিই ইণ্ডিয়াতে এসে হাজির হলো।

প্রথমে সোহম্‌ যেদিন সুমিত্রাকে নিয়ে ক্লাবে গেল সেদিন তার মনে খুবই ভয় হয়েছিল। ভয় অন্য কারণে নয়, ভয় হয়েছিল এই ভেবে যে মানুষটা কেমন হবে। মানুষটা যদি একটু স্ত্রীলোক-ভক্ত হয় তাহলে কোনও ভয় নেই। সে তাহলে সুমিত্রাকে দিয়ে তার চাকরিতে উন্নতি করবার পথ সুগম করে নিতে পারবে! কিন্তু যদি তা না হয়?

সংসারে এক-একজন মানুষ এক-এক স্বভাবের হয়। কেউ খাদ্য-বিলাসী, কেউ পোশাক-বিলাসী, কেউ সাহিত্য-বিলাসী, কেউ সঙ্গীত-বিলাসী—আবার কেউ বা নারী-বিলাসী। নারী-বিলাসী বা অর্থ-বিলাসী হলে তাকে বশে আনা সহজ ব্যাপার। তাকে নিজের বশে আনা সোহম্-এর পক্ষে খুবই সোজা। অর্থটা তো দেবে কোম্পানি। কোম্পানি টাকা নিয়ে মাথা ঘামায় না, মাথা ঘামায় প্রফিট নিয়ে। সেই প্রফিট যদি থাকে তো তুমি যা কিছু খরচ করো আমি তা স্যাংশন করে দেব। তা স্যাংশন্ করতে আমার আপত্তি কীসের ?

সোহম্ বললে—তুমি পারবে তো ঠিক সুমিত্রা ?

সুমিত্রা বললে—এতদিন তো পেরেছি, এবার পারবো কি না জানি না—

—কেন ? এবার পারবে না কেন ?

সুমিত্রা বললে—তোমার ভানুভাই প্যাটেল কী-রকম লোক তা আমি কেমন করে জানবো ?

সোহম্ বললে—লোক যেমনই হোক, কিন্তু তুমিও তো কম নও। ভানুভাই প্যাটেলের যেমন অনেক টাকা আছে, তোমারও তো তেমনি অনেক অস্ত্র আছে—

—বা রে, আমার কী অস্ত্র আছে ?

—কেন, ইব্রাহিমকে যে-অস্ত্র দিয়ে তুমি কাত্ করেছিলে, সেই অস্ত্র ?

—সেই অস্ত্র তো সব মেয়েমানুষেরই আছে। আমার আর বিশেষ কী অস্ত্র আছে ?

সোহম্ হাসলো, বললে—আছে আছে। তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি তোমার কী অস্ত্র আছে। আমি বলতে পারি, শুনবে ?

সুমিত্রা মাথা নীচু করে রইল। মুখে কিছু বললে না।

সোহম্ বললে—ঠিক আছে, তোমাকে তা আর শুনতে হবে না। এই-ই হচ্ছে আমার শেষ রিকোয়েস্ট। এর পরে আর কোনও দিন তোমাকে আর কোনও রিকোয়েস্ট আমি করবো না—

সুমিত্রা বললে—বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার ওপর রাগ করলে—

সোহম্ বললে—সে কী ? তোমার ওপর রাগ করলে কি আমার চলে ?

বলে সুমিত্রাকে কাছে টেনে নিলে।

ওটা ঘুষ। ওই ঘুষ দিয়ে দিয়েই সোহম্ সারা জীবন নিজের ভাগ্যকে নিচু থেকে ওপরে উঠিয়েছে। আর বিশ্বাস করে এসেছে যে ভালো করে ঠিক মানুষকে ঠিক জায়গায় ঠিকমত ঘুষ দিতে পারলে কার্যসিদ্ধি হবেই। বিশেষ করে এই যুগে। সব জিনিসেরই মূল্য বদলায়। মূল্য বদলায় স্থান কাল পাত্র হিসেবে। যে-যুগে সত্যি-কথার মূল্য ছিল সে-যুগ হয়ত সত্যযুগ। অবশ্য সত্যযুগ বলে যদি কিছু থেকে থাকে। ত্রেতাতে সত্য কথার মূল্য একটু কমলো। দ্বাপরে মূল্য কমলো আর একটু। তারপরে এল কলিযুগ। সত্যযুগের লেখা যত শাস্ত্রের শাশ্বত কথা, তা দিয়ে ত্রেতা দ্বাপর বা কলি যুগের আচার-আচরণের বিচার করা উচিত নয়। এই কলি যুগের আচার-আচরণের বিচার এই কলিযুগের মানদণ্ড দিয়েই করতে হবে। আগেকার যুগের মানুষগুলো যখন আর নেই,

তখন তাদের কথার মূল্যও তাই এখন কানাকড়ি।

এই যেমন ক্ষেত্রবাবু!

ক্ষেত্রবাবু জন্মেছেন কলিযুগে, কিন্তু তাঁর বিচারের মানদণ্ড সেই অতীতের সত্যযুগ।

মনে আছে সেই সম্বর্ধনার দিনের কথা। কত সব ভালো ভালো কথা শোনালেন সেদিন। ছেলেদের সকলকে ডেকে বুঝিয়েছিলেন যে যত ভালো কথা শাস্ত্রে লেখা আছে, সেই সব কথা আজকের মানুষ ভাবুক। সেই সব কথা ভেবে কাজ করলে আজকের মানুষের আর কোনও দুঃখ কষ্ট থাকবে না—

ক্ষেত্রবাবু আবৃত্তি করেছিলেন—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি মানতাম······

শ্লোকের মানেটা বুঝিয়ে দিতে গিয়ে ক্ষেত্রবাবু বলেছিলেন—আমাদের গতি আমাদের সঙ্গে থাকুক, আমাদের কথা এক হোক, আমাদের একজন আর একজনকে পরস্পর পরস্পরকে জানুক···

সে কী লম্বা ক্ষেত্রবাবুর বক্তৃতা! সত্যযুগ যে আর এখন নেই তা ক্ষেত্রবাবু হয়ত বুঝতে পারেননি। কিংবা বুঝতে চাননি। বলেছিলেন—আজকে এই তোমাদের সামনে যে-দু'জন প্রাক্তন ছাত্রকে আমরা সম্বর্ধনা জানাচ্ছি, তাঁরা কী কাজ করেছেন? তাঁদের কী গুণের জন্যে আমরা তাঁদের সম্মান দিচ্ছি? সম্মান বা সম্বর্ধনা দিচ্ছি এই কারণে যে তাঁরা দু'জনেই চরিত্রবান। আজকের মানুষের পৃথিবীতে চারদিকে যে-অবক্ষয় দেখছি তার প্রধান কারণ হলো মানুষের চরিত্র-হীনতা। এই সর্বব্যাপী চরিত্রহীনতার যুগে আজ আমাদেরই স্কুলের দু'জন প্রাক্তন ছাত্র নিজেদের সচ্চরিত্রতার গুণে এত বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ হতে পেরেছেন। এ শুধু সেই প্রতিষ্ঠানেরই গর্ব নয়, এ-গর্ব আমাদের স্কুলেরও। আমরা চাই আমাদের স্কুলের প্রত্যেকটি ছাত্র এঁদের মত চরিত্রবান হোক, এঁদের মত সৎ হোক, এঁদের মত সুপ্রতিষ্ঠ হোক। তোমরা সবাই এই দু'জনের পথ অনুসরণ করো, আমি তোমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়ে এই কামনাই করি—

তারপর দু'জন ছাত্র দু'জনকে মালা পরিয়ে দিলে। দু'জনেই মালা দু'টো গলা থেকে খুলে সামনের টেবিলের ওপর রেখে দিলে। আর তারপর মিস্টার সেন বক্তৃতা দিলেন অনেকক্ষণ ধরে। মিস্টার সেন বললেন যে তাঁর যা কিছু উন্নতি বা অবনতি হয়েছে তা সমস্তই এই হেড্‌মাস্টার মশাই-এর জন্যেই! তিনি হেড্-মাস্টার মশাই-এর উপদেশগুলো বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন বলেই আজ তিনি একজন সার্থক মানুষ হতে পেরেছেন। এতে তাঁর নিজের বিশেষ কিছু কৃতিত্ব নেই, যা কিছু কৃতিত্ব সব এই হেড্‌মাস্টার মশাই-এর—

মিস্টার সেন বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের সমস্ত ছোট ছোট ছাত্ররা হাততালি দিয়ে তাদের আনন্দ প্রকাশ করলো।

এবার ক্ষেত্রবাবু আবার উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—এবার এ-স্কুলের আর একজন কৃতী ছাত্র শ্রীমান সোহম্ রায় তোমাদের কিছু বলবেন। ইনিও 'টার্নবুল্ অ্যাণ্ড্ জ্যাক্‌সন্ কোম্পানি'র

একজন বড় অফিসার। একদিন ইনি খুব গরীব ছিলেন। স্কুলের টিউশন্‌-ফিস্‌ও দিতে পারতেন না। কিন্তু মেধা ছিল বলে এঁকে ফ্রী-স্টুডেন্ট্‌শিপ্‌ পাইয়ে দিয়েছিলাম। আমার মর্যাদা তিনি রেখেছেন, এইটেই আমার গর্ব। তিনি শুধু মানুষই হননি, তিনিও মিস্টার সেনের মত মহামানুষ। এই দু'জন প্রাক্তন ছাত্রের দয়ায় বহু মানুষ আজ 'টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাক্‌সস্‌ কোম্পানি'র দয়ায় পেট ভরে খেতে পাচ্ছে—আমি চাই তোমরা এঁদের মত মন দিয়ে লেখা-পড়া করে এঁদের মতই মানুষ হবে—

আজ এতদিন পরে এত যুগ পরে লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে সোহমের মনে হলো হয়ত মেহের আলির কথাই ঠিক!

অথচ আগে তো মেহের আলিকে ঘরে ঢুকতে দিত না সে। তার পিওনকেও সে বলে দিয়েছিল—ওই পাগলটাকে কখনও ঢুকতে দিবি না, জানলি?

সাহেবের হুকুম মানতে চাপরাসী বাধ্য।

তাই মেহের আলি যদি কখনও আপিসে আসতো তো সোহমের ঘরে ঢুকতে চাইতো।

সোহমের চাপরাসীকে মেহের আলি বলতো—জানিস, আমি কে কথা বলছি? আমার নাম মেহের আলি, ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রোকার! আমি রায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো—

চাপরাসীও বলতো—না হুজুর, সাহেব আপনাকে ঘরে ঢুকতে দিতে মানা করে দিয়েছে—

—আরে মুঝে পহ্‌চান্‌তা নেই? ময় মেহের আলি হুঁ। ক্যালকাটা স্টক্‌ এক্সচেঞ্জকা ব্রোকার—

চাপরাসী তবু ঢুকতে দিত না মেহের আলিকে।

তখন মেহের আলি অফিস কাঁপিয়ে চিৎকার করতো—সব ঝুট্‌ হ্যায়—সব ঝুট্‌ হ্যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রন, ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম, সব কুছ ঝুট্‌ হ্যায়—

তখন সেই গোলমালের মধ্যে সদর গেটের গুর্খা দারোয়ান এসে ঘাড় ধরে মেহের আলিকে অফিসের ভেতর থেকে রাস্তায় বের করে দিত।

মনে আছে স্কুলের সেই সম্বর্ধনার শেষে সবাই বাড়ি চলে এসেছিল। মিসেস সেন আর মিসেস রায়ও স্বামীদের সঙ্গে ছিল। রাস্তায় গাড়িতে আসতে আসতে সুমিত্রা বললে—তুমি এতগুলো মিথ্যে কথা একটানা বলে গেলে?

সোহম্‌ বললে—কোন্‌টা মিথ্যে কথা?

সুমিত্রা বললে—ওই যে তুমি বললে তুমি জীবনে কখনও মিথ্যে কথা বলোনি?

সোহম্ বললে—ও-সব তো লেক্‌চারের কথা। ও-সব কথা কেউ বিশ্বাস করে না—

—তার মানে?

সোহম্ বললে—মনে রেখো এটা কলিযুগ—

সুমিত্রা বললে—কলিযুগ বলে কি সব কিছু উল্টে যাবে?

সোহম্ বললে—নিশ্চয়ই। যুগের সঙ্গে যে তাল মিলিয়ে চলতে পারে সে-ই টিঁকে থাকে। এখন এই কলিযুগে যদি আমি সত্যযুগের কথাগুলো মেনে চলি তাহলে কি আমি বাঁচতে পারবো?

—কিন্তু ইস্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা তো তোমার কথাগুলো বিশ্বাস করলে। তারা তো জীবনে ঠকবে! তারা তো তোমাকেই অনুসরণ করে চলবে!

সোহম্ বললে—তাদের কথা ভাবতে আমার বয়ে গেছে—আমি আমার নিজের ঝামেলা নিয়েই ব্যস্ত, তাদের কথা ভাবলে তো আমার কাজ-কর্ম চলবে না—

সুমিত্রা বললে—তাহলে সেন সাহেব যা বললে তাও সব মিথ্যে?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, মিস্টার সেনও আজ আগাগোড়া সব মিথ্যে বলে গেলেন। সত্যি কথা যদি বলতেন তাহলে 'টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানি' থেকে তাঁর চাকরিও চলে যেত। শুধু তাই-ই নয়, ওই কোম্পানিও কবে উঠে যেত। এই পৃথিবীটা এই যুগটা যে মিথ্যের ওপরই চলছে—

—তাহলে কি সবাই মিথ্যেবাদী?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, সবাই সবাই। কেউ বাদ নেই, আমাদের অফিসে যত কিছু রিপোর্ট বেরোয়, আমাদের শেয়ার-হোল্‌ডারদের যা কিছু ফিগার জানানো হয় সব মিথ্যে। গভর্মেণ্টের যা-যা খবর বেরোয় খবরের কাগজে তাও সব মিথ্যে। আমেরিকা, ওয়েস্ট্-জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ডের প্রাইম-মিনিস্টাররাও যা স্টেট্‌মেণ্ট্ দেয় তাও মিথ্যে। এই মিথ্যের যুগে একলা আমি যদি সত্যি কথা বলি তাহলে তো সবাই আমার গলা টিপে মেরে ফেলবে।

এতক্ষণে যেন সুমিত্রা একটু শান্ত হলো। যেন বুঝতে পারলে যে সোহম্ যে-পথে চলছে সেটাই খাঁটি পথ।

সোহম্ বললে—এই যে তোমাকে আমি ক্লাবে গিয়ে মদ খেতে বলি, এই যে নিজেও আমি মদ খাই, নিজেও আমি মিথ্যে কথা বলি, তা কি আমি মন থেকে বলি মনে করো? আমার তো মদ খেতেই ইচ্ছে করে না। আমার তো সব সময় সত্যি কথা বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তা করলে কি আমি টিঁকে থাকবো? তাহলে কি আমি বাঁচতে পারবো? এই কম্‌পিটিশনের যুগে আমি যে তাহলে ভেসে যাবো!

তারপর আরো অনেক কথা বললে সোহম্। জীবনে সে সৎপথে থেকেই মানুষ হতে চেয়েছিল। সৎ জীবনযাপন করে স্বাভাবিক হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন সে দেখলে লেখা-পড়া শেখার চেয়ে টুকে পাস করাকেই সবাই আদর্শ বলে মনে করছে তখনই তার চোখ ফুটলো। তখনই সে দেখলে যুগের সঙ্গে তাল

দিয়ে যে চলে সে-ই টি'কে থাকে। তখন থেকেই সে সকলের সঙ্গে আপোস করে চলতে লাগলো, সকলের তালে তাল দিয়ে চলতে লাগলো।

শেষকালে সোহম্ বললে—তার জন্যেই তো আমি আজ বড়লোক হয়েছি—তার জন্যেই তো আমার গাড়ি হয়েছে, আমার প্রমোশন হয়েছে, আমার এত উন্নতি হয়েছে। তার জন্যেই তো অফিসে ঢুকলে আজ আমাকে এত লোক সেলাম করে—

মাঝে মাঝে অবশ্য সুমিত্রার মনে থাকে না। মনে থাকে না বলেই মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে ওঠে। বিশেষ করে ইব্রাহিমের সঙ্গে এক বিছানায় শোবার পর এই রকম বিদ্রোহ করেছিল একবার। প্রথম মদ মুখে দেবার পরও এই রকম বিদ্রোহ করেছিল। তারপর যখন তার মা স্ট্রোকে মারা গিয়েছিল, তখনও কিছুদিনের জন্যে শোকে একেবারে বিবশ হয়ে গিয়েছিল। তখন সুমিত্রা এমন মুষড়ে পড়েছিল যে কয়েক দিনের জন্যে সোহমের সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছিল। মদ খাওয়া আর ক্লাবে যাওয়াও তার বন্ধ ছিল। কয়েকদিন তো সুমিত্রা ভাতও খায়নি, উপোস করে কাটিয়েছিল। কিন্তু সোহম্ জানতো ও-সব সাময়িক। দুঃখ কষ্ট শোক—ও-সব দুদিনের। যা কেবল চিরদিনের তা হলো টাকা। সে চিরদিনের জিনিসটা যদি হাতের মুঠোয় থাকে তাহলে মানুষ মাতৃশোক তো দূরের কথা, পুত্রশোকও ভুলে যায়!

আর তাই-ই হলো শেষ পর্যন্ত।

হঠাৎ টেলিফোন এল বাড়িতে!

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—সোহম্ রায় স্পিকিং—

ওপাশ থেকে মিস্ সুরিটার গলা।

—মিস্টার রায়, একটা গুড্ নিউজ আছে—

—কী? কী ভালো খবর?

—মিস্টার ভানুভাই প্যাটেল আজ সকালে ক্যালকাটায় আসছেন। আজ ইভ্‌নিংয়ে ক্লাবে মিট্ করবেন—

সোহম্ রায় খবরটা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। বললে—থ্যাঙ্কউ মিস্ সুরিটা, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্—বলে ফোনের রিসিভারটা রেখে দিলে। রেখে দিয়েই আবার সেটা তুললে। মিস্টার সেনকে টেলিফোন করে সুখবরটা জানাতে হবে।

মিস্টার সেন বাড়িতেই ছিলেন।

বললেন—ভেরি গুড্। আজকে সন্ধ্যেবেলা তাহলে তুমি যাবে—আর যদি কিছু ক্যাশ টাকার দরকার থাকে তাহলে অফিসে এসে নিয়ে যেও—এনি অ্যামাউন্ট—ইম্‌প্রেস্ট্ ক্যাশে সব রেডি রেখে দিয়েছি—

সোহম্ বললে—ঠিক আছে স্যার—

মিস্টার সেন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—মিসেস রায় কেমন আছেন?

সোহম্ বললে—একটু রিকভার করেছে।

—যাক্ ভালো! হাজার হোক, মা তো! নিজের মা'র ঐ রকম ডেথ্ যে-

কোনও সন্তানের পক্ষে বড় পেইনফুল। এত বড় শক্ থেকে যে মিসেস রায় এত সহজে সামলাতে পারবেন আমি তা ভাবতে পারিনি। ভেরি গুড্, রিয়্যালি ভেরি গুড্। আর মিস্টার ভানুভাই প্যাটেল ঠিক যে-সময়ে কলকাতায় এলেন সেই সময়েই মিসেস রায় সুস্থ হয়ে উঠলেন, এটা রিয়্যালি গুড্ সাইন—

যে-সুমিত্রা অত বড় শোক পেয়ে একেবারে আপাদমস্তক মুষড়ে পড়েছিল সে-ও শেষ পর্যন্ত সোহমের কথাগুলো শুনলো চুপ করে।

সোহম্ বললে—শুধু এই শেষবার। শেষবারের মত তুমি আমাকে বাঁচাও। এবারের পর আর কখনও তোমায় কিছু অনুরোধ করবো না। ভানুভাই প্যাটেল, যার জন্যে এত তোড়জোড়, এত কাণ্ডকারখানা, সেই মানুষটা এতদিন পরে ক্লাবে আসছে।

কথাটা শুনে সুমিত্রা একটু চুপ করে রইল।

তারপর বললে—আমাকে কী করতে হবে?

সোহম্ বললে—কিছু না, শুধু মদ খেতে হবে মিস্টার প্যাটেলের সঙ্গে—

—কতটা মদ খেতে হবে?

সোহম্ বললে—মিস্টার প্যাটেল যত খেতে বলবেন তত…

—আর কী করতে হবে?

সোহম্ বললে—এর বেশী আর কী করতে হবে? কিছুই না। তুমি তো সব জানো। ইব্রাহিমকে নিয়ে তুমি যা করেছিলে এই মিস্টার প্যাটেলকে নিয়েও তাই-ই করতে হবে!

—মিস্টার প্যাটেলের সঙ্গে কি শুতে হবে?

সোহম্ বললে—সে-সব আমি কিছু বলবো না। আমাদের দুজনের ভালোর জন্যে যা করলে ভালো হয় তাই-ই করবে। এর বেশী আমি আর কিছু বলবো না—

তা শেষ পর্যন্ত সত্যিই সুমিত্রা তৈরি হয়ে নিলে। স্বামীর জন্যে সেকালের স্ত্রীরা কত কী ত্যাগ স্বীকার করেছে, আর একালে সুমিত্রা তার স্বামীর জন্যে একটু কিছু করতে পারবে না?

সোহম্ আর সুমিত্রা যখন ক্লাবে গিয়ে পৌঁছলো তখন সবে সন্ধ্যে নেমেছে। অন্যদিনের সন্ধ্যের চেয়ে যেন আরও জমজমাট, যেন আরো ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যে! মিস্টার আর মিসেস রায়কে দেখে কেউ কেউ হাতে গ্লাস নিয়ে নড্ করলে। কিন্তু সোহম্ দু'চোখ দিয়ে কেবল খুঁজতে লাগলো মিস্ সুরিটাকে। সূর্য ওঠবার আগে যেমন লালচে আকাশ দেখা যায়, মিস্ সুরিটাকে দেখেও তেমনি বোঝা যাবে মিস্টার ভানুভাই প্যাটেলকে।

কিন্তু কোথায় মিস্ সুরিটা?

হঠাৎ নজরে পড়লো লন্-এর পশ্চিম কোণে অনেক মেয়ে-পুরুষের ভিড়। কী হয়েছে ওখানে? নিশ্চয়ই কোনও বিগ্ গাই ওখানে এসেছে!

সোহম্ সুমিত্রাকে নিয়ে সেই দিকেই চলতে লাগলো। পেছনে খুব ঝিম্ আওয়াজে মিউজিক বাজছে। কোনও অর্কেস্ট্রার শিশির-ভেজা কান্না। মদের

নেশার সঙ্গে মিউজিকের নেশা মিশে একটা অরক্রেস্ট্রার একাকার আবহাওয়া।

হঠাৎ ওধার থেকে হাতে গ্লাস নিয়ে মিস্ সুরিটা দৌড়ে এগিয়ে এল।

—হ্যাল্লো হ্যাল্লো, গুড্ গুড্ গুড্ ইভ্নিং···

—মিস্টার ভানুভাই প্যাটেল এসেছেন?

মিস্ সুরিটা বললে—চলুন, ঐ তো রয়েছেন। আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—

সোহম্ দূর থেকে দেখতে পেলে ভানুভাই প্যাটেলকে। খুব হ্যাণ্ডসাম চেহারা। হাতে গ্লাস, আর তার আশেপাশে কিছু সাইকোফ্যাণ্ট্স্ কিছু চাম্চে।

সুরিটা বললে—মিস্টার প্যাটেল, হিয়ার ইজ মিস্টার রায়, অ্যাণ্ড শী ইজ্ মিসেস রায়।

তারপর সোহমের দিকে চেয়ে বললে—অ্যাণ্ড দিস ইজ্ মিস্টার প্যাটেল, বি. বি. প্যাটেল—

সত্যি, সংসারে ভানুভাই প্যাটেল কি একজন? হাজার হাজার বছর আগে তখন হয়তো একজনই ছিল ভানুভাই প্যাটেল। কিন্তু এখন পৃথিবী যত বৃদ্ধ হচ্ছে ততই তাদের সংখ্যা বাড়ছে। আর এখন তো তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

মনে আছে ভানুভাই প্যাটেল যখন বলতো—মিস্টার রায়, তুমি এমন স্ত্রীকে কিনা বাড়ির অন্দরমহলে পুরে বন্দী করে রেখেছ? হোয়াট্ এ পিটি—

যেন বড় দুঃখ পেলেন প্যাটেলজী! দুঃখ তো পাবারই কথা। যার এত রূপসী বউ সে কিনা একবারও সেই বউকে নিয়ে কন্টিনেণ্টে বা স্টেট্স্এ যায়নি! পৃথিবী যে কত বড় আর সেই পৃথিবীতে যে কত রকমের আরাম আর কত রকমের ভোগ্যবস্তু রয়েছে সেই খবরটা পর্যন্ত এই মেয়েটি জানলে না।

মানুষটা সত্যিই বড় ভালো, এত যে টাকা তবু যেন কোনও 'ইগো' নেই, শুধু দুঃখ। পরের অক্ষমতার জন্যে দুঃখ। এদেশের মানুষের দৃষ্টিটা নাকি বড় সংকীর্ণ। দূরের দিকে কেউ দৃষ্টি দেয় না। কেউ দূরের টিকিট কাটে না। নিজের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যেই সবাই ঘোরাফেরা করে। কেন, পৃথিবীটা কি শুধু ইণ্ডিয়া? ওয়ার্ল্ড্-এর ম্যাপটা খুলে কি কেউ একবার দেখবেও না! সেই ম্যাপে ইণ্ডিয়া তো মাত্র একটা বিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়। সেখানে রয়েছে আমেরিকা, রাশিয়া, আফ্রিকা। তা ছাড়া ইণ্ডিয়ার মত ছোট ছোট দেশ অসংখ্য। সেখানেও তো মানুষ থাকে। তারাও তো সভ্য মানুষ। তারাও তো সেখানে জন্মায়, চাকরি করে, টাকা উপায় করে, ব্যবসা করে। ঠিক ইণ্ডিয়ার লোকেদের মতই জন্মায়। চাকরি করে, টাকা উপায় করে, ব্যবসা করে।

কিন্তু সেই সব দেশে ইণ্ডিয়ার মানুষ যাবে না কেন? কেন সেখানকার মানুষের সঙ্গে এখানকার মানুষ মেলামেশা করবে না? 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'—এই হওয়াই তো উচিত। ওখানকার লোকই তো এতদিন এখানে এসেছে। কলম্বাস এখানে আসবার জন্যেই তো বেরিয়েছিল, ভাস্কো-ডি-গামা এখানে এসেই তো তাদের দেশকে বড়লোকের দেশ করতে পেরেছিল। রবার্ট ক্লাইভ এখানে না এলে তো ইংলণ্ড অত বড়লোক হতে পারতো না। সুতরাং আমাদেরও ওই সব দেশে যেতে হবে। এখনও ওই সব দেশের অনেক খোলা বাজার পড়ে রয়েছে। আমাদের দেশের মাল-মশলা ওই সব খোলা বাজারে বেচতে পারলে আমাদের কত প্রফিট হবে ভাবুন তো!

বড় সুন্দর কথা বলে ভানুভাই প্যাটেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সকলের নেশা মাথায় চড়ে গেল।

কিন্তু ভানুভাই প্যাটেল অনড় অচল। তার যেন নেশা হতে নেই। সমস্ত গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের মেম্বাররা তখন ভানুভাই প্যাটেলকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এক-একবার ট্রে হাতে করে নানারকম রং-এর গেলাস ভর্তি পানীয় নিয়ে আসে 'বয়'রা আর ভানুভাই প্যাটেল প্রত্যেকবার নিজের গেলাসটা রেখে দিয়ে আর একটা ভর্তি গেলাস নিয়ে মুখে দেয়।

যেন জল খাচ্ছে। অথচ পা বা হাত কিছুই এতটুকু টলছে না।

হঠাৎ খেয়াল হলো সুমিত্রার হাতে গেলাস নেই।

বললে—এ কী? আপনার গ্লাস কোথায় মিসেস রায়?

সুমিত্রা বললে—আমার অলরেডি দু'পেগ হয়ে গিয়েছে—

ভানুভাই বললে—না না না, আপনি যখন এখনও পেগ-এর হিসেব রেখেছেন তখন বুঝতে হবে আপনার এখনও পুরো খাওয়া হয়নি—

সুমিত্রা বললে—মেয়েরা একটু হিসেবীই হয় মিস্টার প্যাটেল—

ভানুভাই বললে—ওইটি করবেন না মিসেস রায়, প্লীজ্! হিসেব করবেন না—

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে—কেন?

ভানুভাই বললে—জীবনটা বড় ছোট মিসেস রায়। দেখতে দেখতে মানুষের জীবন ফুরিয়ে যায়। তার মধ্যে আবার যদি সব জিনিসের হিসেব রাখতে যান তাহলে দেখবেন দেখতে দেখতে কখন সব হিসেব গরমিল হয়ে গেছে—

তারপরে গেলাসে আর একবার চুমুক দিয়ে বললে—আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে 'পেট' 'প্রেম' আর 'পাপে'র হিসেব রাখতে নেই—

যারা ভানুভাইকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারা সবাই বলে উঠলো—কেন, কেন মিস্টার প্যাটেল? পেট প্রেম আর পাপের হিসেব রাখবো না কেন?

ভানুভাই বললে—কতখানি খাবার খেলে কতটা পেট ভরবে খাওয়ার সময় এ-কথা যে ভাবে, বুঝতে হবে তার শরীর খারাপ—জীবনে কখনও তার স্বাস্থ্য ভালো হবে না—

—আর প্রেম?

ভানুভাই বললে—হিসেব করে যে প্রেম করে সে রোগী। বুঝতে হবে তার নিশ্চয়ই মনের কোনও রোগ আছে। তার উচিত 'নিউরোলজী'র ডাক্তারকে দেখানো—আর পাপ? পাপ কী?

আবার গেলাসে চুমুক দিলে ভানুভাই।

বললে—আপনারা বলুন তো পাপ কী? পাপের কোনও ডেফিনিশন আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পেরেছে যে হিসেব রাখবো? এক দেশের সমাজে ড্রিংক করা পাপ, আবার এক দেশে সেই ড্রিংক করাটাই পুণ্য। এক যুগে যা 'ভারচু', অন্য যুগে তা-ই আবার 'ভাইস্'! বলুন আমি কী করি···?

সবাই খুশী হয়ে হেসে উঠলো। সোহমও হাসলো, সুমিত্রাও হাসলো। মিসেস তলোয়ারকর, মিসেস খান্না, মিসেস দাশগুপ্তও হাসলো। ভানুভাই প্যাটেল মাল্‌টি মিলিওনেয়ার মানুষ।

গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের মেম্বাররা যে ভানুভাই প্যাটেলের পায়ের ধুলোর স্পর্শ পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে এটার প্রমাণ দিতে হবে হেসে। হাসি না পেলেও হাসতে হবে। গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের মেম্বারদের এটাই অলিখিত নিয়ম।

মিসেস খান্না হাসতে হাসতে ঢলে পড়তে পড়তে বললে—আপনি এত হাসাতে পারেন মিস্টার প্যাটেল···

—তবে শুনুন—

আবার ট্রে হাতে নিয়ে একটা বয় এসে ঘুরতে লাগলো—

সবাই আবার নতুন করে গেলাস হাতে তুলে নিলে। কেউ আর এবার হিসেব করতে বসলো না ক' পেগ নিলে। আজ 'পেট' 'প্রেম' আর 'পাপে'র হিসেব কেউ রাখবে না—

মিসেস আহুজা বললে—একটা জোক্ বলুন, মিস্টার প্যাটেল···

—জোক্? তবে শুনুন—

বলে হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে মিস্টার প্যাটেল বললে—সেবার ইজিপ্ট্ থেকে সোজা নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলাম। ওয়াশিংটনে ওয়ার্ল্ড্ ব্যাঙ্কের ইন্টার-ন্যাশন্যাল মানিটারি ফান্ডের সেক্রেটারি চার্লস্ ডান্‌বার শেরম্যান্ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—আচ্ছা মিস্টার প্যাটেল, আপনি আমার একটা কথার জবাব দেবেন?

আমি বললাম—কী কথা, বলুন?

শেরম্যান্ বললেন—আচ্ছা, What do you mean by capitalism?

আমি জবাব দিলাম—Man exploiting man—

তারপর শেরম্যান্ আবার জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে What do yon mean by communism?

আমি বললাম—ওই কথাটা উল্টিয়ে নিন—

—তার মানে?

আমি বললাম—উল্টিয়ে দিলেও ওই একই দাঁড়ায়—Man exploiting man—

শেরম্যান্ সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন আমার কথা শুনে।

তারপর মিস্টার শেরম্যান্ বললেন—আচ্ছা মিস্টার প্যাটেল, আমরা যে কোটি কোটি ডলার সাহায্য আপনাদের দেশে পাঠাই, সে সব যায় কোথায় ?

আমি উত্তর দিলাম—আপনাদের কোটি কোটি ডলার 'এইড্' যারাই নেয় তাদেরই সর্বনাশ হয়—

শেরম্যান্ অবাক হয়ে বললেন—কী রকম ?

জবাবে আমি বললাম—এই দেখুন না, ১৯৫২ সালে আপনারা ইজিপ্টকে কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিয়েছিলেন, তার ফলে ইজিপ্টের রাজা ফারুকের চরম সর্বনাশ হলো। ফারুককে ইজিপ্ট্ ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে হলো। তারপরে ১৯৭১ সালে আপনারা কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিলেন পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খাঁকে, সেই সাহায্যের চোটে ইয়াহিয়া খাঁকে বাংলা-দেশ ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে পালাতে হলো।

শেরম্যান্ সাহেব আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আরো শুনবেন ?

শেরম্যান্ সাহেব চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখ তখন আমসির মত শুকিয়ে গেছে।

কিন্তু আমি থামবো কেন ? আমি বললাম—এই দেখুন, ১৯৭৮ সালে আপনারা কোটি কোটি ডলার দিলেন ইরানের শাহকে, শেষ পর্যন্ত তার কী পরিণাম হলো ? শেষ পর্যন্ত আয়াতুল্লা খোমেনির হাতে তাড়া খেয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে ক্যানসারে মারা পড়তে হলো। এই তো আপনাদের কোটি কোটি ডলার সাহায্যের পরিণতি—

শেরম্যান্ সাহেবের মুখ চুন হয়ে গেল আমার কথা শুনে।

কিন্তু সেটা সামলে নিয়ে শেরম্যান্ আবার বললেন—আপনাদের সোয়ামি ভিভেকানন্দের একটা পোয়েট্রি আপনি পড়েছেন ?

—কী পোয়েট্রি ?

মিস্টার চার্লস ডারবান শেরম্যান্ তখন স্বামী বিবেকানন্দর কবিতাটা গড়-গড় করে মুখস্থ বলে গেলেন :

Life is a mission
Meet it.
Life is a gift
Accept it
Life is an adventure
Dare it
Life is a sorrow
Overcome it
Life is a tragedy
Face it

Life is a duty
Perfom it
Life is a game
Play it
Life is a mystery
Unfold it
Life is a song
Sing it
Life is an opportunity
Take it
Life is a journey
Complete it
Life is a promise
Fulfil it
Life is a love
Enjoy it
Life is a spirit
Realise it
Life is a struggle
Fight it
Life is a puzzle
Solve it
Life is a goal
Achieve it—

সমস্ত কবিতাটা গড়গড় করে মুখস্থ বলে মিস্টার শেরম্যান্ থামলেন। তারপর বললেন—এই তো আপনাদের ইণ্ডিয়া। আমি অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে সেই সোয়ামী ভিভেকানন্দর ইণ্ডিয়া আজ কিনা রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, যে-রাশিয়া ভগবানও বিশ্বাস করে না—

এতক্ষণ যারা ভানুভাই প্যাটেলের কথা শুনছিল, তারা এবার বলে উঠলো—তারপর ? তার জবাবে আপনি কী বললেন মিস্টার প্যাটেল ?

—আমি বললাম—মিস্টার শেরম্যান্, স্বামী বিবেকানন্দের সেইইণ্ডিয়া আজ আর সেই ইণ্ডিয়া নেই—

মিস্টার শেরম্যান্ জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে এখন সেই ইণ্ডিয়া কী ?

আমি বললাম—সেই ইণ্ডিয়া নিয়ে আমি একটা পোয়েট্রি লিখেছি—

—কী পোয়েট্রি ?

আমি বললাম—শুনুন, বলছি—

বলে আমি বলতে লাগলাম :

Life is White Horse Whiskey

Drink it—born in 1794 and still going strong.

কথাটা শুনেই মিসেস খান্না, মিসেস দাশগুপ্ত, মিসেস ওলোয়ারকর, মিসেস রায়, যারাই জোড়ায় জোড়ায় এসেছিল সবাই হেসে হেসে একেবারে ভানুভাই প্যাটেলের গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ভানুভাই প্যাটেল আবার হাঁক মারলে—বয়, আউর এক রাউণ্ড ··

সত্যিই আর এক রাউণ্ড পরিবেশন হতে লাগলো হোয়াইট্ হর্স হুইস্কি।

হুইস্কি পেটে পড়তেই সবাই নতুন করে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করতে লাগলো—তারপর? তারপর কী হলো মিস্টার প্যাটেল? আপনি এত হাসাতেও পারেন সত্যি ··

ভানুভাই প্যাটেল গেলাসে চুমুক দিয়ে বললে—আমার কথা শুনে চার্লস্ ডানবান শেরম্যান্ বললেন—তাহলে সোয়ামী ভিভেকানন্দের দেশের এখন এই হাল?

আমি বললাম—হ্যাঁ মিস্টার শেরম্যান্, এই-ই এখনকার ইণ্ডিয়ার হাল। আপনারা ইণ্ডিয়ায় দিল্লী বোম্বাই কলকাতায় আপনাদের সব এম্ব্যাসিতে, কক্টেল পার্টিতে সব কালচার্ড লোকদের নেমন্তন্ন করে মদ খাইয়ে খাইয়ে তাদের মাতাল করে দিচ্ছেন, তাতে সোয়ামী ভিভেকানন্দর কী দোষ? আপনারা তো তাই ই চাইছিলেন। আপনারা সমস্ত কালচার্ড লোকদের বিনা পয়সায় আমেরিকা ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাদের বেড়ানো থাকা খাওয়া সব ফ্রী করে দিচ্ছেন। তাতে ইণ্ডিয়ার এই হাল হবে না তো কী হবে? তাদের তো মর্যাল ব্যাক্‌বোন্ ভে দিচ্ছেন আপনারা, রাশিয়া আমাদের আর কত ক্ষতি করবে, বলুন? আপ পকেটের পয়সা খরচ করে যা করছেন, রাশিয়া তো তাতে হেরে যাবেই, ত রুবল্ কি ডলারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে?

—তারপর?

ভানুভাই আবার বলতে লাগলো—তারপর ··

গেলাসে আবার এক চুমুক দিয়ে বলতে লাগলো—তারপর আমি মিস্টার শেরম্যান্‌কে বললাম, জানেন মিস্টার শেরম্যান্, আপনাকে আর কী বলবো, আপনি সি-আই-এ'কে দিয়ে তো সব খবরই পাচ্ছেন! এখন জানেন কী হয়েছে? এখন ইণ্ডিয়ার কালচার্ড লোকরা কেউ আর খদ্দর পরে না। কিছু ওল্ড-হ্যাগার্ড কংগ্রেসাইট্ ছাড়া সবাই এখন আপনাদের মতন টেরিলিন টেরিকট গ্যাবার্ডিনের স্যুট পরে থাকে। কারো হাতে আর এইচ-এম-টি ঘড়ি নেই, সবাই ব্যাটারি ঘড়ি পরছে, সবাই ইলেক্‌ট্রনিক ঘড়ি পরছে। সব মেড্-ইন-আমেরিকা, আর নয় তো আপনাদের স্যাটিলাইট্‌দের দেশে তৈরি—

—আপনি বললেন এই কথা?

—বলবো না তো কী? ভানুভাই প্যাটেল কি কাউকে স্ট্রেট্ কথা বলতে ভয় করে?

আবার আর একবার চুমুক।

—তারপর আমি কী বললুম জানেন ?

—বলুন, বলুন, কী বললেন, শুনি ?

ভানুভাই প্যাটেল একাই একশো। ক্লাবের আরো অনেক মেম্বার সেখানে এসে তাকে ঘিরে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে—

ভানুভাই প্যাটেল বললে—আমি মিস্টার শেরম্যানকে বললাম, দেখুন মিস্টার শেরম্যান, আমাদের ওই ওয়েস্ট বেঙ্গলে এ-বছরে শুধু মদ থেকে এক্সাইজ রেভিনু্য এসেছে চল্লিশ কোটি টাকা। নাইনটিন ফরটি সেভেনে যা ছিল দেড় কোটি টাকা। তাহলে মদ খাওয়া কত বেড়েছে বলুন ? হিসেব করুন ?

মিস্টার শেরম্যান হাসলেন। আমার মনে হলো তিনি যেন খবরটা শুনে খুব খুশী হলেন।

তারপর আমি বললাম—আর শুনবেন দুধ থেকে কত রেভেনু্য এসেছে—?

—কত ?

আমি বললাম—এই লাস্ট ইয়ারে দুধ থেকে এক পয়সাও প্রফিট হয়নি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্মেণ্টের। শুধু ডিফিসিট হয়েছে।

—কত ডিফিসিট হয়েছে ?

বললাম—সাড়ে চৌদ্দ কোটি টাকা।

তারপর একটু থেমে আবার বললাম—দিস ইজ দ্য স্ট্যাটিসটিক্স মিস্টার শেরম্যান—এখন বুঝুন আমেরিকার ডলারের কত ক্ষমতা। এই দেশে এখন দুধ বিক্রি হয় না, কিন্তু লাইসেন্স-হোল্ডাররা মদ বেচে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না —ওদিকে সারা ইণ্ডিয়াতে এখন ভিখিরির সংখ্যা দশ লক্ষ। শুধু ইউ-পিতেই ' লক্ষ আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে এক লক্ষ নব্বুই হাজার। তারা রাস্তাতেই বাস করে রাস্তাতেই জীবন কাটায়—

তারপর কথাটা থামিয়েই গেলাসে এক চুমুক দিয়ে ভানুভাই আবার ডাকলে —বয়, আউর এক রাউণ্ড—

তারপর বোধ হয় নেশার ঘোরেই ভানুভাই প্যাটেল সুর করে আবার গান গেয়ে উঠলো ঃ

Life is White Horse Whiskey
Drink it

তারপর গ্রেট ইস্টার্ণ ক্লাবের লন-এর ওপর সকলের কোরাস গান শুরু হয়ে গেল ঃ

Life is White Horse Whiskey
Drink it…born in 1794 and
still going strong…

সুমিত্রাকে এক হাতে ভিড়ের বাইরে টেনে নিয়ে সোহম বললে—এ কী করছো তুমি ?

—কেন ? কী করছি ?

সোহম বললে—তোমাকে এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে শেষকালে কিনা তুমি আমাকেই ডোবাবে ?

—কেন ? আমি তোমাকে ডোবালুম কী করে ?

—ওই দেখ না, মিসেস তলোয়ারকর, মিসেস খান্না, সবাই কেমন মিস্টার প্যাটেলকে জড়িয়ে ধরে নাচছে—শুধু তোমাকেই সবাই কিক্ আউট্ করে দিয়েছে—

সুমিত্রা বললে—তা বলে আমি বাঙালী মেয়ে হয়ে ওদের মত নাচবো ?

সোহম্ বললে—তাতে ক্ষতি কী ? তাহলে কি তোমার জাত যাবে ? তাতে কি তুমি এঁটো হয়ে যাবে ?

সুমিত্রা কেমন গম্ভীর হয়ে রইল।

—কী ? কথা বলছো না যে ?

সুমিত্রা বললে—আমি কী বলবো ?

সোহম্ বললে—এত দিনে তোতা পাখীর মত পড়িয়ে শিখিয়ে শেষে আজ তুমি এই কথা বলছো ? তুমি শুনলে না মিস্টার প্যাটেল কী বললে ?

—কী বললে ?

সোহম্ বিরক্ত হলো। বললে—না, দেখছি তোমাকে দিয়ে আমার একটা কাজও হবে না। শুনলে না ওই যে মিস্টার প্যাটেল বললে—'পেট' 'প্রেম' আর 'পাপ', এর কোনও হিসেব রাখতে নেই—। জীবনটা বড় ছোট, হিসেব করতে বসলেই জীবনটার সব হিসেবে গরমিল হয়ে যাবে—

সোহম্ একটু থেমে আবার বললে—দেখ লক্ষ্মীটি, এমন করে আমার সর্বনাশ কোর না। বার বার তো তোমায় বলছি না। এই শেষ বার। শেষ বারের মত তুমি আমায় উদ্ধার করো—। তারপর তুমি আমার কাছে যা চাইবে তোমাকে তা সব দেব—

সুমিত্রা তখনও যেন একটু সংকোচ করছিল।

সোহম্ বললে—কই, যাও—যাও—ভাবছো কী ? যাও—

সুমিত্রার পা যেন টলছে। বললে—তাহলে যাই ?

—হ্যাঁ, যাও—

—তুমি বলছো আমাকে যেতে ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ হ্যা, যেতেই তো বলছি—

তারপরে বললে—হ্যাঁ, বুকের ডান দিকটা থেকে শাড়িটা একটু সরিয়ে দাও, হ্যাঁ, ঠিক এই রকম···

তারপরে সাহস দেবার জন্যে সোহম্ বললে—ওই দেখ না, মিসেস তলোয়ারকর, মিসেস খান্না, মিসেস দাসগুপ্তা, ওরা সবাই কেমন মিস্টার প্যাটেলের শরীরে লেপ্‌টে রয়েছে—দেখছি সব কন্‌ট্র্যাক্ট্ হয়ত ওরাই পেয়ে যাবে। তাহলে আমার কপালে আর কী বাকি থাকবে ? শেষকালে মিস্টার সেন যে আমাকেই দোষ দেবে। এত হাজার হাজার টাকা খরচ করার পর কোনও কাজ না হলে তো কোম্পানি আমাকেই দোষী করবে ! মিডল্-ইস্টের অত বড় কন্‌ট্র্যাক্ট্-এর একটা ফ্র্যাকশন্ও যদি 'টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানি' না পায় তাহলে···

বলে কথাটা আর শেষ করতে পারলে না সোহম্। তার হার্ট-বিট্ মিনিটে

যেন একশো নব্বুইতে গিয়ে পৌঁছেছে। শেষকালে কি স্ট্রোক হবে তার? শেষ-কালে সে কি টাকার জন্যে প্যারালিসিস্ হয়ে শুয়ে পড়ে থাকবে? সে যে বড় ভীষণ…বড়…

সুমিত্রা তখন টলতে টলতে ভিড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে…

সেখানে তখন কোরাস গান চলছে…

Lite is White Horse Whiskey
Drink it…born in 1794 and
Still going strong.

হমের সৌভাগ্য-সূর্য তখন মধ্য-গগনের কেন্দ্রে জ্বল-জ্বল করছে। যখন নুষের জীবনে সৌভাগ্য-সূর্যের পূর্ণোদয় হয় তখন প্রভাতের আগেকার ন্ধকারের কথা আর তার স্মরণে আসে না, আবার আগামী অস্তগামী সূর্যের অবধারিত অধঃপতনের কল্পনাও তার স্মৃতিকে বিড়ম্বিত করে না।

এই-ই তো জীবন। অল্প-বিস্তর সব মানুষের জীবনই এই। মিলটন কখনও ভাবেননি যে তিনি শেষ বয়েসে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলবেন। তা ভাবলে কি অত রাত জেগে জেগে লেখা-পড়া করতেন! বালজাকের জীবনও তেমনি কষ্টদায়ী। চৌদ্দ বছর প্রতীক্ষা করবার পর যখন তাঁর প্রণয়িনী পোল্যাণ্ডের কাউণ্টেস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন দেখে স্তম্ভিত হলেন যে বালজাক্ রাত জেগে লিখে লিখে দু'চোখ অন্ধ করে ফেলেছেন। শাজাহান যদি যৌবনে জানতে পারতেন যে তাঁরই নিজের ছেলে শেষ জীবনে তাঁকে বন্দী করে রেখে অকথ্য অত্যাচার করবে, তাহলে কি তিনি বিয়ে করতেন?

এ-রকম কত উদাহরণই আছে ইতিহাসের পাতায়। অনেকে সোহম্‌কে তার ছোটবেলায় অনেক কথাই শুনিয়েছে, কিন্তু সে কি তাতে তখন কান দিয়েছে? নেপোলিয়ন যদি জানতেন যে শেষ জীবনে তাঁকে সেণ্ট্ হেলেনা দ্বীপে থেকে মৃত্যুর অক্লান্ত প্রতীক্ষায় প্রহর গুনতে হবে, তাহলে কি তিনি নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজনদের বড় বড় চাকরি দিয়ে তাদের কৃতার্থ করতেন?

মনে আছে ক্ষেত্রবাবু ইংরেজীর ক্লাসে কত বার তাদের হাইনের কবিতাটার ব্যাখ্যা করে বলেছেন—It is from history we learn tha: we do not learn from history.

কিন্তু কে ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছে? ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে কোন্ মানুষ জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে?

সোহম্‌ও কি তার সারাজীবনের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতির পূর্বাভাস পেয়েছিল? সে কি কখনও জানতে পেরেছিল যে একদিন তাকেও তার পাপের বেতন চুকিয়ে দেবার দায় একদিন তার ওপরেই বর্তাবে?

হয়ত তা জানতে পারেনি। জীবনের প্রতিদিনের পথ পরিক্রমায় অনেকে তো অনেক ঘটনা দেখেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। মৃত্যু দেখেও তো অনেকের মনে বৈরাগ্যের শুভ-বুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু একবারও কি তার মনে এই অবধারিত উপলব্ধির দ্বারোদ্ঘাটন হয় যে একদিন তাকেও এই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে?

কিন্তু যিনি বিশ্বসংসারের সমস্ত কর্মকাণ্ডের ভাগ্য-দেবতা তিনি বড় নির্মম। তাঁর দৃষ্টিতে যেমন পুণ্যের পুরস্কার আছে, তেমনি পাপের অনিবার্য পরিণতিও তো বিধি-নির্দিষ্ট। তাকে যে অস্বীকার করবার স্পর্ধা দেখাবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট বিস্তারের কোনও কোণেও তার স্থান সংকুলান হবে না।

"আমি এই জীব-জগতের রহস্যের উন্মোচন করবো, এবং যতক্ষণ না সে-রহস্যের জাল ভেদ করতে পারি ততক্ষণ আমি আমার দেহের অস্থি-মজ্জা-মাংস-রক্ত সমস্ত কিছু উৎসর্গ করতেও কার্পণ্য করবো না"—এই প্রতিজ্ঞা যিনি করেছিলেন তিনি রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। আর যিনি একদিন বলেছিলেন "আমি সেই বোধিকে জেনেছি"—তিনি হলেন ভগবান বুদ্ধদেব। আসলে রাজকুমার সিদ্ধার্থই একদিন আবার ভগবান বুদ্ধদেবে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন।

মানুষ যে একদিন ভগবানে উত্তীর্ণ হতে পারে তার প্রমাণ আড়াই হাজার বছর আগে একজন মানবপুত্র দিয়ে গিয়েছিলেন। এ-কথা বলবার হয়ত প্রয়োজন আছে আজ! আজ যখন দেশে দেশে জনপদে জনপদে মনুষ্যত্বের অপমান হতে আরম্ভ করেছে, তখন তা প্রতিরোধ করবার জন্যে কে এগিয়ে আসবে?

ক্ষেত্রবাবুর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সেদিন সোহম্ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।

ক্ষেত্রবাবু আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—কই, উত্তর দিচ্ছ না যে? বলো কে এগিয়ে আসবে?

তখনও সোহম্ কোনও উত্তর দিতে পারেনি।

ক্ষেত্রবাবু আবার সেই একই প্রশ্ন করে বলেছিলেন—জানো সোহম্, এই একই প্রশ্ন আমি নীহারকেও করেছিলুম—

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—কী উত্তর দিয়েছিল সে?

ক্ষেত্রবাবু বলেছিলেন—নীহার বলেছিল—পারবে—। এতকাল ধরে এত হাজার হাজার ছাত্রকে আমি পড়িয়ে এসেছি, কিন্তু কেউ এ-প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেনি, তাই তোমাকেও আমি সেই একই প্রশ্ন করছি। জিজ্ঞেস করছি—তুমি কি তা পারবে?

ক্লাসের ফ্রী-শিপ্ পাওয়া ছাত্র সোহম্ সেদিন সব শুনে উত্তর দিয়েছিল—আমি পারতে চেষ্টা করবো স্যার···

বড় খুশী হয়েছিলেন সেদিন ক্ষেত্রবাবু সোহমের উত্তর শুনে।

বলেছিলেন—এই তো চাই, এই তো চাই। হতে পারা এক জিনিস আর হতে চেষ্টা করা আর এক জিনিস। কিন্তু হতে চেষ্টা করাও কি কম কথা? তুমি যখন বললে হতে চেষ্টা করবে তাতেই আমি খুশী হয়েছি। আর এই আমি, যে-

আমি তোমায় এত প্রশ্ন করছি, এই আমিই কি ওই রকম মনুষ্যত্বের অপমান প্রতিরোধ করতে পেরেছি ? আমার মতন সামান্য মানুষ আর কতটুকু এগিয়ে যেতে পারবো ? তাই আমি শুধু চেষ্টাই করে যাচ্ছি। লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি আর না পারি, চেষ্টা তো করে চলেছি। আমি চাই তোমরাও কেউ মনুষ্যত্বের অপমান প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে যাবে—

ক্ষেত্রবাবুর চরিত্রের ওই একটা দোষ ছিল। কেবল উপদেশ আর উপদেশ···

এতদিন পরে সেই সব দিনের কথা ভাবতে গিয়ে ক্ষেত্রবাবুর কথাই বার বার মনে পড়ছে।

এই নিউ আলিপুর থেকে লোয়ার সারকুলার রোডের শুরুটা পর্যন্ত পৌঁছুতে এত দেরি কেন লাগছে ? এত দেরি তো লাগবার কথা নয় তার। তার জীবনটা যত বড়, রাস্তার এই দূরত্বটুকু যেন তার চেয়েও বড় বলে মনে হচ্ছে। বড় জীবনের দূরত্বের চেয়ে বড় রাস্তার দূরত্ব যেন বরাবর বড়ই হয়। যেন বড় হওয়াটাই নিয়ম। যেমন জীবনের চেয়ে পৃথিবী বড়। এটাই তো স্বাভাবিক।

মনে আছে পরের দিন অফিসে গিয়েই সোহম্ মিস্টার সেনের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। সোহম্ যেতেই মিস্টার সেন গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের সব ঘটনাগুলো শুনলেন। একেবারে শুরু থেকে সবটা মন দিয়ে শুনলেন তিনি।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—তারপর ?

সোহম্ বললে—তারপর রাত অনেক হলো। আর তারপর রাত তিনটের সময় মিস্টার প্যাটেল যেন একটু ঝিমিয়ে পড়লেন। তখন আর কারো হিসেব রাখবার মত মনের অবস্থা ছিল না কে কত পেগ হুইস্কি খেয়েছে। তখন সবাইকে ধরে ধরে যার-যার গাড়িতে তুলে দেওয়ার পালা। তখন কেউ আর নিজের মধ্যে নিজেরা থাকে না, সবাই পরের হয়ে যায়—

মিস্টার সেন বাকিটা বুঝে নিলেন।

বললেন—দ্যাট্‌স্ গুড্—ভেরি গুড্—

কিন্তু এর পরের পদক্ষেপটা কী ?

মিস্টার সেন 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্' কোম্পানিকে খুব নিচু থেকে উঁচুতে উঠিয়েছেন। কোম্পানির আয় বাড়িয়েছেন। কোম্পানির আয় বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের আয়ও অনেক বেড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্টাফের আয়ও বেড়ে গেছে। তার জন্যে বোম্বাই-এর হেড্ অফিস থেকে মিস্টার আয়েঙ্গার তাঁকে অনেকগুলো প্রমোশন দিয়েছে। যতগুলো এই রকম অপারেশন্ করেছেন তার সবগুলোই সাক্‌সেসফুল।

এখন এবার আর একটা অপারেশন্।

মিস্টার সেন অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন—শুধু একটা পয়েণ্টের কথা আমি ভাবছি—

—কি পয়েণ্ট ?

মিস্টার সেন বললেন—ওই মিস্ সুরিটা ! ওটাকে মাঝখানে রাখলে চলবে না—

সোহম্ও ভাবতে লাগলো। বললে—ওকে বাদ দেব কী করে ?

—সেটাই তো পয়েণ্ট !

পার্টি দিলেই পাল্টা পার্টি দিতে হয়। সেইটেই সভ্য সমাজের নিয়ম। আর পার্টি মানেই কক্‌টেল পার্টি, আর কক্‌টেল না হলে পার্টি দেওয়ার কোনও মানেই হয় না। যে-বন্ধুত্ব হতে সময় লাগে দু'বছর, কক্‌টেল পার্টিতে সেই বন্ধুত্ব সেই ঘনিষ্ঠতা হতে পাঁচ মিনিটও লাগে না।

আগের যুগের মানুষ সততা সত্য-নিষ্ঠা তপস্যা আর সাধনায় বিশ্বাস করতো। সে-সব প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। তখন আমেরিকায় 'ডিক্লেয়ারেশন অব্ ইণ্ডিপেনডেন্স' হয়নি। তখন 'ফ্রেঞ্চ্ রিভোলিউশন'ও হয়নি। অর্থাৎ স্লেভ্ ট্রেডের যুগের অবসান হয়নি তখনও ভালো করে। তখন টাকা দিয়ে ক্রীতদাস কিনতে পাওয়া যেত। কিন্তু যারা দেশের মাথার ওপর নেতাগিরি করতো, তারা বড় বড় বুলি বলতো, বড় বড় স্লোগান দিত। কিন্তু নিজেরা ক্রীতদাসকে টাকা দিয়ে কিনে আবার বাড়িতেও পুষতো আর তাদের পাওনা সেবাটাও পুরোদমে ভোগ করত।

তারপরে একদিন আইন করে ক্রীতদাস-প্রথা উঠে গেল। আমেরিকা স্বাধীন হলো, ফরাসী দেশ বুরবন্ বংশের কব্জা থেকে মুক্তি পেল। আর তারপর কত রকম নামী-দামী পয়গম্বরের জন্ম হলো পৃথিবীতে। তারাও মানুষকে অত্যাচার আর শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যে নানা বুলি আওড়ালো, নানা স্লোগান দিলে, নানা মোটা মোটা কেতাব লিখলে।

দেখা গেল তারা সবাই মানুষের মুক্তিদাতার ভূমিকায় আসরে নেমে পড়েছে। আর সেই বই পড়ে রাশিয়া, চায়না প্রভৃতি সব দেশের ক্রীতদাসরাই এক হয়ে বলে উঠলো—সর্বহারার মুক্তি চাই, মুক্তি চাই—

দলের পেছনের সারির লোকগুলোও সেই সুরে সুর মিলিয়ে চিৎকার করে উঠলো—সর্বহারার মুক্তি চাই, মুক্তি চাই—

এই সর্বহারাদের মধ্যে থেকেই আবার আর এক দল নেতার আবির্ভাব হলো। তাদের মধ্যে থেকেই উদ্ভব হলো ইব্রাহিমদের। সেই ইব্রাহিমরাই আবার নেতা হয়ে বাড়ির মালিক হলো, গাড়ির মালিক হলো। আবার সেই আন্দোলনের সুযোগ নিয়েই উদ্ভব হলো ভানুভাই প্যাটেলদের। আবার সেই ভানুভাই প্যাটেলরাও দলের নেতা হয়ে বাড়ির মালিক হলো, গাড়ির মালিক হলো।

অর্থাৎ ক্যাপিট্যালিজম্ থেকে কমিউনিজম্, আবার কমিউনিজম্ থেকে ক্যাপিট্যালিজম্। তার নীট ফল হলো একই। সেই 'Man exploiting Man'।

বস্তুটা রইল একই, শুধু পদবীটা গেল বদলে।

তখন ইব্রাহিমের উল্টোপিঠের নাম দাঁড়ালো ভানুভাই প্যাটেল আর ভানুভাই

প্যাটেলের উল্টোপিঠের নাম দাঁড়ালো ইব্রাহিম। সেই থিসিস্, এ্যান্টি-থিসিস, আর সিন্‌থিসিস আর সেই সিন্‌থিসিস এ্যান্টিথিসিস আর থিসিস্। এই চক্রের মধ্যেই ঘুরতে লাগলো ইতিহাসটা।

সেই চক্রের ঘূর্ণাবর্তে তখন ক্ষেত্রবাবুরা পড়ে গেলেন পেছনের বেঞ্চিতে আর সামনে এগিয়ে এল ইব্রাহিমরা আর ভানুভাই প্যাটেলরা।

কে কাকে হারিয়ে দিতে পারে তারই লড়াই চলতে লাগলো তখন থেকে। আর তারই চাকার সঙ্গে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো 'টার্নবুল জ্যাক্‌সন্ এ্যান্ড কোম্পানি'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টার আর ডিরেক্টার মিস্টার সোহম্ রায়।

বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটে দুজনেই যদি ঝগড়া করে তাহলে বাড়ির যা অবস্থা হয়, এই পৃথিবীটারও সেই একই রকম অবস্থা হলো। মাঝখান থেকে বাড়িটা যে ভেঙে পড়ছে, সেদিকে কারো খেয়াল আর রইল না।

তা ভাঙুক, তা ভেঙে পড়ুক। পৃথিবী গোল্লায় যাক, ইণ্ডিয়াও জাহান্নমে যাক। তাতে আমাদের কিছু আসে-যায় না। তোমরা যত ইচ্ছে ঝগড়া করো তাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নেই। আমরা এই পৃথিবীতে দু'দিনের জন্য এসেছি। আমরা যে দু'দিন এখানে থাকতে এসেছি সেই দু'দিন শুধু চুটিয়ে ফুর্তি করে কাটিয়ে দিতে চাই। কাল কী হবে, পরশু কী হবে, সে-সব জানবার দায় নেই আমাদের। উই লিভ্ ইন্ দ্য প্রেজেণ্ট। বর্তমানটাই আমাদের কাছে সত্যি, ভবিষ্যৎ ভাবুক ইব্রাহিমরা আর ভানুভাই প্যাটেলরা।

সুতরাং সেন সাহেবের প্রস্তাব হলো ওই ভানুভাই প্যাটেলকে পাল্টা পার্টি দেবে সোহম রায়। টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানির ডাইরেক্টার।

তা তাই ই দেওয়া হলো। গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবে সেদিনও সব মেম্বাররা জমায়েত হলো ঠিক আগের বারের মত। সেদিনও ভানুভাই প্যাটেল সকলকে হাসিয়ে, সকলকে নাচিয়ে, সকলকে মাতাল করে দিয়ে, সকলকে হুল্লোড়ের স্রোতে ডুবিয়ে বাজি মাৎ করলেন।

কিন্তু এ-রকম পার্টি দেওয়া আর কত দিন চলবে? তাতে তো টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানির উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না।

এবার হতে হবে ঘনিষ্ঠ।

সেই ঘনিষ্ঠ হতে গেলে কী করতে হবে?

মিস্টার সেন প্রস্তাব দিলেন—ইব্রাহিমকে যেমন কায়দায় জব্দ করেছিলে তুমি, এই ভানুভাইকেও সেই একই রকম করে জব্দ করতে হবে। তা না হলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না। বোম্বাই থেকে মিস্টার আয়েঙ্গার আমাকে একটা স্পেশ্যাল ডেমি-অফিসিয়াল লেটারে এই কথা লিখেছেন—

—তাঁর কী মত?

—তিনি তোমাকে আর একটা প্রমোশন দিতে বলেছেন।

সোহম নিজের চাকরিতে প্রমোশনের কথা শুনে খুশী হলো।

জিজ্ঞেস করলে—তাতে আমার পে-প্যাকেটে কত টাকা বাড়বে?

মিস্টার সেন বললেন—রাউণ্ড অ্যাবাউট টু-থাউজাণ্ড চিপ্‌স্—অল

ফাউণ্ড—। তোমাকে যেতে হবে ইরাকে। এক মাস দু' মাসের জন্যে নয়, এই ধরো এক বছরের জন্যে—

—ঠিক আছে।

মিস্টার সেন বললেন—কিন্তু একটা কন্‌ডিশান্‌—

—কী কন্‌

—তোমার মিসেসকে কলকাতায় একলা থাকতে হবে। মিসেস রায় তা পারবেন?

সোহম্‌ বললে—কেন পারবে না? কিন্তু আমার কলকাতার এস্‌ট্যাব্‌লিশমেণ্ট কী করে চলবে? সে খরচ কে সামলাবে?

মিস্টার সেন বললেন—সে দায় তোমার নয়, কোম্পানির। কোম্পানি এখানকার এস্‌ট্যাব্‌লিশমেণ্ট্‌ চালাবার সব খরচ বেয়ার করবে। তখন মিসেস রায় যদি ভানুভাই প্যাটেলকে বাড়িতে পার্টি দিতে চান তো সে খরচাও কোম্পানি দেবে—

এত বড় প্রমোশন, এতগুলো টাকা, এ সবই গরীব বাপ মা-মরা সোহমের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত। এ প্রলোভন দমন করা শুধু সোহম্‌ রায়ের কাছে নয়, যে কোনও চাকরি-জীবীর কাছেই অসম্ভব! টাকা বলে কথা!

আর সুমিত্রা?

সুমিত্রাকে সে যে কোনও প্রকারে হোক রাজি করাবেই। সোহম্‌ বলবে—মাত্র তো একটা বছর। একটা বছর তুমি একলা থাকতে পারবে না?

সুমিত্রা হয়ত এ কথায় প্রথমে রাজি হবে না। তখন তাকে টাকার লোভ দেখাতে হবে। টাকাতে কে না ভোলে? বিশেষ করে সে যদি মেয়েমানুষ হয়!

সোহম্‌ বললে—ঠিক আছে স্যার, আই এগ্রি—

মিস্টার সেন ভাবতে পারেননি যে মিস্টার রায় এই সব কন্‌ডিশন দেওয়া সত্ত্বেও এত সহজে রাজি হয়ে যাবে!

সোহম্‌ আবার বললে—ঠিক আছে স্যার, আই এগ্রী···

সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার সেন ইম্‌প্রেস্ট ক্যাশের সিন্দুকটা খুলে তা থেকে হাজার পাঁচেক টাকা বার করে সোহমের হাতে দিলেন।

বললেন এই টাকাগুলো তুমি রাখো, তোমার প্রিলিমিনারি খরচের জন্যে এটা তোমাকে দিলুম—

সোহম্‌ সেই দিনই অফিস থেকে বাড়ি ফেরবার আগে চৌরঙ্গীর একটা জুয়েলারির দোকানে নামলো। তারপর যেটা সব চেয়ে দামী অর্নামেণ্ট্‌ চোখের সামনে পড়লো সেইটেই ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনে নিলে।

আর তখনই সোহমের জীবনে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল!

বাড়িতে পৌঁছিয়ে গাড়িটা গ্যারাজে রেখেই সোহম্ নিজের ফ্ল্যাটের সদর দরজায় গিয়ে রিং করলে। অন্যদিন দরজা খুলে দেয় বদ্যিনাথ। কিন্তু সেদিন এক অবাক কাণ্ড! দরজা খুলে দিলে সুমিত্রা!

—এ কী, তুমি যে? বদ্যিনাথ কোথায় গেল?

সুমিত্রার দিকে চেয়ে সোহম্‌ও যেন এক অন্য সুমিত্রাকে আবিষ্কার করলে!

সুমিত্রা বললে—আমি বদ্যিনাথকে বাজারে পাঠিয়েছি—

—বাজারে? কেন? কী কিনতে গেল আবার সে?

—হুইস্কি—

সোহম্ যেন আকাশ থেকে পড়লো! সুমিত্রার আজ এ কী উন্নতি হলো! এমন তো কখনও হয় না! বরাবর সোহম্‌ই তো সুমিত্রাকে হুইস্কি খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে। আজ এ কী অভাবনীয় পরিবর্তন! সুমিত্রা তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে। অনেকটা দুষ্টুমির হাসি। যে হাসিতে সে একদিন ইব্রাহিমের মত কট্টর কমিউনিস্টকে জব্দ করেছিল, এই হাসিটাও যেন অনেকটা সেই রকম দুষ্টু হাসি।

সোহমের কৌতূহল তখন জিজ্ঞাসার পারা ব্যারোমিটারে একশো দশ ডিগ্রী পেরিয়ে গিয়েছে।

—কী হুইস্কি?

সুমিত্রা বলল—হোয়াইট হর্স, বর্ন ইন্ সেভেন্টিননাইন্টটি-ফোর এ্যাণ্ড স্টীল গোইং স্ট্রং—

সোহম্ বললে—দূর, ও হুইস্কি কিনতে পাঠালে কেন? ওর চেয়ে 'কিং অব কিংস্' কিনতে পাঠালে পারতে। কিংবা 'ডিম্‌পিল্'—

বলেই জুয়েলারির দোকান থেকে সদ্য কেনা অর্নামেণ্টটা বার করলে সোহম্।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে—এ কী?

—এটা একটা অর্নামেণ্ট—

—হঠাৎ এটা কিনতে গেলে কেন?

সোহম্ বললে—তুমি জানো না আজকে আমাদের ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি? ঠিক এই তারিখেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল—মনে নেই?

সুমিত্রা তখনও বড় বড় চোখ বার করে গয়নাটার দিকে দেখছে।

সোহম্ বললে—আরো একটা খবর আছে···

—কী? কী খবর?

সোহম্ বললে মিস্টার সেন আজকেই আমাকে জানালেন খবরটা। আমাকে এক বছরের জন্য ইরাকে যেতে হবে। একস্ট্রা আরো দু-থাউজ্যাণ্ড্ চিপস্ পাবো অল্ ফাউণ্ড। আর এখানে কলকাতার সমস্ত এস্ট্যাব্লিশমেণ্ট্ খরচ

কোম্পানি দেবে—

সুমিত্রা তখন খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বললে—সে-সব কথা পরে শুনব—

সোহম্ বললে—সে কী? তুমি এখন এত ব্যস্ত কেন? কী হয়েছে তোমার?

—না, কিছু হয়নি। বদ্যিনাথ হুইস্কি আনতে এত দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না—

সোহম্ বললে—কিন্তু হোয়াইট হর্স হুইস্কি আনতে দিলে কেন? বললুম তো, যদি হুইস্কি খেতেই হয় তো 'কিং অব্ কিংস্' কিংবা 'ডিম্‌পিল্' আনতে দিলেই পারতে—

সুমিত্রা বলে উঠলো—কিন্তু উনি যে 'হোয়াইট্ হর্স' হুইস্কিটাই বেশি পছন্দ করেন—

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—উনি? উনি কে?

—মিস্টার ভানুভাই প্যাটেল!

—হোয়াট্?

খট্‌খটে রোদ্দুরে মাথার ওপর বাজ ভেঙে পড়লেও মানুষ হয়ত এত আশ্চর্য হয় না।

—কী বললে? আর একবার বলো? মিস্টার ভানুভাই প্যাটেল? তুমি স্বপ্ন দেখছো নাকি? মিস্টার ভানুভাই প্যাটেল আমাদের বাড়িতে? একলা?

—হ্যাঁ।

সোহম্ বললে—কিন্তু বাড়ির সামনের রাস্তায় তো ওঁর গাড়ি দেখলুম না!

সুমিত্রা বললে—ওঁর সোফারকে উনি গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছেন। দরকার হলে বাড়িতে ফোন করে দেবেন বলেছেন—

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—আর মিস্ সুরিটা?

—তাকে না জানিয়েই মিস্টার প্যাটেল এখানে চলে এসেছেন—

সোহম্ বললে—তাহলে তো আমার আর এখানে থাকা চলবে না। এমন সুযোগ হয়ত আর আসবে না আমার জীবনে। আমি এক কাজ করি···

—কী কাজ?

সোহম্ বললে—তার চেয়ে আমি আজ রাতটার মত কোনও হোটেলের একটা স্যুট্ ভাড়া নিয়ে সেখানেই গিয়ে থাকি। আজকে সেখানেই ডিনার খেয়ে নেব। কাল সকালবেলা বাড়িতে আসবো। এখন তুমি মিস্টার প্যাটেলকে পেট ভরে হুইস্কি খাইয়ে কাজ আদায় করো। বুঝলে? বুঝলে তো?

বলে সোহম্ আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোহম্ যেমন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এসেছিল তেমনই আবার সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেল।

সোহম্ জানতো যে শিগ্‌গিরই তার জীবনে এবার ওয়াটার্লুর যুদ্ধ শুরু হবে, কিন্তু সে যুদ্ধ যে এত তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে তা তার জানা ছিল না।

দেখা যাক এবার কে জেতে কে হারে! ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, না নেপোলিয়ন? কে?

এত দিন পরে অতীতের দিকে চোখ ফেরালে সোহম্ কী দেখতে পাবে? সুদূর অতীত নয়, নিকট-অতীত।

সুদূর অতীত মানে তো ছেলে-বেলা। ছেলে-বেলাটা যত কষ্টের, পরবর্তী জীবনকালের অতীতটা তার কাছে আরো বেশি কষ্টের। ছোটবেলাকার কষ্ট-গুলো সহ্য করা শক্ত নয়। তখন যত কষ্টই হোক তা হয়ত সহ্যশক্তির আয়ত্তের মধ্যে থাকে। কারণ শরীর তখন থাকে মজবুত, মন তখন থাকে পল্লব গ্রাহী।

তারপর বয়েস বাড়ে। আস্তে আস্তে আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হতে থাকে। তখন দেহ চায় একটু আরাম, একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয়, একটু ভালবাসার স্পর্শ।

কিন্তু সোহম্ কী তার জীবনে তা পেয়েছে?

যদি না পেয়ে থাকে তো কেন পায়নি?

আজ ভেবে দেখলে সোহম্ দেখতে পাবে তখন সেই বয়েসে সে যা কষ্ট পেয়েছে তার চেয়ে হাজারগুণ কষ্ট পেয়েছে সে তার মধ্যজীবনে। যখন থেকে সে অফিসে ঢুকেছে, যখন থেকে সে বিয়ে করেছে, যখন থেকে সে মেহের আলির সংস্পর্শে এসেছে, যখন থেকে সে শেয়ার কিনতে শুরু করেছে, আর যখন থেকে চাকরিতে তার প্রমোশন হতে আরম্ভ করেছে।

অর্থাৎ যেদিন থেকে সে টাকাকেই ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম বলে মনে করতে শিখেছে।

তারপর তার সেই ইরাক যাত্রা। ইরাক যাত্রা মানেই তার মাইনে আরো দু'হাজার টাকা বেড়ে যাওয়া।

আর সেদিন তার মাইনে বেড়ে যাওয়াই তার জীবনে কাল হলো।

ভানুভাই প্যাটেল যে-রাত্রে তার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল, সে-রাত্রে সে হোটেলে গিয়ে রাত কাটিয়েছিল একটা দামী স্যুট ভাড়া করে।

মনে আছে সেই রাত্রেই সেই হোটেলে দেখা হয়ে গিয়েছিল মেহের আলির সঙ্গে।

মেহের আলিকে দেখে সোহম্ও অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

সোহম্ অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—এ কি মেহের আলি, তুমি? তুমি এখানে?

মেহের আলি সাহেবও অবাক হয়ে গিয়েছিল মিস্টার রায়কে সেই হোটেলে দেখে।

জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি? আপনি কেন এখানে রায় সাহেব?

সোহম্ বলেছিল—এখানে একজনের সঙ্গে আমি মীট করতে এসেছি। কিন্তু আপনি এখানে কেন?

মেহের আলি সাহেব বলেছিল—যেখানে টাকার গন্ধ সেখানেই তো আমি!

এসব তো জানেন আপনি রায় সাহেব। আমি আপনার কাছে যে-জন্যে যাই, এখানেও সেই জন্যে এসেছি। এখানে একটা ক্লায়েণ্ট আছে আমার—

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার ক্লায়েণ্ট কি সব জায়গায় আছে মেহের আলি সাহেব ?

মেহের আলি সাহেব বলেছিল—টাকার গন্ধ যেখানেই আছে সেখানেই আমি যাই রায় সাহেব ·

সোহম্ বলেছিল—এমন একটা জায়গার কি নাম বলতে পারো মেহের আলি সাহেব, যেখানে টাকার গন্ধ নেই ?

হো হো করে হাসতে লাগলো মেহের আলি সাহেব।

বলেছিল—সব জায়গায় টাকার গন্ধ আছে বলেই তো দুনিয়ার শেয়ার-মার্কেট আজ এত তেজী ··

সোহম্ বলেছিল—আচ্ছা মেহের আলি সাহেব, তুমি বলতে পারো তুমি এত টাকা দালালী পেয়ে তোমার কত টাকা ব্যাঙ্কে জমেছে ?

মেহের আলি বলেছিল—টাকা ? আমার টাকার কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি ! টাকার কথাই বলছি !

মেহের আলি বলেছিল— আমার কত টাকা আছে তার তো হিসেব নেই—

—হিসেব নেই ?

মেহের আলি বলেছিল হিসেব কী করে থাকবে রায় সাহেব ? আমি তো ব্যাঙ্কে আমার টাকা রাখি না—

—ব্যাঙ্কে টাকা রাখো না তো কোথায় রাখো ?

মেহের আলি বলেছিল—যারা বোকা তারাই কেবল ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে আমি বলতে পারতুম আমার কত টাকা আছে—আমি সব টাকা ক্যাশ করে রাখি—

—কোথায় ? কোথায় রাখো তোমার টাকা ?

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই হঠাৎ দেখা গেল দূর থেকে মিস্ সুরিটা যাচ্ছে—

মিস্ সুরিটা কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেয়েছে সোহম্‌কে।

ভানুভাই প্যাটেল যখন তাদের বাড়িতে তখন মিস্ সুরিটা এখানে কী করতে এসেছে ?

মিস্ সুরিটার মুখখানা বড় ভার-ভার।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—আপনার কি হয়েছে মিস্ সুরিটা ?

সোহমের সামনে এসে মিস্ সুরিটা বললে—সর্বনাশ হয়ে গেছে মিস্টার রায় !

—কী সর্বনাশ হলো আপনার ?

মিস্ সুরিটা বললে—মিস্টার প্যাটেল ইজ মিসিং ·

—মিস্টার প্যাটেল ইজ মিসিং ? হোয়াট ডু ইউ মীন ?

মিস্ সুরিটা বললে—হ্যাঁ, সেই গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের ককটেল পার্টির পর থেকে আর মিস্টার প্যাটেলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—

সোহম্ বললে—কেন ? কোথায় গেলেন তিনি ?

—তা জানি না। গাড়ির ড্রাইভার পর্যন্ত জানে না কোথায় গেছেন তিনি। এ রকম তো কখনও হয় না !

—কোথায় যেতে পারেন তিনি তা হলে ?

মিস্ সুরিটা একটু শ্রাগ করলে।

বললে—গড্ নোজ—

সোহম্ এবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায়ই বা তিনি যেতে পারেন ?

মিস্ সুরিটা বললে—আমি তো সব জায়গাতেই টেলিফোন করেছি। বোম্বাই, আহমেদাবাদ, দিল্লী অফিসেও টেলেক্সে কথা বলেছি। কোথাও নেই তিনি। তারপর কোথাও তাঁকে খুঁজে না পেয়ে এখন কলকাতার সব ফাইভ-স্টার হোটেলে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখানেও কোথাও নেই—

—তাহলে কী হবে ?

মিস্ সুরিটা বললে—তা তো জানি না। সেই গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের পার্টির পর থেকেই মিস্টার প্যাটেল একেবারে কম্প্লিট্লি চেনজ্ড্ ম্যান—

সোহম্ বললে—আপনার খাওয়া হয়েছে ?

মিস্ সুরিটা বললে—না—

সোহম্ বললে—তাহলে আপনি আমার গেস্ট্ হয়ে যান্। আমি আপনার হোস্ট হবো। আপত্তি আছে ?

মিস্ সুরিটা বললে—মেনি মেনি থ্যাঙ্ক্স্—

সোহম্ তখনই বয়কে ডাকলে—বয়—

বয় আসতেই সোহম্ বললে—হুইস্কি লাও—ডিম্‌পিল্ তিন পেগ্—

সোহমের বাড়িতে তখন মিস্টার প্যাটেল নেশার ঘোরে সোফার ওপরেই ঢলে পড়েছে।

তারপর কোনও রকমে চোখ তুলে বললে—মিস্টার রায় কোথায় গেলেন মিসেস্ রায় ?

সুমিত্রাও তখন টলছে। বললে—তিনি আজ রাতে বাড়ি আসবেন না—

—কেন ? কোথায় গেছেন তিনি ?

সুমিত্রা বললে—তিনি মর্নিং ফ্লাইটে হংকং গেছেন—

—হংকং ?

—হ্যাঁ, তাঁর আসতে দু'একদিন দেরি হবে—

কথাটা শুনে মিস্টার প্যাটেল যেন নিশ্চিন্ত হলো। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সোফার ওপরে আরামে গা এলিয়ে দিলে।

বললে—আর একটা ডিম্‌পিল্ আনাবার ব্যবস্থা করুন—

বলে পকেটের ওয়ালেটটা বার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুমিত্রা বাধা দিলে।

বললে—আপনি আমার গেস্ট্, আমি আজকে আপনার হোস্টেস্—আপনার ওয়ালেট্ আপনি পকেটে রেখে দিন—

বলে বদ্যিনাথকে ডাকলে।

বদ্যিনাথ আসতেই বললে—আর এক বোতল ডিম্‌পিল্ নিয়ে আসবি, এই নে টাকা—

ভানুভাই প্যাটেল বললে—ডিম্‌পিল্ না পেলে যেন 'কিং অব্ কিংস' নিয়ে আসে—

বলে আবার নতুন করে একটা সিগারেট ধরালে—

জীবনে ভানুভাই প্যাটেল স্ত্রী-সংসর্গ কম করেনি। তার জীবনে টাকা যেমন অনায়াসে এসেছে, নারীও তেমনি এসেছে অনায়াসেই। অনায়াসে সব জিনিস পেয়ে পেয়ে এখন এমন হয়ে গেছে যে কোনও কিছু পাওয়ার মধ্যে তার আর আগ্রহ বা আসক্তি কিছুই নেই।

মাঝে মাঝে ভানুভাই প্যাটেল নিজেকেই নিজে একটা প্রশ্ন করে। প্রশ্ন করে—কোন্ জিনিসটা পেলে তার সব চেয়ে আনন্দ হয়? টাকা, না মদ, না নারী?

এর উত্তর ভানুভাই প্যাটেল কোনও দিনই পায়নি। আর হয়ত কোনও দিন পাবেও না।

হয়ত এটা প্রকৃতি-জগতের একটা অনিবার্য নিয়ম। যা সহজে পাওয়া যায় মানুষ বোধ হয় সেটা পেলেও তা সহজেই হারিয়ে ফেলে।

ফাইভ্-স্টার হোটেলের মধ্যে বসে বসে সোহম্ সেদিন কী কথা ভেবেছিল? কার কথা ভেবেছিল? কোন্ জিনিসকে নিবিড় করে পেতে চেয়েছিল?

আজ এতদিন পরে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে সে-সব কথা মনে করতেও যেন তার লজ্জা হচ্ছে!

গাড়ির হেড-লাইটের আলোয় দেখা গেল দূরে একটা পুলিস তার গাড়িটার উদ্দেশ্যে একটা হাত তুলেছে। হাত তুলে গাড়ির চালককে থামতে ইঙ্গিত করছে।

কিন্তু পুলিস কেন তাকে থামতে ইঙ্গিত করবে? সোহম্ কী অপরাধ করেছে?

সোহমের মনে হলো—হ্যাঁ, সে অপরাধই করেছে।

কী তার অপরাধ?

প্রশ্নটা নিজেকে করলেও নিজের প্রশ্নের উত্তরটা সোহম্ নিজেই দিয়েছে। কী-কী অপরাধ সে করেছে সে প্রশ্নের চেয়ে বলা ভালো কী-কী অপরাধ সে করেনি।

বহুদিন আগে একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল সোহম্। তখন ভালো করে সন্ধ্যেও হয়নি। অফিসের যাত্রীরা জোরে জোরে যে-যার বাড়ির দিকে ফিরছে।

হঠাৎ রাস্তার ফুটপাথের ওপর তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।

—কী? কী চাও?

—বাবু, আমার একটা কথা শুনবেন?

—কী কথা? আমার এখন কথা বলবার সময় নেই—

সেদিন সোহমের হাতে অনেক সময় ছিল। মাসের পয়লা তারিখ সেদিন। পকেটে সমস্ত মাসের মাইনের টাকাগুলোও বুকপকেটের মধ্যে রয়েছে। তার ওপর অনেক খুচরো পয়সাও রয়েছে। তার সঙ্গে আছে মানসিক শান্তি। ঠিক এই সময়েই ছেলেটা সামনে এসে দাঁড়ালো।

সোহম্ চিৎকার করে উঠলো—কী? কী চাও?

সোহম্ দেখলে ছেলেটার বয়েস বেশি নয়। দুঃস্থ মানুষের মত চেহারা। বহু রাত্রি-জাগরণের ছাপ সে চেহারায়। শুধু তাই নয়, তাকে দেখেই মনে হয় অনেকদিন ধরেই না খেয়ে আছে সে।

লোকটা বললে—বাবু, আমার একটা কথা শুনবেন?

রাস্তার একটা গরীব ভিখিরি কিনা সোহমকে তার কথা শোনাতে চায়? এত বড় তার স্পর্ধা?

সোহম্ রেগে গিয়ে বলেছিল—আমার এখন কথা শোনবার সময় নেই—

বলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তা সে পারেনি।

ছেলেটা ঘুরে এসে তার সামনে পথ আটকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বলেছিল—আমার কথাটা একবার শুনুন না বাবু—

সেদিন সোহমের মনে হয়েছিল ছেলেটার গালে জোরে একটা থাপ্পড় মারে। কিন্তু ছেলেটাকে ছুঁতেও তার ঘেন্না হয়েছিল।

—একটা কথা শুনুন না বাবু, আমি বড় বিপদে পড়েছি—

—তুই বিপদে পড়েছিস তো আমার কী?

ছেলেটা বলেছিল—বাবু, গরীবের কথা যদি আপনারা না শোনেন তো কাকে শোনাবো? কারা আমাদের কথা শুনবে? আমাদের যে কেউ নেই পৃথিবীতে—

তবু সোহমের মন গলেনি ছেলেটার কথায়। সোহমের জামার বুকপকেটে তখন এক মাসের পুরো মাইনেটা রয়েছে। সে তখন কার পরোয়া করবে?

—ওই দেখুন না বাবু, ওই দিকে একবার চেয়ে দেখুন না—

রাগে সোহমের আপাদমস্তক জ্বলে উঠেছিল।

বলেছিল—আবার? আবার আমাকে বিরক্ত করছিস?

ছেলেটা তখন কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। বলেছিল—ওই দেখুন না বাবু, ওখানে আমার বাবা মরে পড়ে রয়েছে—সৎকার করবার টাকা নেই আমার কাছে-যদি...

মনে আছে সোহম্ এক মুহূর্তের জন্যে ফুটপাথের শেষদিকে চেয়ে দেখেছিল। দেখেছিল একটা ছেঁড়া ময়লা কাপড় দিয়ে কী একটা বস্তু ঢাকা রয়েছে। বোধ

হয় মানুষই একটা। একটা মৃত মানুষ। ছেঁড়া ময়লা কাপড়টার ওপর তখন অনেকগুলো মাছি বসে আছে চুপ করে।

—দিন না বাবু, একটা দশ নয়া দিন না—

—যা ভাগ্—ভাগ—

বলে সোহম্ ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তবে চলে আসবার পরে শুধু একবার পেছনে ফিরে দেখেছিল। দেখেছিল ছেলেটা তার আচমকা ধাক্কা খেয়ে একেবারে রাস্তার ওপরে পড়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে একবার ককিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

তারপর সোহম আর সেখানে দাঁড়ায়নি। জোরে জোরে হেঁটে সে এমন এক দূরত্বে চলে গিয়েছিল যেখান থেকে ছেলেটার কান্না আর তার কানে না আসতে পারে।

মজাটা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সম্পূর্ণ হলো তখনই যখন কিছুদিন পরে অবিনাশবাবু অফিসে এলেন।

অবিনাশবাবুর চেহারা দেখে সবাই অবাক।

অশৌচের পোশাক। সাদা থান পরনে। মুখে তিনদিন ধরে না-কামানো দাড়ি। খালি পা, হাতে পশমের একটা আসন।

সবাই তাঁকে দেখে তাঁর দিকে এগিয়ে এল অবাক হয়ে।

—কী হলো অবিনাশবাবু? কী হলো আপনার?

অবিনাশবাবু ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করতেন হাওড়া লাইনের বাগনান থেকে। কখনও অফিস কামাই করতেন না। তাঁর বাবা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। তবে? তবে কি এবার মা মারা গেলেন?

অবিনাশবাবু বললেন—না, আমার কাকা মারা গেছেন—

—কাকা?

-হ্যাঁ, আমার আপন কাকা। আমার কাকা আর আমার খুড়তুতো ভাই, দু'জনেই মারা গেছেন একসঙ্গে।

সোহমের বুকটা হঠাৎ কথাটা শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। তবে কি···

—কাকা তো আমার কাছে থাকতেন না, তিনি থাকতেন শ্যামনগরে। তাঁরও অনেক বয়েস হয়েছিল। কাকিমা আগেই মারা গিয়েছিল। কাকা ছেলেকে নিয়ে থাকতেন শ্যামনগরে। কিছু জমিজমা ছিল, তাই-ই তিনি দেখাশোনা করতেন। আমি অনেকবার কাকাকে বলেছি আমার কাছে বাগনানে এসে থাকতে। কিন্তু জমি-জমা ছেড়ে তিনি আসতে চাইতেন না। অথচ সে জমি-জমাও এমন কিছু বহুমূল্য জিনিস নয়। আসলে মায়া। প্রপার্টির জন্যে মায়া—

সবাই জিজ্ঞেস করলে—তারপর? তারপর?

—তারপর কদিন আগে কাকার একটু অসুখ হলো। প্রথমে জ্বর, তারপর সর্দি-কাশি। তারপর জ্বর একটু বাড়লো। তবু কাকা কোনও ডাক্তারকে দেখালেন না। ডাক্তারকে দেখালেই তো টাকা লাগবে। আজকালকার ডাক্তারদের তো জানেন? কেবল টাকা—কেবল টাকা। তারপর যখন জ্বর আরো বাড়লো,

তখন তিনি ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে বাগনানে আসবার জন্যে ট্রেনে চেপে বসলেন। তারপরে ট্রেন থেকে শেয়ালদা স্টেশন। সেখান থেকে বাসে বা ট্রামে চেপে হাওড়া স্টেশনের দিকে আসবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাসে-ট্রামে ভিড়ের জন্যে কোনোটাতেই উঠতে পারলেন না। শেষে ওই শরীর নিয়ে হাঁটা—

—তারপর? তারপর কী হলো?

—তারপর একটা রাস্তার মোড়ে এসে নাকি কাকার খুব জলতেষ্টা পেয়েছিল। পাশে একটা গলি। সেই গলিতে একটু ছায়ার নিচে আশ্রয় নেবার জন্যে আমার ভাই বাবাকে সেইখানে নিয়ে গেল। সেইখানেই আমার কাকা মারা পড়লেন—

—আর আপনার খুড়তুতো ভাই? সে কী করলে?

—সে আর কী করবে? চোখের সামনে সে আস্তে আস্তে বাবাকে মরতে দেখলে চুপ করে। সে বাবাকে এক ফোঁটা জলও খেতে দিতে পারলে না তাঁর শেষ সময়ে।

—তারপর?

অবিনাশবাবু বলতে লাগলেন—তারপর সে নিজের গায়ের চাদরটা বাবার গায়ের ওপর চাপা দিয়ে ভিক্ষে করতে লাগলো। গলি থেকে বড় রাস্তায় বেরিয়ে সে লোকের কাছে ভিক্ষে করতে লাগলো। বাবার মৃতদেহটাকে কোনো রকমে সৎকার তো করতে হবে। সেটাকে তো আর সেখানে ফেলে রাখলে চলবে না। এমনি করে দিন দুই কাটলো। একজন-দুজন পয়সা অবশ্য দিলে কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তাকে ভাগিয়ে দিলে। সবাই বললে—বুজরুক্—

যারা এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিল তারা এবার আরো আগ্রহী হয়ে উঠলো। বলতে লাগলো—তারপর?

—তারপর আমার খুড়তুতো ভাই আর কী করবে, তারও দু'দিন পেটে একটু জলও পড়েনি। সে যাকে পাচ্ছে তাকে গিয়েই নিজের অবস্থার কথা বলছে। কিন্তু কে তার কথা শুনবে? ততক্ষণ খেলার মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলার টিকিট কেনার লাইনে দাঁড়ালে কাজ হবে, সিনেমার টিকিট-ঘরের লাইনে দাঁড়ালেও একটা কাজের মত কাজ হবে, কিম্বা আজকাল তো আবার টেলিভিশন বলেও একটা নতুন নেশার খোরাক হয়েছে। বাজে লোকের কথা কানে না তুলে বরং সেটার সামনে বসলেও মনটা একটু জুড়োবে—

—তারপর? তারপর?

অবিনাশবাবু বলতে লাগলেন—তারপর একটা কাণ্ড ঘটলো এ-মাসের পয়লা তারিখে। সেদিন অনেক অফিসেই মাইনে হয়েছে। সেই মাইনের টাকাগুলো নিয়ে সবাই সেদিন অফিস থেকে ফিরছে। আমার ভাই ভাবলে—সেদিন যখন মাস-পয়লা, তখন কারো-না-কারো একটু দয়া হবেই। কিন্তু সেদিনও একই অবস্থা। শেষকালে একটা কাণ্ড হলো। একজন ভদ্রলোক ওই রাস্তা দিয়ে ফিরছিল, আমার ভাই তার কাছে গিয়েও নিজের দুরবস্থার কথা জানালে। কিন্তু আশ্চর্য আজকালকার মানুষের মন। সেই ভদ্দরলোক কী করলে জানেন?

শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। সেই ভদ্রলোক ছেলেটাকে এমন জোরে ধাক্কা দিলে যে সে ঠিক্‌রে একেবারে বড় রাস্তার ওপরে গিয়ে পড়ে গেল।

—তারপর?

—তারপর পেছন দিক থেকে একটা বাস ছুটে আসছিল, তারই তলায় চাপা পড়ে আমার ভাই একেবারে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেল।

খানিকক্ষণের জন্যে তখন আর কারো মুখেই কোনও কথা বেরোল না। সকলের চোখের সামনেই একটা নীরব ছিছিক্কার ঘরের আবহাওয়াকে কলঙ্কিত করতে লাগলো।

—তা আপনি এ-খবর পেলেন কী করে?

অবিনাশবাবু বলতে লাগলেন - সেও এক কাণ্ড! আমার জানা-শোনা এক ভদ্রলোক কী করে সেইখানে হাজির ছিলেন। তিনি ওই বাসেই ছিলেন। তিনিই মৃতদেহটা দেখে চিনতে পারলেন। চিনতে পেরে আমাকে খবরটা দিতেই আমি চলে গেলাম শ্যামনগরে। সেখানে গিয়েই আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম—

অবিনাশবাবু থামলেন।

বললেন—এই-ই হলো মশাই আমাদের জাত। আমরা এখন সবাই পশু হয়ে গিয়েছি মশাই—সবাই জানোয়ার হয়ে গিয়েছি আমরা—

আর আশ্চর্য, সোহম্‌ও সেদিন জোর গলায় বলে উঠেছিল—সব দেখেশুনে আমার কী ইচ্ছে করে জানেন? ইচ্ছে করে সব বাঙালীদের গুলি করে মারি। এদের পশু বললে কম বলা হয়, এরা হচ্ছে শয়তান, এক-একটা আস্ত শয়তান। এদের ধরে ন্যাংটো করে গড়ের মাঠে ধরে ধরে সকলের সামনে চাবুক মারা উচিত।

অপরাধ? অপরাধ কি তার একটা?

কিন্তু সেদিন সে-কথা তার মনে ছিল না কেন? সেদিন কেন সে বাড়িতে স্ত্রীর কাছে ভানুভাই প্যাটেলকে রেখে সমস্ত রাতটা ফাইভ্‌-স্টার হোটেলে কাটিয়েছিল?

মনে আছে সেদিন হোটেলে মিস্‌ সুরিটার সঙ্গে ড্রিংক করতে করতে অনেক কথা হয়েছিল।

মিস্‌ সুরিটা বলেছিল—আচ্ছা বলুন তো মিস্টার রায়, মিস্টার প্যাটেল হঠাৎ কোথায় গেলেন? কোথায় যেতে পারেন?

সোহম্‌ বলেছিল—আমার চেয়ে তো আপনিই মিস্টার প্যাটেলকে বেশি ভালো করে চেনেন! আমার সঙ্গে তো তাঁর নতুন আলাপ! আপনিই আন্দাজ করুন না কোথায় তিনি যেতে পারেন?

মিস্‌ সুরিটা বলেছিল—আমি যতদূর জানি মেয়েদের ওপর মিস্টার প্যাটেলের

মোটেই দুর্বলতা নেই—

—তাহলে তাঁর কীসের ওপর দুর্বলতা আছে ?

—টাকার ওপর—

সোহম্ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—টাকার ওপর দুর্বলতা ? কী বলছেন আপনি ?

—কেন ? তাতে অবাক হওয়ার কী আছে ?

সোহম্ বললে—অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে গরীব লোকদেরই তো টাকার ওপর দুর্বলতা থাকে, ওঁর মত বড়লোকের পক্ষে টাকার ওপর দুর্বলতা কেন থাকবে ? আমরা ছোটবেলা থেকে গরীব, তাই টাকার ওপর দুর্বলতা থাকা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ওঁর তা থাকবে কেন ?

মিস্ সুরিটা গেলাসে চুমুক দিয়ে বললে—তাহলে মিস্টার রায় আমার মনে হচ্ছে আপনি বড়লোক বেশি দেখেননি।

সোহম্ বললে—কেন, আমি তো অনেক বড়লোক দেখেছি—

—কোন্ বড়লোকদের দেখেছেন ?

সোহম্ বললে—কেন, আমাদের অফিসের বস্ মিস্টার এন্-বি-সেনকে দেখেছি, আমাদের বোম্বে অফিসের চীফ্ মিস্টার আয়েঙ্গারকে দেখেছি, তারপর আমাদের কলকাতার যত ক্লাবে আমি যাই, সেখানেও অনেক বড়লোক আসে, তাদের সঙ্গে মিশেও দেখেছি। বড়লোক আমি দেখিনি, কে বললে ?

মিস্ সুরিটা বললে—দু'টো চোখ থাকলেই কি দেখা যায় ? সব মানুষেরই তো দু'টো করে চোখ আছে। তাদের সবাই-ই যদি দেখতে পেত তো তারা সবাই-ই তো এক-একজন ভানুভাই প্যাটেল হয়ে যেত—। রক্‌ফেলার, ফোর্ড, ভানুভাই প্যাটেল—এরা তো গণ্ডায় গণ্ডায় পৃথিবীতে জন্মায় না

তারপর গেলাসে আর একবার চুমুক দিয়ে আবার বলতে লাগলো—কাকে বলে বড়লোক তা আমি দেখেছি—

—কী রকম ?

—এ রকম লোক আমি গাদা গাদা দেখেছি যারা নিজের বাড়িতে নিজের হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়েও খায় না। একজন চাকর গেলাসটা তাদের মুখের কাছে বাড়িয়ে দিলে তবে তারা সে-জল খায়, আর পাশে আর একজন চাকর হাতে তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জল খাওয়া হয়ে গেলে সেই তোয়ালে দিয়ে সে প্রভুর মুখ মুছিয়ে দেয়। অথচ সেই প্রভুই আবার তার মিস্ট্রেসের বাড়ি গেলে সেখানে নিজের হাতে চা তৈরি করে সেই চা তার মিস্ট্রেসকে খাওয়ায়। আর চা খাওয়া হয়ে গেলে সেই লোকই আবার নিজের হাতের তোয়ালে দিয়ে মিসট্রেসের ঠোঁট মুছিয়ে দেয়—

সোহম্ অবাক হয়ে শুনছিল কথাগুলো।

বললে—এমন বড়লোক কি আপনি নিজের চোখে দেখেছেন ?

মিস্ সুরিটা বললে—হ্যাঁ।

—কোথায় দেখলেন তাঁদের ?

মিস্‌ সুরিটা বললে—মিস্টার প্যাটেলের সঙ্গে আমি পৃথিবীর সব দেশেই তো ঘুরেছি। যেমন পাউণ্ড ডলার ফ্র্যাংক লিরা ইয়েনের দেশে ঘুরেছি, তেমনি আবার আরবদের পেট্রো-ডলারের দেশেও ঘুরেছি। আর গরীবদের দেশে তো ঘুরেছিই।

—সেখানে কী দেখেছেন?

মিস্‌ সুরিটা বললে—দেখেছি যে যত বড়লোক, টাকার ওপর তার তত লোভ।

—আর গরীবদের?

—গরীবদের টাকার লোভের চেয়ে বড়লোকদেরই টাকার ওপরে লোভ আরো বেশি!

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করলে—কেন? টাকার ওপরে কেন তাদের অত লোভ? টাকা থাকলেও কি কেউ সোনার রুটি খাবে?

মিস্‌ সুরিটা বললে—যার বিশেষ কোনও গুণ নেই, এমন লোকের সংখ্যাই তো সংসারে বেশি। বেশির ভাগ লোকই তো বিটোফেন হতে পারে না, সেক্‌স্‌-পীয়ারও হতে পারে না। বেশির ভাগ লোকই টমাস এডিসন্‌ হতে পারে না বা মাদাম কুরীও হতে পারে না। তাদেরও তো কিছু না কিছু হতে ইচ্ছে করে! তাহলে কী হওয়াটা সব চেয়ে সহজ? তখন তারা বেছে বেছে বড়লোকই হতে চায়। টাকা উপার্জন করার পথটাকেই তখন তারা শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করে। তখন তাদের সেরা নেশা হয়ে দাঁড়ায় টাকা। আর টাকা উপায়ের সেই নেশার ঘোরে তখন তারা যাকে সামনে পায় তাকেই ঠকায়, যাকে সামনে পায় তারই পকেট কাটে—

মিস্‌ সুরিটার মুখ থেকে সেদিন সোহম্‌ এমন ধরনের কথা শুনবে বলে আশা করতে পারেনি।

মিস্‌ সুরিটা আরো কথা বলতে লাগলো। মদের ঘোরে কি কীসের ঘোরে কে জানে, মিস্‌ সুরিটার মুখে যেন তখন খই ফুটতে লাগলো। সোহম্‌ সমস্ত দিন অফিসে অক্লান্ত কাজ করেছে। তার পরে বাড়িতে গিয়েও যে একটু বিশ্রাম করবে তাও করতে পারেনি। তার পরে বাড়ি থেকে সে সোজা এই হোটেলে এসে পড়েছে। এখানে এসেও যে একটু একলা থাকবে, তাও তার কপালে নেই। তখন থেকেই দু'জনে মিলে পেগের পর পেগ অ্যালকোহল্‌ গিলেছে।

তারপর?

আর রাত যখন আরো গভীর হলো, তখন?

বাড়ির রাতের আবহাওয়ার সঙ্গে হোটেলের রাতের আবহাওয়ার অনেক তফাৎ। বিশেষ করে ফাইভ্‌ স্টার হোটেলের রাতের আবহাওয়া।

বাড়িতে রাত হলে বোঝা যায় রাত হয়েছে। তাই রাত্রে বাড়িতে থাকলে মনে হয় জীবনটা বড় ছোট। মনে হয় সময় থাকতে সব কাজ শেষ করে নাও। কিন্তু ফাইভ্‌ স্টার হোটেলে রাত হলে তা অন্য রকম। সেখানে রাত তিনটের সময়ও মনে হয় জীবন অনেক বড়, মনে হয় যেন এখনও সামনে অঢেল সময় পড়ে আছে, এখন যত পারো কষে ফুর্তি করে নাও—

আজ থেকে সুদূর অতীতের দেখা সেই দৃশ্যগুলো যেন আবার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সে। সেদিনকার সেই হোটেলের স্যুটের ভেতর শুধু তারা দু'জন। আর তখন তাদের সামনে ছিল অফুরন্ত ভবিষ্যৎ। তাদের দু'জনের জীবন যেন অনেক বড় আর তারা যেন অনন্তকাল ধরেই বেঁচে থাকবে আর বেঁচে থেকে অনন্তকাল ধরে 'কিং অব্ কিংস' হুইস্কি খেয়ে যাবে। হুইস্কি খাওয়ার নেশা আর হুইস্কি খেয়ে হজম করার ক্ষমতাও যেন তাদের অনন্তকাল ধরে থাকবে।

আশ্চর্য মানুষের মন আর আশ্চর্য সেই মানুষের মনের গতি-প্রকৃতি।

তখন ক'টা বেজেছে কে জানে আর কে-ই বা তার খবর রাখে। হঠাৎ দরজার কলিং-বেল বেজে উঠতেই সোহম্ চেঁচিয়ে উঠলো—ইয়েস···?

হোটেলের বয় চা নিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

—হুজুর, বেড্-টি—

বেড্-টি! মিস্ সুরিটাও অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। সোহম্‌ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে সোহম্ অবাক হয়ে দেখলে ঘড়ির ছোট কাঁটাটা সাড়ে পাঁচটার দিকে ঢলে পড়েছে। তবে কি গল্প করতে করতে ভোর হয়ে গিয়েছে!

মিস্ সুরিটা বললে—রাতটা কোথা দিয়ে কেটে গিয়ে ভোর হয়ে গেল বলুন তো! আশ্চর্য! আমি তো বুঝতেই পারিনি—

সোহম্ বললে—মিছিমিছি আপনার সময় নষ্ট করে দিলুম। আপনি এখানে মিস্টার ভানুভাই প্যাটেলকে খুঁজতে এসেছিলেন, আর···

—কিন্তু আপনিই বা আজ বাড়িতে গেলেন না কেন? আপনার বাড়িতেও তো মিসেস্ রায় একলা আছেন, তিনি হয়তো এতক্ষণ আপনার পথ চেয়ে চেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন—

সোহম্ বললে—ওয়াইন্ এমনি জিনিস, সব হিসেব গোলমাল করে দেয়—

মিস্ সুরিটা বললে—ওয়াইন্ নয়, মিস্টার রায়, উওম্যান। আসলে মদ নয়, মেয়েমানুষই সব হিসেব গোলমাল করে দেয়—

সোহম্ বললে—আপনি ভুল বললেন মিস্ সুরিটা, ওয়াইন্ বা উওম্যান কিছুই হিসেব গোলমাল করে দেয় না। হিসেব গোলমাল করে দেয় যে-জিনিসটা তা হলো—টাকা!

তারপর একটু থেমে সোহম্ আবার বললে—এই যে আজ আপনি হোটেলে-হোটেলে মিস্টার প্যাটেলকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এ কীসের জন্যে? আসলে টাকার জন্যে। আপনি জানেন যে যদি আপনি মিস্টার প্যাটেলকে কোনও রকমে বিয়ে করতে পারেন তো চিরজীবনের জন্যে আপনি আরাম করে কাটিয়ে দিতে পারবেন, আপনার কখনও খাওয়া-পরার কোনও অভাব থাকবে না—পৃথিবীতে যত রকমের আরামের আর ভোগের জিনিস পয়সা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায়, তা সবই আপনি কিনে ভোগ করতে পারবেন—

কথাটা শুনে মিস্ সুরিটা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। কোনও কথা তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

সোহম্ আবার বললে—এ শুধু আপনি নয়, আমিও তাই। আমিও তাই আপনার মত টাকা চাই। নইলে দেখুন না, আপনি আর আমি একসঙ্গে একই ঘরে সমস্ত রাত রইলুম অথচ কেউ কারো গায়ে হাত দিলুম না। এ রকম কেন হলো? কেমন করে এটা সম্ভব হলো?

মিস্ সুরিটা জিজ্ঞেস করলে—কেন? আপনিই বলুন না, কেন?

সোহম্ বললে—হলো এইজন্যে যে আপনি ভালো করেই জানেন আমি টাকাওয়ালা মানুষ নই, আর আমিও ভালো করে জানি যে আপনিও টাকাওয়ালা মেয়ে নন—

বলে আবার একটু থেমে গিয়ে বললে—বহুদিন আগে আমি কী একটা বইতে একটা কথা পড়েছিলুম, সেইটে পড়ার পর থেকেই সেক্সের ওপর আমার সব আকর্ষণ চলে গেছে—

মিস্ সুরিটা জিজ্ঞেস করলে—কথাটা কী?

—কথাটা হচ্ছে—God is potent, but money is omnipotent The soul has no sex.

কথার মাঝখানেই ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো।

—হ্যালো—

হোটেলের মেয়ে-অপারেটার জানালে—মিস্টার সেন আপনার সঙ্গে কথা বলবেন—

সোহম্ বললে—দিন তাঁকে লাইনটা—

লাইনটা দিতেই ওপাশ থেকে মিস্টার সেন বললেন—কে? মিস্টার রায়?

—হ্যাঁ।

—ঘরে কোনও লোক আপনার সঙ্গে আছে নাকি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে খুব সাবধানে কথা বলুন, যেন সে বুঝতে না পারে। আমি খবর নিয়েছি মিস্টার ভানুভাই প্যাটেল কাল সারারাত আপনার বাড়িতে মিসেস রায়ের সঙ্গে কাটিয়েছেন। এখনও তিনি আপনার বাড়িতেই আছেন। আপনি আর আপনার বাড়িতে যাবেন না। আমাদের অফিস থেকে আপনার ইরাকে যাবার পাসপোর্ট থেকে আরম্ভ করে ইরাকে থাকবার সব কিছুর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। আপনার পাসপোর্ট সাইজের চার কপি ফোটোও যোগাড় করে তার সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। আর আপনার ভ্যাক্সিনেশন, মানে টিকে দেওয়ার জন্যে ডাক্তারের সার্টিফিকেটও কিনে রাখছি। আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা আপনার মিসেসের সব-রকম ব্যবস্থা করে দেব। চেষ্টা করবো যাতে আজকের নাইটের ফ্লাইটেই আপনি ইরাকে যেতে পারেন। তার সঙ্গে ফরেন এক্সচেঞ্জের টাকাও আপনি পেয়ে যাবেন—আমার লোক যাচ্ছে। আপনার ঘরে যদি কোনও লোক থাকে তাহলে তাকে ঘরের বাইরে চলে যেতে বলবেন, কারণ অন্য কোনও লোক থাকলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। আর একটা কথা…

সোহম্ বললে—কী?

মিস্টার সেন বলতে লাগলেন—বোম্বে অফিসের মিস্টার আয়েঙ্গারের সঙ্গে আজকেই এ-সম্বন্ধে ট্রাংক-লাইনে আমার কথা হয়েছে। তিনি বললেন—এই অপারেশন ব্লু স্টার-এ যদি আমরা সাকসেস্‌ফুল হই তো আপনার পে-প্যাকেটে আরো চার হাজার বাড়িয়ে দেওয়া হবে—তিনি আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেছেন—আচ্ছা, ও. কে—

সোহম্‌ও বললে—ও কে—

বলে সোহম্ টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে দিলে।

মিস্ সুরিটা জিজ্ঞেস করলে—টেলিফোনে কে? মিসেস রায়?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ—

—কী বলছিলেন তিনি?

সোহম্ বললে—তিনি বলছিলেন আমি হোটেল থেকে বাড়ি ফিরিনি কেন?

—আপনি কী জবাব দিলেন?

সোহম্ বললে—আমি বললুম মিস্ সুরিটার সঙ্গে 'ড্রিংক' করতে করতে কখন রাত কাবার হয়ে গেল টের পাইনি—

—আমার নাম শুনে মিসেস্ রায় রাগ করলেন না তো?

সোহম্ বললে—আমার মিসেস্ অন্য মেয়েদের মত নয় মিস্ সুরিটা। আমার স্ত্রীর মত অত চেস্ট্ লেডী আর কোনও মেয়ে নয়। আমার স্ত্রীকে আপনি চেনেন না বলেই আপনি ওই কথা বলতে পারলেন। আমার স্ত্রী সারাদিন কেবল লেখা-পড়া আর পুজো-টুজো নিয়েই থাকেন।

মিস্ সুরিটা অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—সত্যি?

—সত্যি না তো কি মিথ্যে?

মিস্ সুরিটা বললে—তাহ'লে ক্লাবে গিয়ে যে দেখতে পাই মিসেস্ রায় পেগের পর পেগ হুইস্কি খাচ্ছেন—

সোহম্ হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—সে তো আমার চাকরির খাতিরে খান, কিন্তু তারপর বাড়িতে গিয়ে কী করেন, জানেন?

—কী?

সোহম্ বললে—বাড়িতে গিয়ে বাথ্‌রুমে ঢুকে পটাশিয়াম্ পারমাংগানেট্ জলে মিশিয়ে সেই জলে স্নান করে নেন, তারপর কাপড় ব্লাউজ বদলে জপ্-তপ্-আহ্নিক করে তবে শুতে যান। এমনি রোজ—

মিস্ সুরিটার মুখে-চোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। বললে—স্ট্রেঞ্জ, ভেরি ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইন্‌ডীড—

আসলে মিস্ সুরিটার কানে কথাগুলো ভালো লাগলো না। সেটা সোহম্ তার দিকে চেয়েই বুঝতে পারলে। বাইরের কোনও মেয়ের কাছে নিজের স্ত্রীর প্রশংসা করলে তা যে তার কাছে ভালো লাগবে না, সেটাই স্বাভাবিক।

মিস্ সুরিটা এর পরে আর বসে থাকতে পারলে না। বললে—এবার তাহলে উঠি মিস্টার রায়—

সোহম্ বললে—অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে—

—না না, কষ্ট কোথায়, সমস্ত রাতটা কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতে পারলুম না। এখন মিস্টার প্যাটেলকে কোথায় খুঁজতে যাই বুঝতে পারছি না—

সোহম্ বললে—যাবেন আর কোথায়, নিশ্চয় কোথাও কোনও আর্জেন্ট কাজ পড়েছে তাঁর—

সোহম্ দরজা পর্যন্ত মিস্ সুরিটাকে পেঁছে দিতে গেল।

যেতে যেতে মিস্ সুরিটা জিজ্ঞেস করলে—আপনি বাড়ি যাবেন না ?

সোহম্ বললে—আজ এখান থেকে সোজা অফিসে চলে যাবো, তারপর অফিস থেকে বাড়ি—

মিস্ সুরিটা বাইরে গিয়ে লম্বা করিডোরের পথ ধরে কোথায় কোন্ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সে অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে আরো দুজনকে আসতে দেখে সোহম্ চমকে উঠলো। একজন পুরুষ, আর তার পাশে একজন মহিলা।

ইব্রাহিমই প্রথম এগিয়ে এল সোহমের দিকে—

—আরে, তুই ? তুই এখানে কী করতে ?

সোহম্ বললে—আমি একটা কাজে এসেছি, কিন্তু তুই ?

—আমিও একটা কাজে এসেছি। জানিস না, ম্যাক্নীল বেরী কোম্পানির লেবার-ইউনিয়নেরও তো প্রেসিডেণ্ট আমি। সেখানেও যে এখন স্ট্রাইক চলছে—

সোহম্ বললে—আর ক'টা কোম্পানির সর্বনাশ করবি ? অনেক তো হলো, এবার একটু পরকালের কথা ভাব্। এত মানুষের অভিশাপে কি তোর ভালো হবে মনে করিস ?

তারপর মহিলাটির দিকে ইঙ্গিত করে বললে—এ আবার কার বউ ?

ইব্রাহিম বললে—এও তোরই মতন ম্যাক্নীল বেরীর এক ওয়েলফেয়ার অফিসারের বউ—

বলে অন্য দিকে চলে গেল। আশ্চর্য ! সোহম্ আরো আশ্চর্য হয়ে গেল। এরা কি কাউকেই শান্তিতে থাকতে দেবে না ? অবশ্য এ-সব কাজ না করলে ইব্রাহিমদের এত খরচ কোত্থেকেই বা উশুল হবে ? রোজ পনেরো-কুড়ি লিটার পেট্রল, পঞ্চাশ টাকা কিলোর মাছ, আর তার সঙ্গে সেই বিলিতি হুইস্কি, এ-সব ইব্রাহিমদের কে যোগাবে ?

ইরাক।

মনে আছে প্রথম-প্রথম সোহমের খুব একলা-একলা লাগতো।

সুমিত্রার পাশে শুয়ে থাকাটা তার একটা অভ্যেসের মত হয়ে গিয়েছিল। তা যা হোক, কিন্তু তার বদলে তো সে অনেক টাকা পাচ্ছে। আগে পেত ছ' হাজার।

তারপর আরো চার। সব মিলিয়ে দশ হাজার। তা থেকে অনেক টাকা ইন্‌কাম ট্যাক্সের জন্যে কেটে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যা কেটে নেওয়া হচ্ছে না—সেটা হচ্ছে প্রত্যেক মাসের এনটারটেনমেণ্ট অ্যালাউয়েন্স। তার জন্যেও মাসে মাসে দেওয়া হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা। তার সব টাকাটা খরচও হয় না। সেটাও জমে যায়। এতগুলো টাকা নিয়ে সোহম্‌ কী করবে?

প্রথম দিন ইরাকে পেঁছেই সে সুমিত্রাকে একটা চিঠি লিখলে।

চিঠির মধ্যে জানতে চাইলে ভানুভাই প্যাটেল সে-রাত্রে তাদের বাড়িতে এসে কেমন কাটালো। সুমিত্রাকে কী কী বললে। কোন্‌ হুইস্কি খেলে। ভানুভাইকে সুমিত্রা খুশী করতে পেরেছে কি না। সেদিনের পর মিস্টার প্যাটেল আর এসেছেন কিনা। লিখলে—তুমি মিস্টার প্যাটেলকে খুব খাতির কোর। তোমার খাতিরের ওপরেই আমাদের দু'জনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—মনে রেখো—

এমনি সব অনেক কথা।

শেষে সোহম্‌ লিখলে—তাড়াতাড়ি চিঠি দিও, তোমার চিঠির পথ চেয়ে এই বিদেশ-বিভুঁই-এ আমি হাঁ করে বসে রইলাম—

আর একটা চিঠি লিখলে মিস্টার সেনকে।

তাঁকে লিখলে—আমি এখানে এসে ওপরের ঠিকানায় উঠেছি। এখানে আমাকে কী কী কাজ করতে হবে তা জানাবেন। কলকাতায় মিসেস রায় একলা আছেন, তাঁর দেখা-শোনার ভার আপনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম। তাঁর টাকার দরকার হলে তার ব্যবস্থাও করবেন। মিসেস্‌কে একলা রেখে এসে আমি এখানে শান্তি পাচ্ছি না। যদি পারেন আমার মিসেস্‌কে টেলিফোন করে সব খবর নিয়ে আমাকে জানাবেন। আমি আপনার চিঠির আশায় দিন গুনবো—

চিঠি দু'টো নিয়ে নিজে রাস্তায় বেরোল। সব অচেনা মানুষ। বড় সুন্দর সাজানো শহর। কলকাতার মত নোংরা নয়। কলকাতার মত মানুষের ভিড়ে জর্জর নয়। চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে সোহম্‌ চলতে লাগলো। কত রকম জাতের মানুষ, কত রকম মডেলের গাড়ি। একজন ইণ্ডিয়ানকেও দেখতে পাওয়া গেল না। বাঙালী কোনও লোককে দেখতে পেলেও একটু সুবিধে হতো। একটু বাঙলা ভাষায় কথা বলতে পারলেও শান্তি হতো। তাও হলো না।

সোহমের ভাবনা হতে লাগলো। সুমিত্রাকে ছেড়ে সে এখানে একটা বছর কাটাবে কী করে? সুমিত্রাকে ছেড়ে যে সোহম্‌ এক ঘণ্টাও কাটাতে পারে না সেই তাকে ছেড়ে সে পুরো একটা বছর এখানে কী করে কাটাবে? রাত্রিতে সুমিত্রাকে জড়িয়ে না শুলে যে সোহমের ঘুমই আসে না। তাহলে? এখানে কাকে জড়িয়ে সে শোবে?

হোটেলে কোনও রকম সুখ-সুবিধের অভাব নেই। যা চাও তাই-ই পাবে।

আর মেয়েমানুষ?

কে জানে এ-দেশের সমাজ কেমন। হোটেলের ব্যবসার প্রথম শর্তই তো হলো কাস্টোমার বা খদ্দেরকে খুশী করা। তা যদি হয় তো ট্যুরিস্টরা যা চাইবে তার দাবী তো হোটেল-মালিককে মেটাতেই হবে। ট্যুরিস্ট মানেই ফরেন-এক্স-

চেঞ্জ। আর কোন্ দেশ ফরেন-এক্সচেঞ্জ না চায় ? বিশেষ করে যাদের দেশ গরীব তারা। ট্যুরিস্টরা যদি কোনও মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করে, তা হলেও পৃথিবীর গরীব দেশে তাদের কোন শাস্তি দেবার নিয়মই নেই। ঘটনাটা পাঁচ-কান হওয়ার আগেই তা ধামা-চাপা দেওয়া হয়। তাড়াতাড়ি সেই দেশের এম্‌ব্যাসীকে খবর দিয়ে চুপি চুপি ট্যুরিস্টকে নিজের দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এর কারণ কী?

কারণ হলো—টাকা।

আর, সব টাকাই তো সত্যিকারের টাকা নয়। মানুষের মত টাকারও তো আবার জাত-বিভাগ আছে। টাকার জগতে কোনও টাকা নৈকষ্য কুলীন, আবার কোনও টাকা তপশীলভুক্ত টাকা। এককালে কোনও বাড়িতে চিংড়ি মাছ এলে সে-বাড়ির জাত চলে যেত। টাকাওয়ালা মানুষের সমাজে সে-জাতিচ্যুত হতো। একঘরে হতো। টাকাওয়ালা মানুষের সমাজে তার ধোপা-নাপিত বন্ধ হতো।

কিন্তু ফরেন এক্সচেঞ্জের দৌলতে সেই তুচ্ছ চিংড়ি-মাছই এখন আবার জাতিতে ব্রাহ্মণ। সে এখন জাতে উঠেছে।

মানুষের সমাজে যদি জাতি-বিভাগ থাকে তাহলে টাকার সমাজেই বা জাতি-বিভাগ থাকবে না কেন ? এ-যুগে কারো গুণাগুণ দেখে তো তার বিচার হয় না, মনুষ্যত্ব দিয়েও এ-যুগে কারো বিচার হওয়ার নিয়ম নেই। তোমার কাছে যে টাকা আছে সে-টাকা কি ডলার, না পাউণ্ড, না ফ্রাংক, না লিরা, না ইয়েন ? সেই প্রশ্নটার জবাব আগে দাও—

পাউণ্ড বা ফ্রাংক বা লিরা বা ইয়েন যদি তোমার কাছে থাকে, তাহলে তুমি কুলীন ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারবে না। হতে পারবে সাধারণ ব্রাহ্মণ। কিন্তু তোমার কাছে ডলার থাকলে আমি তোমার পদধূলি নেব, আমি তোমার পাদোদক খাবো।

আর যদি তোমার কাছে শুধু ইণ্ডিয়ার টাকা থাকে তো তাহলে তুমি নমঃশূদ্র। তোমার দেওয়া জলও আমি ছোঁব না।

ইরাকে গিয়েই সোহম্ প্রথমে বুঝতে পারলে যে টাকার সমাজে সে মাত্র একজন নমঃশূদ্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর ভানুভাই প্যাটেল ?

তিনি হলেন নৈকষ্য কুলীন সম্ভ্রান্ত এক সদাচারী ব্রাহ্মণ। আর সেই জন্যেই 'টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্‌শন্' কোম্পানি সেই ভানুভাই প্যাটেলের পাদোদক খাবার জন্যে এত ব্যাকুল।

ক'দিন পরেই চিঠি এল সুমিত্রার কাছ থেকে। সুমিত্রা লিখেছে যে ভানুভাই প্যাটেল এত দিন ধরে আমাদের বাড়িতেই রয়েছে। সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত আমার কাছেই থাকছে আর এখানেই খাচ্ছে। আমি তাকে বলেছি যে তুমি হংকং-এ গেছ। সেই কথা শোনবার পর থেকে মিস্টার প্যাটেল আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যায় না।

শেষকালে লিখেছে—তুমি কেমন আছো ? নিজের শরীরের দিকে নজর

রাখবে—আমি ভালো আছি—

চিঠিটা পড়ে সোহমের খুশীর মাত্রা আরো বেড়ে গেল। এবার তাহলে সে শুধু টাকাতেই বড়লোক হবে না, জাতেও ব্রাহ্মণ হবে। শুধু টাকায় বড়লোক না হয়ে ডলারেও সে বড়লোক হবে। মানুষের সমাজে তার মাথা আরো উঁচু হবে। এখন যেমন সবাই ভানুভাই প্যাটেলের পাদোদক খায়, তেমনি এবার থেকে সবাই সোহম্ রায়েরও পাদোদক খাবে। সবাই সোহম্ রায়ের পদধূলি নেবে।

সেইদিনই সোহম্ একটা চিঠি লিখে দিলে।

লিখলে—'তোমার চিঠি পেয়ে সব কিছু জেনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। দেখ, ভানুভাই প্যাটেলের ওপরেই আমাদের দু'জনের ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন সব কিছু নির্ভর করছে। ওঁকে খুব খাতির করবে, ওঁর সঙ্গে খুব মিষ্টি ব্যবহার করবে। তোমাকে যতরকম ছলা-কলা আমি শিখিয়েছি, সমস্ত কিছু তাঁর ওপর প্রয়োগ করবে। সব সময়ে মনে রেখো, সংসারে টাকার চেয়ে বড় জিনিস আর কিছু নেই। টাকা পেলেই সব কিছু পাওয়া হয়ে যায়। শুধু বর্তমান নয়, ভবিষ্যতেও টাকাটাই হলো একমাত্র বুকের বল। জীবনে সব কিছু উচ্ছিষ্ট হতে পারে, কিন্তু টাকা কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না, অপবিত্র হয় না, কলঙ্কিত হয় না। সেই কথাগুলো তোমাকে মনে করিয়ে দিয়ে তোমাকে এত কথা লিখছি…'

যতটুকু মনে আছে তাতে এইসব কথাগুলোই লিখেছিল সে। অনেকটা এই রকমই তার ভাষা। এই চিঠি পেয়ে সুমিত্রাও তার উত্তর দিত। সোহমের প্রত্যেক চিঠিতেই টাকার কথা থাকতো। আর সুমিত্রাও তার প্রত্যেকটা চিঠিতে ভানুভাই প্যাটেলের কথা লিখতো।

লিখতো—তুমি কিছু ভেবো না, এখানে আমার কোনও অসুবিধে নেই। মিস্টার সেন মাঝে মাঝে টেলিফোনে আমার খবর নেন আর নিয়ম করে টাকা পাঠিয়ে দেন—

মনে আছে ইরাকে সোহমের সময় আর কাটতেই চাইত না। মাঝে মাঝে বারে গিয়ে এক-এক সময়ে গ্লাস নিয়ে বসতো, কিন্তু তাও বেশিক্ষণ ভালো লাগতো না। সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই, কতক্ষণ একলা-একলা বসে মদ খেতে ভালো লাগে! তারপর ইচ্ছে হলে টেলিভিশন দেখো। কিছু বোঝ আর না বোঝ শুধু চেয়ে থাকো। তোমার সময়টা তো অন্তত কাটবে।

সময় কাটানোটা যে কত শক্ত তা সেদিন সোহম্ যেমন করে বুঝেছিল, জীবনে আর কখনও সোহম্ তেমন করে বোঝেনি। হোটেল থেকে রোজ হেঁটে হেঁটে পোস্ট্ অফিসে গিয়ে পেঁছিতো, জিজ্ঞেস করতো—তার নামে কোনও চিঠি আছে কিনা। পোস্ট্ অফিসের লোকরাও তাকে চিনে গিয়েছিল। তার চেহারা দেখেই বলতো—নো নো মিস্টার, তোমার কোনও চিঠি নেই—

সোহমের যেন নির্বাসন-দণ্ড হয়েছে। তার টাকা আছে, তার স্বাস্থ্য আছে, তবু যেন তার কিছু নেই, কেউ নেই। অথচ এমন আরাম কে কবে পেয়েছে? শুধু বসে বসে যে হাজার হাজার টাকা মাইনে পাওয়া যায় এমন অভিজ্ঞতা বোধ হয় সোহমের আগে ইতিহাসে আর কোনও মানুষের হয়নি।

আসলে এর নামই তো আরাম।

কিন্তু আরামও যে এত অসহ্য, আরামও যে এত দুর্বহ হতে পারে তা আগে সোহমের জানা ছিল না। অথচ একদিন এই আরামটুকু পাবে বলেই তো মানুষ সারাজীবন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যায়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সর্বস্ব বাজি রেখে ওভার-টাইম খাটে শেষ জীবনে একটু আরাম পাওয়ার আশায়। শতকরা একশোজন বাঙালীর তো তা ই একমাত্র অ্যাম্বিশন।

তা কি সবাই পায়?

সেদিন হঠাৎ একজন ইংরেজ ট্যুরিস্ট-এর সঙ্গে ডাইনিং-টেবিলে আলাপ হয়ে গেল।

ট্যুরিস্ট মানুষ, অথচ মদ খায় না। এ আবার কেমন ট্যুরিস্ট?

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—আপনি ড্রিঙ্ক করেন না?

—না।

সোহম্ বললে—আশ্চর্য!

ভদ্রলোকের নাম জর্জ স্যানডোজ্।

জর্জ বললে—কেন, তুমি আশ্চর্য হচ্ছো কেন? মদ খায় না এমন লোক কি তুমি আগে দেখনি?

সোহম্ বললে—মদ খায় না এমন ইণ্ডিয়ান আমি অনেক দেখেছি, কিন্তু মদ খায় না এমন ইংরেজ আমি একটাও দেখিনি। অবশ্য আমি ক'টা ইংরেজ আর ক'টা আমেরিকানকেই বা দেখেছি—

তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনি মদ খান না কেন?

জর্জ বললে—খাই না এইজন্যে যে মদ খেলে আমার শরীর খারাপ হয়। একজন বিখ্যাত আইরিশ-ম্যান লেখক জর্জ বার্নার্ড শ'ও মদ খেতেন না, ওয়ার্লড ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট মিস্টার ম্যাক্নামারা একজন আমেরিকান, তিনিও মদ খান না। আমার জানা আরো অনেক ইংরেজ আর আমেরিকান আছেন যাঁরা তেমন বিখ্যাত মানুষ নন, তাঁরাও মদ খান না—। তোমাদের ধারণা যে আমরা সবাই বুঝি মদ খাই—?

সোহম্ স্বীকার করলে। বললে—হ্যাঁ, আমাদের সত্যিই সেই ধারণা—

জর্জ বললে—শুধু তাই নয়, আমি সিগারেট চুরোট মাছ মাংস ডিম কিছুই খাই না। আমি ভেজিটারিয়ান আর নন্-স্মোকার, দুই-ই—

—একেবারে নিরামিষ খান?

—হ্যাঁ। ভেজিটারিয়ান ডায়েটই তো বেস্ট্ ডায়েট। আমাদের দেশের ডায়েট্-স্পেশ্যালিস্টরাও তো তাই-ই বলেন। একবার জার্মানীর একটা অনাথ আশ্রমের ছেলেদের দু'জায়গায় দু'ভাগে ভাগ করে রাখা হয়েছিল। এক ভাগে ছেলেদের খেতে দেওয়া হতো মাছ মাংস ডিম, আর অন্য ভাগের ছেলেদের খেতে দেওয়া হতো ডাল-ভাত-রুটি-তরকারি। ডাক্তার উইডাওসন তাদের নিয়ে এক মাস ধরে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন দু'দলের ছেলেদেরই সমান ভাবে উন্নতি হয়েছে, কোনও তফাৎ হয়নি তাদের—

সোহম্ বললে—আপনার কাছে আমি এক নতুন জিনিস শুনলুম।

—হ্যাঁ, আরো শোন, আমেরিকাতে যাদের হার্ট-ডিসীজ্ হয়েছে তাদের নিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া ছেড়ে দেবার পর তারা আবার ভালো হয়ে উঠেছে। যারা একেবারে নড়তে পারতো না, তখন তারা আবার উঠে দৌড়তে পারছে—। যে-ডাক্তার এই পরীক্ষা করেছিল তার নাম প্রিটিকিন—

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—আপনি কী করেন?

জর্জ বললে—আমি কিছুছুই করি না—

সোহম্ বললে—কিছুছু যদি করেন না তো আপনার চলে কী করে? আপনার কি পেটার্নাল প্রপার্টি আছে? পৈতৃক সম্পত্তি?

—পেটার্নাল প্রপার্টি অনেক ছিল, তা থেকে আমি একটা পয়সাও নিইনি—

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—কেন?

জর্জ বললে—যে টাকা আমি খেটে উপার্জন করিনি তার ওপর কোনও অধিকার নেই বলেই আমি তা নিইনি। সে-টাকা সমস্ত আমি আমার ভাইদের দিয়ে দিয়েছি—

–তাহলে এই যে আপনি ইরাকে এসেছেন, এর খরচা কী করে চালাচ্ছেন? কে এর খরচ দিচ্ছে?

জর্জ বললে—নিজের উপায় করা টাকা খরচ করেই আমি এদেশে বেড়াতে এসেছি, আর আমার নিজের উপায় করা টাকা খরচ করেই আমি এই ইরাক থেকে দেশে ফিরে যাবো—

—আপনি কী করে এই টাকা উপায় করেছেন?

—উপায় করেছি হোটেলে কাজ করে। আমি বছরে দু'মাস কাজ করি। শুধু মাত্র দু'মাস কাজ করে যা কিছু টাকা উপায় করি আমি সেই টাকা দিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াই।

—দু'মাস কাজ করে আপনি দশ মাস দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর খরচ উশুল করেন? তা কি সম্ভব?

জর্জ বললে—কেন সম্ভব নয়? আমার নিজের আর কতটুকু খরচ? আমি বিয়ে করিনি, তাই আমার বউ-এর খরচের কথাই ওঠে না। তার ওপর আমি কোনও রকম নেশা করি না। খালি ডাল-ভাত-আলু হলেই আমার ক্ষিধে মেটে। তাতে আর ক'টা টাকা খরচ হয়?

সোহম্ আশ্চর্য হয়ে শুনছিল জর্জ স্যানডোজের কথাগুলো। এ কী রকম মানুষ? এ কোন্ জাতের মানুষ? এ কী জন্যে এত দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়? ঘুরে বেড়িয়ে এত টাকা নষ্ট করে এর কী লাভ?

জর্জ আবার বলতে লাগলো—তুমি তো ইণ্ডিয়ান, তুমি আমার কথা শুনে এত আশ্চর্য হচ্ছো কেন? তোমাদের বই পড়েই তো আমি এ-সব শিখেছি—

সোহম্ অবাক হয়ে বললে—আমাদের ইণ্ডিয়ান বই?

—হ্যাঁ।

—কী বই ?

জর্জ বললে—তোমাদের গীতা, তোমাদের উপনিষদ, তোমাদের রামায়ণ, তোমাদের মহাভারত পড়েই তো আমি শিখেছি যে পাপ আর পুণ্য এ-দুটোকে একসঙ্গে সেবা করা যায় না। জুডাস আর যেশাস্ দু'জনকে যেমন একই সঙ্গে সেবা করা যায় না, এও তেমনি। পাণ্ডবরা হচ্ছে বঞ্চনা আর কৌরবরা হচ্ছে লোভ—এ দু'জনকে কি একসঙ্গে পুজো করা যায়? এই যে পৃথিবীতে দু'টো যুদ্ধ হয়ে গেল, দুটো যুদ্ধতেই তো জার্মানী হেরে গিয়েছিল। তাহলে কে জিতলো? গ্রেটব্রিটেন? না আমেরিকা? কে? তোমাদের মহাভারত পড়েই তো আমি শিখেছি যে সে-দু'টো যুদ্ধে জার্মানীও হারেনি আর গ্রেট-ব্রিটেন বা আমেরিকাও জেতেনি। মহাভারতের কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে কি কৌরবরা জিতে-ছিল আর পাণ্ডবরা হেরেছিল? তা তো নয়। যে হেরেছিল তার নাম হলো—মহাভারত। যদি গ্রেট ব্রিটেন আমেরিকা আর জার্মানীর সেই মহাভারত পড়া থাকতো তাহলে কি তারা ওই দু'টো যুদ্ধ বাধাতো? না ওই দু'টো যুদ্ধের ফলে কোটি কোটি লোক মারা যেত—?

জর্জ কথা বলতে বলতে থামলো। তারপর সোহমের দিকে চেয়ে বললে—অমন করে আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে কী ভাবছো?

সোহমের যেন হঠাৎ চমক ভাঙলো। বললে—ভাবছি—

—কী ভাবছো?

সোহম্ বললে—ভাবছি আপনি ইংরেজ হয়ে আমাদের গীতা উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত—কত সব বই পড়েছেন—

জর্জ জিজ্ঞেস করলে—তুমি পড়োনি?

—না।

জর্জ আবার জিজ্ঞেস করলে—কেন? পড়োনি কেন? তোমাদের নিজেদের ভাষায় লেখা বই, আর তবু তুমি তা পড়োনি? তোমাদের স্কুলে কি এ-সব পড়ানো হয় না?

সোহম্ বললে—না।

জর্জ বললে—আশ্চর্য তো, কেন পড়ানো হয় না বলো তো?

সোহম্ বললে—ও-সব পড়লে তো চাকরি পাওয়া যায় না। যা পড়লে চাকরি পাওয়া সেই সবই আমাদের স্কুলে পড়ানো হয়—

জর্জ বললে—স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ! আমি ইউরোপীয়ান হয়ে তোমাদের দেশের বই পড়ে এত কিছু শিখলুম, আর তোমাদের নিজেদের ভাষায় লেখা বই তোমরা পড়লে না? তা জীবনে চাকরি পাওয়াটাই কি সবচেয়ে বড় কথা হলো? শুধু টাকা উপায় করাটাই কি জীবনে সব?

সোহম্ বললে—টাকা যদি সব না হয় তো আর কীই বা আছে যা টাকার চেয়েও বড়?

জর্জ জিজ্ঞেস করলে আমার একটা কথার উত্তর দাও তো—টাকা দিয়ে কি সব কিনতে পারা যায়?

সোহম্ বললে—সব কিনতে পারা যাবে। টাকা দিয়ে পৃথিবীর তো সব কিছু কিনতে পাওয়া যায়—

জর্জ জিজ্ঞেস করলে—টাকা দিয়ে তুমি বিছানা কিনতে পারো, কিনতে পারো খুব দামী বিছানা গদী তোশক সব কিছু। কিন্তু ঘুম? টাকা দিয়ে কি তুমি ঘুম কিনতে পারো?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমবো। টাকা দিয়ে ঘুমের বড়ি কিনবো।

—কিন্তু ঘুমের বড়ি খেয়ে যে ঘুম তা কি সত্যিই ঘুম? সে তো ঘুম নয়, সে তো ডেথ্! সে তো মৃত্যু! টেম্পোরারি ডেথ্—সে হলো সাময়িক মৃত্যু—

তারপর একটু থেমে জর্জ আবার জিজ্ঞেস করলে—টাকা দিয়ে তুমি বই কিনতে হয়ত পারবে, কিন্তু ব্রেণ? ব্রেণ কিনতে পারবে তুমি টাকা দিয়ে?

এ কথার জবাব দিতে পারলে না সোহম্।

জর্জ আবার জিজ্ঞেস করলে—এরপর ধরো টাকা দিয়ে তুমি মেডিসিন কিনতে পারলে, কিন্তু হেল্থ? টাকা দিয়ে তুমি স্বাস্থ্য কিনতে পারবে?

এ কথারও কোনও জবাব দিতে পারলে না সোহম্।

জর্জ আবার জিজ্ঞেস করলে—টাকা দিয়ে তুমি বাড়ি বা 'হাউজ্' কিনতে পারবে, কিন্তু হোম? টাকা দিয়ে তুমি হোম কিনতে পারবে?

এ-কথারও কোনো জবাব বেরোল না সোহমের মুখ দিয়ে।

—টাকা দিয়ে তুমি ফুড্ কিনতে পারবে, কিন্তু ক্ষিধে? তুমি কি ক্ষিধে কিনতে পারবে টাকা দিয়ে?

সোহম্ চুপ করে রইল?

—টাকা দিয়ে তুমি লাক্সারি কিনতে পারবে, কিন্তু কাল্চার কিনতে পারবে কি?

জর্জ একটার পর একটা প্রশ্ন করে যেতে লাগলো কিন্তু সোহম্ একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারলে না। অথচ সারাজীবন তো সোহম্ এই টাকাকেই মনে-প্রাণে চেয়ে এসেছে। সে তো সারাজীবন একসঙ্গে জুডাস আর যীশুকেই ভজনা করে এসে এসেছে, কৌরব আর পাণ্ডবকেই একসঙ্গে আরাধনা করে এসেছে।

তা হলে?

তাহলে কি মেহের আলি যা বলতো তাই-ই সত্যি? সেই—সব ঝুট্ হ্যায়?

অদ্ভুত ছেলে ওই জর্জ স্যান্ডোজ। পিঠে একটা হ্যাভারস্যাক্। তার ভেতরে তার সংসারের যাবতীয় সামগ্রী। তার মধ্যে তার বালিশ-বিছানা তোয়ালে-ওয়ালেট সবই আছে। সেইটে পিঠে বেঁধেই সে পৃথিবী ঘুরতে এসেছে। হাঁটতে হাঁটতে হয়ত জলতেষ্টা পেয়েছিল, তাই হোটেলের ডাইনিং রুমে ঢুকে পড়ে সোহমের সঙ্গে দেখা।

অনেক দিন আগেকার সে-সব কথা। সব ভালো করে মনেও নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে ছেলেটা সোহম্‌কে খানিক্ষণের জন্যে অবাক করে দিয়েছিল।

ছেলেটা তখন হ্যাভারস্যাক্টা পিঠে বেঁধে রওনা দিতে প্রস্তুত।

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি কি চলে যাচ্ছেন ?

জর্জ বলেছিল—হ্যাঁ—

—আর থাকবেন না ইরাকে ?

জর্জ বলেছিল—না, আমার টাকা ফুরিয়ে এসেছে।

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি যে কথাগুলো বললেন ও-সব কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন ?

—বিশ্বাস ? 'বিশ্বাসে'র মানে ইংরিজীতে অনেকগুলো আছে। যেমন Belief, Faith, Confidence, Conviction.-এর মধ্যে আমি Conviction শব্দটাই বেশি পছন্দ করি। যে শুধু একটা মতবাদকে বিশ্বাস করে সেই বিশ্বাস-টার নাম Faith. কিন্তু যে সেই বিশ্বাসটাকে নিজের জীবনে কাজে লাগায় সেটা হলো Conviction। আমার বিশ্বাসের সঙ্গে অন্য লোকের বিশ্বাসের তফাৎ এই যে, আমি সেই বিশ্বাসটাকে আমার জীবনে কাজে লাগাবার চেষ্টা করি।

তারপর একটু থেমে ছেলেটা আবার বললে—কিন্তু আমি তোমাদের ইণ্ডিয়াতে গিয়ে দেখেছি ইণ্ডিয়ানরা তাদের দেশে আমাদের কালচারকেই প্রাণপণে রপ্ত করবার চেষ্টা করছে, আর আমি ইংরেজ হয়েও ইণ্ডিয়ার কালচারকে মনেপ্রাণে রপ্ত করবার চেষ্টা করছি। একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা তোমার কাছে আরো স্পষ্ট হবে। যেমন আমি মদ খাওয়াটা ছেড়ে দিয়েছি আর তোমরা ইণ্ডিয়ানরা দেখলুম মদ খাওয়ার অভ্যেসটাই আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরছো। আমি ইংরেজ হয়েও যত ত্যাগের দিকে যাচ্ছি, ইণ্ডিয়ানরা তত ইংরেজ হতে চাইছে, তারা তত ভোগের দিকে যাচ্ছে—। শুনলুম ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্ট নাকি বছরে বছরে মদ থেকে সব চেয়ে বেশি রেভিনিউ উশুল করে চলেছে। হোয়াট্ এ পিটি, হোয়াট্ এ শেম্—

বলে সেদিন ছেলেটা আর দাঁড়ায়নি। আর বোধ হয় বেশি দাঁড়াবার সময়ও ছিল না তার। তার টাকা ফুরিয়ে আসছে। তার দিকে চেয়ে সোহম্ সেদিন অনেকক্ষণ ধরে অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিল আর মনে মনে হেসেছিল। ভেবে-ছিল—কী বোকা ছেলেটা ! এরাই হিপি, এরা সবাই সি-আই-এ'র চর—। এরা হিপি সেজে সারা দুনিয়ার ভাঁড়ার-ঘরে সিঁধ কেটে ভেতরের হাঁড়ির খবর আদায় করতে বেরিয়ে পড়েছে—

কতক্ষণ যে সোহম্ অমন হতভম্বের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল তা তার খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ একটা শব্দে তার জ্ঞান ফিরে এল।

—স্যার, আপনার চিঠি—

সোহম্ দেখলে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন পোস্ট্ অফিসের পিওন। হাতে একটা চিঠি।

এতদিন ইরাকে থাকতে থাকতে পোস্ট্ অফিসের পিওনরাও সোহম্‌কে চিনে ফেলেছিল। সোহম্ রোজই পোস্ট্ অফিসে গিয়ে তাগাদা করতো বলে সবাই জেনে গিয়েছিল যে এই ভদ্রলোক সারাদিন চিঠির আশায় বসে থাকে।

সোহম্ সঙ্গে সঙ্গে খামের মুখটা ছিঁড়ে ভেতরের চিঠিটা বার করলে। চিঠি লিখেছে মিস্টার সেন। 'টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাকসন্' কোম্পানির কলকাতা অফিসের জেনারেল ম্যানেজার।

লিখেছে—'তুমি হয়ত জেনে খুশী হবে যে আমাদের 'অপারেশন-ব্লু-স্টার' সাকসেসফুল হয়েছে। ভানুভাই প্যাটেলের ফার্ম থেকে মিডল্-ইস্টের টোট্যাল কনট্র্যাকটের থার্টি পার্সেন্ট কাজ পেয়ে গেছে 'টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাকসন্' কোম্পানি। এ কাজের সমস্ত কৃতিত্বটুকু সোহম্ রায়ের। এ-কথা জানিয়ে আমি বোম্বাইয়ে মিস্টার আয়েঙ্গারকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছি…পরের চিঠিতে তোমাকে তোমার বাড়ির অন্যান্য খবর জানাবো—'

চিঠিটা পড়ে সোহম্ অনেকক্ষণ সেইখানে সেই অবস্থায়ই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। 'অপারেশন-ব্লু-স্টার' সাকসেস্ফুল! 'অপারেশন-ব্লু-স্টার' সাক্সেস্ফুল! 'অপারেশন-ব্লু-স্টার……অপারেশন……'

কিন্তু তারপর আর কোনও চিঠি আসে না কলকাতা থেকে। মিস্টার সেনও চিঠি লেখে না, সুমিত্রাও চিঠি লেখে না। সোহমের মনের সে এক দম-বন্ধ অবস্থা তখন। কোথাও থেকে কোনও খবর না আসার সে যে কী যন্ত্রণা তা সোহম্ আগে কখনও তেমন করে টের পায়নি। ভানুভাই প্যাটেলের কাছ থেকে যখন সমস্ত অপারেশনটা সাক্সেস্ফুল করে দিলে সোহম্, তখন কলকাতার দিক থেকে এত নীরবতা কেন?

সেদিন থেকে সোহম্ রোজ এবেলা ওবেলা পোস্ট্ অফিসে গিয়ে হানা দিতে লাগলো।

—আমার কোনও চিঠি এসেছে কি স্যার?

—না।

আবার পরের দিন।

—আমার কোন চিঠি এসেছে স্যার?

—না।

আবার তার পরের দিন।

—আমার কোন চিঠি এসেছে স্যার?

—না।

তার পরের দিনও আবার।

—আমার কোন চিঠি এসেছে স্যার?

—না।

তবু হতাশ হয় না সোহম্। আবার পোস্ট্ অফিসে গিয়ে তাগাদা করে।

—আমার কোনও চিঠি আছে স্যার?

—না।

কিন্তু সেদিন আর সোহম্কে পোস্ট্ অফিসে যেতে হলো না। সেদিন পোস্ট্ অফিসই এসে হাজির হলো সোহমের কাছে। সোহম্ তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। ক'দিন ধরেই ভাবনা-চিন্তার জ্বালায় রাত্রে তার ভালো ঘুম হচ্ছিল না। তাই

সেদিন সোহম্ একটা ঘুমের বড়ি কিনে খেয়ে নিয়েছিল। পেট ভরে একদিন সে ঘুমোবে এইটেই ছিল তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে যে অত দেরি পর্যন্ত ঘুমোবে তা সে কল্পনা করতে পারেনি। হঠাৎ দরজার বাইরে কে যেন কলিং বেলটা বাজালে।

—কে ?

—আমি পোস্ট্ অফিসের পিওন স্যার—আপনার টেলিগ্রাম আছে—

সোহম্ তাড়াতাড়ি ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে গলিয়ে নিলে। তারপর দরজাটা খুলে বাইরে আসতেই দেখলে পোস্ট্যাল-পিওন তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

টেলিগ্রামটা এগিয়ে দিতেই সোহম্ তার কাগজে একটা সই করে দিলে। তারপর টেলিগ্রামটা খুলে পড়তে লাগলো।

টেলিগ্রাম করেছে মিঃ সেন—"ভানুভাই প্যাটেল এক্সপায়ার্ড, লেটার ফলোজ্।"

অর্থাৎ "ভানুভাই প্যাটেল মারা গেছেন। চিঠি যাচ্ছে।"

টেলিগ্রামটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সোহমের সমস্ত জীবনটার ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেই তার ছোটবেলা, সেই তার অনাথ হওয়া, সেই পিসীমার বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া, তারপর ক্ষেত্রবাবুর চিঠিতে চাকরি হওয়া। যা সে হতে চেয়েছিল তাই-ই তো হতে পেরেছে সে!

একটা জিনিসই চেয়েছিল সে—সে জিনিসটা হচ্ছে টাকা। ভানুভাই প্যাটেল মরে গিয়ে সোহম্‌কে যে বড়লোক করে দিয়ে গেল, এই সত্যটাই তার প্রথম মনে পড়েছিল। সত্যিই সে বড়লোক হলো।

যে-কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। ভানুভাই প্যাটেলের মত বড়লোকের মৃত্যু আরো বেশী দুঃখজনক। কারণ তার মৃত্যুতে বহু লোক অনাথ হবে। ভানুভাই প্যাটেল ছিল বনস্পতি। বনস্পতির অনুপস্থিতিতেই তো বহু জীব নিরাশ্রয় হয়।

তাহলে সোহমের আনন্দ হলো কেন ?

বাঙলায় একটা কথা আছে—ভাগাড়ে মড়া পড়লে শকুন হাসে। তাহলে সেও কি শকুন ? তা না হলে ভানুভাই প্যাটেলের মৃত্যুর খবরে তার আনন্দ হয়েছিল কেন ?

মনে আছে টেলিগ্রামটা পেয়েই সোহম্ সেইদিন সেই ভোরবেলাতেই সুমিত্রাকে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কথা বলতে চেষ্টা করেছিল। আর্জেণ্ট ট্রাঙ্ক-কল্।

কিন্তু দু ঘণ্টা চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি।

সোহম্ এক্সচেঞ্জের লেডী অপারেটারকে বলেছিল—একবার লাইনটা দিন আমাকে। আমার জরুরী কাজ, আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে জরুরী কথা বলবো—

তবু লাইন পাওয়া যায়নি।

শেষকালে মিস্টার সেনকেও টেলেক্স্ করেছিল। সে লাইনও পাওয়া যায়নি। ইণ্ডিয়ার লাইন পেতে এত দেরি কেন হয় তাও সে বুঝতে পারেনি। তখন সে একটা টেলিগ্রাম করেছিল মিস্টার সেনকে। আর্জেণ্ট আর এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম।

কিন্তু টেলিগ্রামের জবাব আসতেও তো অনেক সময় লাগবে!

হোটেলের ম্যানেজার জিজ্ঞেস করলে—টেলিফোন পেলেন না?

সোহম্ বললে—না, কী করি বলুন তো?

ম্যানেজার বললে—আরও অপেক্ষা করা ছাড়া আর কীই-বা করবেন?

এতদিন ধরে ম্যানেজার সোহম্‌কে দেখে আসছে, তবু দেখে অনেকবার অবাকও হয়ে গিয়েছে। এ আবার কী রকম ধরনের লোক! সারাদিন তো লোকটা শুধু বসে বসে আরাম করে। আর পোস্টাফিসে গিয়ে তার নামে কোনও চিঠি এসেছে কি না তার খোঁজ নেয়। আর হোটেলে অন্য যে সব বোর্ডার আসে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। কেন যে লোকটা এতদিন ইরাকে এসেছে তাও বোঝা যায় না। কিন্তু প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়ম করে মিস্টার রায়ের নামে, হাজার হাজার টাকা আসে। সেই টাকা এলে মিস্টার রায় হোটেলের সব বিল পুরো মিটিয়ে দেয়। কোনও মাসে কোনও টাকা মেটাতে বাকি থাকে না। একটা পাইপয়সা পর্যন্ত শোধ করে দিয়ে রসিদ নিয়ে নেয়।

একদিন ম্যানেজারের কেমন কৌতূহল হলো। ভাবলে—এ ভদ্রলোকটার কাজ কী? এ কি স্পাই? নাকি সি-আই-এ অথবা কে-জি-বি'র লোক।

একদিন জিজ্ঞেস করেই ফেলেছিল—আচ্ছা মিস্টার রায়, আপনি কোন্ অফিসে কাজ করেন ইণ্ডিয়াতে—

সোহম্ বলেছিল—আমি তো আপনাকে বলেইছি—টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানিতে—

—সে অফিস কীসের অফিস? কী কাজ হয় সে ফার্মে?

সোহম্ বলেছিল—একটা ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কনসার্ন—

—সেখানে কী ম্যানুফ্যাক্‌চার হয়?

সোহম্ বলেছিল—সেখানে তৈরি হয় Fish plates, Truss, Wagons আর Wagon fittings—এই সব। আরো নানান্ জিনিস তৈরি হয়—

—আপনি কি সে-কোম্পানির ইঞ্জিনীয়ার?

সোহম্ বলেছিল—না—

—তাহলে আপনি কী?

সোহম্ বলেছিল—আমি কোম্পানির ওয়েলফেয়ার অফিসার—

ম্যানেজারের কৌতূহল তাতেও মেটেনি। জিজ্ঞেস করেছিল—তা কোম্পানির ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে এতদূরে এই ইরাকে পড়ে আছেন কেন?

সোহম্ বলেছিল—পড়ে আছি বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে—

—বিশ্রাম?

সোহম্ বলেছিল—হ্যাঁ, একবার আমার খুব একটা সিরিয়াস অসুখ হয়েছিল। সে অসুখে আমি এক বছর শয্যাশায়ী হয়ে ছিলাম। তারপর ডাক্তারের চিকিৎসায়

ভালো হওয়ার পর তিনি আমাকে দূরে কোনও ড্রাই ক্লাইমেটের কান্ট্রিতে বিশ্রাম নিতে বললেন। তাই অফিস আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের খরচে—

সারাজীবন সোহম্‌কে কার্য-উদ্ধার করবার জন্যে অনেক অনেক মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে। কত লোককে যে ঠকাতে হয়েছে, কত লোকের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কেন সোহম্‌ সে সব করেছে? তার একমাত্র কারণ—টাকা। অফুরন্ত টাকা পাওয়ার জন্যেই ওই সব মিথ্যাচারণ করতে হয়েছে তাকে। তার পুরস্কার তো সে পেয়েছে। তবু আরো টাকা পাওয়ার জন্যে সে আরো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার টাকা চাওয়ার নেশা কি কোনও দিনই মিটবে না?

সকালবেলা টেলেক্স-কল বুক করা সত্ত্বেও কলকাতার লাইন পাওয়া গেল না। সন্ধ্যে উত্রে গেল। ম্যানেজার বললে—কী হলো, কলকাতা পেলেন না?

সোহম্‌ হতাশ হয়ে বললে—না—

ম্যানেজার বললে—আপনি যদি কিছু টাকা খরচ করেন তাহলে লাইন পেয়ে যাবেন—

সোহম্‌ বললে—তার মানে কি? ঘুষ?

ম্যানেজার হাসলো। বললে—হ্যাঁ—

সোহম্‌ বললে—এখানেও কি ঘুষের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে?

ম্যানেজার বললে—শুধু এখানে নয়, সারা পৃথিবীতেই এখন ঘুষের রাজত্ব চলছে। তবে এখানে আমরা 'ঘুষ'-এর নাম দিয়েছি টিপস্‌—তার মানে বখশিশ।

তা সোহম্‌ তাতেই রাজি হয়ে গেল। ম্যানেজার টিপস্‌ নিয়ে নিজেই যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে। আর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার লাইন পাওয়া গেল। লাইন পেতেই সোহম্‌ এদিক থেকে প্রশ্ন করলে—কে? বদ্যিনাথ?

বদ্যিনাথ বললে—হ্যাঁ—

সোহম্‌ বললে—আমি সাহেব বলছি, মেমসাহেব কোথায়?

—মেমসায়েব তো বাড়িতে নেই হুজুর, বাইরে গিয়েছে।

বদ্যিনাথের কথা শুনে সোহম্‌ আশ্চর্য হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা সুমিত্রা কোথায় গেল? ভানুভাই প্যাটেল মারা গেছে, তাহলে কার সঙ্গে কোথায় গেল সে? একলা তো কোথাও যাওয়ার মত মেয়ে নয় সুমিত্রা! তা হলে?

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করলে—কোথায় গিয়েছে মেমসাহেব, তুই জানিস?

বদ্যিনাথ বললে—কুলকার্নি সায়েবের সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছেন—

সোহম্‌ অবাক হয়ে গেল বদ্যিনাথের কথা শুনে। কুলকার্নি সাহেব? কুলকার্নি সাহেব আবার কে? সে কোথা থেকে এল?

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করলে—কুলকার্নি সাহেব কে রে? আমি তো তাকে চিনি না। সে কোথা থেকে এল?

বদ্যিনাথ বললে—কুলকার্নি সায়েব তো ভানুভাই প্যাটেল সায়েবের সঙ্গে রোজ বাড়িতে আসতো। আরো অনেক সায়েব আসতো বাড়িতে। সবাই দল বেঁধে বাড়িতে মদ খেত—

খবরটা শুনে সোহম্ হতবাক হয়ে গেল। সবাই তারই বাড়িতে বসে তারই টাকায় মদ খেত!

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—এখন বাড়িতে তোরা কে কে আছিস?

বদ্যিনাথ বললে—মেমসায়েব বলে গেছে আজকে বাড়িতে তিনি খাবেন না। তাই আমি খুকুমণিকে নিয়ে খেলা করছি—

—খুকুমণি? খুকুমণি আবার কোথা থেকে এল রে? কার মেয়ে?

বদ্যিনাথ বললে—হুজুর আপনার। আপনার মেয়ে। খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে। এইটুকু বয়সেই খুব বুদ্ধি! এই বয়সেই খুব কথা বলতে শিখেছে—

সোহমের পায়ের তলা থেকে তখন মাটি সরে গিয়েছে। বললে—কত বয়েস হয়েছে তার?

বদ্যিনাথ বললে—খুকুমণির কথা জিজ্ঞেস করছেন? আপনি কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার তিন মাস পরেই খুকুমণি জন্মেছে। এখন ন'মাস বয়েস হলো।

সোহম্ শুধু হতবাক নয়, স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

বদ্যিনাথ আবার বললে—মেমসায়েব খুকুমণির খুব ভালো নাম দিয়েছেন হুজুর—

—কী নাম?

বদ্যিনাথ বললে—শম্পা—

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—শম্পা? তার মানে?

বদ্যিনাথ তো লেখা-পড়া-জানা মানুষ নয়। সে বললে—আমি মুখ্যু মানুষ, শম্পার মানে আমি জানি না—

হঠাৎ কথার মাঝখানে টেলিফোনের লেডী অপারেটার বলে উঠলো—থ্রী মিনিটস্ ওভার প্লীজ—

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার লাইনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বদ্যিনাথের সঙ্গে আর কোনও কথা হওয়ার সুযোগ রইল না।

কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে কাঁটার মত বিঁধে রইল। শম্পা! শম্পা!! কে শম্পা?

সংসারে অনেক মানুষ অনেক কিছু চায়! কেউ চায় স্বাস্থ্য, কেউ চায় খ্যাতি, কেউ চায় চাকরি, কেউ চায় স্ত্রী! এসব ছাড়াও মানুষের আরও অনেক কিছু চাইবার আছে!

আবার এমন লোকও আছে যারা কিছুই চায় না।

কিন্তু তাদের নিয়ে পৃথিবীর কোনও মাথাব্যথা নেই। শুধু পৃথিবীরই নয়, তাদের নিয়ে ইতিহাসেরও মাথাব্যথা নেই। যারা নিঃস্বার্থ লোক তারাও

তো পরের ভালো চায় ! পরের ভালো চাওয়াও তো একরকমের পাওয়া-চাওয়া ।

আসলে চাওয়াটাই পাপ !

সোহম্‌ জীবনে একটা জিনিসই চেয়েছিল । সেটা হচ্ছে—টাকা ।

আজ এই মাঝরাত্রে গাড়ি চালাতে চালাতে তার সেই পুরো জীবনটাই পরিক্রমা করতে আরম্ভ করলো । জীবনের যেমন একটা শেষ আছে, জীবন-পরিক্রমারও তেমনি একটা শেষ আছে । আজ যেন তার জীবন পরিক্রমার শেষ পরিচ্ছেদে এসে সে পৌঁছিয়েছে ।

রাত আরো গভীর হলো । নিউ আলিপুরের সেই বাড়িটা থেকে সে রাত বারোটার সময় গাড়িটা নিয়ে বেরিয়েছিল, আর এইটুকু রাস্তা ড্রাইভ্‌ করে আসতেই তার যেন কত বছর সময় লাগছে ।

হঠাৎ ট্রাম-রাস্তার ক্রসিং-এর সামনে আসতেই দেখলে পুলিস-পোস্ট্‌টার মাথায় হলদে রং-এর আলোটা কেবল জ্বলছে আর নিভছে, নিভছে আর জ্বলছে ! মানুষের জীবনও কি এইরকম একবার জ্বলে আর নেভে, নেভে আর জ্বলে ?

সেদিন সেই ইরাকের একটা শহরে যখন কলকাতার সঙ্গে টেলেক্সে কথা বলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখনও তার মনে হয়েছিল যেন জীবনটাও তার একবার জ্বলছে আর একবার নিভছে, একবার নিভছে আর একবার জ্বলছে ।

হোটেলের ম্যানেজার তার চেহারা দেখে চমকে উঠেছিল ।

জিজ্ঞেস করেছিল—এ কী স্যার ? আপনার চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন ? আপনি কি কলকাতা থেকে কোনও খারাপ খবর শুনলেন ?

সোহম্‌ এক মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল—না না, কোনও খারাপ খবর নয় ।

—তাহলে ?

সোহম্‌ সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল । কই, টেলেক্স না করলে তো সোহম্‌ জানতেও পারতো না যে তার ইরাকে চলে আসার তিন মাস পরেই তার একটা মেয়ে হয়েছে !

সত্যিই তো, এতদিন সুমিত্রা এত চিঠি তাকে লিখেছে কিন্তু কোনও চিঠিতেই তো সে তার মেয়ে হওয়ার কথা লেখেনি । সে সব চিঠিতেই তো লিখেছে ভানুভাই প্যাটেলের কথা । ভানুভাই প্যাটেল তাদের বাড়িতে আছে, ভানুভাই প্যাটেল তাদের বাড়িতেই থাকছে—সেই সব কথাই সুমিত্রা সাত-কাহন করে লিখেছে । অন্য কথা তো কিছুই লেখেনি !

আর মিস্টার সেন ! মিস্টার সেনেরও তো জানানো উচিত ছিল যে সোহম রায়ের মেয়ে হয়েছে । কেন তিনি সে-কথা লিখলেন না ? তাহলে কি মিস্টার সেনও তার মেয়ে হওয়ার কথা জানতেন না ? বা তার মেয়ে হওয়ার কথা মিস্টার সেনকে হয়ত জানানোই হয়নি ?

আর শম্পা ! শম্পা মানে কী ? হাতের কাছে একটা বাঙলা ডিক্‌সনারিও নেই যে 'শম্পা' শব্দটার মানে জেনে নেবে সে ! সুমিত্রা এত নাম থাকতে 'শম্পা'

নামটাই বা রাখলে কেন মেয়ের ?

ঘরের মধ্যে গিয়েও সোহম্‌ ছট্‌ফট করতে লাগলো। মনে হলো কখন মিস্টার সেনের চিঠি আসবে ? তিনি লিখেছেন—'লেটার ফলোজ'। তার মানে চিঠি আসছে। কিন্তু সে চিঠি কবে আসবে ? কখন আসবে ? চিঠি আসতে কত দেরি হবে ? কতক্ষণ সে-চিঠির জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হবে ?

সেদিনও সোহম্‌ হাঁটতে হাঁটতে পোস্টাফিসের দিকে গেল।

তাকে দেখতে পেয়েই পোস্ট্‌-মাস্টার বললে—না স্যার, আপনার চিঠি নেই—

সোহম্‌ হতাশ হয়ে হোটেলে ফিরে এসে একটা বীয়ারের বোতল নিয়ে চুপ করে বসে রইলো। বসে বসে টেলিভিশনের দিকে চোখ রেখে দিলে। কিন্তু তার একটা বর্ণও বুঝতে পারলে না।

তার পরদিন আবার।

পোস্টমাস্টার ভদ্রলোক মানুষ। বললে—আপনি কষ্ট করে কেন এতখানি রাস্তা হেঁটে আসেন ? চিঠি এলে আমাদের লোক গিয়ে আপনার হাতেই তো চিঠি দিয়ে আসবে।

সোহম্‌ বললে—না, আমার তো হাঁটাও হয় এই উপলক্ষ্যে—

বলে আবার হতাশ হয়ে হোটেলে ফিরে এসে একটা বীয়ারের বোতল টেনে নিলে।

রাত্রেও যে তার ভালো করে ঘুম হবে, তাও নয়। ঘুমোতে গেলেই শম্পার একটা কাল্পনিক চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বদ্যিনাথ বলেছিল অবশ্য যে শম্পাকে দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু কতটা সুন্দর তা বলেনি। হয়তো তা-বলা সম্ভবও নয়। সৌন্দর্যের মাপকাঠি তো সকলের এক নয়। রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে অনেক সময়ে শম্পার গলার আওয়াজও শুনতে পায় সোহম্‌। শম্পা যেন ডাকে—বাবা—বাবা—

হয়তো স্বপ্ন ! স্বপ্ন তো স্বপ্নই। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না—তা সবাই-ই জানে। তবু ভালো স্বপ্নকে সত্যি বলে ভেবে নিয়ে আনন্দ তো পাওয়া যায়।

মনে আছে প্রথম যখন সোহম্‌ কলকাতায় এসে পৌঁছলো তখন অনেক রাত। প্লেনটা দেরি করে পৌঁছনোর জন্যে সোহম্‌ আগে থেকে বাড়িতে খবর দিতে পারে নি। আর এছাড়া উদ্দেশ্য ছিল হঠাৎ বাড়ি পৌঁছিয়ে সুমিত্রাকে চমকে দেবে।

ট্যাক্সি থেকে দু'টো সুটকেস নিজেই নামিয়ে নিয়ে তার ভাড়াটা মিটিয়ে দিলে। তারপর দু'টো সুটকেস দু'হাতে ধরে বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কলিং বেল বাজাতেই বদ্যিনাথ ভেতর থেকে জবাব দিলে—কে ?

সোহম্‌ বললে—আমি রে বদ্যিনাথ, আমি—

সঙ্গে সঙ্গে বদ্যিনাথ দরজা খুলে দিয়েছে। আর সুমিত্রাও শব্দ পেয়ে বাইরে এসেছে।

বললে—এ কী, তুমি ? আগে একটা খবরও তো দিতে হয় ! খবর দিলে আমি এয়ার-পোর্টে···

সোহম্‌ সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে বললে—শম্পা কোথায় ?

সুমিত্রা আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে—তুমি শম্পার নাম জানলে কী করে?

সোহম্ বললে—মিস্টার সেন আমাকে টেলিফোনে সব জানিয়ে দিয়েছেন। তুমি আমাকে জানাওনি কেন?

সুমিত্রা হাসলো। বললে—তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে—

সোহম্ বললে—চলো, আগে শম্পাকে দেখি গিয়ে—

সুমিত্রা সোহম্‌কে নিয়ে শোবার ঘরে গেল। সোহম্ দেখলে খাটের ওপর ফরসা ফুটফুটে একটা মেয়ে বিছানা আলো করে শুয়ে আছে—

সোহম্ তাড়াতাড়ি ঘুমন্ত শম্পাকে কোলে তুলে নিতে গেল। সুমিত্রা বললে—ও কী করছো? ও কী করছো—

কিন্তু সোহম্ বললে—না, এতদিন পরে ওকে দেখছি, ওকে আমি এক মিনিটের জন্যে কোলে করবোই—

বলে সুমিত্রাকে এক হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে।

শম্পা তখন ঘুমে অচেতন। সোহম্ সেই ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে একদৃষ্টে তার মুখখানা দেখতে লাগলো। ঠিক সুমিত্রার মত মুখটা। হয়েছে, ঠিক সুমিত্রার মতই গায়ের রং, ঠিক সুমিত্রার চোখের মত চোখ দুটো। সুমিত্রা যখন ঘুমোয় তখন তাকে ঠিক এই রকমই দেখায়।

সুমিত্রা বললে—জানো, শম্পা ভারি দুষ্টু হয়েছে। ঠিক তোমার মত। মোটে ঘুমোতে চায় না। লক্ষ্মীটি, ওকে শুইয়ে দাও, অনেক কষ্টে ওকে ঘুম পাড়িয়েছি—

—তাহলে ওকে একবার আমি চুমু খাই—

বলে সোহম্ শম্পার গালের ওপর আলতো করে একটা চুমু খেলে। শম্পা বোধহয় অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, তাই জেগে উঠলো না—

সুমিত্রা সোহমের কোল থেকে শম্পাকে নিয়ে আস্তে আস্তে আবার বিছানায় শুইয়ে দিলে। সোহম্ সেই ঘুমন্ত শম্পার মুখটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। কী সুন্দর শম্পাকে দেখতে।

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে—কী দেখছো অমন করে?

সোহম্ বললে—দেখছি শম্পাকে দেখতে ঠিক তোমার মত হয়েছে—অবিকল তোমার মত গায়ের রং, অবিকল তোমার মত চোখ, অবিকল তোমার মত ··

সুমিত্রা বাধা দিয়ে বললে—যাঃ, বাজে কথা, ও ঠিক তোমার মত দেখতে হয়েছে, অবিকল তোমার মত গায়ের রং, অবিকল তোমার মত চোখ, অবিকল তোমার মত ··

সোহম্ বললে—না···

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলে—থাক, আর বলতে হবে না, যথেষ্ট হয়েছে! এখন কী খাবে বলো?

—খাবো? কী খাবো?

বলে সোজা সুমিত্রার মুখটা জোর করে দুই হাতে ধরে নিজের মুখের কাছে এনে বললে—এই, এই খাবো—

হঠাৎ সুমিত্রা জোরে চেঁচিয়ে উঠেছে—করছো কী, করছো কী ? বদ্যিনাথ যে পাশের ঘরে রয়েছে, সবাই শুনতে পাবে যে। ছাড়ো লক্ষ্মীটি, ছাড়ো—

সুমিত্রার গলার আওয়াজেই সোহমের ঘুম ভেঙে গেল। আর তারপর ঘুম ভাঙতেই সে সেই হোটেলের অন্ধকার ঘরের মধ্যেই চোখ চেয়ে একবার চারদিকে দেখে নিলে। কোথায় কলকাতা ? কোথায় সুমিত্রা ? কোথায় শম্পা ? কেউ তো কোথাও নেই ! তাহলে এতক্ষণ কি সে স্বপ্ন দেখছিল ? এ তো ইরাক। সে তো এখনও ইরাক ছাড়েনি। সে তো মিস্টার সেনের চিঠির অপেক্ষায় ইরাকেই রয়েছে !

তাহলে মিস্টার সেনের চিঠি আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন ? কলকাতা থেকে ইরাকে চিঠি আসতে এত দেরি হয় কেন ? তাহলে কেউ কি পোস্টঅফিসে কাজ করে না ?

মনে আছে সোহম্ সেদিন আর দেরি করেনি। টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানিতে টেলিফোন করবার কথাটাও একবার তার মনে এসেছিল। কিন্তু না, টেলিফোন করতে গেলে আবার তাদের ঘুষ দিতে হতো।

তার চেয়ে সোজা কলকাতায় চলে যাওয়াই ভালো। কলকাতায় পেঁছিয়ে সোজা নিজের বাড়িতে গিয়ে সুমিত্রাকে সে অবাক করে দেবে !

কলকাতায় কখন সে পেঁছিবে ?

কখন সে পেঁছিবে তা এখান থেকে বলা যাবে না। এয়ার-পোর্টে গিয়ে তবে জানা যাবে। বিদেশে থাকার যেমন সুবিধে আছে, তেমনি অসুবিধেও আছে অনেক। মানুষের যদি পাখীর মতো পাখা থাকতো···। আগের যুগ হলে দূরত্বটা যত অসহ্যই হোক, তা বাধ্য হয়ে সহ্য করতে হতো। কিন্তু এ-যুগে ওড়বার ব্যবস্থা থাকলেও মানুষ কি সুখী হয়েছে ? আসলে সুখ জিনিসটা যে কী তা আজ পর্যন্ত কি কেউ ব্যাখ্যা করতে পেরেছে ?

আগের যুগে বলা হতো যার ঋণ নেই সে-ই সুখী। কিংবা যে অপ্রবাসী সে-ই সুখী।

সেদিন সোহমের মনে হয়েছিল, প্রবাস-বাস থেকে সে নিজের দেশে নিজের বাড়িতে এলেই সুখী হবে।

এখন মনে হচ্ছে, কেন সে সেদিন অত তাড়াতাড়ি কলকাতায় আসার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল ? বরং ইরাকেই তো সে ছিল ভালো। ইরাকে তার কোনও কাজ যেমন ছিল না, তেমনি টাকার অপ্রাচুর্যও তো ছিল না তার।

কিন্তু কলকাতায় ?

আগে থেকে ইচ্ছে করেই বাড়িতে সুমিত্রাকে কোনও খবর দেয়নি সে।

ভেবেছিল হঠাৎ পৌঁছিয়ে সুমিত্রাকে অবাক করে দেবে সে।

আর কুলকার্নি ?

নামটা সোহমের মনের ভেতরে খচ্ খচ্ করে বিঁধছিল। বদ্যিনাথের কাছে টেলিফোনে আর কতটুকু জানা যায়। ভানুভাই প্যাটেল মারা গেছে, এটা তো একটা সুখবর, কিন্তু ওই কুলকার্নিটা আবার কে ?

এয়ার-হোস্টেস্ লাঞ্চ্ দিয়ে গেল। ক্ষিধেও পেয়েছিল। কিন্তু খাওয়ার দিকে মন ছিল না। বাড়ির দিকে যদি মন থাকে তাহলে খাওয়ার দিকে মন থাকবে কী করে ? তবে নিত্যকর্ম করতেই হয়। সেইভাবেই খাওয়াটা একসময়ে শেষও হলো।

সোহম্ চুপ করেই বসে ছিল। অন্য সবাইও চুপ। অন্য সকলের তো আর তার মত সমস্যা নেই। আর সমস্যা নেই এমন মানুষ কোথায় পাওয়া যাবে ? বেঁচে থাকলেই সমস্যা থাকবে, মরে গেলে কারো কোনও সমস্যার বালাই থাকে না।

—শম্পা !

শম্পা মানে কী ? ও-নামটা কে রাখলো ? কলকাতায় গিয়েই একটা ডিক্শনারী কিনে নিয়ে মানেটা দেখতে হবে। বদ্যিনাথের কথায় সোহম্ ইরাকে চলে যাওয়ার তিন মাস পরে জন্মেছে। কার মতন দেখতে হয়েছে শম্পাকে ? সোহমের মত, না ইব্রাহিমের মত, না ভানুভাই প্যাটেলের মত ?

প্রথমে জাম্বো-জেট প্লেনটা বোম্বাইতে এসে নামলো সান্টা-ক্রুজ এয়ার-পোর্টে। তারপর প্লেন বদলে একেবারে সোজা কলকাতায়।

সেই কলকাতা। যে-কলকাতার সঙ্গে তার আজন্ম সম্পর্ক। এই কলকাতাতেই সে বেড়ে উঠেছে, ফেঁপে ফুলে উঠেছে। স্যুটকেস যখন হাতে এসে পৌঁছুলো তখন যেন তার আর দেরি সইছে না। তারপর ট্যাক্সি। ট্যাক্সিটাও যেন আস্তে আস্তে চলছে।

সোহম্ অধীর হয়ে বলে উঠলো—ভাইয়া, জেরা জলদি চলিয়ে, ঘরমে জরুরী কাম হ্যায়—

ট্যাক্সিওয়ালা কী বুঝলো কে জানে! আর কী করেই বা বুঝবে ? তার স্ত্রীকে ছেড়ে সে তো আর এক বছর ইরাকে থাকেনি! তাহলে হয়ত বুঝতো সোহমের মনের অবস্থা। আর তাছাড়া ইচ্ছে থাকলেও তো কলকাতা শহরে কেউ তাড়াতাড়ি গাড়ি চালাতে পারে না। এখানে পদে পদে নিষেধের গণ্ডী বাঁধা। পদে পদে বিপদের ফাঁদ পাতা।

সোহমের মনে হলো যেন সময় আর কাটবে না। যেন ঘড়ি আর চলবে না। বাড়ির সামনে আসতেই সোহম্ নেমে পড়ে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলে।

ব্যালেন্স্ ? ব্যালেন্স্ আর ফেরত চাই না সর্দারজী। ওটা তোমার বখশিশ ধরে নাও—

—বদ্যিনাথ, বদ্যিনাথ—

ঘড়িতে তখন সন্ধ্যে সাতটা।

দরজা খুলতে এত দেরি হচ্ছে কেন ? আবার বাজালো কলিং-বেল—বদ্যিনাথ, বদ্যিনাথ—

এতক্ষণে দরজা খুললো।

ততক্ষণে সোহম্ রেগে আগুন হয়ে গেছে।

—কী রে, তোরা কোথায় ছিলি সব ? সবাই কি কানে কালা হয়ে গেছিস নাকি ? আমি এতক্ষণ ধরে কলিং-বেল বাজাচ্ছি ! আর ঠাকুর ? ঠাকুর কোথায় গেল ?

কিন্তু বদ্যিনাথের ওপর রাগ করে কী হবে ? সুমিত্রা তো বাড়িতে আছে, সেও কি কানে কালা হয়ে গেল ?

বদ্যিনাথকে বললে—আমার স্যুটকেসটা নিচে থেকে নিয়ে আয়—

বলে সোহম্ নিজের শোবার ঘরের দিকে গেল। কিন্তু ভেতর থেকে অনেক লোকের গলার আওয়াজ আসছিল। তার ঘরে এত লোক কোথা থেকে এল ? সোহম্ কিছুই বুঝতে পারলে না।

হঠাৎ ঘরের পর্দাটা সরাতেই যেন মৌচাকে ঢিল পড়লো। নানা বয়েসের একদল লোক ভেতরে বসে সামনে ডিকেন্টার নিয়ে বোধ হয় হুইস্কি খাচ্ছে।

—কে ?

তাদের মধ্যে থেকে কে একজন উদ্ধত ভঙ্গীতে বলে উঠলো—হু আর ইউ ?

এতক্ষণে সুমিত্রা দেখতে পেয়েছে।

—এ কী ? তুমি ? তুমি কখন এলে ?

সুমিত্রার মুখ থেকে অ্যালকোহলের গন্ধ বেরোচ্ছিল। যেন একটু টলছিল সে।

সুমিত্রা আবার জিজ্ঞেস করলে—কী হলো ? কখন এলে তুমি ? কথা বলছো না যে ?

সুমিত্রা সোহম্কে ঠেলতে ঠেলতে খানিকটা বাইরে নিয়ে এল। সোহম্ লোকগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—ওরা কারা ?

সুমিত্রা বললে—বলছি বলছি, কিন্তু তুমি কখন এলে ? আমাকে তো তুমি কিছু জানাওনি ? কতক্ষণ এসেছ ?

সোহম্ বললে—এই এখখুনি। কিন্তু আমার কথার জবাব দাও আগে। ওরা কারা ? এখানে ওরা কী করছে ?

—আঃ, অত চেঁচিও না। ওরা আমার ফ্রেন্ড—

—ফ্রেন্ড ? ফ্রেন্ড মানে ?

সুমিত্রা বললে—আবার চেঁচাচ্ছ কেন ? বলছি তো ওরা আমার ফ্রেন্ড !

সোহম্ বললে—আমি বাড়িতে নেই, তোমার ফ্রেন্ডরা এ-সময়ে আসে কেন ? ওরা জানে না যে এটা আমার বাড়ি ?

—আবার চেঁচাচ্ছ ?

সোহম্ বললে—আগে আমার কথার উত্তর দাও ! ওরা কেন এসেছে ? ওরা কি তোমার কাছে রোজই এইরকম আসে ?

সুমিত্রা বললে—তুমিই তো যাবার আগে আমাকে ভানুভাই প্যাটেলকে খুব খাতির করতে বলে গিয়েছিলে।

সোহম্ বললে—কিন্তু সে-স্কাউণ্ড্রেলটা তো মারা গেছে—

সুমিত্রা বললে—আজ বুঝি সে তোমার কাছে স্কাউণ্ড্রেল হয়ে গেল হঠাৎ ?

সোহম্ বললে—যখন আমার স্বার্থ ছিল তখন তাকে এন্টারটেন্ করতে বলেছিলুম, কিন্তু এখন তো আমার কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে, আর এখন সে মারাও গেছে। কিন্তু এরা ? এরা কারা ?

সুমিত্রা বললে—এরা সেই ভানুভাই প্যাটেলেরই সাঙ্গোপাঙ্গ, ভানুভাই প্যাটেলের ইয়ার-দোস্ত সব—

—কিন্তু আমাদের যখন কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে, তখন এদের বাড়িতে আসতে দাও কেন ? এরা কার টাকায় মদ খাচ্ছে ?

সুমিত্রা বললে—আমি এ-বাড়ির হোস্টেস, খরচটা তো আমারই করা উচিত—

—খরচটা তোমার মানে ?

সুমিত্রা বললে—আমার মানে আমার—

সোহম্ বললে—মিথ্যে কথা। আমার টাকায় ওরা মদ খাচ্ছে—।

সুমিত্রা বললে—কিন্তু আমি তোমার স্ত্রী, তোমার টাকা কি আমার টাকা নয় ? তুমি আর আমি কি আলাদা ?

সোহম্ বললে—আলাদা নয় স্বীকার করি, কিন্তু আমি তো এদের সঙ্গে মিশতে, এদের বাড়িতে ডেকে মদ খাওয়াতে তোমাকে বলিনি—

সুমিত্রা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপর বললে—এ-কথার জবাব আমি এখন দেব না, ওরা চলে গেলে দেব—

—কখন যাবে ওরা ?

সুমিত্রা বললে—এই তো সবে একটু আগে এল ওরা। এখনও এক রাউণ্ড্ও খাওয়া হয়নি—

সোহম্ বললে—ওদের চলে যেতে বলো এখ্খুনি। বলো গিয়ে যে আমি ইরাক থেকে হঠাৎ এসে গেছি—

সুমিত্রা বললে—তুমি দেখছি খুব রেগে গেছ—

সোহম্ বললে— আমার রাগ যদি হয়েই থাকে তো সে কি অন্যায় রাগ ?

সুমিত্রা বললে—তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ, তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে, তুমি আগে একটু ঠাণ্ডা হও—

—ওরা আমার বাড়ি থেকে আগে চলে যাক তবে আমার মাথা ঠাণ্ডা হবে—

সুমিত্রা বললে—ছিঃ, তুমি কী সব যা-তা বলছো, দেখছি রেগে গেলে তোমার জ্ঞান থাকে না মোটে—

সোহম্ বললে—ওরা ক'জন আছে ঘরে বলো, ওদের নাম কী ?

সুমিত্রা গলা নামিয়ে বললে—অনেকে আছে···

—অনেকে মানে ? নাম নেই ?

সুমিত্রা বললে—নাম বললে তুমি চিনবে না—

—তবু শুনিই না—

সুমিত্রা তেমনি গলা নামিয়েই বললে—একজন আছে কুলকার্নি, একজন ভাটনগর, একজন ব্যানার্জি, আর একজন লাহিড়ী···আর···

কুলকার্নি! কুলকার্নি নামটা শুনেই সোহমের বুকটা কেমন ছাঁৎ করে উঠলো। ওই নামটাই বৈদ্যনাথ ট্রাংক-টেলিফোনে বলেছিল। ওই কুলকার্নির সঙ্গেই নাকি সেদিন সুমিত্রা কোথায় বেরিয়েছিল।

সোহম্ বললে—তুমি ওদের সঙ্গে কোথায় যাও? আমি টেলিফোন করে তোমাকে পাই না—

সুমিত্রা বললে—হ্যাঁ, বৈদ্যনাথ বলেছিল আমাকে তুমি ইরাক থেকে টেলিফোন করেছিলে—

—কোথায় গিয়েছিলে তুমি সেদিন?

সুমিত্রা বললে—তা কি মনে আছে? ওরা এসে পীড়াপীড়ি করলে কী করবো বলো? হয়ত সিনেমায় গিয়েছিলুম

—টাকা কার?

—কুলকার্নি'র, আবার কার?

সোহম্ বললে—তুমি যে আমার সঙ্গে এমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা আমি ভাবতেই পারিনি—

সুমিত্রা বললে—বিশ্বাসঘাতকতা? বলছো কী তুমি? কারো সঙ্গে সিনেমায় যাওয়াটাও কি বিশ্বাসঘাতকতা হলো?

ঘরের ভেতর থেকে মাতালদের মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো—কই মিসেস রায়, কোথায় গেলেন?

সুমিত্রা চমকে উঠলো। বললে—ওই, ওরা ডাকছে, আমি যাই—

সোহম্ সুমিত্রার একটা হাত ধরে ফেললে। বললে—না, তুমি ওই মাতালদের কাছে যেতে পারবে না—

সুমিত্রা কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। বললে—না, লক্ষ্মীটি আমাকে যেতে দাও, আমাকে এক মিনিটের জন্যে ও ঘরে যেতে দাও, আমি এখখুনি আবার চলে আসবো—

—না, কিছুতেই আমি তোমায় যেতে দেব না। এতদিন পরে আমি তোমার কাছে এলুম, আর তুমি ওদের কাছে যাচ্ছো? আজ ওরাই তোমার নিজের লোক হলো? আমি তোমার কেউ না—?

—না না, লক্ষ্মীটি আমাকে একবারটি যেতে দাও। ওরা আমার গেস্ট্, ওরা কী মনে করবে বলো দিকিনি! আমি যাই···

বলে সোহমের হাত ছাড়িয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। কিন্তু সোহম্ বললে—তাহলে আমার মেয়ে কোথায় বলো? কোথায় সে?

সুমিত্রা বললে—শম্পা? শম্পার কথা বলছো? তার কথা তুমি জানলে কী করে?

—বৈদ্যনাথ টেলিফোনে আমাকে বলেছিল—

সুমিত্রার হাতে তখন বোধ হয় সময় কম ছিল। বললে—যাও না, ওই ঘরে চলে যাও, বাসন্তিয়া আছে, শম্পা ওর কাছে রয়েছে, দেখো গে না, খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে, খুব লাভ্‌লি। ঠিক তোমার মত দেখতে হয়েছে—যাও—

বলে আর সেখানে দাঁড়ালো না। তার সত্যিই বোধ হয় হাতে সময় ছিল না তখন। ঘরে তখন গেস্ট্ রয়েছে অনেক। তাদের গ্লাস খালি হলে সুমিত্রাকেই হুইস্কি ঢেলে দিতে হবে। কাজ কি তার কম?

কী আশ্চর্য! এক বছরের মধ্যেই সুমিত্রার এত পরিবর্তন হয়ে গেল! বদ্যিনাথ সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তার হাতে তখন স্ন্যাক্স্-এর ট্রে। গরম গরম কী সব ভাজা নিয়ে যাচ্ছে গেস্ট্‌দের ঘরে।

সোহম্ তাকে ডাকলে—এই বদ্যিনাথ—

বদ্যিনাথকেও যেন খুব ব্যস্ত মনে হলো। তবু অনিচ্ছের সঙ্গেও সাহেবের সামনে একটু দাঁড়ালো সে।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যাচ্ছিস তুই? ট্রে'তে ওসব কী?

বদ্যিনাথ বললে—চিকেন কাটলেট্—

সোহম্ বললে—ও-সব পরে নিয়ে গেলেও চলবে—আগে আমার স্যুটকেসটা খুলে আমার পাজামা শার্ট আর ড্রেসিং-গাউনটা বের করে দে—

বদ্যিনাথের কানে যেন সোহমের কথার গুরুত্বটা তেমন করে স্পর্শ করলো না। বললে—দিচ্ছি। এই কাট্‌লেটগুলো আগে দিয়ে আমি আসছি, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার কুলকার্নি সাহেব ক্ষেপে যাবেন—

—কী বললি?

সোহমের গলার চড়া আওয়াজ ঘরের সিলিং-এ গিয়ে প্রতিধ্বনি তুললো।

ঘরের ভেতরে সুমিত্রার কানেও বোধ হয় সোহমের চড়া গলার আওয়াজটা পৌঁছেছিল। সে তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচল দোলাতে দোলাতে এসে হাজির হলো।

বললে—আবার কী হলো? অত চ্যাঁচামেচি কীসের?

সোহম্ বললে—এই দেখ না, বদ্যিনাথকে বলছি স্যুটকেসটা খুলে পাজামা শার্ট ড্রেসিং-গাউন বার করে দিতে, আর ও বলছে কাটলেট্ দিতে দেরি হলে নাকি কুলকার্নি সাহেব ক্ষেপে যাবে—

সুমিত্রা বললে—ও তো ঠিক কথাই বলেছে! তোমার পাজামা ড্রেসিং-গাউন একটু দেরি করে বার করে দিলে কী এমন ক্ষতি? কাটলেট্ দিতে দিতে দেরি হলে ওরা ক্ষেপে যাবে না?

সোহম্ বললে—তা আমার চাইতেও কি কুলকার্নি সাহেব তোমার নিজের লোক হলো? সে এ-বাড়ির কে? আমি এ-বাড়ির মালিক, না সে মালিক? মালিক কে?

সুমিত্রা রেগে উঠলো, বললে—আঃ, অত চেঁচাচ্ছ কেন? ওরা শুনতে পাবে না?

সোহম্ বললে—থাক্ শুনতে! ওরা শুনতে পেলে তো আমার বয়ে গেল!

সুমিত্রা বললে—তোমার বয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার এখনও ইজ্জৎ ভদ্রতা বোধ বলে একটা জিনিস আছে। ওরা আমার গেস্ট, আমি ওদের সঙ্গে অত খারাপ ব্যাবহার করতে পারবো না—

সোহম্ খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে রইল, তারপর বললে—ওঃ, এই এক বছরের মধ্যে এতদূর গড়িয়েছে ?

সুমিত্রা বললে—তোমার এই সব বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই, আমি চললুম—

ভেতর থেকে আবার কে যেন বলে উঠলো—কই মিসেস রায়, আপনি কোথায় গেলেন ?

সুমিত্রা বললে—ওই শোন, ওরা ডাকছে, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার এই সব বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই—

—না, শোনো, আগে বলো শম্পা কোথায় ?

সুমিত্রা বললে—বললুম তো বাসন্তিয়ার কাছে—

—বাসন্তিয়া ?

সুমিত্রা বললে—হ্যাঁ, শম্পাকে দেখবার জন্যে ওই আয়াকে রেখেছি, দেখ গে যাও, আমি চলি—

সোহম্ আর পারলে না। তার শম্পাকে দেখতে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো—

কোথায় যেন সোহম্ পড়েছিল শিক্ষার কী কী শত্রু, কী কী বাধা ! শিক্ষার সব চেয়ে বড় বাধা হলো পাঁচটা। কী বাধা সেই পাঁচটা ? প্রথম হচ্ছে অহংকার, দ্বিতীয় হচ্ছে ক্রোধ, তৃতীয় রোগ, চতুর্থ হচ্ছে প্রমাদ আর পঞ্চম হচ্ছে আলস্য।

এই পাঁচটা বাধার মধ্যে সোহমের কোন্ দোষটা ছিল ?

অহংকার ?

কিন্তু সোহমের তো কোন অহংকার ছিল না। অহংকার তার থাকবে কেমন করে ? ছোটবেলায় তার অহংকার করবার মতন ছিলই বা কী ? না ছিল তার টাকা, না ছিল তার বিদ্যে। বাইরে কেউ না জানুক, সোহম্ নিজে তো ভাল করেই জানে যে সে কী করে বি এ পাস করেছে। তাদের সময়ে যেভাবে বেশির ভাগ ছেলে পরীক্ষায় পাস করতো, সোহম্ও সেইভাবেই পাস করেছিল।

সুতরাং অহংকারের প্রশ্নই ওঠে না।

তারপর হলো ক্রোধ। ক্রোধ কি সোহমের ছিল ? কার ওপরে সে ক্রোধ করবে ? সোহম্ তো বরাবর ক্রোধের পথ এড়িয়েই চলেছে। যে-লোক সকলের সঙ্গে আপোস করে চলে তার ক্রোধ থাকবে কেন ?

আসলে যে-দোষটা তার ছিল সেটা হচ্ছে প্রমাদ। তা নাহলে এমন কেন

হলো ? কেন সে মেহের আলির কথায় ভুললো ? মেহের আলি সাহেবই তো তাকে বুঝিয়েছিল যে সংসারে টাকাটাই হলো আসল জিনিস, আর বাকি সব কিছু মিথ্যে।

অফিসে মিস্টার সেন একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন—ইরাক থেকে আসার পর আপনি যেন কী রকম অন্য মানুষ হয়ে গেছেন লক্ষ্য করছি—ব্যাপারটা কী বলুন তো !

সোহম্ উত্তর দিয়েছিল—কই, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না—

মুখে সোহম্ যা-ই বলুক, ভেতরে ভেতরে সে তো ফাঁপা হয়ে গিয়েছিল।

মিস্টার সেন আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন—ব্লাডপ্রেসার আছে নাকি ! ডাক্তারকে একবার দেখান না।

সোহম্ বলেছিল—তা দেখালে হয়—

মিস্টার সেনের তবু সন্দেহ দূর হয়নি। বলেছিলেন—অফিসের ডাক্তার তো রয়েইছে···ঘুম টুম হচ্ছে তো ঠিক !

সোহম্ বলেছিল—তা হচ্ছে—

মিস্টার সেন বলেছিলেন—ইরাকের ক্লাইমেটটা বোধ হয় আপনার তেমন ঠিক স্যুট করেনি। সকলের তো সব ক্লাইমেট স্যুট করে না। আমারও একবার ওই রকম হয়েছিল। দার্জিলিং গিয়ে আমার এমন ডিসেণ্ট্রি হলো যে সে আর সারলো না। শেষকালে যেবার জার্মানী গেলুম, তখন ঠিক হলো। আমাদের এই যে শরীরটা, এটার কলকব্জাগুলো খুব পিকিউলিয়ার—

তারপর শরীর সম্বন্ধে একটা লম্বা লেক্চার দিতে লাগলেন মিস্টার সেন।

শুধু মিস্টার সেনই নয়, যে দেখলে সে-ই চমকে উঠলো। বললে খাওয়া-দাওয়ার খুব কষ্ট ছিল নাকি সেখানে ?

কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলে · সেখানে বুঝি খুব মাংস খেতেন ?

আবার একজন বললেন—মরুভূমির দেশ তো, বাঙালীর হেলথ্ সেখানে টিঁকবে কেন ?

আবার আর একজন জিজ্ঞেস করলে—স্যার, ইরাকে কি আমাদের নতুন ব্রাঞ্চ অফিস খুলছে নাকি ?

সোহম্ বললে—না তো ?

—তাহলে আপনি ইরাকে গিয়েছিলেন কেন ?

সোহম্ বললে—অফিস আমাকে পাঠিয়েছিল ওদের দেশের ফ্যাক্টরিগুলো দেখতে। ওরা কী করে ওদের মাল এক্সপোর্ট-মার্কেটে এত সস্তায় দিতে পারে তাই জানতে—

—কী দেখে এলেন ?

সোহম্ বললে—দেখলুম ওখানকার ওয়ার্কাররা খুব এফিসিয়েণ্ট, সকলের বাঁধা-ধরা কোটা আছে কাজের। এখানকার মত ওভারটাইমের লোভ নেই। আর মাইনেও কম। কাজ না করলে ওদের চাকরি চলে যাওয়ার ভয় আছে। তাই সবাই মন দিয়ে কাজ করে—

—লেবার-ইউনিয়ন নেই এখানকার মত ?

সোহম্ কি ইরাকের লোকদের সঙ্গে কোনও দিন মিশেছে নাকি যে বলতে পারবে সেখানকার ফ্যাক্টরিতে লেবার-ইউনিয়ন আছে কি না ? সে যে সারাদিন সারারাত হোটেলের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতো, এ কথা তো কলকাতার লোক জানতে পারেনি। সে যে ইরাকে নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে গিয়েছিল, সে-কথা সে কেমন করে এখানকার লোকদের বলবে ? সবাই জানে তার অনেক টাকা মাইনে বেড়েছে, সবাই জানে সোহম্ অনেক টাকার মালিক। কিন্তু তার জন্যে তার কী মূল্য দিতে হয়েছে, তা কি কেউ জানে ?

অফিসের সেকশানে সেকশানে সবাই আলোচনা করে—আরে মশাই, আমাদের মত তো ফাটা কপাল নয় রায় সাহেবের ! রায় সাহেবের একাদশে বৃহস্পতি—

আর একজন জিজ্ঞেস করে—একাদশে বৃহস্পতি মানে ?

—তা কে জানে মশাই ? লোকের মুখে শুনে আসছি 'একাদশে বৃহস্পতি' থাকলে নাকি খুব টাকা হয়, তাই বলছি—

কিন্তু আলোচনা একদিনে থামে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তার জের চলে। এক সেক্শান থেকে আর এক সেক্শানে, অফিস থেকে ফ্যাক্টরিতে সবাই একই আলোচনা করে। আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে আসে যে, 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্শন্ কোম্পানি' ইরাকে আবার নতুন অফিস খুলছে। এই অফিস খুললে কিছু নতুন লোক নেবেই। তখন কলকাতা থেকে কি আর কিছু লোক নেবে না ? তার জন্যে এখন থেকেই ধরাধরি করা ভালো।

কিন্তু কাকে ধরা যায় ?

রায় সাহেবকে ধরলে অবশ্য হয়, কিন্তু যা গম্ভীর মানুষ ! যদি ভাগিয়ে দেয় ? অথচ সকলেই জানে রায় সাহেব এককালে নাকি ভীষণ গরীব মানুষ ছিল। বাপ মা কেউ ছিল না। পরের বাড়িতে মানুষ।

কেদার সান্যাল এ-অফিসে নতুন এসেছে। এম. এ পাস করেছে, কিন্তু কোথাও ভালো কোনও চাকরি পায়নি। কিন্তু এই অফিসে পা রেখে সারা ইণ্ডিয়া চষে বেড়াচ্ছে একটা ভালো মোটা মাইনের চাকরির জন্যে।

কেদার সান্যালের বন্ধুরা ভালো ভালো চাকরি যোগাড় করে সমাজের মাথায় উঠে মাথার শোভা হয়ে বিরাজ করছে। কেদার সান্যালের নিজের অবস্থার জন্যে কারো সঙ্গে দেখা করতে লজ্জা করে।

যখন সে অফিসে ঢোকে তখন পাছে কেউ দেখতে পায়, তাই কোনও রকমে মাথা ঢেকে ভেতরে ঢুকে পড়ে। হাত পেতে তিনশো টাকা মাইনে। সেই মাইনেটা নিতেও তার যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

অথচ তার বন্ধুরা ?

তার অনেক বন্ধুরা আবার গাড়িও কিনেছে। হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে গেলে এক-একজন বড়লোক বন্ধু জিজ্ঞেস করে—কী রে, কী করছিস আজকাল ?

কেদার বলে—বি-সি-এস পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছি—

এমনি অবস্থায় কেদার খবর পেলে যে কোম্পানি ইরাকে একটা অফিস খুলছে।

রায় সাহেবই নাকি সেইজন্যে ইরাক গভর্মেণ্টের সঙ্গে কথা বলতে সেখানে গিয়েছিল। তখন সবেমাত্র কয়েকদিন হল সোহম্ কলকাতায় ফিরেছে। বড় ব্যস্ত। যখনই গেছে তখনই রায় সাহেবের চাপরাসী বলেছে—সাহেব সেন সাহেবের ঘরে আছেন—

হতাশ হয়ে শুধু শুকনো মুখে কেদার সান্যাল ফিরে এসেছে।

সেদিন ছুটির পর অফিসের সবাই বেরিয়ে যে যার বাড়ি চলে গিয়েছে। এই সুযোগ! কেদার ঠিক করলে সেদিন সে রায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেই।

রায় সাহেবের ঘরের সামনে সাহেবের চাপরাসীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—রায় সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করবো, সাহেব আছে ভাই?

চাপরাসী বললে—না, নেই—

—সে কী! সারাদিন তো সাহেব ঘরে নেই, আজকে আর সাহেব অফিসে আসবে না নাকি?

চাপরাসী বললে—তা আমি কি জানি, সাহেবই জানে!

রায় সাহেবের যেমন তিরিক্ষি মেজাজ, সাহেবের চাপরাসীর মেজাজও তেমনি!

আশ্চর্য, কপাল খারাপ হলে বোধ হয় এইরকমই হয়। কেদার আর কী-ই বা করবে! হতাশ হয়ে যেই মুখ ফিরিয়ে বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে, হঠাৎ দেখলে সামনেই রায় সাহেব গট্ গট্ করে অফিসে নিজের চেম্বারে ঢুকছে।

—স্যার?

সোহম্ বাধা পেয়ে কেদারের দিকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে চেয়ে দেখলে—

—হোয়াট!

কেদার নিজের পরিচয় দিতে গেল, কিন্তু সোহমের অত বাজে কথা শোনবার সময় নেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সে যেমন নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল তেমনি ভঙ্গিতেই তার ভেতরে ঢুকে গেল। কেদারও সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো। চাপরাসীটা এবার আর কিছু বলবার সময়ই পেলে না। শুধু হাত তুলে তার সাহেবকে একটা সশ্রদ্ধ সেলাম করলে।

সোহম্ তখন নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়েছে। কেদারের দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—ইয়েস্?

কেদার বুদ্ধি করে দাঁড়িয়েই রইল। বললে—স্যার, আমি একটা এ্যাপ্লিকেশন এনেছি—

—এ্যাপ্লিকেশন? কীসের এ্যাপ্লিকেশন?

কেদার বললে—চাকরির স্যার—

—চাকরির? কী চাকরি?

কেদার বললে—ইরাকে আমাদের 'টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাকশন্' কোম্পানির অফিসের চাকরি—

—ইরাক?

সোহম্ অবাক হয়ে গেছে কথাটা শুনে। তার ইরাকে যাওয়ার পেছনে এই গুজব রটেছে নাকি? ভালো, ভালো, ভেরি গুড্!

—কে আপনাকে বললে ইরাকে আমাদের অফিস হচ্ছে ?

কেদার বললে—অফিসের সবাই বলাবলি করছে—

সোহম্‌ কেদারকে ভাল করে তীক্ষ্ন নজর দিয়ে দেখলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে—আপনার নাম কী ?

—কেদারনাথ সান্যাল—

—কত মাইনে পান আপনি ?

—তিনশো টাকা।

সোহম্‌ আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনার কোয়ালিফিকেশন ?

—আমি ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস এম. এ—

সোহম্‌ জিজ্ঞেস করলে—আপনি ম্যারেড্‌, না আন্‌ম্যারেড ?

—ম্যারেড্‌—

সোহম্‌ আবার জিজ্ঞেস করলে—চিলড্রেন ?

কেদার বললে—একটা মেয়ে আছে কেবল—

বলেই সঙ্গে সঙ্গে বললে—ওই মেয়েটির জন্যেই আমার যত ভাবনা স্যার। আজকাল ছেলে-মেয়ে মানুষ করা যে কী কষ্টের তা হয়তো আপনি বুঝবেন না স্যার—

—কেন বুঝবো না ?

—আপনারা বড়লোক, অনেক টাকা মাইনে পান, আমাদের কষ্ট আপনারা কী করে বুঝবেন ? আজকাল বেবি ফুড-এর দাম এত বেড়ে গেছে যে প্রত্যেক মাসের শেষে টাকা ধার করতে হয়। আর তাতেও সব মাসে কুলোয় না—

সোহম্‌ বললে—মাইনে যখন এত কম পান তখন আপনারা বিয়ে করেন কেন ? তার জন্যেও কি অফিস দায়ী ? দোষ করবেন আপনি আর তার জন্যে ভুগবে অফিস ?

কেদার সান্যাল চুপ করে রইল। এ কথার সে কী জবাব দেবে ?

সোহম্‌ রেগে গেল। বললে—যান, নিজে দোষ করবেন আর আমার কাছে এসে কাঁদুনি গাইছেন, লজ্জা করে না কাঁদতে ?

সত্যিই তখন কেদার সান্যাল কেঁদে ফেলেছিল। তখন তার মনে পড়ছিল বন্ধুদের কথা। তার মত তারাও বিয়ে করেছে, তাদেরও ছেলে-মেয়ে হয়েছে, তাদের ছেলে-মেয়েরা বিলিতি স্কুলে পড়ছে। স্কুলের গাড়ি করে তারা পাড়ার সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে স্কুলে পড়তে যায়, দামী দামী ইউনিফর্ম তাদের গায়ে। এক-একটা ফ্রকের দাম নাকি নব্বুই-একশ টাকা দামের! আর তার নিজের মেয়ে ? তার জন্যে একজোড়া ভালো জুতোও কিনে দিতে পারে না সে।

সোহম্‌ চিৎকার করে উঠলো—কাঁদছেন কেন ? কাঁদতে ইচ্ছে হয় আমার ঘরের বাইরে গিয়ে কাঁদুন। এ-রকম কান্না আমার অনেক দেখা আছে—যান—

তবু কেদার সান্যাল সেখানে দাঁড়িয়েই হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলো।

সোহম্‌ এবার অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। বলে উঠলো—কেন কাঁদছেন ?

কেদার সান্যাল বললে…। কিন্তু বলতে গিয়েও কান্নার বন্যায় তার মুখের কথা ভেসে তলিয়ে গেল—

সোহম্ বলে উঠলো—আরে, এ তো মহা মুশকিল হলো দেখছি, বলুন কেন কাঁদছেন ?

কেদার বললে—শম্পার কথা ভেবে—

শম্পা !!!

সোহম্ চমকে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলে—শম্পা কে ? কে শম্পা ?

কেদার বললে—আমার মেয়ে—

সোহম্ কী করবে বুঝতে পারলে না। এর মেয়ের নামও শম্পা ?

সোহম্ নিজের চেয়ারের ওপর নড়ে-চড়ে বসলো। বললে—আপনি কাঁদবেন না, বসুন। ওই চেয়ারটাতে বসুন –

কেদারকে বসতে বলতে পেরে সোহম্ যেন একটা অহেতুক মানসিক স্বস্তি পেলে। কেন স্বস্তি পেলে সে ? শুধু ওই 'শম্পা' নামটা শুনে ? 'শম্পা' নামটা তো কারো কপিরাইট্ নয়। যে-কোনও লোকের মেয়ের নাম 'শম্পা' হতে পারে। তাহলে ?

কেদার পাশে রাখা চেয়ারটায় বসে পড়লো। বসে মাথা নিচু করে চোখ মুছতে লাগলো। এও সোহমের জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা। সারাজীবন ধরে কত মানুষের সংস্পর্শে এসেছে সে। কেউ অর্থের তাগিদে, কেউ স্বার্থের তাগিদে, কেউ বা ক্ষেত্রবাবুদের মত পরমার্থের তাগিদে। সকলের জীবনে তাগিদটাই বড়। সাধারণ ভাবে যে-তাগিদটা সকলের চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ সেটা হচ্ছে টাকা। সোহমের নিজের কাছেও টাকার তাগিদটাই সে সারাজীবন ধরে বেশি অনুভব করেছে। কেদারও তাই। টাকার তাগিদেই সে সোহমের কাছে এসেছে। কিন্তু তাদের কারো মেয়ের নাম তো 'শম্পা' নয়। মেহের আলি সাহেবেরও একমাত্র মেয়ে ছিল, কিন্তু সে-মেয়ের নামও তো 'শম্পা' নয়। মেয়ের 'শম্পা' নাম হওয়ার জন্যেই কি সে কেদারকে খাতির করে চেয়ারে বসতে বললে ?

প্রতিদিন সোহম্ অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সেই একই দৃশ্য দেখেছে। বাড়ির সেই একই আবহাওয়া। সেই কুলকার্নি, সেই ভাটনগর, সেই ব্যানার্জি, সেই লাহিড়ী। তারা সবাই তার ঘরে বসে মদের ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। সেই সুমিত্রা তাদের সকলকে হুইস্কি সার্ভ করছে, রাম সার্ভ করছে, জিন্ সার্ভ করছে। আর মাঝে মাঝে বদ্যিনাথ কিচেন থেকে চিকেন কাটলেট, ফিশ্-ফিঙ্গার, আরো সব কী-কী স্ন্যাকস ঘরের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে নানা লোকের কথা, গোলমাল, গানের টুকরো কানে ভেসে আসছে।

আর তার পাশের অন্য ঘরে সে তার 'শম্পা'কে নিয়ে আদর করছে। ক'মাসই বা বয়েস শম্পার, কিন্তু তবু সোহমকে সে চিনতে পারে। সে যেন ওইটুকু বয়েসেই বুঝতে পেরেছে যে, যে-লোকটা প্রতিদিন তাকে বাসন্তিয়ার কোল থেকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে নিবিড় করে চুমু খেয়ে খেয়ে মুখ-গাল ভরিয়ে দেয়, সে-লোকটা তাকে সত্যি-সত্যিই ভালোবাসে। আর তাই বাবার কোলে উঠেই সেই অতটুকু

মেয়ে একগাল হেসে ওঠে।

সোহম্ বাসন্তিয়াকে শাসন করে। বলে—শম্পাকে অত কাঁদাস কেন রে তুই? এই তো আমার কোলে উঠেই সব কান্না কেমন থেমে গেল! অত কাঁদাস কেন ওকে?

বাসন্তিয়া বলে—আমি তো কত আদর করি, তবু কাঁদে। আমি কী করবো?

সোহম্ বলে—তা আমি কি সারাদিন অফিস কামাই করে একে কোলে নিয়ে বাড়িতে বসে থাকবো? তুই কি তাই চাস?

বাসন্তিয়াকে বকা বৃথা। যে-মেয়ের মা তাকে দেখে না সে তো কাঁদবেই।

সোহম্ জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ রে, তা শম্পা কি দুপুরবেলাও কাঁদে নাকি এমনি করে?

—হ্যাঁ সায়েব!

—কেন, কাঁদে কেন? দুপুরবেলায় তো আর বাড়িতে বাইরের সাহেবরা আসে না?

বাসন্তিয়া বলে—সায়েবরা আসে না, কিন্তু তবু কাঁদে—

—কেন? তবু কাঁদে কেন?

বাসন্তিয়া বলে—আমি কী করে জানবো সায়েব, আমার কাছে থাকলেই মিসিবাবা কাঁদে—

সোহম্ বলে—তুই ছাড়া বাড়িতে মিসিবাবাকে দেখবার কি আর কোন লোক নেই?

বাসন্তিয়া বলে—বদ্যিনাথ আছে, ঠাকুর আছে, আমি যখন গোসল করতে যাই, আমি যখন খানা খেতে যাই, তখন ওরা মিসিবাবাকে দেখে—

—ওরা ছাড়া মিসিবাবাকে দেখতে বাড়িতে আর কেউ নেই?

বাসন্তিয়া বলে—হুজুর, মেমসায়েবের কথা বলছেন? তা মেমসায়েব তো তখন ঘুম করেন!

—ঘুম করেন?

—হ্যাঁ সায়েব।

—দিনভর ঘুম করেন?

বাসন্তিয়া বলে—রাতভর মেমসায়েব জেগে থাকেন, তাই দিনভর মেমসায়েব ঘুম করেন—মেমসায়েবের কী কসুর—

এর পর আর কোনও কথা বলা চলে না। সোহম্ শম্পাকে কোলে করে তার মুখখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে থাকে। দেখতে দেখতে আরো নিবিড় করে তাকে জড়িয়ে ধরে। শম্পার মুখখানা অবিকল সোহমের মত দেখতে হয়েছে। ঠিক তারই মতন ভ্রু, তারই মত কপাল, তারই মতন পাতলা ঠোঁট! শম্পার সব কিছুই ঠিক সোহমেরই মত।

তারপর যখন আরো একটু রাত হয় তখন শম্পাকে খাওয়াতে হয়। রাত্রে শম্পাকে খাওয়ানোর ডিউটিটা সোহমের। শুধু খাওয়ানোই নয়, তাকে ঘুম পাড়ানোটার ডিউটিও সোহমের।

একসময় সোহমের কোলের ওপরেই শম্পা ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে আলতো করে তুলে তার বিছানায় শুইয়ে দেয় সোহম্।

তখন সোহমের নিজের খাওয়ার পালা।

বদ্যিনাথ এসে বলে—আপনার খাবার দিয়ে যাবো হুজুর ?

—তা দে—

সেই ঘরেই একটা ছোট টিপয়ের ওপর খাবারের থালা দিয়ে যায় বদ্যিনাথ। সেটা নিয়মরক্ষে মাত্র। অর্থাৎ খেতে হয় তাই খাওয়া। যাকে এক-কথায় বলে —ক্ষুন্নিবৃত্তি!

বদ্যিনাথ জিজ্ঞেস করে—আর খাবেন না হুজুর ?

—না।

বদ্যিনাথ তবু জিজ্ঞেস করে—ফিশ্-ফিঙ্গার, চিকেন-বিরিয়ানি করেছিলুম, ওই সব একটু দেব আপনাকে ?

সোহম্ বলে—না—

পাশের ঘরের ভেতর থেকে তখন অনেক মানুষের গলার আওয়াজ আর খুশির হল্লার শব্দ শোনা যায়।

প্রথম দিনই সোহম্ বদ্যিনাথকে জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ রে বদ্যিনাথ, ওরা বাড়ি যাবে না ?

—কারা হুজুর ?

বদ্যিনাথ বলেছিল—ওই যে ও-ঘরে যারা আছে—

—এখন যাবে না হুজুর!

—তাহলে কখন যাবে ?

বদ্যিনাথ বলেছিল—সে এখন কী ? কোনও কোনও দিন ভোর তিনটে-চারটেও বেজে যায়—তখন সবাইকে ধরে ধরে যার যার গাড়িতে উঠিয়ে দিতে হয় আমাকে—

—আর তোর মেমসাহেব ?

বদ্যিনাথ বলেছিল—মেমসায়েবও ততক্ষণ পর্যন্ত জেগে কাটাবে—

—আর মেমসাহেবের রাত্তিরের খাওয়া ?

বদ্যিনাথ বলেছিল—ওই যে অত চিকেন কাটলেট, বিরিয়ানি, ফিশ্-ফিঙ্গার, চিলি-চিকেন বানালাম, তাই খেয়েই সকলের পেট ভরে গেছে, আবার কী খাবেন ?

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে মেমসাহেব কাল ঘুম থেকে কখন উঠবেন ?

বদ্যিনাথ বলেছিল—তা বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে যাবে—

মনে আছে, সোহম্ সেই রাত্রিটা সেই শম্পার ঘরে শম্পাকে পাশে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল আর বাসন্তিয়াও ঘুমিয়েছিল সেই ঘরের দরজার সামনে।

কেদার সান্যালের সামনে বসে বসে সোহম্ নিজের জীবনটাই পরিক্রমা করে চলেছিল।

সত্যিই তো, এই কেদার সান্যালের তিনশো টাকাতে মাস চলবে কী করে ?

এক-একটা প্রশ্নের এক-একটা জবাব দিয়ে যাচ্ছিল কেদার সান্যাল।

—আপনি কি কোনও পার্টি'র মেম্বার ?

কেদার বুঝতে পারলে না রায় সাহেব তাকে এত প্রশ্ন করছেন কেন ?

বললে –সব পার্টি'রই মেম্বার ছিলুম এককালে, কিন্তু এখন আমি আর কোনও পার্টি'তে নেই।

—কেন এমন হলো ?

কেদার বললে—আমি মিশে দেখেছি স্যার, সবাই সমান।

—কী রকম ?

কেদার বললে—সব পার্টি'ই মাত্র একটা জিনিস চায়—

—সেটা কী ?

কেদার সান্যাল বললে—টাকা। মানুষের ভালো করবার ইচ্ছে কোনও পার্টি'রই নেই—

সোহম্ তার নিজের জীবনের পুরনো দিনগুলোর কথা মনে করতে লাগলো। এককালে সে নিজেও তো একজন এই কেদার সান্যালই ছিল !

—আপনি মদ খান ?

—মদ ?

কেদার সান্যাল রায় সাহেবের এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলো। এ প্রশ্ন তাকে কেন করলেন রায়সাহেব ?

বললে—মদ যে খাবো, তা টাকা কোথায় পাবো ?

সোহম্ বললে—তাহলে তো আপনার কিচ্ছু হবে না। নিজে আপনাকে মদ খেতে হবে, পরকে মদ খাওয়াতে হবে, নিজের বাড়িতে কক্‌টেল পার্টি' দিতে হবে। বড় বড় লোককে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে পার্টি' দিতে হবে। নিজের ওয়াইফকে তাদের সামনে ভিড়িয়ে দিতে হবে, নিজের ওয়াইফকে মদ খাওয়ার নেশা করাতে হবে, তবে আপনার টাকা হবে—

কেদার সান্যাল রায় সাহেবের সামনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোল না।

—কই, কথা বলছেন না যে ?

কেদার কী বলবে ? তবু বললে—স্যার, আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন—

সোহম্ বললে—আমি তো সহজ বাঙলা ভাষাতেই কথা বলছি ! আপনি তো বললেন, আপনি ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস এম. এ.। তার ফলে কি আপনি বাঙলা ভাষাও ভুলে গেছেন ?

কেদার সান্যাল লজ্জায় পড়লো। বললে—না, স্যার। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি কী বলতে চাইছেন !

—আমি আপনার স্ত্রীকে মদের নেশা করতে বলছি। ক্লাবে গিয়ে সকলের সঙ্গে মদ খেতে বলছি। বাড়িতে কক্‌টেল পার্টি' দিতে বলছি—

কেদার বললে—কিন্তু তাতে তো অনেক টাকা খরচ হবে স্যার—

—তা হোক, কাবলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করেও পার্টি' দিতে হবে।

—তাতে কী হবে স্যার ?

সোহম্ বললে—তাতে আপনার টাকা হবে। আপনি তো টাকাই চান—

কেদার সান্যাল স্বীকার করলে যে সে টাকা চায়। কিন্তু বাড়িতে কক্‌টেল পার্টি দিলে টাকা কী করে আসবে তা সে বুঝতে পারলে না।

সোহম্ বললে—কী হলো ? অত ভাবছেন কী ? পৃথিবীসুদ্ধ লোক যা করে থাকে, আমি তো আপনাকে তাই-ই করতে বলছি—

তবু কেদার সান্যালের মুখ দিয়ে কোনও কথা ফুটলো না। সে চাকরিতে প্রমোশন চাইতে এসেছিল, ইরাকে যেতে চেয়েছিল, তার জবাবে রায়সাহেব ওকে এসব কী বলছেন ?

সোহম্ এবার রেগে গেল। বললে—কী হলো ? আমি যা বলছি তা আপনার কানে যাচ্ছে না ? আপনার স্ত্রীকে মদ খাওয়াতে পারবেন না ?

তবু কেদার সান্যালের মুখে কোনও জবাব নেই।

খানিক পরে কেদার বললে—স্যার, আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না, আমি আপনার চেয়ে সব বিষয়ে ছোট। আমাকে 'তুমি' বলে কথা বলুন—

—ঠিক আছে। আমি তাই ই বলছি। তুমি কাবলিওয়ালার কাছে টাকা ধার করে বাড়িতে কক্‌টেল-পার্টি দাও। আর সব বড় বড় লোকদের নেমন্তন্ন করো তোমার বাড়িতে—

কেদার বললে—তারা আমার মত গরীব লোকের বাড়িতে আসবে কেন ?

সোহম্ বললে—আসবে আসবে, সবাই আসবে। মদ আর মেয়েমানুষের গন্ধ পেলে যত বড়লোকই হোক সবাই তোমার বাড়িতে আসবে। দেখে নিও—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আর দেখ, তোমার মেয়ের নাম 'শম্পা' না ?

—হ্যাঁ—

সোহম্ বললে—ওই শম্পাকে একটা আলাদা ঘরে একটা ঝি-এর কাছে রাখবে। সে যেন তার মা'র কাছে না আসে—

কেদার চুপ করে রইল।

সোহম্ আবার বললে—আর, আর একটা কথা, তোমার ওয়াইফ যেন মদ খেতে রিফিউজ্ না করে। কিম্বা বড়লোকদের সামনে বমি না করে—

—কিন্তু…

—কিন্তু কী ?

কেদার সান্যাল বললে—কিন্তু স্যার আমার ওয়াইফের যে টি-বি ··

—টি-বি ? মানে থাইসিস্ ?

সেই কেদার সান্যাল! কেদার সান্যালের কথা মনে পড়তেই সোহমের আরো অনেক লোকের কথা মনে পড়ে গেল। এতদিন ধরে এত লোকের সঙ্গে মিশেছে সে। মানুষ তো সোহম্ কম দেখলে না। কত মানুষের মিছিল তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে চলে গেল। আর শুধু মানুষই নয়, অনেক দেশও তো দেখা হয়ে গেল। সে নিজে না হয় বেশি দেশ দেখেনি, কিন্তু এমন অনেক লোকের সঙ্গে তো মিশেছে যারা অনেক দেশ ঘুরেছে, অনেক দেশের অনেক মানুষকে দেখেছে।

সেই ইরাকের জর্জ স্যান্ডোজকে যেমন একদিন দেখেছিল, তেমনি আবার কলকাতায় কেদার সান্যালকেও সে দেখলে।

দুজনে যেন দুই বিপরীত মেরুর লোক। একজন উত্তর মেরু, আব একজন দক্ষিণ মেরু। একজন চায় অভাব থেকে মুক্তি পেতে, আর একজন চায় একেবারে অভাব বোধহীন হয়ে থাকতে। জর্জ স্যান্ডোজ নিজের প্রয়োজন-বোধের মূলটাকেই উপড়ে ফেলে দিয়ে মুক্তপুরুষ হয়ে গেছে, আর কেদার সান্যাল নিজের প্রয়োজনের অক্টোপাশেই বন্দী হয়ে ছট্ফট করে মরছে।

এই প্রয়োজন-বোধটুকুই বোধ হয় সংসারে সবচেয়ে বড় দস্যু। সে সব কিছু নিজের বলে আত্মসাৎ করতে চায়। সে ন্যায়-অন্যায় বোঝে না, সে আপন-পর জানে না, সে নিরঙ্কুশ, স্বার্থের ব্যাপারে সে নির্বিকল্প।

ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলো ছোটবেলায় সোহম বোঝেনি। আজ এখন গাড়ি চালাতে চালাতে সেই ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলোর যেন সে মানে খুঁজে পেলে।

ক্ষেত্রবাবু বলতেন—যে-মানুষ তার প্রয়োজনের পরিধি কেবল বাড়িয়েই চলে, তখন সে হয় প্রয়োজনের দাস, আর যে-মানুষ তার প্রয়োজনকে যথাসম্ভব সীমিত করে রাখে সে হয়ে যায় প্রয়োজনের প্রভু।

এই কথাই বলেছিল জর্জ স্যান্ডোজ—ইরাকে।

বলেছিল—জানো মিস্টার রায়, তোমাদের একজন গড্ ছিল, প্রহ্লাদ—

প্রহ্লাদ! সোহম্ চমকে উঠেছিল জর্জের মুখে 'প্রহ্লাদ' কথাটা শুনে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি প্রহ্লাদের নাম জানলে কী করে?

জর্জ বলেছিল—কেন, জেনেছি তোমাদের মাইথোলজি পড়ে।

—সত্যি অবাক কাণ্ড!

—যখন নৃসিংহ-অবতার প্রহ্লাদের ফাদারকে মার্ডার করে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করলে—তুমি কী ফেভার চাও আমার কাছে প্রহ্লাদ? তখন প্রহ্লাদ কী জবাব দিয়েছিল, মনে আছে মিস্টার রায়?

সোহম্ বলেছিল—না, আমি পড়িনি!

জর্জ বলেছিল—সে কী? তুমি ইণ্ডিয়ান হয়েও পড়োনি! আর আমি তো

ফরেনার টুরিস্ট, আমি কেন তা পড়েছি ?

সোহম্ নিজের অজ্ঞতায় নিজেই বড় লজ্জা পেয়েছিল সেদিন।

জিজ্ঞেস করেছিল—কী ফেবার চেয়েছিল ?

জর্জ বলেছিল—তার জবাবে প্রহ্লাদ কী বলেছিল জানো ? বলেছিল—আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট এনি ফেবার ফ্রম ইউ। যে লোক পরের কাছে কোনও ফেবার চায় সে বিজনেস্ম্যান। আমি তোমার একজন সেল্ফ্লেস্ ডিভোটী, আমি তোমার কাছ থেকে কোনও ফেবার চাই না। যদি আমাকে তুমি কিছু ফেবার করতেই চাও, তাহলে আমাকে এইটুকু ফেবার করো যে আমি যেন কারো কাছে কখনও কোনও ফেবার না চাই। আমার মনে যেন কারো কাছে কখনও কোনও ফেবার চাইবার ইচ্ছেই না হয়—

কথাগুলো বলেই জর্জ স্যানডোজ নিজের দুই হাত বুকের ওপর ক্রস্ করে রাখলে।

তারপব নিজের মনেই বলে উঠলো—ওঃ, হোয়াট্ এ নোবল্ এ্যাণ্ড গ্রেসাস্ সোল—

তারপর আবার বললে—আমি অনেক দেশ দেখেছি, অনেক বই পড়েছি, বাইবেল্ তো পড়েছিই, কিন্তু কোনও দেশের কোনও হোলি বুকে এমন কথা পড়ি নি। কারো কাছে আমি এ-রকম কথা শুনিনি। দেখ, আমাদের দেশে আমরা যদি কারো কাছ থেকে কিছু পাই তো আমরা তখনই বলি—থ্যাংকিউ - বলি না ?

সোহম্ বলেছিল—হ্যাঁ—

জর্জ বলেছিল—কিন্তু ইণ্ডিয়াতে 'থ্যাংকিউ' বলবার সিস্টেম নেই। আমি ইণ্ডিয়াতে গিয়ে তা দেখেছি। এটা লক্ষ্য করে আমার মনে হয়েছিল ইণ্ডিয়ানরা বুঝি বড় অসভ্য জাত। কিন্তু জানো, তোমাদের ইণ্ডিয়ার বেনারসের এক হোলি-সাধুর কাছে এর এক অদ্ভুত জবাব পেলাম। তিনি বললেন ইণ্ডিয়ানরা দিয়েই কৃতার্থ, নিয়ে নয়। এ এক অদ্ভুত এক্সপিরিয়ান্স্ আমার মিস্টার রায়। ওঃ, হোয়াট এ নোবল্ এ্যাণ্ড্ গ্রেসাস্ ফিলজফি—

তারপরে জর্জের মুখে হিন্দুদের সে কী প্রশংসা, হিন্দু রিলিজিয়নের ওপর সে কী শ্রদ্ধা—

কথাগুলো বলতে বলতে জর্জের লাল মুখ শ্রদ্ধায়-ভক্তিতে যেন আরো লাল হয়ে উঠেছিল।

তারপর বলেছিল—আই এ্যাম্ জেলাস অব্ ইউ মিস্টার রায়! সত্যিই মিস্টার রায়,তোমাদের ওপর আমার খুব হিংসে হচ্ছে, ইউ আর সো নোবল্ এ্যাণ্ড সো গ্রেট—

কেদার সান্যালের সামনে বসে সোহমের সেই সব ইরাকের পুরনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ছিল।

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি স্ত্রীকে ডাক্তার দেখাচ্ছেন তো ?

কেদার সান্যাল বলেছিল—স্যার, ডাক্তার দেখাতে গেলেও তো পয়সা লাগে, আমার সে-পয়সা কোথায় ? আর আজকালকার ডাক্তারদের তো আপনি নিশ্চয়ই

জানেন। তবু ডাক্তার দেখাচ্ছি—

এর কোনও জবাব দেওয়ার মত কথা সোহমের মুখে যোগায়নি সেদিন। ওই টাকা! ওই টাকাই তো এ-যুগে তাই সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস! কিন্তু কেদার সান্যাল তো বিলাসিতা করবার জন্যে টাকা চাইছে না। চাইছে স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে! তার টাকা চাওয়া কি অন্যায়?

কেদার সান্যাল আবার বলেছিল—এই জন্যে আমার অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে স্যার। এখন আর কেউ টাকা ধার দিতে চাইছে না—অফিসের মাইনে থেকে অনেক টাকা মাঝে মাঝে কেটে নিচ্ছে—

এই কেদার সান্যাল এর পরে অনেক দিন আর সোহমের কাছে আসেনি। সোহমও নিজের কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হেড-অফিসের কাজের সঙ্গে ফ্যাক্টরিতেও ঘন ঘন থাকতে হচ্ছিল, যেতে হচ্ছিল। সকলেরই সাহায্য দরকার, সকলেরই টাকার দরকার। সকলেরই সহানুভূতির দরকার, সকলেরই সহযোগিতার দরকার, আর সেই সব কিছু দরকারের সমাধানের জন্যেই তো সোহমকে রাখা। সোহমই তো 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জাকশন'-এর ওয়েলফেয়ার অফিসার। তাকে তো এই সব অসংখ্য কেদার সান্যালদের দেখবার জন্যেই ওই পোস্টে বসানো হয়েছে।

কিন্তু ওয়েলফেয়ার অফিসার সোহমের নিজের ওয়েলফেয়ার অফিসার কে? তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? কোথায় গেলে সে তার নিজের ভালো-মন্দ নিয়ে সেই ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাছে দরবার করতে পারবে?

অনেক দিন কেদার সান্যাল আর তার কাছে মাইনে বাড়াবার আরজি নিয়ে আসেনি। তবে কি সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে?

সমস্ত স্টাফের বাড়ির ঠিকানা তার অফিসের ফাইলে থাকে। একদিন সোহম ফাইলগুলো তার এ্যাসিসটেন্টের কাছ থেকে নিজের কাছে চেয়ে নিয়েছিল। কই, কেদার সান্যাল তো চাকরি ছাড়েনি—। সে তো এখনও চাকরি করছে। তা হলে অফিসে আসছে না কেন?

রাস্তায় যেতে যেতে একদিন মনে পড়ে গেল কেদারের কথাটা। রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর দেখে গাড়িটা থামালো। একবার ডাকবে নাকি কেদারকে? অন্ততঃ জেনে আসা উচিত কেন সে অফিসে আসছে না। কেদারের বউয়ের তো টি-বি আছেই, হয়ত তার নিজেরও অসুখ হতে পারে। কিম্বা তার মেয়েরও অসুখ হতে পারে। শম্পার!

নামটা মনে পড়তেই তার নিজের মেয়ের নামটাও মনে পড়ে গেল। সেই শম্পা!

ড্রাইভারকে বললে—গোবিন্দ, গাড়িটা একটু দাঁড় করা তো এখানে—

গোবিন্দ গাড়িটা দাঁড় করালো।

সোহম নামলো গাড়ি থেকে। চারদিকে এত নোংরা, এত জঞ্জাল, এত দুর্গন্ধ! এখানে মানুষ থাকে কী করে? এখানে থাকলে টি-বি তো হবেই।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আসলে সেটা একটা বস্তী। আশেপাশে দু'একটা

ছোটখাটো দোকান। কোনওটা পান-সিগারেটের, কোনওটা মশলা-পাতির। তখন সেখানে বেচা-কেনা চলছে। কিছু খরিদ্দার, কিছু আড্ডাবাজ মানুষের জটলা।

সোহম্ সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বলতে পারেন, এখানে কেদার সান্যাল বলে কেউ থাকে ?

তাদের মধ্যে একজন বললে—কেদার সান্যাল ? আছে আছে, ওই যে সামনের গলিটা, ওখান দিয়ে সোজা ভেতরে চলে যান—ডাক দিলেই বেরিয়ে আসবে—

গলিটা সরু। এত সরু যে একটা রিকশাও ভেতরে ঢুকতে পারবে না।

লোকটা সোহমের দিকে চেয়ে কী ভাবলে কে জানে। সোহমের সাজ-পোশাক দেখে বোধ হয় একটু সমীহ হলো। বললে—দাঁড়ান, আমি নিজে গিয়ে খবর দিয়ে আসছি, একটু দাঁড়ান—

লোকটা সোহম্‌কে দাঁড় করিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সরু গলিটার ভেতর ঢুকে গেল।

সোহমের মনে হলো—এ কী ? এ সে কী করছে ?

হঠাৎ যেন এক মুহূর্তে সোহম্ একেবারে আপাদ-মস্তক অন্য মানুষ হয়ে গেল। তার মনে হলো কেন সে এখানে কেদার সান্যালের জন্যে দাঁড়িয়ে আছে! কেদার সান্যাল তো তার অফিসের একজন সাধারণ কেরানী। সোহমের অফিসের এক অধস্তন কর্মচারী মাত্র। সোহম্ তো সেখানকার একজন উচ্চপদস্থ অফিসার—কেদার সান্যালদের সকলের নাগালের বাইরে। তার পক্ষে তো এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা শোভা পায় না। সে কী করতে যাচ্ছে ? তার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

সোহম্ আর দাঁড়ালো না। সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। উঠে বসেই বললে—গোবিন্দ, বাড়ি চল—

বলার অপেক্ষা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আবার কেদার সান্যালদের নাগালের বাইরে। হয়ত কেদার সান্যাল বাড়ির গলির সামনে এসে দাঁড়াবে। বলবে—কোথায় ? কে ডাকছিল আমাকে ? কেউ তো কোথাও নেই ! ডাকছিল কে ?

পালিয়ে এসে সোহম্ যেন স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো। সত্যিই বাঁচা গেছে। না না, সে আর এখন সাধারণ ক্লার্ক নয়, সে অনেক দিন আগে অনেক পথ মাড়িয়ে অনেক মূল্য দিয়ে অনেক রক্তপাত করে সে আজ অনেক ওপরে উঠে এসেছে। এখন আর নিচের দিকে চেয়ে দেখবে না সে !

মূল্যের কথা মনে পড়তেই সোহম্ ভয়ে আঁৎকে উঠেছে। বাইরের লোক কেউ জানে না কত বড় মূল্য সে দিয়েছে। কত অপমানকর সে মূল্য ! বাইরের লোক জানে শুধু তার চাকরির কথা, জানে তার গাড়ি-বাড়ির কথা, জানে তার অর্থ-কৌলীন্যের কথা ! কিন্তু তার মনের, তার অন্তরের অন্তস্তলের কথা ? সেটা যদি কেউ দেখতে পেত ?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো সোহমের।

গোবিন্দ নিজের মনেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। সোহম্ বললে—গোবিন্দ—

গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—স্যার ?

সোহম্ বললে—একবার নিউ মার্কেটের দিকে চল্ তো, একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম—

কোথায় সেই টি-বি গলি, আর কোথায় সেখান থেকে একেবারে স্বর্গ। এও দুই বিপরীত মেরু। এও যেন সেই একদিকে কেদার সান্যাল আর অন্য এক-দিকে সোহম্ রায়। কথাটা মনেই ছিল না। ইরাক থেকে কতদিন আগে সে ইণ্ডিয়াতে এসেছে, তা তার অবশ্য মনে নেই, কিন্তু শম্পাকে দেখে বুঝতে পারা যায় যে দিনে দিনে কত জল গড়িয়ে গেছে হাওড়ার পুলের তলা দিয়ে। শম্পা যে তার কত রাতের সঙ্গী, শম্পা যে তার জীবনে কত গভীর ছাপ রেখে গেছে তারও প্রতিটি হিসেব তার মনে আজ অক্ষয় হয়ে আছে।

মনে আছে শম্পা তখন সবে সামান্য সামান্য কথা শিখতে শুরু করেছে। তখনই সোহম্ জানতো যে বড় হলে তার খুব বুদ্ধি হবে।

বাসন্তিয়াও বড় ভালো মেয়ে বলতে হবে। অনেক সৌভাগ্য হলে তবে অমন আয়া পাওয়া যায়। বড় আদর করতো শম্পাকে। বলতে গেলে সমস্ত দিন বাসন্তিয়ার কাছেই থাকতো সে। সন্ধ্যের পর যখন সোহম্ অফিস থেকে ফিরতো তখন শম্পা ঝাঁপিয়ে পড়তো সোহমের কোলে। সোহমের কোলে ঝাঁপিয়ে না পড়তে পারলে শম্পা যেন তখন শান্তি পেত না।

অল্প-অল্প আধো-আধো ভাষায় বলতো—বা-বা-বা-বা—

তারপর বাবার কোলে উঠে যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেত।

কী দিন গেছে সে-সব। পৃথিবীতে যে এত সুখ আছে তা তখনই বুঝতো সোহম্। সে-সুখের কাছে অর্থ, পদ-মর্যাদা, বিলাসিতা, সব যেন তুচ্ছ হয়ে যেত। অনেকক্ষণ শম্পাকে বুকে নিয়েও যেন তৃপ্তি হতো না তার। সে ছিল তার এক নতুন অভিজ্ঞতা।

বদ্যিনাথ এসে জিজ্ঞেস করতো—হুজুর, খাবার দেব ?

সোহম্ জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁরে, ও-ঘরে আজ কারা সব আছে রে, কারা কারা···?

বদ্যিনাথ বলতো—সেই যে-সায়েবরা রোজ আসেন, তাঁরা।

—তাদের নাম নেই ?

—ওই কুলকার্নি সায়েব, ভাটনগর সায়েব, ব্যানার্জি সায়েব, লাহিড়ী সায়েব—

—ওরা ফিশ্-ফিঙ্গার, ফ্রায়েড্ চিকেন, চিলি-চিকেন-টিকেন সব খেয়েছে তো—?

—হ্যাঁ হুজুর, খেয়েছেন।

সোহম্ তখন কথাটা শুনে যেন নিশ্চিন্ত হতো। বলতো—তোর হাত যদি খালি থাকে তাহলে আমাকে খাবার দে, আমি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি—

শুধু সোহম্ নয়, শম্পাও তার সঙ্গে খেত। সোহম্ তাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিত। বাসন্তিয়া খাইয়ে দিতে গেলেই সে তাকে ঠেলে ফেলে দিত। কে যেন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে সোহম্ তার নিজের লোক, আর বাসন্তিয়া পর।

বলতো—আমি ওর কাছে খাবো না—ও দুষ্টু—

কে আপন আর কে পর তা বোধ হয় শিশুদের চিনিয়ে দিতে হয় না। সোহম্ অফিসে চলে যাওয়ার সময় সে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠবে—আমি যাবো বাবা, আমি যাবো—

আবার অফিস থেকে ফেরবার পরও ঠিক তেমনি। সকালবেলার অত কান্না অত বায়না সব যেন শোধ-বোধ হয়ে যেত রাত্রে অফিস থেকে ফেরবার পর। তখন তাকে ছেড়ে কোনও কাজ-কর্ম করাও চলবে না সোহমের। তাকে নিয়েই তখন আজে-বাজে খেলা করতে হবে, তাকে কোলে নিয়ে খাওয়াতে হবে, তাকে পাশে নিয়ে ঘুমোতেও হবে। তখন বাসন্তিয়া বাতিল। তখন বাসন্তিয়াকে সে বাতিল করে দেবে একেবারে বরাবরের মত।

সোহম্ বাসন্তিয়াকে দেখিয়ে বলতো—বাসন্তিয়ার কোলে যাবে তুমি?

শম্পা মাথা নাড়তো জোরে জোরে।

সোহম্ জিজ্ঞেস করতো—কেন? ও কী দোষ করেছে?

শম্পা আধো-আধো গলায় বলতো—ও দুষ্টু—

বাসন্তিয়া বলতো—বড় হয়ে মিসিবাবা বড়ী সমঝদার লেড়কী হবে বাবুজী—

সোহম্‌ও তাই ভাবতো।

একদিন রাত্রে হঠাৎ খুব গোলমালের শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সোহমের। যেন ওধারের ঘর থেকে অনেক মানুষের গালাগালি আর চেঁচামেচির শব্দ আসছে। যেন কাচ ভাঙার শব্দে সমস্ত ফ্ল্যাটটা চৌচির হয়ে উঠলো।

কী হলো? কী হলো? সোহম্ যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থাতেই ঘরের বাইরে গিয়ে আলো জ্বাললো।

কে যেন চিৎকার করছে—ব্লাডি ব্যাস্টার্ড, সান্ অব্ এ বীচ্—গেট্ আউট্, গেট্ আউট্ ফ্রম হিয়ার—

আর একজন কে পাল্টা হুমকি দিলে—স্কাউন্ড্রেল, শুয়ার কি বাচ্ছা, নিক্‌লো, নিকাল যাও ইঁহাসে, আবভি নিকাল যাও—

এবার সুমিত্রার গলার শব্দ এল—আঃ, থামুন না মিস্টার কুলকার্নি, থামুন না—

এবার আর একজন কে বলে উঠলো চিৎকার করে—স্টপ্ ইট্, আই সে—

কিন্তু কে কার কথা শোনে তখন? মারামারি ধাক্কাধাক্কির শব্দে সমস্ত বাড়িটা তখন কাঁপছে। শেষকালে সেই ভিড় সেই মারামারির স্রোত ঘর থেকে ঘরের বাইরে ভেসে এসে একেবারে সব ভাসিয়ে দিলে। সবাই মিলে সবাইকে জড়িয়ে ধরে একবার এদিকে আসছে, আর একবার অন্যদিকে চলেছে। সে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থা। কেউ কারো চুলের মুঠি ধরে টানছে, কেউ কারো গলার টাই। আর তার মধ্যে সকলকে থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে করে সুমিত্রা যেন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সোহম্ গিয়ে সুমিত্রাকে ধরে তোলবার চেষ্টা করতেই সুমিত্রা ফোঁস করে উঠলো। বললে—হু আর ইউ দ্য ব্লাডি ব্যাস্টার্ড—

সুমিত্রার গায়ে একজন হাত দিচ্ছে দেখে অন্য সবাই তখন সোহম্‌কে চেপে ধরেছে। বাকি গালাগালিটা তারাই সম্পূর্ণ করে বলে উঠলো—তুমি কে বাবা ? তুম্‌ কোন্‌ হ্যায় ? ভাগো—ভাগো হিঁয়াসে—ভাগ যাও—

ততক্ষণে বোধহয় সুমিত্রার জ্ঞান ফিরে এসেছে। ওদিক থেকে বদ্যিনাথ, ঠাকুর, বাসন্তিয়া সবাই দৌড়ে এসে সোহম্‌কে ধরে টেনে নিতে চেষ্টা করতে লাগলো···

তারা বললে—হুজুর, আপনি চলে চলুন এখান থেকে—আপনি চলে আসুন—

কিন্তু কেউ যদি সোহম্‌কে চলে আসতে না দেয় তো সে চলে আসবে কী করে ? একদিকে টানছে সুমিত্রার সাঙ্গোপাঙ্গরা, আর অন্যদিকে বদ্যিনাথ আর ঠাকুর। তারা মাত্র দু'জনে অত গায়ের জোর কোথায় পাবে ?

সেই অবস্থায় সুমিত্রা বলে উঠলো—তোমার লজ্জা করে না এদের গায়ে হাত দিতে ?

সোহম্‌ বললে—আমি কার গায়ে হাত দিয়েছি ? বলছো কী তুমি ?

সুমিত্রা বললে—চুপ করো তুমি, তুমি তোমার ঘরে চলে যাও—

সোহম্‌ বললে—আমার ঘর মানে ?

—তোমার ঘর মানে তোমার ঘর ! বাংলা ভাষাও বুঝতে পারো না ? যাও—

সোহম্‌ বলে উঠলো—কেন যাব ? এ-বাড়ির সমস্ত ঘরই তো আমার ঘর ! আমার এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও আমি যাবো না—

—সমস্ত তোমার ঘর ? সমস্ত তোমার বাড়ি ?

—আমার বাড়ি নয় তো কি তোমার বাড়ি ? আমার নিজের টাকা দিয়েই তো আমি এ-বাড়ি কিনেছি—

সুমিত্রার নেশার ঘোর তখনও রয়েছে।

বললে—তোমার টাকা দিয়ে তুমি কিনেছ ?

সোহম্‌ বললে—আমার টাকা নয় তো কার টাকা ? তোমার ?

সোহমের কথা শুনে সুমিত্রা খিল্‌-খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। সে হাসি যেন আর থামতেই চায় না। তারপর একটু সামলে নিয়ে আবার বললে—যা বলছিলে তা আর একবার বলো ?

সোহম্‌ বললে—বলেছি তো আমি আমার টাকায় এ-বাড়ি কিনেছি—

সুমিত্রা তেমনি করেই হাসতে হাসতে কুলকার্নির গা-য়ে ঢলে পড়লো। বললে—শোন, শোন কুলকার্নি, ও কী বলছে শোন, বাগারটা কী বলছে শোন—

বলে আরো জোরে খিল্‌-খিল্‌ করে হাসতে লাগলো।

—বাগার ? আমি আজ তোমার কাছে বাগার ?

সোহম্‌ চিৎকার করে উঠলো। বললে—তুমি আমায় বাগার বললে আজ ?

—তা বাগার বলবো না তো কী বলবো ? তুমি একটা ব্লাডি বাগার—

সোহম্‌ এবার রাগে আরো ফেটে পড়লো। বললে—কী বললে আবার বলো ?

সুমিত্রাকে তখন ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করছে কুলকার্নি। কুলকার্নি বলছে—

আপনি চুপ করুন মিসেস রায়, আপনি চুপ করুন—

সুমিত্রা বললে—না, আমি চুপ করবো কেন, আমি চুপ করবো না। আমি আবার বলছি, ও একটা ব্লাডি—ব্লাডি বাগার—

সোহম্ বললে—মাতালের কথায় রাগ করতে নেই বলে আমি আর কিছু বললাম না। মাতাল না হলে আমি আজ তোমার ঘাড় ধরে লাথি মেরে তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতুম—

—কী বললে ?

—যা বলেছি তা তো তুমি কান দিয়ে শুনেছ—

সুমিত্রা চিৎকার করে উঠলো - আমি মাতাল ?

কুলকার্নি বললে—আপনি চুপ করুন মিসেস রায়, আপনি চুপ করুন—

সুমিত্রা বলে উঠলো—ও আমাকে মাতাল বললে ? ও আমাকে মাতাল বললে ?

ততক্ষণে ভাটনগর, লাহিড়ী, ব্যানার্জি সবাই তখন কোন্ ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সুমিত্রা তখন নেশার ঝোঁকে হাউ হাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

—ও আমায় মাতাল বললে ? ও আমায় মাতাল বললে ?

কুলকার্নি তখনও সান্ত্বনা দিচ্ছে সুমিত্রাকে। বলছে আপনি চুপ করুন মিসেস রায়, আপনি চুপ করুন—

সুমিত্রা সাপের মত ফণা তুললো। বললে—ও আমায় মাতাল বললে আর তুমি চুপ করে শুনছো কুলকার্নি, তুমি কিছু বলছো না ? তুমি কিছু বলো ওকে, তুমি কিছু বলো—

কুলকার্নি বললে—আপনাদের দু'জনের ঝগড়ার মধ্যে আমি কী বলবো ?

সুমিত্রা তেমনি করে কুলকার্নির গায়ের ওপর হেলান দিয়েই বলতে লাগলো, কিন্তু তুমি যদি কিছু না বলো তো কে আমার হয়ে বলবে ? আমার আর কে আছে ? তুমি ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই কুলকার্নি—

কুলকার্নি সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

বলতে লাগলো—চুপ করুন মিসেস রায়, আপনি চুপ করুন···

তারপর সোহমের দিকে চেয়ে বললে—মিস্টার রায়, কাইণ্ড্লি আপনি আর কিছু বলবেন না মিসেস রায়কে। মিসেস রায় বড় আপসেট্ হয়ে পড়েছেন—

সোহম্ বললে—মিসেস রায় যে আপসেট্ হয়ে পড়েছে সেটা কি আমার দোষ ? অত মদ খেলে আপসেট্ তো হবেই ! কে ওকে অত মদ খেতে বলেছিল ? কে ওকে অত মদ খাইয়েছিল ? কে ? কেন ও মাতাল হয়েছিল ?

সুমিত্রা আবার ফোঁস করে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে আবার চেঁচিয়ে উঠলো। বললে—বলবো কে আমাকে মদ খাইয়েছে ? বলবো কে আমাকে মদ খেতে শিখিয়েছে ? বলবো কে আমাকে মাতাল করেছে ?

সোহম্ বললে—বলো না, সত্যি কথা বলবার যদি সাহস থাকে তো বলো না কে তোমাকে মদ খাওয়া শিখিয়েছে। বলো বলো কে শিখিয়েছে ? কে ?

সুমিত্রা মদের ঝোঁকে হাউ-হাউ করে হঠাৎ হেসে উঠলো।

বলতে লাগলো—বলবো? বলবো কে শিখিয়েছে?

সোহম্ বললে—মাতালের কথার দাম কী? এখন তোমার মাথার ঠিক নেই, এখন তোমার কথারও কোনও দাম নেই…

সুমিত্রা সেই মদের নেশাতেই চেঁচিয়ে উঠলো—আবার মাতাল বলছো আমাকে? আবার আমাকে মাতাল…

হঠাৎ ভেতরের ঘর থেকে শম্পার কান্নার শব্দ এল। এই চেঁচামেচিতে হয়ত তার ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভেঙে কাঁদছে—বাবা—বাবা—বা-বা-বা—

এ-রকম ঘটনা কি একদিন?

যখন চাকরিতে সোহমের প্রথম প্রমোশন হয়েছিল তখন তার মনে হয়েছিল এইবার তার জীবনে সুখ আসবে, এইবার সে সুখী হবে। বছরে দশ টাকা মাইনে বাড়লেই যারা ভাবে তাদের অনেক কিছু পাওয়া হয়ে গেল, সোহম্ ছিল তাদেরই দলে। মনে আছে যখনই যার মাইনে বাড়তো তখন তাকে বন্ধুদের খাওয়াতে হতো। কী খাওয়াতে হতো? বড় কোনও হোটেলে গিয়ে এক প্লেট মাংস।

সামান্য এক প্লেট মাংস। তখন কতই বা তার দাম? বড় জোর পাঁচ সিকে। আর নয় তো বড় জোর দেড় টাকা। কিন্তু তা খাইয়ে আর খেয়েই কত লোক কৃতার্থ হয়েছে। কত অল্পতেই তখন সবাই সন্তুষ্ট হতো, আর কত অল্পতেই তখন সবাইকে সন্তুষ্ট করা যেত।

সেই রাত বারোটার সময় নিউ আলিপুর থেকে সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল। বেরিয়ে কত রাস্তা, কত প্রান্তর, কত নদী, কত প্রাচীর, কত জনপদ, কত সমুদ্র অতিক্রম করে মাত্র এই লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড় পর্যন্ত এসে পেঁছিতে পারা গেল। অথচ দূরত্বটা তো বেশি নয়! আঁতুড়-ঘর থেকে শ্মশান পর্যন্ত যেতে কতটুকুই বা সময় লাগবার কথা! তবু সোহম্‌কে এত বাধা, এত রাস্তা, এত প্রান্তর, এত নদী, এত প্রাচীর, এত জনপদ, এত সমুদ্র পেরোতে হলো কেন? কেন এত সময় লাগলো তার? তবে কি সে রাস্তা ভুলে গন্তব্য-স্থল চিনতে পারেনি?

সত্যিই তো, পৃথিবীতে কে সঠিক রাস্তা চিনতে পারে?

ক্ষেত্রবাবু তো তাকে ছোট বেলাতেই সঠিক রাস্তার হদিস দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন সোহম্ সে-পথ চিনতে পারেনি?

কেন পথটা চিনতে পারেনি সেটা মনে করতে গিয়ে প্রথমেই মনে তার পড়লো মেহের আলির কথা। 'ক্ষুধিত-পাষাণে'র সেই পাগলা মেহের আলি নয় যে সব সময় বলতো 'সব ঝুট্ হ্যায়'। এ অন্য। এ শেয়ার মার্কেটের রোকার মেহের আলি। এই মেহের আলি কেবল বলতো—'সব ঠিক হ্যায়'। এ কেবল বলতো

—রায় সাহেব, রুপাইয়া হ্যায় ভগবান—

সেই মেহের আলির জন্যেই তো তার লোয়ার সার্কুলার রোডের 'ট্রিভোলি পার্কে'র বাড়িতে পেঁছিতে এত দেরি হচ্ছে। এই মেহের আলিই তো তার পথ ভুলিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন চাপরাসী ভেতরে এসে একটা স্লিপ্ দিয়ে গেল। বোধ হয় রায় সাহেবের সঙ্গে কেউ দেখা করতে চায়।

—হুঁজুর, মেহের আলি—

সোহম্ বললে—বলে দে, এখন দেখা হবে না—

—হুঁজুর, বলছে খুব জরুরী কাম আছে—

সোহম্ চিৎকার করে উঠলো। বললে—যা বলছি তাই কর্—ভাগিয়ে দে—

চাপরাসীটা ভয় পেয়ে চলে গেল। কিন্তু মেহের আলি অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সোহম্ শুনতে পেলে সে তখন বাইরে চিৎকার করছে—ম্যয় মেহের আলি হুঁ, ম্যয় মেহের আলি—

আর তারপর সেই একই পুরোন স্লোগান—সব ঝুট্ হ্যায়—সব ঝুট্ হ্যায়—

সোহমের একবার মনে হলো সে মেহের আলিকে একবার ভেতরে ডাকে, একবার ডেকে বলে—মেহের আলি সাহেব, তুমি এখন যা বলছো সব ঠিক। সবই মিথ্যে। তাহলে আগে কেন তুমি বলতে সব ঠিক হ্যায় ?

কিন্তু এ-সব কথা বোঝবার মত মাথা তখন তার ছিল না।

সোহম্ চাপরাসীকে আবার ডাকলে। ঘণ্টাটা বাজাতেই চাপরাসীটা ভেতরে ঢুকে সেলাম দিলে—হুঁজুর ?

সোহম্ বললে—পাগলটা কোথায় গেল রে ?

—হুঁজুর, ও এখান থেকে বড় সাহেবের ঘরে গিয়েছিল—

—তাই নাকি ? তারপর ?

বড় সাহেব মানে সেন সাহেব। ওই সেন সাহেবই মেহের আলিকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছিল। ওই সেন সাহেবই মেহের আলির সঙ্গে সোহমের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

বলেছিল—রায়, তুমি যদি শেয়ার-টেয়ার কিনতে চাও তো এই মেহের আলির কাছ থেকেই কিনো। এ একজন খুব এক্সপার্ট শেয়ার-ব্রোকার—বাজারের লেটেস্ট খবর এর কাছে পাবে—

কলকাতার যারা বড় বড় টাকাওয়ালা লোক তারা সবাই এই মেহের আলির পরামর্শমত শেয়ার বেচা-কেনা করে টাকার পাহাড় জমিয়েছিল। সেন সাহেবও এই মেহের আলির পরামর্শ নিয়ে শেয়ার কিনে-বেচে বড়লোক হয়েছিলেন। কিন্তু যার পরামর্শে সবাই বড়লোক হয়ে গিয়েছিল তাকেই সবাই তখন এড়িয়ে চলতো। বাড়িতে বা অফিসে যেখানে হোক দেখা করতে এলেই সবাই দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিত। বলতো—ওকে ভাগিয়ে দে, বলে দে এখন দেখা হবে না—

'সব ঝুট্ হ্যায়'—কথাগুলো যেন অমঙ্গলের। যেন অশুভ। যেন অপয়া। তখন এমন একটা ধারণা সকলের হয়েছিল যে মেহের আলিকে দেখলেই যেন

দিনটা খারাপ যাবে। সকলের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে মেহের আলি লোকটাই অলক্ষ্মী। ওর মুখ দেখলেই অযাত্রা।

আজ এতদিন পরে গাড়ি চালাতে চালাতে সোহমের মনে হচ্ছিল এইটেই বোধহয় হয়। যখন মানুষের যৌবন থাকে তখন যেমন কেউ বার্ধক্যের কথা শুনতে চায় না, এও তেমনি। গরু বুড়ো হওয়ার পর যখন দুধ দেওয়া বন্ধ করে তখন কি কেউ তাকে খেতে দেয়? অনেকে তো আবার তাকে কশাইদের কাছে বিক্রিও করে দেয়।

আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নেহাৎ প্রয়োজনভিত্তিক। আমার কাছে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে, সুতরাং তুমি আমার কেউ নও। এখন থেকে আর তোমাকে আমি চিনি না।

অনেক দিন পরে একদিন রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল মেহের আলির সঙ্গে। তাকে দেখেই সোহম্ বলেছিল—গোবিন্দ, গাড়িটা একটু থামা তো—

গোবিন্দ গাড়িটা রাস্তার একপাশে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো।

সোহম্ বললে—গোবিন্দ, ওই দ্যাখ্, ওই যে পাগলটা যাচ্ছে, ওকে গিয়ে একবার ডেকে আন্ তো—যা শিগ্‌গির, নইলে গলির মধ্যে ঢুকে যাবে—

যে-লোকটাকে সোহম্ কতবার বাড়ি থেকে অফিস থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেই তাকেই আবার সেদিন সোহম্ ডেকে পাঠিয়েছিল।

মেহের আলি সামনে আসতেই সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—মেহের আলি সাহেব, তুমি আমাকে চিনতে পারো?

না, মেহের আলি সোহম্‌কে চিনতে পারলে না।

সোহম্ আবার বললে—আমি রায় সাহেব, মেহের আলি। আমাকে চিনতে পারলে না?

মেহের আলি তবু চিনতে পারলে না।

বললে—আপনার বাড়ি কোথায়?

সোহম্ বললে—সে কী, মনে নেই তুমি আমাকে কত শেয়ার বেচেছ! মনে পড়ছে না? সেই তুমি বোম্বাইতে গেলে তোমার মেয়ে আর বিবিকে খুঁজতে? মনে পড়ছে না?

মেহের আলি কী বুঝলো কে জানে। বড় বড় চোখ করে সোহম্‌কে কেবল একদৃষ্টে দেখতে লাগলো!

সোহম্ বললে—তুমি সেদিন যা বলেছিলে মেহের আলি, সব সত্যি—জানো, সব সত্যি—আজ বুঝেছি সব—

মেহের আলি হঠাৎ বোমা ফাটানোর মত শব্দ করে চিৎকার করে উঠলো—সব ঝুট্ হ্যায়—

সত্যি, লোকটা মেয়ে আর বিবির শোকে পাগলই হয়ে গিয়েছিল। হয়ত পাগল হয়ে গিয়ে মেহের আলি সত্যিই বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু সোহম্ কেন তখনও পাগল হয়নি?

সেই অবস্থায় মেহের আলিকে সেখানেই রেখে সোহম্ বললে—চল্ গোবিন্দ,

বাড়ি চল্—

গোবিন্দ গাড়িটা ছেড়ে দিলে। অনেক বছর ধরেই গোবিন্দ রায় সাহেবের গাড়ি চালাচ্ছে। গোবিন্দ আগে কতদিন ক্লাব থেকে সাহেবকে উঠিয়ে নিয়ে বাড়ি এসেছে। কতদিন সাহেব মেম দু'জনেই মদ খেয়ে গাড়িতেই বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। তখন সে একলাই দু'জনকে একসঙ্গে সামলিয়েছে। তারপর এখন তো সাহেব একলাই অফিসে যায় আর একলাই অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু এক-একদিন সাহেবের কী খেয়াল হয়, সাহেব বলে—গোবিন্দ, এখন বাড়ি যাবো না রে, অন্য কোথাও চল্—

গোবিন্দ বলে—তাহলে বলুন কোথায় যাবো?

সোহম্ বলে—আচ্ছা, চল্ তো একবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে—

আবার কোনও দিন বলে—চল্ তো একবার টালিগঞ্জের দিকে—

কিন্তু টালিগঞ্জ তো ছোট জায়গা নয়। গোবিন্দ গাড়ি চালিয়ে কতদূর যাবে? টালিগঞ্জের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চালিয়ে গোবিন্দ বলে—আর কতদূরে যাবো? টালিগঞ্জ তো শেষ হয়েছে এখানে—

—শেষ হয়ে গেছে?

গোবিন্দ বলে—হ্যাঁ—

—এর পর রাস্তাটা কোথায় পেঁছুবে?

—বৈষ্ণবঘাটার দিকে—

সোহম্ বলে—তাহলে চল্, বৈষ্ণবঘাটার দিকেই চল্—

এই রকম ঘুরতে ঘুরতে একদিন ওই দিককার এক বস্তিতে গিয়েই গাড়িটা দাঁড় করাতে বলেছিল সাহেব। তারপর গাড়ি থেকে নেমে সাহেব একদল ছেলের কাছে গিয়ে বলেছিল—আচ্ছা, এখানে কেদার সান্যাল বলে কেউ থাকে?

একটা ছেলে বলেছিল—এই গলি দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে যান। ওখানে গিয়ে ডাকলেই কেদার সান্যালকে পেয়ে যাবেন—

কিন্তু না, ছেলেটা নিজেই শেষকালে কেদার সান্যালকে ডাকতে গিয়েছিল। সাহেব কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়েই কী ভাবলে কে জানে, শেষকালে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বলেছিল—গোবিন্দ, চল্ রে, শিগ্‌গির চল্—

গোবিন্দও তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে দিয়েছিল। সাহেব বলেছিল—একবার নিউ মার্কেটের দিকে চল্ তো গোবিন্দ, একটা জিনিস কিনতে হবে—

ইরাক থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই সাহেবের এইরকম অবস্থা হয়েছে—এই রকম অস্থির স্বভাব। বাড়ি থেকে অফিসে যাবার গরজ আছে, কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার কোনও গরজ নেই।

গোবিন্দ গাড়িটা নিয়ে সোজা নিউ মার্কেটের উদ্দেশ্যেই চলতে লাগলো।

ছোটবেলা থেকে এই এত বয়েস পর্যন্ত কত লোকের সঙ্গে তার কত রকমের সম্পর্ক গড়ে উঠলো। কোনওটা স্বার্থের, কোনওটা সাহচর্যের, কোনওটা অবসর বিনোদনের, আবার কোনওটা বা শুধু প্রয়োজনের।

কিন্তু তার মধ্যে সকলের সঙ্গেই তো শুধু গ্রহণের সম্পর্ক। সকলকেই সে শুধু বলেছে—দাও – দাও, আরো দাও। সকলে তাই শুধু তাকে দিয়েই গেছে। সে শুধু পেয়েই কৃতার্থ হয়েছে।

কিন্তু এমন কি কখনও ঘটেছে যখন সে কাউকে বলেছে—নাও, নাও, আরো নাও—

হ্যাঁ, ঘটেছে। একজনকেই শুধু সে বলেছিল—নাও, নাও, আরো নাও—

সে ওই শম্পা। গোবিন্দও সাহেবকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সোহম্ একটা মস্ত বড় কাঠের ঘোড়া কিনেছিল শম্পার জন্যে। এর আগে সোহম্ যে শম্পার জন্যে কত রকমের খেলনা কিনেছিল তার ঠিক নেই।

শম্পা বলতো—তুমি আমাকে খুব ভালোবাসো, না বাবা?

সোহম্ বলতো—কেন? তুমি ও-কথা বলছো কেন?

শম্পা বলতো—তুমি ছাড়া আর কেউ যে আমাকে ভালোবাসে না—

সোহম্ জিজ্ঞেস করতো—কেন, তোমার মা? তোমার মা তোমাকে ভালোবাসে না?

শম্পা বলতো—না—

—কেন?

শম্পা বলতো—মা কেবল আমাকে বকে—

সোহম্ বলতো—তুমি নিশ্চয়ই দুষ্টুমি করো তাই বকে। দুষ্টুমি করলে মা তো বকবেই—

—বা রে, আমি কোথায় দুষ্টুমি করি? তুমি বাসন্তিয়াকে জিজ্ঞেস করো। আমি মোটেই দুষ্টুমি করি না, তবু মা আমাকে বকে—

বাসন্তিয়া পাশে থাকলে সোহম্ তাকে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ রে বাসন্তিয়া, ওর মা কি শম্পাকে কেবল বকে?

বাসন্তিয়া আর কী বলবে! সে মনিবকেও চটাতে চায় না, মনিবের মেয়েকেও চটাতে চায় না। আবার মেমসাহেবকেও চটালে তার চলে না।

—কী রে বাসন্তিয়া, তুই কথা বলছিস না যে? আমি জিজ্ঞেস করছি, শম্পাকে মেমসাহেব বকে?

শম্পা কথার মাঝখানে প্রতিবাদ করে ওঠে। বলে—বাসন্তিয়া কী বলবে? আমি কি মিছে কথা বলছি নাকি?

সোহম্ বলতো—বকুকগে তোমার মা। আমি তো তোমাকে বকি না—

আমি তো তোমাকে ভালোবাসি—

শম্পা তবু খুশী হতো না। বলতো—কিন্তু মা কেন আমাকে বকবে মিছিমিছি? আমি কী করেছি?

সোহম্ বলতো—তুমি নিশ্চয় মা'র ঘরে গিয়ে গোলমাল করেছ—

শম্পা বলতো—না, আমি গোলমাল করিনি। সত্যি বলছি, আমি গোলমাল করিনি। তুমি বাসন্তিয়াকে জিজ্ঞেস করো, আমি গোলমাল করেছি কি না—

সোহম্ বাসন্তিয়াকে জিজ্ঞেস করতো—বল্ তো বাসন্তিয়া,শম্পাকে মেমসাহেব কেন বকেছিল? শম্পা কি দুষ্টুমি করেছিল?

বাসন্তিয়া বলতো—দুষ্টুমি করেনি, শুধু একটা কাচের গেলাস ভেঙেছিল—

শম্পা প্রতিবাদ করে উঠতো। বলতো—না না বাবা, বাসন্তিয়া মিছেকথা বলছে, আমি গেলাস ভাঙিনি—

সোহম্ বাসন্তিয়াকে বলতো—কী রে, তুই যে বললি শম্পা কাচের গেলাস ভেঙেছে—

শম্পা বলতো—বা রে, আমি কি ইচ্ছে করে ভেঙেছি নাকি? আমার পায়ে লেগে পড়ে গেলে আমি কী করবো? মা যে ওখানে গেলাস রেখেছে তা আমি কী করে জানবো?

তখন বাসন্তিয়ার বকুনি খাওয়ার পালা। সোহম্ বাসন্তিয়াকে বকতো।

জিজ্ঞেস করতো—কীসের গেলাস রে?

বাসন্তিয়া বলতো—মদের—

এর পরে সোহমের আর কিছু বলবার থাকতো না। সারাদিন সোহম্ অফিসে কাটাতো। তখন শম্পা কী করে সময় কাটাবে? সারাদিন ধরে শম্পাকে চোখে চোখে রাখা তো বাসন্তিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। তার নিজেরও তো খাওয়া-দাওয়া আছে, তার নিজেরও তো কাপড় কাচা চান করা আছে। সেও তো একটা মানুষ বটে!

অফিসে বেরোবার সময় শম্পা বড় বায়না ধরে। বলে—আমি তোমার সঙ্গে যাবো বাবা—আমি তোমার সঙ্গে যাবো—

সোহম্ আদর করে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। বলে—না, না, দুষ্টুমি করতে নেই। আমার জামা ছাড়ো—

—না, আমি যাবো। তোমার সঙ্গে যাবো আমি—

কিছুতেই সোহম্কে ছাড়তে চায় না শম্পা। তখন সোহম্ বাসন্তিয়াকে ডাকে —ওরে ও বাসন্তিয়া, কোথায় গেলি তুই? ও—

বাসন্তিয়ারও কি কম কাজ! সে বাড়ির অন্য কারো কাজ না করুক, শম্পার সমস্ত কাজের ভারই তো তার ওপর। শম্পাকে দুধ খাওয়ানো, ভাত খাওয়ানো, তার সঙ্গে খেলা করা, তাকে চান করানো, ঘুম পাড়ানো, বিকেলে তাকে নিয়ে পাড়ার পার্কে বেড়ানো, তারপর তাকে খেলনা দিয়ে ভোলানো···। কত রকমের কাজ! শম্পার জন্যে সারাদিনের মধ্যে বাসন্তিয়ার এক দণ্ড ফুরসুৎ নেই।

সন্ধ্যে হলেই শম্পা বায়না ধরবে—বাবা কখন আসবে? বাবা অসছে না কেন?

তখন বাসন্তিয়াকে মিথ্যে কথা বলে শম্পাকে ভোলাতে হবে। বলতে হবে—এই এখুনি বাবুজী এসে পড়বে—এই এখুনি—

খানিক পরে শম্পা আবার বলবে—কই, এখনও তো বাবা আসছে না রে—

শুধু তাই নয়, যদি কখনও একটু ফাঁক পেয়ে শম্পা মেমসাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ে তো তখনই হুলস্থুল কাণ্ড বেধে যাবে। মেমসাহেব চিৎকার করে উঠবে—বাসন্তিয়া, কোথায় তুই ? একে এ-ঘর থেকে নিয়ে যা না—বাসন্তিয়া—

শম্পা তখন মা'র ঘরের মধ্যে ঢুকে অনেক অচেনা মুখ দেখে কেঁদে উঠবে—

মা বলবে—বাসন্তিয়া—বাসন্তিয়া, নিয়ে যা না একে—

তখন কুলকার্নি এসে গেছে, ভাটনগর এসে গেছে, চ্যাটার্জি এসে গেছে, লাহিড়ী এসে গেছে। সবাই এসে গেছে। তখন বদ্যিনাথ সকলকে চিকেন কাটলেট পরিবেশন করছে, ফিশ্ ফ্রাই পরিবেশন করছে, ফিশ্-ফিঙ্গার পরিবেশন করছে, চিলি-চিকেন পরিবেশন করছে—

এই সব পরিবেশনের মধ্যে যখন সবাই নেশার মৌজে আকণ্ঠ ডুবে গেছে তখন শম্পা তার ভেতরে ঢুকে যদি সকলের রসভঙ্গ করে দেয় তো তাতে তো মেমসাহেবের রেগে যাওয়া অন্যায় কিছু নয়।

বাসন্তিয়া ঘরে ঢুকতেই সুমিত্রা চিৎকার করে উঠবে—তোকে না হাজার বার বলেছি মিসিবাবাকে এ-ঘরে আসতে দিবি না, তবু তুই কথা শুনবি না—

কুলকার্নি বললে—আপনি বড় লিনিয়েণ্ট্ মিসেস রায়! ছোটলোকদের অত আদর দেন কেন ? ছোটলোকদের যত আদর দেবেন ততই ওরা মাথায় উঠবে—

মা'র দিক থেকে শম্পা যত অনাদর পেত ততই বাবার ওপর তার আকর্ষণ বেড়ে যেত। অফিসে যাবার সময় ততই সে বাবার সঙ্গে বাড়ির বাইরে যাবার জন্যে বায়না ধরতো।

বলতো—আমি তোমার সঙ্গে অফিসে যাবো বাবা—

শেষকালে শম্পাকে ঘুষ দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেত সোহম্।

বলতো—আজকে তোমার জন্যে আমি একটা লাল পুতুল কিনে নিয়ে আসবো—তুমি এখন আমাকে ছেড়ে দাও।

এই রকম কোনও দিন লাল পুতুল, কোনও দিন কলের সাইকেল, কোনও দিন প্লাস্টিকের ঝুমঝুমি কিনে নিয়ে এসে শম্পাকে ঘুষ দিত সোহম্। যাকে সোহম্ 'মা' দিতে পারে নি, তাকে তো এই রকম খেলনা ঘুষ দিয়ে ভোলাতে হবেই। এ ছাড়া তখন সোহমের আর কীই বা উপায় ছিল!

ঘুষেরও আবার মাত্রা আছে। ছোট ঘুষ, বড় ঘুষ। মোটা ঘুষ, পাতলা ঘুষ।

সেদিন শম্পা আর এক নতুন আবদার ধরে বসলো।

বললে—আমাকে একটা ঘোড়া কিনে দিতে হবে বাবা—

সোহম্ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। বললে—ঘোড়া ? ঘোড়া তুমি কী করবে ?

শম্পা বললে—আমি ঘোড়ায় চড়বো—

বাসন্তিয়া বললে, সেদিন পার্কে বেড়াতে যাওয়ার পথে বেবি নাকি একটা ঘোড়ায় চড়া পুলিস দেখেছে। তারপর থেকেই ওই বায়না ধরেছে।

সোহম্ অফিসে যাবার সময় কথা দিলে। বললে—আচ্ছা, আজ আমি তোমার জন্যে একটা ঘোড়া নিশ্চয়ই কিনে আনবো—

তা সেদিন অফিসে গিয়ে প্রথমে কাজের ভিড়ের মধ্যে ঘোড়ার কথাটা সোহম্ একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। কেদার সান্যালের কথাটা মনে পড়তেই একেবারে সোজা চলে গিয়েছিল কেদার সান্যালের বাড়ির উদ্দেশ্য। কিন্তু কেদার সান্যালের সঙ্গে দেখা না করে সোজা একেবারে নিউ মার্কেটে চলে গিয়েছিল ঘোড়া কিনতে।

কিন্তু তখন কে জানতো যে এমন হবে!

বাড়িতে এসে ঘোড়াটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি শম্পাকে দেবে বলে দরজার কলিং-বেলটা টিপতেই বদ্যিনাথ দরজা খুলে দিলে।

সাহেবকে দেখেই বদ্যিনাথ বলে উঠলো—হুজুর, এত দেরি করে এলেন? এ-দিকে বাড়িতে যে সব্বোনাশ হয়েছে—

সোহম্ চমকে উঠলো। বললে—সর্বনাশ? কী সর্বনাশ রে? কার সর্বনাশ?

সব জিনিসেরই একটা নিয়ম আছে। অন্ততঃ প্রকৃতির বেলাতে তো তা বটেই। ঠিক নিয়ম করে সকালে সূর্য ওঠে, ঠিক নিয়ম করেই সূর্য অস্ত যায়। কিন্তু এর যদি কখনও কোনও ব্যতিক্রম হয়, তখন? তখন কী যে তার প্রতিক্রিয়া হবে তা প্রত্যক্ষ করবার দুর্ভাগ্য আজ পর্যন্ত কারো হয়নি।

কিন্তু তা কল্পনা করে নিতে দোষ কী?

তখন ওই সুমিত্রাও থাকবে না, শম্পাও থাকবে না, ওই কুলকার্নিও থাকবে না। আর আমি এই সোহম্ও থাকব না। এই আমি, যে-আমি এখন এই এত রাতে গাড়ি চালিয়ে নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছি। কিন্তু এখনই তো আমার সব নিয়ম বেনিয়ম হয়ে গিয়েছে। এখনই তো আমার জীবনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। এখনও তো আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়নি। এখনও তো আমার শ্বাস-প্রশ্বাস উঠছে পড়ছে। এখন তো গাড়ির অ্যাকসিলারেটর-এ চাপ দিলে গাড়ির বেগ বেড়ে যাচ্ছে!

আমার মনে হচ্ছে সব কিছু যেন এই সেদিন ঘটে গেছে। সেই সুমিত্রা, সেই শম্পা, সেই মেহের আলি, সেই ক্ষেত্রবাবু, সেই মিস্টার সেন, সেই ভানুভাই প্যাটেল, সেই ইব্রাহিম, সেই ইরাকের জর্জ, সব কিছু যেন সেদিনের মানুষ, সে-দিনের ঘটনা।

সেদিন নার্সিং-হোমের ডাক্তার রায়ও বলেছিল—এমন অ্যাকসিডেণ্ট কী করে

হলো ? মা আর মেয়ে···

সোহম্‌ই বা কী করে বোঝাবে কী করে এটা হলো ! ছোট মেয়ে হলেই বা । ছোট ছেলেমেয়েরা একটু চঞ্চল ছট্‌ফটে তো হয়ই । তা বলে দেখবার লোক কি বাড়িতে কেউ নেই ? তাহলে মাইনে দিয়ে অত লোক রাখবার তার দরকারই বা কী ?

আর শম্পার মা ? তার স্ত্রী সুমিত্রা ?

সেও তো বদ্যিনাথ আর ঠাকুরের মত মাইনে পায় ঠিক নিয়ম করে । হ্যাঁ, মাইনেই তো একরকম সেটা । সে-মাইনেটার অংকও তো বড় কম নয় । তাহলে মাইনে বা মাসোহারা যেটা সে পায় তার বিনিময়ে সংসারের কিছু কাজ কি তার করা উচিত নয় ?

সুমিত্রার নিজেরও যুক্তি ছিল ।

সে বলতো—আজ যে তুমি এত টাকা মাইনে পাচ্ছো এর জন্যে আমার কি কিছু কন্‌ট্রিবিউশান্‌ নেই ? আমি ইব্রাহিমের সঙ্গে না শুলে, ভানুভাই প্যাটেলের সঙ্গে না শুলে তোমার কি মাইনে বাড়তো ? এর পেছনে আমারও তো একটা সার্ভিস আছে—

সোহম্‌ বলতো—সেটা করেও কি শম্পাকে দেখা যায় না ? শম্পা তো তোমার নিজেরই মেয়ে !

সুমিত্রা বলতো—আমি কুলকার্নিদের দেখবো না শম্পাকে দেখবো ?

সোহম্‌ বলতো—এখন তো আমাদের অনেক টাকা হয়ে গেছে । এখন থেকে তুমি কুলকার্নিদের ছেড়ে দিয়ে শুধু শম্পাকেই দেখতে পারো না !

সুমিত্রা দিনের মধ্যে খানিকটা সময়ের জন্যেই শুধু প্রকৃতিস্থ থাকতো । সোহমের কথা শুনে সুমিত্রা অনেক সময়ে হেসে গড়িয়েই পড়তো ।

বলতো—বাঃ বাঃ, বেশ তো তোমার যুক্তি ! আমাদের কাজ হাঁসিল হয়ে গেছে বলে আমরা এখন কুলকার্নিদের ছেঁড়া জুতোর মত ছুঁড়ে ফেলে দেব ?

সোহম্‌ বলতো—কেন, তাতে দোষ কী ? চিরকাল তাদের আমরা খাতির করবো এমন কড়ার তো করিনি আমরা তাদের সঙ্গে—

—কড়ার করার কথা তো হচ্ছে না । কিন্তু ভদ্রতা ? ভদ্রতা বলেও তো সংসারে একটা জিনিস আছে—

সোহম্‌ বলতো—মাতালদের সঙ্গে আবার ভদ্রতা কী ? মাতালরা কখনও ভদ্রলোক হয় ?

সুমিত্রা বলতো—মাতালদের যে তুমি গালাগাল দিচ্ছ, তা তুমি কী ? তুমি নিজে মাতাল নও ?

সোহমের রাগ হয়ে গেল । গলা চড়িয়ে বললে—তুমি ওদের সঙ্গে আমার তুলনা করলে ? ওরা আর আমি কি এক ?

—এক নও তো কী ? ওদের সঙ্গে তোমার তফাৎটা কোথায় ? মদ খেলে কুলকার্নিও টলে পড়ে, তুমিও টলে পড়ো—মদ খেলে তোমাদের দু'জনের কারোরই মাথার ঠিক থাকে না—

সুমিত্রার কথায় সোহমের আত্মসম্মানে ঘা লাগলো।

বললে—তা আমি কি ওদের মত পরের বউএর সঙ্গে ঢলাঢলি করি? ওদের মত পরের পয়সায় মদ খাই?

সুমিত্রা বললে—পরের বউএর খোঁটা দিতে তোমার লজ্জা করলো না?

ডাক্তারের কথাটা আবার মনে পড়লো। ডাক্তার বলেছিল—এমন এ্যাক্সিডেন্ট কেমন করে হলো? মা আর মেয়ে—

এমন এ্যাক্সিডেন্ট যে কেমন করে হলো তা কী করে বলবে সোহম্? সুমিত্রার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়াটাই তো এ্যাক্সিডেন্ট! আসলে জীবনটাই তো একটা এ্যাক্সিডেন্ট! নইলে জন্মের পরই কেন তার বাবা-মা সবাই মারা গেল? বড়লোকের বাড়িতে কেন সে জন্মালো না? কেন তাকে তার পিসীমার গলগ্রহ হতে হলো? সে যদি পিসীমার গলগ্রহ না হতো তাহলে তার পিস্তুতো দাদা তাকে অমন অপমান করতো না, অপমান করে অমনভাবে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিত না—। আর তাড়িয়ে না দিলে অমন সব অমানুষদের সংস্রবেও তাকে আসতে হতো না।

কিন্তু তাদের মধ্যে সৎ লোকেরও তো অভাব ছিল না। যেমন সেই ক্ষেত্রবাবু। কেন সে ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলো নিজের জীবনে পালন করেনি! ক্ষেত্রবাবুকে তো সে বরাবর নির্বোধ মানুষ ভেবে এসেছে। সোহম্ বরাবর ভেবে এসেছে, যাদের কাম ক্রোধ মোহ মদ মাৎসর্য নেই তারা নির্বোধ। যে-কোন প্রকারে হোক নিজের কার্যসিদ্ধি করাটাকেই বুদ্ধিমান মানুষের লক্ষণ বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এসেছে। কেন? কেন সে সেদিন জীবন-যাপনের এই ভুল পথটা বেছে নিলে?

তখনও তার কানের ভেতর সুমিত্রাব কথাগুলো বাজছিল: পরের বউএর খোঁটা দিতে তোমার লজ্জা করলো না?

সোহম্ বলেছিল—বেশ করেছি পরের বউএর কথা বলেছি। ওদের নিজেদের বউ নেই বলে কি পরের বউএর সঙ্গে এক বিছানাতেই রাত কাটাতে হবে?

সুমিত্রার মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটে গিয়েছিল। বলেছিল—এ কথা আজ বলছো কেন? যেদিন ভানুভাই প্যাটেলের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে তুমি কলকাতার একটা হোটেলে গিয়ে ঘরভাড়া করে রাত কাটিয়েছিলে, সেদিন তোমার এ-কথা মনে পড়েনি?

সোহম্ বলেছিল—তখন তো আমার টাকার অভাব ছিল—

সুমিত্রা বলেছিল—তা আমি কি তোমার সেই টাকা উপায় করবার যন্ত্র যে যখন দরকার হবে তখন আমায় ভাড়া খাটাবে?

সোহম্ সুমিত্রার কথা শুনে বলেছিল—ও-সব কথা ওঠে কেন?

সুমিত্রা বলেছিল—তুমিই তো ও-কথা আরম্ভ করলে, তাই আমি এত কথা বলছি। তুমিই নিজেই নিমগাছ পুঁতলে আর এখন আফসোস করছো নিম-ফল এত তেতো কেন বলে! আশ্চর্য—

একবার সুমিত্রার কথাগুলো কানে বাজছিল, আর একবার ডাক্তারের কথা—এমন এ্যাক্সিডেন্ট হলো কী করে?

বাড়িতে যার মা তার মেয়েকে দেখে না, দেখবার সময় পায় না, সে মেয়ে যে এখনও বেঁচে আছে, এইটেই তো আশ্চর্য। নার্সিং-হোম, ডাক্তার—টাকার হরির লুঠ হয়ে গেল এক ঘণ্টার মধ্যেই।

সোহম্ কত কিছু আশা নিয়ে নিউ মার্কেট থেকে শম্পার জন্যে একটা বিরাট কাঠের ঘোড়া নিয়ে এসেছিল। অথচ যার জন্যে আনা সে সেটা দেখতে পেলে না। তখন তার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে।

ডাক্তার যে-কথা সোহম্‌কে জিজ্ঞেস করেছিল, সোহম্‌ও সেই একই কথা জিজ্ঞেস করেছিল বাসন্তিয়াকে—

—এমন এ্যাক্সিডেণ্ট হলো কী করে রে বাসন্তিয়া?

বাসন্তিয়া নিজেই তখন ভয়ে থর-থর করে কাঁপছে। সোহম্‌ও থর-থর করছে রক্ত পড়া দেখে।

বললে—কী রে, কথা বলছিস নে কেন তুই? কী হয়েছিলটা কী?

বাসন্তিয়া তখন কী বলবে তাই-ই বুঝতে পারছিল না। যদি সত্যি কথা সে বলে, তাহলে কি তার চাকরি যাবে? নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে গেলে একজন-না একজন কাউকে তো দোষী করতেই হবে।

—বল্ কী হয়েছিল?

বাসন্তিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল হয়ত, কিন্তু তার আগেই সুমিত্রা এসে পড়লো হুড়মুড় করে।

জিজ্ঞেস করলে—বাড়ি এসেই এত চ্যাঁচামেচি করছো কেন? ডাকাত পড়েছে নাকি? তুমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকো না ততক্ষণই শান্তি! বাড়িতে এলেই যত···একটু শান্তিতেও কি থাকতে দেবে না?

কিন্তু তারপরেই হঠাৎ সেই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

কথাটা বলেই সুমিত্রা চলে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কাঠের ঘোড়াটার গায়ে ধাক্কা লেগে সে সোজা সামনের দিকে মুখ করে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আর পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সুমিত্রার নাক মুখ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়ে ঘরের মেঝে ভেসে গেল।

আর সেই সুমিত্রার ধাক্কা লেগে কাঠের অতবড় ভারি ঘোড়াটাও ছিটকে গিয়ে পাঁচ হাত দূরে দেয়ালের গায়ে আট্‌কে গেল।

সেদিন যে সে কী নিদারুণ দুর্ঘটনা তা ভাবলে সোহমের শরীরে এখনও রোমাঞ্চ হয়।

ডাক্তার তাই বললে—এমন এ্যাক্সিডেণ্ট কেমন করে ঘটলো? মা আর মেয়ে···

সোহম্ এখন একলা আর কীই বা করবে? আর কীই বা করতে সে পারতো! ঠাকুর-বৈদ্যনাথ-বাসন্তিয়া সবাই মিলে কাকে সামলাবে তাই ঠিক করতে পারছে না। শম্পার জন্যে কাঠের ঘোড়াটায় ধাক্কা লেগে সুমিত্রা যে এমন ভাবে পড়ে যাবে তা কে জানতো।

আর শম্পা! তার মাথা দিয়ে এমন রক্তের বন্যা বইছে কেন?

গোবিন্দকে ডাকা হলো। সবাই মিলে ধরাধরি করে দু'জনকে তোলা হলো গাড়িতে। সোহম্ গোবিন্দকে বললে—চল্, সেই ডাক্তারবাবুর নার্সিং-হোমে চল্—

এর আগেও একবার দু'বার নার্সিং-হোমে সুমিত্রাকে নিয়ে যেতে হয়েছে সোহম্‌কে। কিন্তু সোহম্ জানতো নার্সিং-হোম মানেই কালো টাকা উপায় করবার একটা গ্যাঁড়াকল। সোহম্ যেমন অফিসকে ঠকিয়ে কাজ না করে একেবারে গ্রাস-রুট থেকে মাসিক আট হাজার টাকার উঁচু পোস্টে উঠেছে, ডাক্তাররাও তাই। উকিল যেমন ওকালতি বিদ্যে না জেনেও শুধু মুখরোচক কথা বিক্রি করে কোর্টের উঁচু মহলে ওঠে, ডাক্তাররাও ঠিক তেমনি। আজকের পৃথিবীতে অন্ততঃ ইণ্ডিয়াতে সবাই-ই তাই। এখানে লেখক লিখতে জানবে না, তবু লেখক হিসেবে খ্যাতি পাবে। কবি কাব্য বুঝবে না, তবু কবি হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা হবে। তাহলে পৃথিবী কী করে চলবে? বাড়িতে অফিসে হাটেবাজারে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বত্র এখন তো তাই-ই চলছে। কিন্তু ডাক্তার বা উকিলকে বাদ দিলেও তো জীবন চলবে না। ওরা তো এখনকার জীবনের সব চেয়ে ক্ষতিকর আবার সব চেয়ে অপরিহার্য অঙ্গ।

কিন্তু কেন এমন হলো?

যে পৃথিবীতে যীশু খৃষ্ট জন্মেছেন, যে পৃথিবীতে হজরত মহম্মদ জন্মেছেন, যে পৃথিবীতে তথাগত বুদ্ধদেব, মহাবীর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্মেছেন, যে পৃথিবীতে মহাত্মা গান্ধী জন্মেছেন, সে-পৃথিবী তাহলে এমন হয়ে গেল কেন?

এ-সমস্তই সেই ক্ষেত্রগোপালবাবুর কাছে শোনা। তাঁর কাছেই শোনা ছিল আইনস্টাইনের কথা। আইনস্টাইন নাকি বলেছিলেন—Science without religion is lame and religion without science is blind. সেই ক্ষেত্রবাবুই একদিন কী একটা সংস্কৃত শ্লোক বলেছিলেন, সেটা সোহমের এখন আর মনে নেই। কিন্তু তার বাঙলা মানেটা মনে আছে। সেটা হলো—যে নিজের মধ্যে সকলকে দেখতে পায় আর সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পায় সে কখনও কারো অনিষ্ট করতে পারে না—

সোহম্ কি জীবনে কখনও তা করেছে? সে কি নিজেকে ছাড়া অন্য কারো কথা কখনও ভেবেছে?

মনে আছে সেদিন নার্সিং-হোমের ভিজিটার্স রুমে বসে বসে সোহম্ অনেকক্ষণ ধরে এই সব কথাই কেবল ভেবেছে। সেদিন বলতে গেলে সেখানে বসে বসে তার সমস্ত জীবনটাই সে পরিক্রমা করেছে। তাহলে সমস্ত জীবনের প্লাস-মাইনাস করে শেষ পর্যন্ত নীট ফল কী দাঁড়ালো?

বদ্যিনাথও কাছে ছিল সোহমের। সে গোড়া থেকে সোহম্‌কে দেখে এসেছে। আবার এখনও দেখছে।

সোহম্ হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে বদ্যিনাথ, শম্পার মাথাটা ফাটলো কী করে রে? হয়েছিলটা কী?

বদ্যিনাথ বললে—হুজুর, কুলকার্নি সাহেব আজ দুপুরবেলা এসেছিল—

—আজ ? দুপুরবেলা ? একলা ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

—তা কী করে জানবো হুজুর ?

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—তারপর ? তারপর কী হলো ?

—তারপর হুজুর মেমসাহেব আমাকে দোকান থেকে হুইস্কি আনতে বললেন। আমি হুইস্কি কিনে আনলুম, আর চীনেম্যানদের দোকান থেকে চিলি চিকেনও কিনে আনলুম। তারপর আমি আর কিছু জানি না।

—তারপর ? তারপর কী হলো ?

—তারপর অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ মিসিবাবার কান্নার শব্দ পেয়ে দৌড়ে গেলুম মেমসাহেবের ঘরে।

বলে বদ্যিনাথ একটু থামলো।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—তারপর ? তারপর কী হলো বল্ ?

বদ্যিনাথ বললে—তারপর মেমসাহেবের ঘরে গিয়ে দেখি মিসিবাবা মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে ছট্‌ফট করছে আর চিৎকার করে কাঁদছে, আর মাথা দিয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত পড়ছে—

—তারপর ?

—তারপর দেখলুম হুইস্কির বোতলটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, ভাঙা কাচের টুকরোগুলো ঘরময় ছড়ানো পড়ে আছে—

—তারপর ?

—তারপর আমি হুজুর মিসিবাবাকে দু'হাতে ধরে বাইরে নিয়ে এলুম।

সোহম্ উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল।

জিজ্ঞেস করলে—আর মেমসাহেব ?

বদ্যিনাথ বললে—মেমসাহেব তখন হুইস্কির নেশায় অজ্ঞান হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন—তাই তাঁকে আর আমি ডাকিনি—

—আর কুলকার্নি সাহেব ?

বদ্যিনাথ বললে—কুলকার্নি সাহেব তার আগেই মিসিবাবার মাথায় বোতল দিয়ে মেরেই পালিয়ে গেছে—

—তারপর ?

বদ্যিনাথ বললে—তারপর আমি আর কী করবো, আমি বাসন্তিয়াকে ডাকলুম—

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—বাসন্তিয়া তখন কী করছিল ? বাড়িতে এত কাণ্ড হয়ে গেল তা সে দেখতে পেলে না একবার ?

—সে দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার পাশে মিসিবাবাও ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু মিসিবাবা কখন যে ঘুম ভেঙে তার পাশ থেকে উঠে মেমসাহেবের ঘরের দিকে গিয়েছিল তা সে ঘুমের ঘোরে টের পায়নি—

—তারপর ?

—তারপর যখন এই রকম অবস্থা তখন আমি আপনার অফিসে টেলিফোন করলাম। সেখান থেকে আপনার চাপরাসী বললে, সায়েব অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন—

সোহম্ বললে—পুলিসে খবর দিলি না কেন?

বদ্যিনাথ এ-কথার কী জবাব দেবে?

শুধু বললে—আমরা শুধু বসে বসে অপেক্ষা করছিলুম আপনি কখন আসেন তারই জন্যে। ভাবছিলুম আপনি এসে যা-হোক কিছু করবেন—

তারপর একটু থেমে বদ্যিনাথ জিজ্ঞেস করলে—তা আজকে আপনি অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে এত দেরি করলেন কেন হুজুর?

সোহম্ এ-কথার কী জবাব দেবে? কেন যে সোহম্ অফিস থেকে সোজা বাড়িতে না ফিরে কলকাতার রাস্তায় ঘাটে মাঠে ঘুরে বেড়ায়, কেন বৈষ্ণবঘাটায় কোন্ স্বার্থে কোন্ এক কেদার সান্যালের বাড়িতে গিয়ে একটু শান্তি পাবার চেষ্টা করে, তা তো সোহম্ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর সে-কথা বাইরের কাউকে জানানো সম্ভবও নয়। আর জানালেও হয়ত কেউ তা বুঝবেও না।

সোহম্ বললে—দেরি করলুম নিউ মার্কেট থেকে শম্পার জন্যে ওই ঘোড়াটা কেনবার জন্যে। অনেক দিন ধরেই তো শম্পা ঘোড়া নেবার জন্যে বায়না ধরেছিল, তাই আজকে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম···কিন্তু সেই ঘোড়ায় ধাক্কা খেয়ে যে মেমসাহেব পড়ে—

হঠাৎ নার্সিং-হোমের ডাক্তার এসে পড়াতে কথায় বাধা পড়লো।

সোহম্ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলে—আমার পেশেণ্টরা কেমন আছে···?

ডাক্তার বললেন—আপনি এক্ষুনি একটা কাজ করুন, ব্লাড্-ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত আনতে হবে এখ্খুনি। উইদাউট্ ডিলে—

তারপরে চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়ালেন।

বললেন—আমি এক্ষুনি আমাদের নার্সিং-হোমের স্লিপ নিয়ে আসছি। আপনি টাকাটা রেডি করে রাখবেন—

ব্লাড্ ব্যাঙ্ক। ব্লাড্ ব্যাঙ্কের কথা মনে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো কেদার সান্যালের কথা।

ব্লাড ব্যাঙ্কে কখনও আগে যায়নি সোহম্। জিনিসটা শোনা ছিল। কিন্তু সে যে কেমন জায়গা তা এর আগে জানা ছিল না।

—স্যার, আপনি?

সোহম্ কেদার সান্যালকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাই জিজ্ঞেস করলে—তুমি?

কেদার সান্যালের মুখে কোনও উত্তর নেই। সে যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। অথচ অমন ব্যবহার করবার তো কোনও কারণই নেই। সে কেন ব্লাড্-ব্যাংকে এসেছে? তবে কি তার স্ত্রীর অসুখ বেড়েছে? তার স্ত্রীকে সুস্থ করবার জন্যে রক্ত কিনতে এসেছে?

অনেক দিন ধরেই কেদার সান্যাল অফিসে আসতো না। অনেক দিন সোহম্ তার খবরাখবরও নিয়েছিল। কেদার সান্যাল চেয়েছিল তার মাইনে বাড়ুক। মাইনে বাড়াবার চেষ্টা করাটা তো অন্যায় নয়। তা সবাই-ই করে থাকে।

তার পরে সোহম্ একদিন হঠাৎ কেদার সান্যালের বাড়িতেও গিয়ে হাজির হয়ে পড়েছিল।

অনেক ডাকাডাকির পর যে দরজা খুলে দিয়েছিল সে একজন মহিলা। নিশ্চয় কেদার সান্যালেরই স্ত্রী। ফ্যাকাশে মুখ চোখ, আধ-ময়লা শাড়ি।

—কাকে চান আপনি?

—এখানে কেদার সান্যাল বলে কেউ থাকে?

—হ্যাঁ।

—তিনি কোথায়?

মহিলাটি একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু আপনি কে?

সোহম্ বললে—আমি তাকে চিনি—

মহিলাটি এবার যে-প্রশ্ন করলে তা শুনে সোহম্ হতবাক হয়ে গেল। বললে—তার কাছে আপনি কত টাকা পান?

—টাকা?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় আপনি টাকা চাইতে এসেছেন। টাকার সুদ চাইতে এসেছেন!

সোহম্ অবাক হয়ে গেল কেদার সান্যালের স্ত্রীর কথা শুনে। সোহম্‌কে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বললে—আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, আপনারা কেউ ওকে আর টাকা ধার দেবেন না দয়া করে—

—তার মানে?

মহিলাটি বললে—তার মানে আপনি বোঝেন না বলতে চান? আপনি কত টাকা ধার দিয়েছিলেন আমার স্বামীকে? কত টাকা ঠিক করে বলুন তো? দুশো না তিনশো? কত টাকা সুদ আপনার পাওনা হয়েছে?

সোহম্ এমন আচম্‌কা প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কী উত্তর দেবে সে তা ভাবতেই পারছিল না।

মহিলাটি আবার জিজ্ঞেস করলে—বলুন না, কত টাকা সুদ আপনার পাওনা হয়েছে?

সোহম্ তবু চুপ।

মহিলাটি কোনও জবাব না পেয়ে আবার বলে উঠলো—আপনাদের সবাইকেই আমি বলছি দয়া করে আমার স্বামীকে আর টাকা ধার দেবেন না। টাকা ধার দিলে আর তা ফেরত পাবেন না। আসল টাকাও পাবেন না, টাকার সুদও পাবেন না—

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—জানেন তো, আমার স্বামী ইংরিজীতে ফার্স্ট ক্লাস এম-এ—

সোহম্ বললে—শুনেছি—

—সেটা শুনেছেন যখন তখন এটাও নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আমার স্বামী টার্ন বুল এ্যাণ্ড জ্যাকসন্ কোম্পানির অফিসে মাসে তিনশো টাকা মাইনে পান—

সোহম্ জেনেশুনেই মিথ্যে কথা বললে। বললে—না, তা শুনিনি তো—

—কেন শোনেননি ?

সোহম্ বললে - আমি আপনার স্বামীর কাছে সে-প্রশ্ন কখনও করিনি—

—আপনারা কি তাহলে শুধু মানুষের মুখ দেখেই টাকা ধার দেন ?

সোহম্ বললে—না, কেদারবাবুর বিপদের কথা শুনেই আমি তাঁকে টাকা ধার দিয়েছিলুম—

—কী বিপদ ?

—শুনেছিলুম কেদারবাবুর স্ত্রীর নাকি টি-বি হয়েছে, তার চিকিৎসার খরচের জন্যেই টাকা দরকার। তাই তাঁকে টাকা ধার দিয়েছিলুম—

—আমিই তার স্ত্রী, তা এখন কি আমাকে দেখে আপনার মনে হচ্ছে যে আমার টি বি রোগ আছে ?

সোহম্ বললে—তা আমি কী করে বুঝবো বলুন। আমি তো ডাক্তার নই—

—সব মিছে কথা, জানেন, সব মিছে কথা। আপনাদের সবাইকে আমি বলে দিচ্ছি যে আমার স্বামীর মিছে কথায় আপনারা কেউ-ই ভুলবেন না।

—তাহলে আপনার টি. বি হয়নি ?

—না। যেটা হয়েছে তা হচ্ছে না খেতে পেয়ে। খেতে না পেয়েই আমি এই রকম রোগা হয়ে গিয়েছি—। আমরা খাবো, না আমাদের মেয়ে শম্পাকে খাওয়াবো ! সেও না খেতে পেয়ে খুব রোগা হয়ে গেছে—

সোহম্ একটু বিচলিত হয়ে উঠলো 'শম্পা' কথাটা শুনে। বললে—খুব ভালো নাম রেখেছেন তো আপনাদের মেয়ের।

—আমার স্বামীই মেয়ের ওই নাম রেখেছেন।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—'শম্পা' কথাটার মানেটা কী ?

মহিলাটি বললে—'শম্পা' কথার মানেটা আমিও জানতুম না। কিন্তু আমার স্বামী বরাবর লেখা-পড়ায় ভালো ছিলেন বলে মেয়ের ওই নাম রেখেছেন। 'শম্পা' মানে 'বিদ্যুৎ'। আমরা ভেবেছিলুম মেয়ের নাম 'শম্পা' রাখলে আমাদের জীবনও আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। কিন্তু তা হলো না—

—কেন ? হলো না কেন ?

—কেন হলো না, তা তো সবাই ই জানে। তবু আপনি জিজ্ঞেস করছেন কেন আমাদের জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল ? আগে ছিলুম আমরা দু'জন, এর পর হয়েছি তিনজন। ওই তিনশো টাকা মাইনেতে বাড়িভাড়া দিয়ে তিন-জনের পেট আজকালকার বাজারে চলে ? তাই তো বলছি আপনারা ও'কে আর টাকা ধার দেবেন না—

সোহম্ বললে—আমি তো এ-সব কিছুই জানতুম না—

—তা এখন তো আমি আপনাকে সব খুলে বললুম। এখন থেকে আর কিছুতেই ও'কে টাকা ধার দেবেন না। এখনই তো উনি পাওনাদারদের ঠ্যালায় বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়ান, এর পরে আরো বেশি টাকা ধার দিলে হয়ত আর বাড়িতেই আসবেন না—

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—তা কোনও পার্টির মেম্বার তো হতে পারেন কেদার-বাবু। পার্টির মেম্বার হলে তো ভালোমতো একটা চাকরিও পেতে পারতেন—

—তা কি হয়নি ভেবেছেন? সব পার্টিরই মেম্বার হয়েছেন উনি।

—কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—তারা কিছু করেনি?

—না।

—কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বার হয়েছেন? জনতা পার্টি, আর-এস-পি…

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ, আসলে আমরা দেখেছি কোনও পার্টির মেম্বার হলেই কিছু হয় না। আজকের কলকাতায় চোর জোচ্চোর না হলে কারো কিছু হয় না। আমার স্বামী আবার ধর্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির। এককালে কলেজের বইতে যা পড়ে এসেছেন তাই-ই এখনও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে চলেছেন। এখনও মনে করেন চুরি মহাপাপ। এ-রকম মানুষ নিয়ে আমি কী করি বলুন তো?

—আপনার বাবা-মা-ভাই-বোন কেউ নেই?

মহিলাটি বললে—সবাই-ই আছে কিন্তু আমি ও'কে বিয়ে করেছি বলে তাদের সকলের সঙ্গে আমার সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমিও তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছি—আমরা দু'জনে ভালোবেসে বিয়ে করেছি বলে সবাই আমাদের পর করে দিয়েছে—

এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। তবু যেন সোহমের কোনও ক্লান্তি লাগছিল না। সোহমের মনে হচ্ছিল সে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর এক সোহম্ রায়ের কাহিনী শুনছে।

এবার সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—তা অফিসে কেদারবাবুর মাইনে বাড়ে না-ই বা কেন? এত কম মাইনে তো কোনও অফিসেই কেউ পায় না। ও'র অফিসের বড় সাহেবকে গিয়ে কখনও উনি মাইনে বাড়াবার কথা বলেছেন?

—অনেক বার বলেছেন। ও'রা ইরাকে একটা ব্রাঞ্চ খুলছেন শুনে উনি ও'র বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

—বড় সাহেব? বড় সাহেবের নাম কী?

—তাঁর নাম সোহম্ রায়। ও'দের অফিসের একজন ডিরেক্টর আর ওয়েল-ফেয়ার আর পাবলিক্ রিলেশনস্ অফিসার—

সোহম্ নিজের নামটা শুনেই ভেতরে ভেতরে চম্‌কে উঠলো। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—তা তিনি কী বললেন?

—তিনি যা বললেন তা বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না—

—তবু বলুন না, কী বললেন তিনি ?

মহিলাটি বললে—তিনি বললেন আমাকে মদ খাওয়া শেখাতে—'

—সে কী ? নিজের স্ত্রীকে তিনি মদ খাওয়া শেখাতে বললেন ?

—হ্যাঁ ।

—কেন ? কেন তা বললেন ?

—বললেন নিজের স্ত্রীকে মদ খাওয়া শেখালে বড় বড় লোকেরা বাড়িতে মদ খেতে আসবে আর তার বদলে আমার স্বামীর চাকরিতে নাকি আরো প্রমোশন হবে—

সোহমের মনে পড়ে গেল কেদার সান্যালকে সেদিন কী কী কথা বলেছিল ।

তারপর জিজ্ঞেস করলে—আর কী কী করতে বলেছিলেন ?

—বলেছিলেন বাড়িতে কক্‌টেল পার্টি দিতে—

—আশ্চর্য তো—

কেদার সান্যালের স্ত্রী বললে —আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন ! অথচ ওই বড় সাহেব সোহম্‌ রায় নিজেই নাকি ওই টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্‌ কোম্পানির অফিসে একজন কেরানী হয়ে ঢুকে এখন অত বড় পোস্টে উঠেছেন—

—সে কী করে সম্ভব হলো ?

—ওই তিনিও লেবার-লীডারদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিশতে দিয়েছেন, তাদের মদ খাইয়েছেন । আর তারপর ভানুভাই প্যাটেল নামে আর একজন কোটিপতির সঙ্গে নিজের স্ত্রীর আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন । নিজের বাড়িতে তাঁকে রেখে তাঁর মন গলিয়েছেন । তার ফলে কোম্পানির খুব ইন্‌কাম্‌ বেড়েছে, আর কোম্পানিও তাই মিস্টার রায়কে প্রমোশন দিয়ে একেবারে ডিরেক্টার করে দিয়েছে—

সোহম্‌ এ-কথার উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারলে না ।

কেদার সান্যালের স্ত্রী বলে উঠলো —আমার স্বামী তো প্রাণ গেলেও এ-সব করতে পারবেন না । তাহলে কী করে তাঁর চাকরিতে উন্নতি হবে ? কী করে তাঁর প্রমোশন হবে ? তাই তো আপনাদের বলছি, ওঁকে আর আপনারা টাকা ধার দেবেন না । তার চেয়ে আমরা উপোস করে মরি সেও ভালো । আর ওঁর কথায় আপনারা দয়া করে ভুলবেন না—

মনে আছে কেদার সান্যালের স্ত্রীর কথা শুনতে শুনতে সেদিন সোহম্‌ রায়ের চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল ।

– আপনার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথাগুলো ?

সোহম্‌ বললে—না ভাবছি, এও সম্ভব এ-যুগে ?

কেদার সান্যালের স্ত্রী বললে—যদি বিশ্বাস না হয় তো আমার সঙ্গে আসুন, আমার সঙ্গে ভেতরে আসুন—

—ভেতরে ? ভেতরে কোথায় যাবো ?

—ভেতরে আমার রান্নাঘরে । আমার রান্নাঘরে ঢুকলে সব কিছু চোখে দেখলে আপনার নিশ্চয় বিশ্বাস হবে । আসুন না, আসুন—

সোহম্ বললে—কিন্তু কেদারবাবু কোথায় গেছেন, অফিস তো অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে—এতক্ষণ কোথায় থাকেন ?

—কোথায় আর যাবেন, টাকার ধান্ধায়—

ততক্ষণে সোহম্‌কে বাড়ির ভেতরে যেতে হলো। সে যে কী নির্লজ্জ দারিদ্র্য সারা বাড়িটাকে গ্রাস করে রেখেছে তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না। পাশের তক্তপোশের ওপর একটা ছোট মেয়ে শুয়ে আছে চাদর চাপা দিয়ে। তার চারদিকে মাছি ভন্‌-ভন্ করছে খাদ্যের লোভে। দেখেই সোহমের গা ঘিন্‌-ঘিন করে উঠলো।

জিজ্ঞেস করলে—এখানে কে শুয়ে আছে ?

—ও শম্পা—

সোহম্ আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো শম্পাকে। সোহমের মনে হলো শম্পার মানে যেন বিদ্যুৎ নয়, শম্পার মানে যেন অমাবস্যা। অমাবস্যাই যেন জীবন্ত আকাশকে আজ গ্রাস করে ফেলেছে। সমস্ত পৃথিবীর মানুষের চোখের সামনে যেন একটা প্রশ্ন-চিহ্ন হয়ে সে তার অস্তিত্বকে নিঃশব্দে ঘোষণা করছে।

—ওখানে অমন করে কী দেখছেন ?

সোহম্ বললে—শম্পা এমন অসময়ে ঘুমোচ্ছে কেন ?

—তিন সপ্তাহ ধরে ও জ্বরে ধুঁকছে—

—কাকে দেখাচ্ছেন ?

—হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে। এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার দেখাবো কেমন করে বলুন ? তাতে তো অনেক টাকা লাগে !

—তাতে কি রোগ সারবে—?

কিন্তু ততক্ষণে পাশের একটা ঘেরা জায়গায় ঢুকে পড়েছে কেদার সান্যালের স্ত্রী।

বললে—আসুন, এইটে আমার রান্নাঘর, এসে দেখুন কী রান্না হচ্ছে—

সোহম্‌ও ঢুকলো, কিন্তু সেখানে ঢুকেও সোহম্ দেখতে পেলে না কী রান্না হচ্ছে। উনুনটা খালি।

জিজ্ঞেস করলে—কই, কী রান্না হচ্ছে এখানে ?

মহিলাটি বললে—দেখলেন তো আমার মেয়ে ওখানে জ্বরে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। আর আমি ?

সোহম্ বললে—সত্যিই তো, আপনি কী খেয়ে থাকবেন ? আর কেদারবাবুই বা বাড়িতে এসে কী খাবেন ?

মহিলাটি বললে—সে যখন আমার স্বামী বাড়ি ফিরবেন তখন ভাবা যাবে কী খাবো আমরা। কিন্তু দোহাই আপনার, আপনার পায়ে পড়ছি, আপনারা আর কখনও আমার স্বামীকে টাকা ধার দেবেন না—

সোহম্ পালিয়ে আসছিল সেখান থেকে। রাস্তায় বেরোবার মুখে হঠাৎ কেদার সান্যালের স্ত্রী পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলে—কত টাকা আমার স্বামীকে

ধার দিয়েছিলেন ?

সোহম্ বললে—দু'হাজার টাকা—

—আমার স্বামী বাড়ি ফিরলে আপনার নাম কী বলবো ?

সোহম্ বললে—বলবেন আমার নাম শরদিন্দু বোস—ওই নাম বললেই তিনি চিনবেন—

এর পর সোহম্ আর সেই বৈষ্ণবঘাটায় যায়নি। অফিসেও কখনও কেদার সান্যালের সঙ্গে দেখা হয়নি সোহমের।

এতদিন পরে এই ব্লাড্-ব্যাংকে এসে হঠাৎ কেদার সান্যালের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব আশ্চর্য লাগলো সোহমের।

জিজ্ঞেস করলে—কী হলো ? তুমি যে এখানে ?

কেদার সান্যালের চোখ মুখ দেখে মনে হলো সে যেন খুব লজ্জায় পড়েছে।

বললে—এখানে রক্ত কিনতে এসেছিলুম স্যার—

—কেন ? কার অসুখ ?

—আমার এক আত্মীয়ের জন্যে—

বলেই আর দাঁড়ালো না সেখানে। সোজা রাস্তায় গিয়ে জনতার স্রোতে মিশে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সোহম্ সেদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে সেই পুরনো দিনের কথা ভাবতে লাগলো। সেই একান্ত অনুরোধ—আমার স্বামীকে আর টাকা ধার দেবেন না। দোহাই আপনার, আপনার পায়ে পড়ছি, আর যেন টাকা ধার দেবেন না আমার স্বামীকে—

খানিক পরে যে-ভদ্রলোক কাউণ্টারে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকেই সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা দেখুন, ওই যে-লোকটি এখুনি আপনাদের ব্লাড্-ব্যাংক থেকে বেরিয়ে গেল, ও কার জন্যে রক্ত কিনে নিয়ে গেল ?

—কার জন্যে তা তো জানি না।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—আপনাদের খাতায় পেশেণ্টদের নাম লেখা থাকে না ?

—না।

—প্রেসক্রিপশন্ তো থাকে !

—হ্যাঁ, তা থাকে।

ভদ্রলোক খুব ব্যস্ত মানুষ। অনেকবার তাগাদা দেবার পর ভদ্রলোক খাতাটা খুলে নামটা বার করলেন।

তারপর বললেন—ও ভদ্রলোক তো রক্ত কিনতে আসেননি, রক্ত বেচতে এসেছিলেন—

—তার মানে ?

কাউণ্টারের ভদ্রলোকটি বললেন—এখানে ব্লাড্ ডোনেট করলে, রক্ত বেচতে এলে টাকা পাওয়া যায়, তা জানেন না ?

—রক্ত বেচলে টাকা পাওয়া যায় ?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ—

—কত টাকা পাওয়া যায় ?

ভদ্রলোক বললেন—চৌষট্টি টাকা করে দেওয়া হয়। আর এক কাফ কফি—কফিটা ফ্রী—

সোহম্ বললে—ও ভদ্রলোকের নামটা কী লেখা আছে দেখুন তো ?

ভদ্রলোক খাতার পাতাটা দেখে বললেন—কে সান্যাল—

সোহমের মাথার মধ্যে সেই বৈষ্ণবঘাটার কেদার সান্যালের বাড়িতে তার স্ত্রীর বলা কথাগুলো তখনও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছিল—দোহাই আপনাদের, আপনার পায়ে পড়ছি আপনারা আমার স্বামীকে আর টাকা ধার দেবেন না, ধার দেবেন না আর আমার স্বামীকে—

—এই নিন—

কথাটা কানে যেতেই সোহম্ আবার যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে একেবারে বর্তমানের পৃথিবীতে ফিরে এল। বর্তমান পৃথিবীই শুধু নয়, সে নির্মম নিষ্ঠুর পৃথিবীও বটে। আবার তার মনে পড়ে গেল নার্সিং-হোমে তার স্ত্রী আর তার মেয়ে শম্পা পড়ে আছে। তাদের জন্যে সে ব্লাড্-ব্যাঙ্কে রক্ত কিনতে এসেছে। মনে পড়ে গেল এই রক্ত কিনে নিয়ে নার্সিং-হোমে গিয়ে পৌঁছে দিলে তবে তাদের চিকিৎসা হবে, তবে তারা সুস্থ হয়ে উঠবে—তবে তারা…

সংসারে কেউই অবিনশ্বর নয়। এমন কি মহাপুরুষরাও নন। কিন্তু তবু সেই সব মহাপুরুষদের নাম করেই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ একটু শান্তি পেতে চায়। অথচ যে-সব মহাপুরুষের নাম করে সবাই শান্তি পায় তাঁরা কি জীবনে কখনও শান্তি পেয়েছেন ? তাঁরা নিজেরাই তো চরম দুঃখী। যীশু খৃষ্টের ভজনা করতে বহু লোক গীর্জায় যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভজনা করতে বহু লোক রামকৃষ্ণ মিশনের মঠে যায়, চৈতন্যদেবের ভজনা করতে বহুলোক মায়াপুরে গৌড়ীয় মঠে যায়। কিন্তু যাঁদের ভজনা করতে মানুষ সে-সব জায়গায় যায়, তাঁরা ? তাঁরা কি নিজেদের জীবনে কখনও শান্তি পেয়েছিলেন ?

সোহম্ তাই কখনও শান্তি চায়নি। চেয়েছিল টাকা। কারণ সোহম্ জানতো শান্তি চাইলেও শান্তি পাওয়া যায় না। ও শব্দটা শুধু অভিধানে লিখতে হয়। কিন্তু টাকাটা এমনই এক জিনিস যেটা চাওয়ার মত করে চাইতে জানলে পাওয়া যাবেই।

টাকাই সোহম্ চেয়েছিল ; তাই টাকাই সোহম্ পেয়েছে।

কিন্তু টাকা চাইলে যে তার সঙ্গে এত অশান্তি পেতে হবে তা কে জানতো ?

মিস্টার সেন-এর কাছে গিয়ে একদিন সোহম্ কেদার সান্যালের কথাটা বলেছিল। সমস্ত কাহিনীটাই বলেছিল।

মিস্টার সেন বলেছিলেন—আমাদের অফিসে কাজ করে ? কেদার সান্যাল ? কই, আমি তো জানি না কিছু—

সোহম্ বলেছিল—আমি জানি। সে নাকি এম-এ'তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল—

মিস্টার সেন বলেছিলেন—কিন্তু তুমি তো আমাকে কিছু বলোনি—

—না, আমি বলিনি—

মিস্টার সেন বলেছিলেন—কেন ? বলোনি কেন ?

—ভেবেছিলাম সে আমার মত আর একজন সোহম্ রায় হয়ে উঠবে, তাই আপনি আমাকে যা-যা করতে বলেছিলেন তাই-ই আমি তাকে করতে বলেছিলুম।

- আমি তোমাকে কী করতে বলেছিলুম ?

—আপনি আমাকে ভানুভাই প্যাটেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্যে গ্রেট ইস্টার্ন ক্লাবের মেম্বার হতে বলেছিলেন, আমার মিসেসকে ড্রিংক্ করতে শেখাতে বলেছিলেন, আমিও তাকে তাই-ই করতে বলেছিলুম। আমি তাকে বাড়িতে কক্‌টেল-পার্টি দিতে বলেছিলুম। তখন তাতে সে রাজি হয়নি। কেন রাজি হয়নি তা কালকে ব্লাড্-ব্যাংকে গিয়ে বুঝতে পারলুম—বুঝতে পারলুম যে সে মদ খাওয়ার চেয়ে কক্‌টেল-পার্টি দেওয়ার চেয়ে ব্লাড্-ব্যাংকে গিয়ে রক্ত বিক্রি করাটাকেই টাকা উপায়ের সহজ রাস্তা বলে ধরে নিয়েছিল—

মিস্টার সেন-এর মুখ দিয়ে একটা সহানুভূতিসূচক শব্দ বেরিয়ে এসেছিল—আহা, বেচারী—

তারপর একটু থেমেই আবার বলেছিলেন—দেখ, সবাই কি সব এ্যাডভাইস্ মেনে নিতে পারে ? আমি তো তোমাকে ভালো এ্যাডভাইস্ দিয়েছিলুম। সেই এ্যাডভাইস্ মেনে তোমার তো ভালোই হয়েছিল। ভাবো তো সেই স্কাউনড্রেল ইব্রাহিমের কাণ্ডটা ! তখন তুমি কী পোস্টে চাকরি করতে আর এখন কী পোস্টে চাকরি করছো ভাবো ! আর সেই তখনকার 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানি' আর এখনকার 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানি'র মধ্যে কত তফাৎ বলো তো ! এখন কোম্পানির এ্যানুয়াল-টার্ন্‌ওভার কত বেশি হয়েছে ভাবো তো ! কোম্পানির নেট্ প্রফিট কত বেড়েছে বলো তো ! শেয়ার-হোল্ডাররাও কত বেশি ডিভিডেণ্ড পাচ্ছে, তারা কত হ্যাপি এখন ! আমি তোমাকে যে সলিউশন দিয়েছিলুম তাতে স্টাফেরও বেনিফিট হলো, কোম্পানিরও বেনিফিট হলো, সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেণ্টেরও বেনিফিট হলো। গভর্নমেণ্ট কত কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স পাচ্ছে—

সোহম্ বলেছিল—কিন্তু স্যার, কেদার সান্যালকে দেখে কাল আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল—

মিস্টার সেন বলেছিলেন—যাক্‌গে, ও-সব নিয়ে বেশি ভেবো না। যারা নিজের ভালো বোঝে না তাদের তুমি হাজার চেষ্টা করেও ভালো করতে পারবে না—তারা ইডিয়ট্—

তারপর একটু থেমে আবার বলেছিলেন—হ্যাঁ ভালো কথা, তোমার মিসেস আর তোমার বেবি কেমন আছে এখন ?

সোহম্ বললে—এখন আর কোনও ডেন্‌জার নেই—

—নার্সিং-হোম কী বলছে ?

—বলছে পেশেন্টের যখন ভালো ঘুম হয়েছে, ভালো এ্যাপিটাইট্ হয়েছে, তখন আর কোনও বিপদ নেই—

এর পরে এ নিয়ে সেদিন আর কোনও কথা হয়নি। কেদার সান্যালের যে অত বড় বিপদ চলছে সে-ব্যাপারে মিস্টার সেন আর একটা কথাও বললেন না। কেদার সান্যাল যেন একটা গরু কি ছাগল। তার বেশী যেন কিছু নয়।

এর কিছুদিন পরেই সুমিত্রাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল সোহম্। শম্পাকেও সেই একই দিনে বাড়িতে এনেছিল। সঙ্গে ওষুধ। আর ডাক্তার মাঝে মাঝে এসে দেখে যেত।

শম্পা এক ঘরে, আর অন্য এক ঘরে সুমিত্রা।

দু'টো ঘরে গিয়েই সোহম্‌কে দেখতে হতো দু'জনকে। সোহম্ যখন অফিসে যেত তখন বাসন্তিয়াকে বলে যেত শম্পাকে দেখতে। আর একজন নার্সকে রেখে দিয়েছিল সুমিত্রাকে দেখতে। রাত্রে সে বাড়িতে চলে যেত। শুধু দিনের বেলাটা নার্স দেখতো সুমিত্রাকে।

নার্স মেয়েটি একদিন বলেছিল—স্যার,মিসেস রায় বড্ড হুইস্কি খেতে চান—

—সে কী ?

নার্স বললে—আমি হুইস্কি দিইনি। বলেছি আপনাকে জিজ্ঞেস না করে হুইস্কি দেব না—

সোহম্ বললে—শুনে আমার মিসেস কী বললেন ?

নার্স বললে—বললেন মিস্টার রায় যা-ই বলুন, আমার কথা শুনতেই হবে—আমি হুইস্কি খাবোই—

—তারপর ?

—তারপর আর কী বলবেন ! কিছুই বললেন না—

সোহম্ বললে—ঠিক আছে, আমি আজকে মিসেস রায়কে যা বলবার তা বলবো ! আপনি কাল ঠিক সময়ে আসবেন, এখন আপনি চলে যান—

নার্স মেয়েটি চলে গেল। সোহম্ সেই দিনই সুমিত্রার ঘরে ঢুকলো। দেখলে সুমিত্রা তখন ঘুমোচ্ছে। সেই দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল সোহম্। সত্যিই, কী রকম দুর্বল হয়ে গেছে সুমিত্রা ! কত অসহায় দেখাচ্ছে তাকে !

খানিক পরেই সুমিত্রা চোখ খুললো। সোজা নজর পড়লো সোহমের দিকে।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছো ?

সুমিত্রা মাথা নাড়লো। অর্থাৎ—না, ভালো নেই—

—অসুবিধেটা কী হচ্ছে ?

সুমিত্রা বললে—একটু হুইস্কি খেতে ইচ্ছে করছে—

সোহম্ বললে—হুইস্কি না-ই বা খেলে ! ওটা এখন খাওয়া কি ভালো ?

সুমিত্রা বললে—দাও একটু, তোমার পায়ে পড়ছি—দাও একটু—

সোহম্ বললে—না না, ও-রকম কোর না। তুমি তো জানো ওটা খাওয়া খারাপ।

—তাহলে তুমি কেন ওটা আমাকে ধরিয়েছিলে ?

সোহম্ সুমিত্রার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। বললে—যখন ধরিয়েছিলুম তখন ধরিয়েছিলুম, এখন তো আমাদের কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে। আর আমি তো এখন কোম্পানির ডিরেক্টার হয়ে গিয়েছি, এখন আর তোমার ওটা খাওয়ার দরকার কী ? লক্ষ্মীটি, আর ওটা খেও না। ও খেলে তোমার শরীর খারাপ হবে। দেখ না, আমি তো আর ও-সব খাই না—

—ওগো, একটুখানি দাও. খাই—একটুখানি খেয়ে কাল থেকে আর খাবো না। আমি কথা দিচ্ছি আর খাবো না—

সোহম্ বললে—না, তুমি খেতে পাবে না। ওটা বিষ—

কথাটা শুনে সুমিত্রা হো-হো করে হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে খুব কাশি এল গলায়। কাশতে কাশতে কী হলো কে জানে—মুখ দিয়ে একঝলক রক্ত বেরিয়ে সোহমের হাত জামা প্যাণ্ট সব কিছু ভাসিয়ে দিলে—

সোহম্ ভয় পেয়ে গেল। বললে—এ কী করলে ? এ কী করলে তুমি ? এতো রক্ত বেরোচ্ছে কেন ?

অনেকটা রক্ত বেরোবার পর যেন সুমিত্রা একটু ঝিমিয়ে এল। তারপর সোহমের হাতের পাতার ওপরেই অচৈতন্য হয়ে রইল খানিকক্ষণ। সোহম্ তাকে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। সুমিত্রা তখন আবার ঘুমোতে লাগলো।

অন্য ঘরে তখন শম্পাকে পাশে নিয়ে বাসন্তিয়া বসে আছে। সাহেবের জামায় প্যাণ্টে রক্তের বন্যা দেখে বদ্দিনাথ চম্‌কে উঠেছে। তার মুখে চোখে আতঙ্কের ছাপ।

বললে—হুজুর, এ কী হয়েছে ?

সোহম্ তাকে হাতের একটা আঙুল মুখে দিয়ে ইঙ্গিতে কথা বলতে বারণ করলে। তারপর চুপি চুপি বললে—একটা নতুন শার্ট আর প্যাণ্ট আমার বাথরুমে রেখে দিয়ে আয় তো, আমি চান করবো -

কিন্তু তার আগেই পাশের ঘর থেকে শম্পা কেঁদে উঠেছে। কেঁদে কেঁদে তাকে ডাকতে লাগলো—বাবা, বাবা তুমি কোথায়, ও বাবা—

সোহম্ তার ঘরে ঢুকতেই শম্পা দেখতে পেয়েছে। বললে—তুমি কোথায় গিয়েছিলে বাবা, আমি তোমায় কত ডাকছি—

সোহম্ শম্পার কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বললে—এই তো আমি এসেছি, কেন ডাকছো আমাকে ?

—তুমি আমার কাছে থাকো, আমার পাশে বসে থাকো তুমি—

সোহম্ বললে—বাসন্তিয়া তো তোমার পাশে রয়েছে—

শম্পা না-ছোড়বান্দা। বললে—না, ও থাকবে না আমার কাছে, তুমি বসে থাকো আমার পাশে—

তারপর হঠাৎ বোধ হয় বাবার হাতে বাবার জামায় প্যাণ্টে রক্ত দেখতে পেয়েছে। বললে—এত রক্ত কেন তোমার হাতে ? এত রক্ত কেন বাবা ? তুমি বুঝি পড়ে গিয়েছিলে ?

সোহম্ বললে—ও কিছু না ; কেটে গেছে—

—কী করে কাটল ? দাড়ি কামাতে গিয়ে···?

সোহম্ আর কী-ই বা বলবে, শুধু বললে—হ্যাঁ—

তারপর আবার বললে—আমি রক্তটা ধুয়ে আসছি, হ্যাঁ ? তুমি চুপ করে থাকবে তো ? আমি এখুনি হাত-টাত ধুয়ে শার্ট-প্যান্ট বদলিয়ে তোমার কাছে আসছি, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো, গোলমাল কোর না—বুঝলে ?

—আচ্ছা তুমি যাও, কিন্তু বেশি দেরি কোর না—

—আচ্ছা—

বলে সোহম্ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বদ্যিনাথ বাইরেই ছিল। বললে—বাথরুমে আপনার নতুন শার্ট-প্যান্ট রেখে দিয়েছি হুজুর—

কিন্তু তখন হঠাৎ সোহমের আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। ডাক্তার সরকারকে একবার টেলিফোনে কল্ দিতে হবে। মনে পড়তেই আর বাথরুমে ঢোকা হলো না। সোজা টেলিফোনের দিকে চলে গেল। কোরিডোরের মধ্যেই টেলিফোন।

মনে আছে,সেইটুকু সময়ের মধ্যেই হঠাৎ আবার মনে পড়ে গেল মিস্টার সেনের কথাগুলো। মিস্টার সেন বলেছিলেন—দেখ, সবাই কি সব এ্যাডভাইস্ মেনে নিতে পারে ? আমার এ্যাডভাইস্ মেনে তোমার তো ভালোই হয়েছে। সেই স্কাউনড্রেল ইব্রাহিমটার কথা একবার ভাবো তো ? কোম্পানির এ্যানুয়েল টার্ন-ওভার কত বেড়েছে তোমার জন্যে। 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানি' ভানুভাই প্যাটেলের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার বিজনেস পেয়ে যে কত কোটি টাকা নেট প্রফিট করলে তা সমস্তই তো তোমারই জন্যে। তাতে কোম্পানিরও বেনিফিট হলো, শেয়ার-হোল্ডারদেরও বেনিফিট হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজেরও বেনিফিট হলো—। ভাবো তো আগে তুমি কোন্ পোস্টে ছিলে আর এখন তুমি কোন্ পোস্টে আছো— ।

হ্যাঁ, সোহম্ সারাজীবন ওই কথাই ভেবেছে। কোম্পানির কত বেনিফিট হয়েছে তা কোম্পানির অডিট রিপোর্টে আছে, কোম্পানির ব্যালেন্স-শীটে আছে। শেয়ার-হোল্ডারদের কী বেনিফিট হয়েছে তা ডিভিডেণ্ডের পার্সেন্টেজের ফিগারেই লেখা আছে। আর সোহমের নিজের বেনিফিট ? আগে কী পোস্টে সে ছিল আর এখন কী পোস্টে সে আছে, সেই ফিগারটা দেখলেই যে-কোনও লোক বলে দিতে পারবে কার কতটা বেনিফিট হয়েছে।

কিন্তু তার জীবন ?

মানুষের জীবনেরও তো একটা অডিট-রিপোর্ট আছে। মানুষের জীবনেরও তো একটা ব্যালেন্স-শীট্ আছে। মানুষের জীবনেরও তো একটা ডিভিডেণ্ড্-ওয়ারেণ্ট্ আছে।

সেই জমা-খরচের হিসেব-নিকেশ যে-অডিটার-জেনারেল তৈরি করেন তাঁর হিসেবের সঙ্গে কি এই পৃথিবীর অডিটার-জেনারেলের জমা-খরচের হিসেব-নিকেশের অঙ্ক মেলে ?

সত্যি কেদার সান্যাল বোকা। তাই সোহমের ভালো এ্যাডভাইস্ সে মানেনি। মানলে এই রকম করে তাকে রক্ত বেচে সংসার চালাতে হতো না। সে-এ্যাডভাইস্ মানলে একদিকে যেমন তার কোম্পানির কোটি কোটি টাকা টার্ন-ওভার হতো, কোটি কোটি টাকা নেট্ প্রফিট হতো, তেমনি আবার কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ডের পার্সেণ্টেজও বাড়তো, আর কেদার সান্যালের নিজেরও অনেক বেনিফিট হতো।, তার তিনশো টাকার স্যালারিটাও বেড়ে হয়ত তের হাজার টাকাতে গিয়ে পৌঁছুতো।

সত্যিই, মিস্টার সেনদের চোখে তাই কেদার সান্যালরা বোকা। মিস্টার সেনদের চোখে তাই কেদার সান্যালরা অপাঙ্‌ক্তেয়, মিস্টার সেনদের চোখে তাই কেদার সান্যালরা অবাঞ্ছিত। মিস্টার সেনদের চোখে তাই কেদার সান্যালরা আজও সমাজের ডাস্টবিন!

ডাক্তার সরকার বললেন—হঠাৎ রক্ত উঠেছে? ক'বার?

—একবার।

ডাক্তার বললেন—কিন্তু আমি তো পেশেণ্টকে থরো চেক করেছি। লিভারে তো আলসারের কোনও চিহ্নই নেই। হেপাটাইটিসের কোনও ট্রেসও তো আমি পাইনি। এ্যাপিটাইট্ কেমন? ক্ষিদে আছে?

সোহম্ বললে—আপনি যে ডায়েট-চার্ট দিয়েছিলেন সেই রকম ডায়েটই তো এখনও দেওয়া চলছে। কিন্তু আজকে হঠাৎ হুইস্কি খাওয়ার জন্যে বায়না ধরেছিল। ভীষণ বায়না ধরেছিল। কিন্তু আমি দিইনি। সেই এক্সাইট্‌মেণ্টের পরই হঠাৎ মুখ দিয়ে ঝলক-ঝলক্ রক্ত উঠতে লাগলো—

ডাক্তার সরকার বললেন—আগে তো এ্যানিমিয়া ছিল, তাই পেসেণ্টকে ব্লাড্ দিতে বলা হয়েছিল। তবু এখন এত রক্ত আবার কোত্থেকে এল?

তারপর একটু থেমে ডাক্তার সরকার আবার বললেন—যা হোক, আপনি পেশেণ্টকে আবার আমার নার্সিং-হোমে পাঠিয়ে দিন, আবার একবার থরো চেকিং করতে চাই।—আর বেবি? সে কেমন আছে?

সোহম্ বললে—সে তো ভালোই আছে মনে হচ্ছে—। যা হোক, আমি মিসেসকে এখ্খুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। বেড্ খালি আছে তো?

সকলের জীবনেই এমন একটা সময় আসে যখন সে প্লাস-মাইনাস মিলিয়ে দেখতে চায় শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ালো—ডেবিট না ক্রেডিট?

আজ এই রাত্রেও সোহমের মনের সেই অবস্থাই দাঁড়িয়েছে। জীবনের সমস্ত দেন-পাওনা যোগ-বিয়োগ করে দাঁড়িয়েছে কী? তার ডেবিট আছে, না ক্রেডিট! কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তার সমস্ত হিসেবে গরমিল হয়ে গেল। কেবল মনে হতে লাগলো সে তো সারা জীবনভোর কেবল চেয়েই এসেছিল, দেওয়ার কথা কি

কখনও সে ভেবেছে ? দিতে গেলে যে কিছু ত্যাগ করতে হয়, সে-ভাবনা কি কখনও মাথায় ঢুকেছে তার ?

মনে আছে স্কুলের পরীক্ষার সময় সে তার সারা শরীরে প্রশ্নপত্রের সম্ভাব্য উত্তরগুলো গায়ে হাতে পায়ে জামার তলায় লুকিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। স্কুলের মাস্টার মশাইরা কিছুই জানতে পারেননি।

সেদিনকার মাস্টার মশাইদের সে ঠকাতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু স্কুলের মাস্টার মশাইদের চেয়েও যে মহাজীবনের আরো অন্য একজন বড় মাস্টার মশাই আছেন তাঁকে কি সে ঠকাতে পেরেছে ? সেই মাস্টারমশাইএর কাছে যে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, কিছুই অগোচর থাকে না, তাঁর জমা-খরচের খাতার পাতায় যে কখনও হিসেবের কোনও গরমিল হয় না, সেকথা কি তখন সে একবারও ভেবেছে ?

তখনকার শোনা একটা গল্প সোহমের মনে পড়লো।

গল্পটা ক্ষেত্রবাবু তাকে বলেছিলেন।

বহুদিন আগে স্বামী রামানন্দ তীর্থ একবার উত্তর গাড়োয়ালের পাহাড়ী রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন দূরের একটা গাছে কিছু ফুল ফুটে আছে।

তখন ইংরেজ আমল।

ফুলগুলো দেখে তিনি সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে বাধা দিলে একজন মিলিটারি প্রহরী।

প্রহরী বললে—ওদিকে যাওয়া নিষেধ—

রামানন্দ তীর্থজী জিজ্ঞেস করলেন—কেন ?

প্রহরী বললে—ইংরেজ সরকারের বারণ আছে। তা আপনি ওদিকে কী করতে যাবেন ? ওদিকে কি কিছু কাজ আছে আপনার ?

স্বামীজী বললেন—হ্যাঁ, আমি বেশিদূর যাবো না, ওই ফুলটার সঙ্গে শুধু একবার কথা বলেই চলে আসবো।

—আচ্ছা যান—

স্বামীজী গেলেন। গিয়ে ফুলগাছটার কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই আবার চলে এলেন।

এত তাড়াতাড়ি স্বামীজীকে ফিরতে দেখে প্রহরী জিজ্ঞেস করলে—ফুলগাছটার কাছে গিয়ে আপনি কী করছিলেন ?

স্বামীজী বললেন—আমি ফুলটাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলাম।

—কী কথা ?

স্বামীজী বললেন—আমি ফুলটাকে জিজ্ঞেস করলাম—ফুল, তোমার মধ্যে এত সুগন্ধ তুমি কোথা থেকে পেলে ?

—তার উত্তরে ফুল কী বললে ?

—তার উত্তরে ফুল বললে, আমার বুকে যে মধু আছে।

গল্পটা বলে সেদিন ক্ষেত্রবাবু তার মানেটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—ওই 'সুগন্ধ'টা হচ্ছে চারিত্রিক পবিত্রতা আর 'মধু' হচ্ছে প্রেম। ওই চারিত্রিক পবিত্রতা আর প্রেম যার মধ্যে আছে সে-ই হচ্ছে সত্যিকারের মানুষ। তোমরা

সবাই সত্যিকারের মানুষ হতে চেষ্টা করবে।

কতকাল আগের কথা। তারপর জীবনের ওপর দিয়ে কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত শীত, কত বসন্ত চলে গেছে, কত উত্তেজনা, কত অবসাদ তাকে কতবার বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু কখনও এই গল্পটার কথা তার মনে উদয় হয়নি। কখনও মনে হয়নি যে সে পথভ্রষ্ট হয়েছে, কখনও ভাবেনি যে সে ভুল করেছে। কেবল একটা কথাই তার মনে হয়েছে—সব ঠিক হ্যায়, সব ঠিক হ্যায়। ওই ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন ঠিক হ্যায়, ওই বিড়লা জুট ঠিক হ্যায়, ওই ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস্ ঠিক হ্যায়, ওই ক্লোরাইড্ ঠিক হ্যায়—

তখন প্রতিদিন তার কাজ ছিল অফিসে যাওয়া, অফিস থেকে বিকেলবেলা নার্সিং-হোমে যাওয়া, আর বাড়িতে এসে শম্পার সঙ্গে প্রাণভরে খেলা করা আর তাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করা।

শম্পা বলতো—পাপ্পা, তুমি এত দেরি করে আসো কেন? আরো তাড়াতাড়ি আসতে পারো না?

সোহম্ বলতো—আমি যে হাসপাতালে তোমার মাম্মিকে দেখতে যাই, তোমার মাম্মির যে অসুখ, তা জানো না?

শম্পা বলতো—মাম্মীর অসুখ হোক গে, তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে না, তুমি অফিস থেকে বাড়িতে চলে আসবে—

সোহম্ বলতো—ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই। তোমার মা তোমাকে কত ভালোবাসে।

শম্পা উত্তর করতো—না, মাম্মি আমাকে ভালোবাসে না—

—তাহলে কে তোমাকে ভালোবাসে?

শম্পা বলতো—তুমি—

বলেই তার পাপ্পাকে জড়িয়ে ধরতো। আর সোহম্‌ও শম্পাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখময় চুমুতে ভরিয়ে দিত।

সোহম্ হাসপাতালে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো—আজ কেমন আছো?

সুমিত্রা বলতো—আছি এক রকম—

—পেটের ব্যথাটা একটুখানি কমেছে?

সুমিত্রা বলতো—না—

সোহম্ জিজ্ঞেস করতো—ব্যথাটা কেন কমছে না বলো তো? ডাক্তার কিছু বলছে?

সুমিত্রা কিছু উত্তর দিত না। সোহমের মনে হতো, অসুখ করলে মানুষ বোধ হয় এমনিই হয়ে যায়, আর তাছাড়া সুমিত্রার এই অবস্থার জন্য তো সোহম্ নিজেই দায়ী। সোহম্ তার স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই তো সুমিত্রাকে এই চূড়ান্ত অবস্থায় এনে ফেলেছে!

সুমিত্রা বিছানার ওপর নির্জীব হয়ে শুয়ে থাকতো, বেশি কথাও বলতো না। অনেকবার জিজ্ঞেস করার পর বলতো, আমি বোধ হয় আর বেশিদিন বাঁচবো না—

সোহম্ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতো—ও-কথা বলতে নেই, তুমি না বাঁচলে

আমি বাঁচবো কী করে ? তুমি নেই, এ-কথা যে আমি কল্পনা করতেও পারি না—

সুমিত্রার সেই রোগজর্জর শরীর দেখে সোহম্ মনে মনে খুব কষ্ট পেত। কেবল নিজেকেই সে ধিক্কার দিত। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতো—কেন আমি সুমিত্রার এই সর্বনাশ করলুম ? কেন আমি এমন করে নিজের স্ত্রীকে খুন করলুম ?

সেই সময়েই বার-বার ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলো মনে পড়তো। যার বুকের মধ্যে মধু আছে, তার চরিত্রেই পবিত্রতা থাকে। কিন্তু বাইরের কেউ তা জানুক আর না জানুক, সোহম্ নিজে তো জানতো তার চরিত্রে পবিত্রতা ছিল না, তার বুকে মধু ছিল না।

তারপর সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই নিয়মমত সোহম্ নার্সিং-হোম থেকে বেরিয়ে আসতো।

আর তারপরেই তার বাড়ি। বাড়িতেও তখন শম্পা তার জন্যে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকতো। তখন সে কাউকে চাইবে না, কারও সঙ্গে কথাও বলবে না, কোনও খেলনা পেলেও ভুলবে না। সে কেবল বাসন্তিয়াকে জিজ্ঞেস করবে—পাপ্পা কখন আসবে ? পাপ্পা বাড়ি আসতে এত দেরি করছে কেন ?

বার-বার একই কথা জিজ্ঞেস করে করে সে সকলকে বিরক্ত করে ছাড়বে।

আর সত্যি-সত্যিই সোহম্ শেষ পর্যন্ত যখন বাড়ি ফিরবে তখন সে বাবার কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বলবে—পাপ্পা, তুমি এত দেরি করো কেন ? এত দেরি করো কেন তুমি বাড়ি ফিরতে ?

সোহম্ বলবে—আমি যে তোমার মাম্মিকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলুম। তোমার মাম্মিকে দেখতে যাবো না ? তুমিই বলো ?

শম্পা বলতো—না, মাম্মিকে তুমি দেখতে যাবে না। তুমি আগে আমার কাছে আসবে

মনে আছে একদিন সোহম্ শম্পাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা ফোটোগ্রাফির দোকানে গিয়ে শম্পার একটা ফোটো তুলিয়ে দিয়েছিল।

শম্পা জানতো না কেন হঠাৎ তার ফোটো তোলা হচ্ছে। আর তখন তো সে কিছু বুঝতোও না ফোটো সম্বন্ধে।

কিন্তু সোহম্ জানতো। সেদিন তার জন্মদিন। শম্পার জন্মদিনে সোহম্ সেদিন অনেক কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করতে বলেছিল বদ্যিনাথকে। কেক, পেস্ট্রি, সন্দেশ, আরো কত কী ! সে-সব খাবারের নাম এখন এতদিন পরে আর তার মনে নেই।

সেদিন সোহম্ অফিস থেকে হাসপাতালে যায়নি। সোজা বাড়ি চলে এসেছিল।

শম্পা অবাকও যেমন হয়েছিল, তেমনি হয়েছিল খুশী।

শম্পা বলেছিল—পাপ্পা, তুমি আজ এত আগে-আগে এলে ?

শম্পা জানতো না যে সোহমের এত আগে আগে আসার অর্থটা কী। আর পাপ্পা যে তার জন্মদিনের জন্যেই আগে-আগে বাড়িতে এসেছিল এ-কথা সে কেমন করে জানবে ?

আরো একটা কথা মনে আছে সোহমের। মনে আছে, শম্পার জন্মদিনের পরে সে অফিস থেকে বেরিয়েছে নার্সিং-হোমে যাওয়ার জন্যে। মনে মনে ভাবছে—সুমিত্রা হয়ত একদিন তাকে না দেখতে যাওয়ার জন্যে অনুযোগ করবে। বলবে—কই, কালকে তো এলে না তুমি ?

সে-কথার উত্তরে সোহম্ কী বলবে তাও সে মনে মনে তৈরি করে রেখেছিল।

ভেবেছিল বলবে—শম্পার জন্মদিনের জন্যে তাকে একটু বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সুমিত্রা হয়ত জিজ্ঞেস করবে—কোথায় কোথায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলে শম্পাকে ? উত্তরে সোহম্ বলবে—কালকে শম্পার জন্মদিনের জন্যে ওর একটা ফোটো তুলিয়ে নিয়ে এলাম—

সুমিত্রা হয়ত জিজ্ঞেস করবে—কই, ফোটোটা কী রকম হলো দেখি—

সোহম্ বলবে—সে ফোটো তো এখনও হাতে পাইনি—

সুমিত্রা বলবে—হাতে পেলেই আমাকে দেখিও কিন্তু। ওর একটা ফোটোও তোলা হয়নি এ-পর্যন্ত, যাক্, তুমি তবু মনে করে তুললে তাই ভালো—

হঠাৎ সামনে একটা মিছিলের জন্যে গাড়িটা থেমে গেল। কাদের, কোন্ পার্টির মিছিল, তাও আজ এতদিন পরে মনে নেই আর।

কিন্তু হঠাৎ আর একটা ঘটনার জন্যে তারিখটা স্মরণীয় হয়ে আছে সোহমের কাছে। ঘটনাটা ঘটলো ঠিক মিছিলের পেছনেই। এ মিছিলের পেছনেই চলছিল একটা মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার ঘটনা।

হঠাৎ তার কানে একটা মৃদু অস্পষ্ট আওয়াজ এলো—বল হরি হরি বোল্, বল হরি হরি বোল্—

শব্দগুলো সত্যিই বড় মৃদু আর অস্পষ্ট। কিংবা মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী মানুষের সোল্লাস স্লোগান বোধ হয় দরিদ্রের মৃত্যুর অকিঞ্চিৎকরতাকে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ করছিল বার বার।

মৃতদেহ এমন কতই বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতার লোক তা নিয়ে কখনও মাথাব্যথা করে না।

কিন্তু পেছনে হেঁটে যাওয়া লোকটাকে দেখে সোহম্ চমকে উঠলো।

কেদার সান্যাল না ?

মাত্র চারজন শববাহক, আর পেছনে মাত্র একজন শবানুগামী। আর পেছনের সেই শবানুগামী হচ্ছে কেদার সান্যাল।

সোহম্ বললে—গোবিন্দ, গাড়িটা একটা রাস্তার একপাশে কর্ তো—

গোবিন্দও অবাক হয়ে গেছে। এখানে আবার সাহেবের হঠাৎ কী কাজ পড়লো এখন ?

গাড়িটা থামতেই সোহম্ নেমে পড়লো।

—কেদার—কেদার—

কেদার সান্যাল আচম্কা এই ডাক শুনে থম্কে দাঁড়ালো।

—কোথায় যাচ্ছো ?

কেদার সান্যাল বললে—শ্মশানে—

—শ্মশানে কেন ? কে মারা গেল ?

—আমার স্ত্রী।

যেন আকাশ থেকে পড়লো সোহম্। এর পর কেদার সান্যালই বা কী বলবে আর সোহম্-ই বা কী বলবে! দু'জনের কারোমুখেই আর কোনও কথা বেরোল না।

হঠাৎ সোহম্ তার পকেট থেকে পার্স বার করলে। তার ভেতর থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে কেদার সান্যালের দিকে বাড়িয়ে ধরলে।

বললে—এই টাকাটা নাও তুমি ভাই, আমার কাছে এখন এই-ই আছে—

কেদার তার মাথাটা নাড়লো।

বললে—এখন এর আর দরকার নেই স্যার—

বলে চলে যাচ্ছিল। সোহম্ এগিয়ে গিয়ে বললে—তোমার স্ত্রীর জন্যে দরকার না থাক, তোমার শম্পার কথা ভেবে অন্ততঃ এটা নাও—

—না, তার আর দরকার হবে না—

বলে কেদার সান্যাল যেমন সামনের দিকে যাচ্ছিল তেমনিই চলতে লাগলো। আর একবারও পেছন ফিরে দেখলে না।

সোহম্ গাড়িতে উঠে আবার তার পার্সটা নিজের পকেটে রেখে দিলে। তারপর কখন যে সে নার্সিং-হোমে গিয়ে পৌঁছিয়েছে তার খেয়াল নেই। যেন কলের পুতুল সে। কেউ যেন তার বুকের স্প্রিং-এর চাবিতে দম দিয়ে তাকে এই পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছে, আর তাই সে নিয়ম করে অফিসে যাচ্ছে, নিয়ম করে নার্সিং-হোমে যাচ্ছে, আর প্রতিদিন নিয়ম করে বাড়িতে গিয়ে শম্পাকে পাশে নিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু সেদিন নার্সিং-হোমে গিয়ে সোহম্ খবর শুনে অবাক!

—পেশেণ্ট তো ছাড়া পেয়ে গিয়েছে! মিসেস রায় বাড়ি চলে গিয়েছেন!

—সে কী! আমি জানতে পারলাম না আর মিসেস রায় আমার বাড়িতে চলে গিয়েছেন?

—হ্যাঁ স্যার, এই দেখুন স্যার রিসিট্। সমস্ত পেমেণ্ট সব মিটিয়ে দিয়ে গেছেন আপনার রিপ্রেজেণ্টেটিভ্।

—আমার রিপ্রেজেণ্টেটিভ? কে সে? নাম কী তার?

হেড্ ক্লার্ক খুব ব্যস্ত মানুষ। আরো অনেক লোক আরো অনেক আর্জি নিয়ে হেড্ ক্লার্কের কাউণ্টারে ভিড় করে আছে। সকলেরই দাবী তাদের কথাই আগে শুনুক হেড্ ক্লার্ক, তাদের দাবীই আগে মেটাক্ হেড্ ক্লার্ক, তাদের আর্জিরই আগে ফয়সালা করুক হেড্ ক্লার্ক।

—এই দেখুন, তেতাল্লিশ হাজার সাত্শো একান্ন টাকা পেমেণ্ট করে দিয়ে গেছেন আপনার রিপ্রেজেণ্টেটিভ—

তেতাল্লিশ হাজার সাত্শো একান্ন টাকা! সুমিত্রাকে রিলিজ করবার জন্যে তেতাল্লিশ হাজার সাত্শো একান্ন টাকা কে পেমেণ্ট করে দিয়ে গেল? কে সে? কার বুকের মধ্যে এত মধু? কার চরিত্রের মধ্যে এত পবিত্রতা?

সেই-ই বলতে গেলে শুরু হলো অধঃপতন। অনেক আগে থেকেই যে সেই অধঃপতনের সূত্রপাত হয়েছিল তা সে জানতে পারেনি। শুধু সোহম্ কেন, কেউই তা জানতে পারে না। কেল্লার ভেতরে যখন কেউ ঢোকে তখন কে-ই বা জানতে পারে যে সে ক্রমশঃ নিচের দিকেই নামছে! যখন কেল্লার ভেতরে গিয়ে পেঁছোয় তখনও তা সে জানতে পারে না। জানে কখন? যখন সে কেল্লা থেকে ওপরে উঠে আসে। ওপরে এসে দাঁড়ালেই তখন সে বুঝতে পারে যে সে কত নিচেয় নেমেছিল।

প্রথমে সোহম্ মনের ভেতরে যে মন আছে তাতে একটু ধাক্কা খেয়েছিল। তারপরে নার্সিং-হোম থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখলে সেখানে সুমিত্রা নেই।

বদ্যিনাথ যেমন রোজ চা দিতে আসে তেমনি চা দিতে এসেছিল। সোহম্ প্রথমে ভেবেছিল বদ্যিনাথকে সুমিত্রার কথা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল। কলঙ্ক অনেকটা বিষের মত। তাকে যত ভুলে থাকা যায় ততই স্বাস্থ্যকর।

শম্পা বাবাকে পেয়ে খুব খুশী, বললে—তুমি বুঝি আজ হাসপাতালে যাওনি পাপ্পা?

সোহম্ বললে—না, তুমি যে আমাকে অফিস থেকে সোজা বাড়িতে আসতে বলেছিলে!

শম্পা কথাটা শুনে আরো খুশী হয়ে সোহমের কোলের ওপরে উঠে বসলো। বললে—মাম্মির চেয়ে তুমি আমাকে বেশি ভালোবাসো, না পাপ্পা?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ—

মুখে হ্যাঁ বললে কী হবে, মন তো পড়েছিল সুমিত্রার কাছে। সত্যিই তো সুমিত্রা গেল কোথায়? এমন তো কখনও হয় না? বিয়ের পর থেকে সুমিত্রাকে ছেড়ে সোহম্ কখনও একলা থাকেনি! অফিসের কাজে যখন সে বোম্বাইতে যেত প্রথম প্রথম সে বরাবর টেলিফোনে সুমিত্রার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। মিস্টার সেন কিম্বা মিস্টার আয়েঙ্গারেরও সে-কথা অজানা ছিল না।

শুধুমাত্র যখন সে ইরাকে গিয়েছিল তখনই অনেকদিনের জন্যে সুমিত্রার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেনি। যোগাযোগ না রাখতে পারাও তো তার 'ডিউটি'র অন্তর্গত। সে অনুপস্থিতি তো অফিসেরই স্বার্থে। যে-অফিস তাকে গাড়ি দিয়েছে, তাকে আরাম দিয়েছে, তাকে ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ততা দিয়েছে। শুধু তাকেই নয়, সুমিত্রাকেও নিশ্চিন্ততা দিয়েছে। যখন তার চাকরি থেকে অবসর নেবার সময় হবে তখন তার সঙ্গে সুমিত্রা নিজেও তো সে-নিশ্চিন্ততা ভোগ করবে। এর ওপর মানুষ আর কী চায়?

তুমি কথা বলছো না কেন পাপ্পা ?

আজকেই কেদার সান্যালের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। দু'জনের মধ্যে তফাৎ কতটা ? একজন গরীব আর একজন আর্থিক দিক থেকে বড়লোক। একজনের স্ত্রীর মৃত্যু হলো আর্থিক অসচ্ছলতায়, আর একজনের স্ত্রী চলে গেল আর্থিক প্রাচুর্যে।

তাহলে লোকে কেন অর্থের প্রাচুর্য চায় ? আর্থিক অসচ্ছলতা যদি অভিশাপ হয়, তাহলে আর্থিক প্রাচুর্যও তো অভিশাপ। কেন সে এ-কথা আগে বোঝেনি ! অনুতাপ নয়, মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন এসে সোহমকে কেবল বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলো, অথচ অর্থ অভিশাপ হলে কেন সবাই সেই অর্থকেই একমাত্র কাম্য বস্তু বলে মনে করে ?

মনে পড়লো সেই ইরাকের কার্ল স্যানডোজের কথা। সেই মানুষটাই বোধহয় নিজে আমেরিকান হয়েও পৃথিবীতে একমাত্র ব্যতিক্রম।

সোহম্ একদিন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমাদের আমেরিকা তো টাকার দেশ, বড়লোকের দেশ। তুমি সেই টাকার দেশের লোক হয়েও এ-রকম ব্যতিক্রম হলে কেন ?

—কেন হলুম, জানো ? আমার বাবার জন্যে !

—সে কী ? তোমার বাবার কী হয়েছিল ?

কার্ল স্যানডোজ্ বললে—আমার বাবার বয়েস বেশি হয়নি। বড় জোর প'য়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ। আমার বাবাকে একজন ডাক্তার টাকার জন্যে মার্ডার করেছিল—

—ডাক্তার ? মার্ডার করেছিল কী জন্যে ?

কার্ল স্যানডোজ্ বললে—ওই তো বললুম, টাকার জন্যে। সেই ডাক্তার ওষুধের কোম্পানির কাছ থেকে ঘুষ নিত। বলতে গেলে বাবার কোনও রোগই হয়নি। ডাক্তাররা তো মানুষকে বাঁচায়, কিন্তু আমেরিকার ডাক্তাররা টাকার জন্যে মানুষকে মারে।

সোহমের তবু কথাটা বিশ্বাস হয়নি। জিজ্ঞেস করেছিল—সে কী রকম ?

—তবে শুনুন—

বলে কার্ল স্যানডোজ্ পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। এটা কোনও কাল্পনিক ব্যাপার নয় মিস্টার রায়। সেখানে যে সব ওষুধের সেলস্ম্যানরা ডাক্তারদের বেশি কমিশন দেয় ডাক্তাররা দরকার না হলেও সেই সব ওষুধই রোগীদের ওপর প্রয়োগ করে। দরকার না হলেও সার্জিক্যাল অপারেশন করে। তাতে রোগীরা মারা গেলেও ডাক্তারদের অনেক টাকা হয়। এ-ঘটনা শুধু আমার বাবার ব্যাপারেই যে ঘটেছে তা নয়, অন্য হাজার হাজার লোকেদের ব্যাপারেও ঘটেছে। এ খবরটা এবার ইউ-এস কংগ্রেসের সাব্-কমিটির রিপোর্টেই বেরিয়েছে। শুধু যে ডাক্তাররাই কাল্প্রিট তা নয়, বড় বড় ওষুধের কোম্পানিরাও কাল্প্রিট।

কথাগুলো বলতে বলতে কার্ল স্যানডোজের চোখ দিয়েও জল পড়তে লাগলো। চোখটা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললে—সেই জন্যেই তো আমি আমেরিকা ছেড়ে এশিয়ায় এসেছি। খুঁজে দেখতে এসেছি এখানকার অবস্থাটা কী রকম!

—এখানে এসে কী দেখলে?

—দেখলুম এখানেও মানুষ মারার কল বেরিয়েছে! কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, এখানকার বড়লোকরা কিম্বা এ-দেশের প্রেসিডেন্ট্ আর মিনিস্টাররা রোগ সারাবার জন্যে সেই আমাদের দেশেই যায়। এ এক বড় আশ্চর্য জিনিস। এই দেশে এসে দেখছি এখানকার ওষুধ কোম্পানিগুলোর সেলস্‌ম্যান-রাও ডাক্তারদের দরজায়-দরজায় গিয়ে বেশি কমিশন দেবার লোভ দেখিয়ে মানুষ মারার ফাঁদ পেতেছে পাড়ায় পাড়ায় নার্সিং-হোম খুলে –

খানিক থেমে কার্ল স্যানডোজ্ আবার বলেছিল—আরো একটা আশ্চর্য জিনিস এখানে দেখেছি। হস্‌পিট্যালের 'ফ্রি বেডে' অ্যাডমিশন নিলে এখানে ইজ্জৎ যায়, আর নার্সিং-হোমে বেশি টাকা দিয়ে ভর্তি হলে এদেশে পাড়ার লোকের চোখে ইজ্জৎ বাড়ে—

সোহম্‌ও এখন তাই ভাবতে বসলো। তার তেতাল্লিশ হাজার সাত্‌শো একান্ন টাকা দিয়ে কেনা ইজ্জত আজ ধুলোয় মিশে ধুলো হয়ে গেল।

—পাম্পা, তুমি কথা বলছো না কেন? কথা বলো পাম্পা—

সোহম্ বললে—এই তো কথা বলছি তোমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যেই তো আজ তোমার মাম্মিকে হাসপাতালে দেখতে যাইনি। অফিস থেকে সোজা তোমার কাছে চলে এসেছি।

কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েই সোহমের মনে পড়ে গেল কেদার সান্যালের কথা। কেদার সান্যাল বোধহয় এতক্ষণে শ্মশানে স্ত্রীকে পুড়িয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে কেদার সান্যালও তার শম্পাকে কোলে নিয়ে সোহমের মত আদর করছে। এই শম্পারও আজ মা নেই, সেই শম্পারও আজ মা নেই। আজ দুই শম্পাই এক হয়ে গিয়েছে। আর কেদার সান্যাল আর সোহম্‌ও এক হয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে আর কোনও তফাত নেই।

সেদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো সোহমের বাড়িতে। এমন ঘটনা যে কখনও ঘটতে পারে এ-বাড়ির কেউই তা কল্পনা করতে পারেনি। ঠাকুর, বদ্যিনাথ, বাসন্তিয়া সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

দরজার কলিং-বেলটা সাধারণতঃ এ-সময়ে কেউ বাজায় না। কারণ সোহম্ তখন অফিসে থাকে। ঠাকুরেরও কোনও কাজ থাকে না তখন। আর শম্পাও

তখন ঘুমোয় বাসন্তিয়ার কাছে।

বদ্যিনাথও তখন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঘণ্টার বাজনাটা শুনেই সে উঠে দরজাটা খুলে দিয়েছে।

কিন্তু খুলে দিতেই মেমসাহেবকে দেখে অবাক।

—আপনি?

—শম্পা কোথায়?

বদ্যিনাথ বললে—সে বাসন্তিয়ার কাছে ঘুমোচ্ছে—

এর পরে আর কোনও কথা নয়। সুমিত্রা যেমন এসেছিল তেমনি ভাবেই সোজা জুতো পরেই শম্পার ঘরে ঢুকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তিয়ারও ঘুম ভেঙে গেছে। সে ধড়ফড় করে মেমসাহেবকে সেলাম করলে। কিন্তু সেদিকে সুমিত্রার ভ্রূক্ষেপও নেই। ততক্ষণে শম্পাকে হাত ধরে টেনে তুলেছে সে।

আচমকা ঘুম ভাঙতেই শম্পা কেঁদে উঠেছে—তুমি কখন এলে মাম্মি?

সে-কথার জবাব না দিয়ে সুমিত্রা বাসন্তিয়াকে বললে—ওকে কোলে নিয়ে আমার সঙ্গে আয় তো—

বাসন্তিয়াও এ রকম হুকুম পেয়ে অবাক।

বললে—কোথায় যাবো মেমসাহেব?

সুমিত্রা বললে—নিচেয়, রাস্তায়। ওকে আমার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবি চল্—

বদ্যিনাথ, ঠাকুর, তারাও সবাই মেমসাহেবের কথায় অবাক হয়ে গেছে। মেমসাহেব তো হাসপাতালে ছিল, এইটেই সবাই জানে। হঠাৎ সেই মেমসাহেব এমন করে হঠাৎ বাড়িতে এলই বা কেন? আর এলই যদি তো মিসিবাবাকে এমন করে নিয়েই বা যচ্ছে কেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

বাসন্তিয়ার কোলে উঠেই শম্পা কাঁদতে লাগলে—আমার পাপ্পা কোথায় গেল মাম্মি? আমার পাপ্পা কোথায় গেল?

সুমিত্রা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—তুমি আমার সঙ্গে চলো, তোমার পাপ্পাকে দেখতে পাবে. চলো আমার সঙ্গে—আমার সঙ্গে চলো। কাঁদে না, ছিঃ, কাঁদলে সবাই নিন্দে করবে—কাঁদতে নেই—ছিঃ—

বদ্যিনাথ. ঠাকুর, সবাই চুপ করে সব ঘটনাটা চোখ মেলে দেখতে লাগলো। এতদিন ধরে তারা এ-বাড়ির ঘটনা দেখে আসছে, এখন আর কোনও ঘটনাতেই তারা আশ্চর্য হয় না। সব তাদের চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। তাদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও নেই যেমন, তেমনি সে অধিকারও নেই তাদের যেন।

বাসন্তিয়া শম্পাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নামতে লাগলো। আর তার আগে আগে নামতে লাগলো সুমিত্রা। আর তাদের সকলের পেছন-পেছন নামতে লাগলো ঠাকুর আর বদ্যিনাথ।

রাস্তার ওপরেই একটা ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির ড্রাইভার মেমসাহেবকে দেখে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দাঁড়াতেই মেমসাহেব আগে নিজে ঢুকলো আর তারপর বাসন্তিয়ার কোল থেকে সুমিত্রা শম্পাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলে।

শম্পা বাসন্তিয়ার দিকে চেয়ে বললে—টা-টা—

বাসন্তিয়া বললে—আবার এসো মিসিবাবা—

শম্পা গাড়ির ভেতর থেকেই বলে উঠলো—আমি আমার পাপ্পার কাছে যাচ্ছি—

ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়িটায় স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। সেটা সোঁ সোঁ করে সামনের দিকে গিয়ে সকলের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

টার্নবুল এ্যান্ড জ্যাক্‌সন্‌ কোম্পানির অফিসে মিস্টার সেনের ঘরে সোহমের অনেক কাজ ছিল। কাজ শেষ হতে সন্ধ্যে ছটা বেজে গেল। ইয়ারক্লোজিং-এর আর্জেন্ট কাজ সব।

মিস্টার সেন বাড়ি যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। হঠাৎ মিস্টার সেনের মনে পড়ে গেল কথাটা।

জিজ্ঞেস করলেন—বাই-দি-বাই, তোমার মিসেস কেমন আছেন এখন রায়? আর কতদিন নার্সিং-হোমে থাকতে হবে? ডাক্তাররা কিছু বলছে?

সোহম্‌ কী বলবে বুঝতে পারলে না।

মিস্টার সেন বললেন—তোমার মিসেসকে একটু ভালো করে দেখাও রায়। আসলে এই যে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমাদের কোম্পানির এত প্রফিট হয়েছে এ সমস্ত কিন্তু তোমার মিসেসের জন্যেই। সেই ভানুভাই প্যাটেলকে তুমি তোমার মিসেসকে দিয়ে যে-ভাবে প্লীজ করেছ এর সমস্ত ক্রেডিট তোমার আর তোমার মিসেসের। সেই জন্যেই আমরা মিডল্‌-ইস্টের অত কোটি টাকার কনট্র্যাক্ট পেয়েছিলুম। আমি বোম্বেতে মিস্টার আয়েঙ্গারকে একটা ডেমি-অফিসিয়াল চিঠিতে সব ক্লীয়ার করে লিখে দিয়েছি। আর তার সঙ্গে ইউনিয়ন লীডার ইব্রাহিমের ব্যাপারটা তো আগেই লিখে দিয়েছিলুম। আওয়ার কোম্পানি ইজ রীয়্যালি গ্রেটফুল টু ইওর ওয়াইফ্‌। আর সেই সঙ্গে তোমার একটা প্রমোশনের কথাও লিখে দিয়েছি তাঁকে। আমাদের অপারেশান-ব্লু-স্টার যে সাকসেসফুল হলো এটা সমস্ত তোমার মিসেসের জন্যেই।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—এখন তো তুমি নার্সিং হোমে যাচ্ছো?

সোহমের মুখ দিয়ে এতক্ষণে একটা কথা বেরোল। একেবারে পুরোপুরি মিথ্যে কথা।

বললে—হ্যাঁ স্যার, আমি এখান থেকেই সোজা নার্সিং-হোমে যাবো—

মিস্টার সেন বললেন—তাহলে একটা কাজ করো। যাওয়ার সময় নিউ মার্কেট থেকে আমার তরফ থেকে একটা 'ফ্লাওয়ার-বোকে' নিয়ে যাও। এ্যাজ্‌ এ টোকেন অব্‌ গ্র্যাটিচিউড্‌—আওয়ার অফিস উইল্‌ পে দ্য কস্ট্‌। এর টাকা অফিস দিয়ে দেবে। আমি আর তোমার দেরি করিয়ে দেব না—

বলে মিস্টার সেন বেরিয়ে গেলেন।

সোহম্‌ও একটু পরে বেরোল। বাইরে গাড়ি নিয়ে গোবিন্দ দাঁড়িয়ে ছিল। সোহম্‌ উঠতেই গোবিন্দ গাড়ি ছেড়ে দিলে। মিস্টার সেনের কথাগুলো তখনও তার কানে বাজছিল—এই যে এই ফাইন্যান্‌সিয়াল ইয়ারে আমাদের কোম্পানির এত কোটি টাকার প্রফিট হয়েছে, এর সমস্ত ক্রেডিট কিন্তু তোমার মিসেসের। সেই ভানুভাই প্যাটেলকে তুমি তোমার মিসেসকে দিয়ে যে-ভাবে প্লীজ্‌ করেছ তার ফলেই আমরা মিডল ইস্টের অত কোটি টাকার কন্‌ট্রাক্ট পেয়েছিলুম। আমি বোম্বের মিস্টার আয়েঙ্গারকে একটা ডেমি-অফিসিয়াল চিঠিতে সব ক্লীয়ার করে লিখে দিয়েছি। আওয়ার কোম্পানি ইজ্‌ রীয়্যালি গ্রেটফুল টু ইওর ওয়াইফ্‌।··· আমাদের 'অপারেশন-ব্লু-স্টার'যে সাক্‌সেস্‌ফুল হলো এটা সমস্ত তোমার মিসেসের জন্যেই··

সোহম্‌ কথাগুলো ভাবতে গিয়ে হাসবে না কাঁদবে কিছুই বুঝতে পারলে না। যে নেই তাকে কোম্পানি করুণা করছে! এ অনেকটা সেই মারা যাওয়ার পর কোরামিন্‌ ইন্‌জেকশান দেওয়ার মত।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল সোহমের।

গোবিন্দ গাড়িটা নিয়ে সোজা বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু কথাটা মনে পড়তেই বললে—গোবিন্দ, একবার বৈষ্ণবঘাটার দিকে চল্‌ তো। সেই কেদার সান্যালের বাড়িতে—

কেদার সান্যাল! তার সেই স্ত্রী মারা গেছে। দৃশ্যটা তখনও তার চোখে ভাসছে। চারটে লোক তার স্ত্রীর মৃতদেহটা নিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছিল। সোহম্‌ তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে গাড়ি থেকে নেমে কেদার সান্যালকে একটা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিয়েছিল। ঘেন্নায় সে সোহমের টাকাটা তো নিলেই না, এমন কি একটা কথাও বললে না তার সঙ্গে।

কিন্তু কেদারের মাইনে যে বাড়েনি তার জন্যে দায়ী কে? সোহম্‌ রায়ই দায়ী? তাহলে সুমিত্রা যে নার্সিং-হোম থেকে চলে গেল তার জন্যও কি সোহম্‌ রায় দায়ী?

গাড়িটা সোঁ সোঁ করে বৈষ্ণবঘাটার দিকে ছুটে চলেছিল। কেদার সান্যাল যে তার টাকা নিতে অস্বীকার করেছে এও তো সেই মিস্টার সেনের কথার মতনই।

অনেকটা সেই মারা যাওয়ার পর কোরামিন্‌ ইন্‌জেকশন দেওয়ার মতন। মিস্টার সেনও তো সেই একই রকম কথা বললেন—আওয়ার কোম্পানি ইজ্‌ রীয়ালি গ্রেটফুল টু ইওর ওয়াইফ্‌—

বাড়িতে বোধহয় এখন শম্পা বাসন্তিয়াকে বার-বার জিজ্ঞেস করছে—আজ পাপ্পা বাড়ি আসতে এত দেরি করছে কেন? এত দেরি করছে কেন পাপ্পা বাড়ি আসতে?

বাসন্তিয়া হয়ত বলছে—এখুনি আসবে পাপ্পা—এখ্‌খুনি বাড়ি আসবে, আর একটু সবুর করো—

শম্পা হয়ত বিশ্বাস করছে না বাসন্তিয়ার কথা। বলছে—পাপ্পা তাহলে

আজ মাম্মিকে দেখতে নার্সিং-হোমে গেছে—নিশ্চয়ই পাম্পা মাম্মিকে দেখতে হাসপাতালে গেছে—

সোহম্ কেন যে সেদিন বৈষ্ণবঘাটায় গিয়েছিল তা প্রথমে সে অফিস থেকে বেরোবার সময়েও ভাবেনি। কথাটা মনে পড়লো রাস্তায় বেরিয়ে। মিস্টার সেন বলেছিলেন—সোহমের জন্যেই নাকি কোম্পানির কোটি-কোটি টাকা প্রফিট হয়েছে।

প্রফিট নিশ্চয়ই হয়েছে, তা না হলে অডিটার-জেনারেল তো তা পাস করতো না। অডিটারের হাতে নানা কাগজপত্র, নানা বিল্, নানা ভাউচার সাপ্লাই করা হয়। সেই সব কাগজপত্র, সেই সব বিল্, সেই সব ভাউচার পেয়ে আর মিলিয়ে ডেবিট-ক্রেডিট দেখে তবে তো একটা কোম্পানির ব্যালেন্স-শীট তৈরি হয়। কিন্তু তার পেছনে কি আসল কারণটা কোথাও নোট করা থাকে? সোহম্ যে ইরাকে গিয়েছিল, তার ইরাকে যাওয়ার জন্যে কোম্পানির কত লাখ টাকা খরচ হলো, কেন খরচ হলো, তার ভাউচার তো কেউ দেবে না। তার ইরাক যাওয়ার জন্যে কোম্পানির খাতায় ইরাক যাওয়ার আসল উদ্দেশ্যটা কী লেখা রইলো? কোম্পানি কী কারণ দেখিয়েছে তার কাগজপত্রে?

কারণটা দেখিয়েছে এই যে ইণ্ডিয়ার বাইরে কোম্পানির মার্কেট সার্ভে করতে যে অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল তিনি এত লাখ টাকা খরচ করেছেন।

আর শুধু তাই-ই নয়, একটা মিথ্যে সার্ভে-রিপোর্টও সাব্‌মিট করতে হয়েছিল সোহম্‌কে। সে-রিপোর্টে লেখা হয়েছিল ইরাকে থাকতে কোন্ কোন্ অফিসে তাকে যেতে হয়েছিল, কোন্-কোন্ লোকের সঙ্গে তাকে দেখা করতে হয়েছিল।

সমস্ত রিপোর্টটাই তৈরী করতে হয়েছিল কলকাতার অফিসে বসে বসে। কিন্তু আসলে কোথাওই তো সে যায়নি। শুধু হোটেলে বসে বসে একলা-একলা দিন কাটিয়েছে—ওই পর্যন্ত। আর কিছু নয়। অথচ আগাগোড়া মিথ্যে লিখেই সে কোম্পানিকে অত কোটি টাকা পাইয়ে দিলে। আর তার বিনিময়ে সে কী পেলে?

সোহম্ নিজেকেই বার বার জিজ্ঞেস করলে তার বিনিময়ে কী-ই বা সে পেলে?

পেলে এইটুকুই যে সুমিত্রা নার্সিং-হোম থেকে অন্য কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আর বাকি ছিল শম্পা। তাকেও সে আজ বাড়ি থেকে নিয়ে চলে গেল।

আজকে কোম্পানি নিজেদের কোটি-কোটি টাকার প্রফিটের বিনিময়ে মিসেস রায়কে একটা 'ফ্লাওয়ার-বোকে' পাঠানোর খরচটা বহন করলে।

আশ্চর্য, কোথায় সে নিউ মার্কেটে গিয়ে ফুলের মালা কিনবে, না চলেছে বৈষ্ণবঘাটার দিকে!

সোহমের হঠাৎ খেয়াল হলো গাড়িটা কখন থেমে গেছে।

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—কী রে গোবিন্দ, থামলি কেন?

গোবিন্দ বললে এই তো স্যার, বৈষ্ণবঘাটাতেই তো এসে গিয়েছি—

এতক্ষণে যেন সোহম্ মাটির পৃথিবীতে এসে পেঁছুলো। চারদিকে চেয়ে দেখলে—হ্যাঁ, সত্যিই সে বৈষ্ণবঘাটাতেই এসে পেঁছিয়েছে, এই তো সেই বস্তিগুলো, এই তো সেই গলিটা। এই পথ দিয়েই তো সে ঢুকেছিল কেদার সান্যালের সেই ভাঙা বাড়িটাতে।

গলির সামনে সেদিনও কয়েকজন বেকার ছেলে একটি বাড়ির রোয়াকে বসে আড্ডা দিচ্ছিল—আর সিগারেট ফুঁকছিল।

সোহম্ তাদের কাছে চেনা লোক। আগে দু'বার তারা দেখেছে সোহম্‌কে। তাই এবার তারা শুধু চেয়ে দেখলে তার দিকে। কিছু জিজ্ঞেস করলে না।

সোহম্ ভেতরে কেদার সান্যালের বাড়ির সামনে গিয়ে ভাবতে লাগলো—কেদার সান্যালের সঙ্গে দেখা হলে প্রথমে সে কী বলবে? সেদিনকার কথাটা মনে পড়লো তার, সেই রাস্তায় যেদিন কেদার তার স্ত্রীর মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছিল। আজও কি সে সেই রকম করেই তাকে অভ্যর্থনা করবে? সেই অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেবে তাকে? স্ত্রী মারা যাওয়ার পর এখন সে তার শম্পাকে নিয়ে নিশ্চয়ই খুবই বিব্রত হয়ে আছে। তাকে কার কাছে রেখে সে বাইরে যাবে? কে তার রান্নাবান্না করে দিচ্ছে? সংসার চলছে তার কী করে? কোথা থেকে টাকা আসছে তার? কী করে চলছে তার দিনগুলো?

বাড়িটার সামনে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল সে চুপ করে।

—কে?

হঠাৎ ওদিক থেকে কে যেন মেয়েলি গলায় জিজ্ঞেস করলে—কে?

সোহম্ চারদিকে কাউকে দেখতে পেলে না। তার একটু ভয় করতে লাগলো, ভয় অন্য কিছুর জন্যে নয়, ভয় হলো এতগুলো কাঁচা টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছে বলে। এ দিকটা তো ঠিক শহরের মত নয়। ছাড়া ছাড়া বাড়ি, ছাড়া ছাড়া বন-জঙ্গল। এখনও জায়গাটা পুরোপুরি শহর হয় ওঠেনি। সবে দু'একটা নতুন পাকা বাড়ি গজিয়ে উঠছে। যে-কটা বাড়ি আগেকার ছিল, সেগুলো ভাঙা-চোরা, পলেস্তারা ভাঙা। একদিন হয়ত এখানেও আরো নতুন নতুন পাকা বাড়ি গজিয়ে উঠবে। তখন আর বাইরের দারিদ্র্য থাকবে না। মানুষের ভেতরের দৈন্যটা ঢাকা দেওয়ার জন্যে বাইরে বালি-সিমেণ্ট-রং লাগানো হবে। তখন আরো সুবেশ হয়ে উঠবে পরিবেশটা।

—কথা বলছো না কেন? কে তুমি?

সোহম্ এবার চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে—এ-বাড়িতে কেদারবাবু আছেন? কেদার সান্যাল মশাই?

এতক্ষণে একটা জ্বলন্ত ল্যম্প হাতে নিয়ে নিয়ে একজন মহিলা সোহমের

সামনে এগিয়ে এল। এসে আলো ধরে সোহমের মুখটা দেখে নিজের মুখের ঘোমটাটা আর একটু নিচুতে টেনে দিলে।

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোত্থেকে আসছেন?

সোহম্ বললে—আমি কলকাতা থেকে আসছি, কেদার সান্যাল মশাই-এর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই—

মহিলাটি বললে—কিন্তু তিনি তো এখন বাড়িতে নেই। দেখছেন না সদর দরজায় তালা লাগানো রয়েছে।

তাই বটে। অন্ধকারে আগে দেখতে পায়নি তালাটা।

জিজ্ঞেস করলে—কখন আসবেন তিনি?

মহিলাটি বললে—আর বেশি দেরি হবে না, এইবার ফেরবার সময় হয়ে এসেছে—

এবার সোহম্ বললে—তিনি কোথায় গেছেন বলতে পারেন?

মহিলাটি বললে—তা জানি নে, আমার কাছে মেয়েকে রেখে তিনি রোজ আপিসে কাজ করতে যান—

—কোন্ অফিসে?

মহিলাটি বললে—তা তো আমি বলতে পারবো না—

সোহম বললে—কেদারবাবু অফিসে চলে গেলে তাঁর মেয়ে শম্পা কোথায় থাকে? তার মা তো মারা গেছে—

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ, মা মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি শম্পাকে আমার কাছে রেখে যান। শম্পা সারাদিন আমাদের কাছেই থাকে খায়, তারপর তার বাবা অফিস থেকে এলে তখন বাবা তাকে বাড়িতে নিয়ে যান—

—এখন শম্পা কি আপনার কাছেই আছে?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ—

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—সে এখন কী করছে? জেগে আছে?

মহিলাটি বললে—হ্যাঁ, আমি রান্না করছি আর সে আমার পাশে বসে খেলা করছে।

সোহম্ বললে—আমি একবার শম্পাকে দেখতে পারি?

মহিলাটি বললে—আসুন না, আমার কিন্তু মাটির বাড়ি, আমি তো বিধবা মানুষ, বড় গরীব আমরা—আপনাকে বসতে দেওয়ার মত জায়গা নেই। আপনার কষ্ট হবে খুব—

সোহম্ বললে—তা হোক, আপনি চলুন। আমি শম্পাকে একটু দেখবো—

মহিলাটি বললে—বড্ড দুষ্টু হয়েছে মেয়েটা—

সোহম্ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলে—কেদারবাবু আপনার কে হন?

মহিলাটি বললে—কে আবার হবেন, কেউই না। পাশাপাশি বাড়িতে থাকি এই পর্যন্ত! মেয়েটার মা মারা যাওয়ার পর আমিই বললুম, ও আমার কাছে থাকুক, আমি ওর দেখাশোনা করবো। কেদারবাবুর রান্না-বান্না, শম্পার দেখা শোনার ভার সবই আমার ঘাড়ে তুলে নিলুম। উনি খরচ-পত্তর সব দেন। ওঁর

তো আত্মীয়স্বজন কেউ নেই—

ততক্ষণে মহিলাটি তার বাড়িতে ঢুকলো।

সোহম্ ভেতরের দিকে চেয়ে দেখলে—একখানা মাত্র ঘর, তার ভেতরে একটা উনুনে রান্না হচ্ছে, আর উনুনের পাশে একটা ছোট্ট মেয়ে বসে বসে নিজের মনেই খেলা করছে।

কুঁড়েঘর। মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে। একপাশে মাদুর আর বালিশ বিছানা গোটানো রয়েছে। সোহম্ শম্পাকে এক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো।

মহিলাটি বললে—আপনাকে আমি কোথায় বসতে দিই বুঝতে পারছি না। আপনার কষ্ট হবে—

ঘরের একপাশে একটা জলচৌকি ছিল। মহিলাটি বললে—আপনি এটার ওপর বসতে পারেন—

শম্পা সোহম্‌কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে—ও কে মাসি?

মহিলাটি বললে—উনি তোমার বাপীর বন্ধু—

সোহম্ জিজ্ঞেস করলে—তুমি আমায় চিনতে পারছো না? অনেক দিন আগে আমি তোমাদের বাড়িতে এসেছিলুম। তোমার খুব জ্বর তখন—

মহিলাটি বললে—ও তো বরাবরই জ্বরে ভোগে। ওর মাও কেবল জ্বরে ভুগতো, ওই মেয়েও জ্বরে ভোগে বরাবর—

শম্পা বললে—জ্বর হলে খুব কষ্ট হয় আমার—

সোহম্ বললে—আমারও জ্বর হলে খুব কষ্ট হয়—

শম্পা বললে—তোমারও খুব জ্বর হয় বুঝি?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, খুব জ্বর হয়।

—জ্বর হলে তুমি কী খাও?

সোহম্ বললে—আমি তখন দুধ খাই,—

—দুধ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, দুধ খাই। বার্লি খাই, সাবু খাই, মিছরি খাই—

শম্পা বললে—জ্বর হলে আমার খুব ভাত খেতে ইচ্ছে করে। মাসি আমাকে ভাত খেতে দেয় না। মাছ খেতে দেয় না। মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে আমার খুব ভালো লাগে। মাসি আমাকে মোটে মাছ খেতে দেয় না।

মহিলাটি বললে—এ্যাই, মিছে কথা বলতে নেই! একদিন তোমাকে মাছ খেতে দিইনি?

শম্পার মনে পড়লো। বললে—হ্যাঁ, কিন্তু সে শুধু এক দিন। তারপর আর কোনও দিন মাছ খেতে দিয়েছ?

মহিলাটি সোহমের দিকে চেয়ে বললে—শুনছেন মেয়ের কথা? আচ্ছা, মাছের কত দাম বলুন তো? ওর বাবা যা মাইনে পায় তাতে কি মাছ কিনতে পারে? ওর বাবা যা মাইনে পায় তার সবই চলে যায় দেনা শোধ করতে। কাবলিওয়ালার কাছে অনেক টাকা দেনা করেছিল ওর বাবা। ওর মায়ের অসুখের সময় তো অনেক দেনা হয়ে যায় ওর বাবার ডাক্তার-ওষুধের জন্যে! কী করে

ওর বাবা মাছ কিনবে বলুন ?

সোহম্‌ বললে—এবার রোজ মাছ খেতে দেবেন শম্পাকে—দুধ মাছ ফল—সব খেতে দেবেন—

রান্না করতে করতে মহিলাটি ভাতের হাঁড়িটা মেঝেতে নামালো। উনুনের খোলা আগুনে মহিলাটির মুখ আরো করুণ হয়ে উঠলো। মহিলাটিকে এবার আরো স্পষ্ট করে দেখতে পেলে সোহম্‌। তারও শরীরে রক্ত নেই। শম্পার মুখটাও উনুনের আগুনের আভায় আরো স্পষ্ট দেখা গেল। তাকে দেখে মনে হলো সে-মুখেও যেন রক্ত নেই।

—দুধ, মাছ, ফল !

মহিলাটির গলার আওয়াজে পৃথিবীর সমস্ত খেদ যেন একসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল।

বললে—দুধ, মাছ, ফল—ও-সব জিনিসের নামই তো কেবল শুনে এসেছি, চোখে কখনও দেখিনি। ওর বাপ মাসে মাইনে পায় তো তিনশো, তার থেকে কাবুলিওয়ালার দেনা শোধ করতেই সব বেরিয়ে যায়। যা হাতে থাকে তা দিয়ে নুন-ভাতই যোগাড় করতে পারে না। তার ওপর আবার দুধ মাছ ফল…

সোহম্‌ বললে কেদারবাবুর টাকা না থাকে তো কী হয়েছে তাতে ! আমি টাকা দেব—আমি অনেক টাকা এনেছি সঙ্গে করে—

—আপনি টাকা দেবেন ?

—হ্যাঁ।

—কেন ?

সোহম্‌ ততক্ষণে কোটের ভেতরের পকেটে হাত ঢুকিয়েছে। বললে—ওই শম্পার জন্যে।

—শম্পার জন্যে ?

সোহম্‌ বললে—আমার নিজেরও তো মেয়ে আছে। আমিও তো একজন মেয়ের বাপ—

মহিলাটি অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো সোহমের মুখের দিকে। এ-রকম মানুষ যেন আর সে কখনও চোখে দেখেনি।

কিন্তু তখন সোহম্‌ এক-তাড়া নোটের একটা বাণ্ডিল বার করে শম্পার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বলছে—এইটে নাও তুমি মা, এই টাকা তোমাকে দিয়ে গেলুম। এই টাকা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছে তাই খেয়ো। দুধ, মাছ, ফল—যা তোমার খুশি—

শম্পাও টাকার বাণ্ডিলটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিয়েছে।

মহিলাটি তখনও অবাক বিস্ময়ে দেখছে সোহম্‌কে। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলে—টাকা দিচ্ছেন ওকে ?

—হ্যাঁ—

—ওতে কত টাকা আছে ?

সোহম্‌ বললে—পঞ্চাশটা একশো টাকার নোট। মোট পাঁচ হাজার টাকা

আছে ওতে—

মহিলাটি প্রথমে টাকার অংকটা শুনে চমকে উঠেছিল। তারপর টাকার বাণ্ডিলটা শম্পার হাত থেকে নিতে গেল। কিন্তু শম্পা দিলে না। বললে—ও আমার টাকা, আমি দেব না—

সোহম্ শম্পাকে বোঝালো। বললে—না, তোমার কাছে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। ওই টাকা দিয়ে তোমার যা ইচ্ছে তাই খাবে। দাও, মাসির কাছে দাও—

শম্পা তবু দেবে না টাকা। বললে—এ টাকা আমি বাবাকে দেব—

বলে নিজের মুঠো শক্ত করে ধরে রাখলে। যাতে কেউ না কেড়ে নিতে পারে।

হঠাৎ বাইরে কার গলার আওয়াজ শোনা গেল।

—দিদি দিদি, ও দিদি –

মহিলাটি এবার উঠলো। বললে · ওই কেদার এসেছে, ভালোই হয়েছে—

দরজাটা খুলে দিতেই সোহম্ চোখের সামনে ভূত দেখলে।

মহিলাটি বললে – ওই দেখ কেদার, কে একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন -

—কই ?

—ওই যে বসে আছেন !

কেদার সোহম্ রায়কে দেখে চমকে উঠেছে। হঠাৎ তার মুখের চেহারায় ভয়, বিস্ময়, ঘৃণা, সব কিছুর মিলিত চিহ্ন ফুটে উঠলো।

—আপনি ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ, তোমার খোঁজেই এসেছিলুম। তুমি ছিলে না তাই তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই বসে আছি। সেদিন শ্মশানে যাচ্ছিলে তুমি—তখন তোমার মনের অবস্থা খারাপ ছিল, তাই তুমি আমার দেওয়া একশো টাকার নোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে। আজ তাই ভাবলুম হয়তো এখন তোমার রাগ কমেছে—

মহিলাটি এবার বললে—এই দেখ, শম্পাকে ইনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে গেলেন—

শম্পা বলে উঠলো—হ্যাঁ বাবা, আমি এই টাকা দিয়ে দুধ, মাছ, ফল—আমার যা ইচ্ছে তাই কিনে খাবো—

হঠাৎ কেদার একটা কাণ্ড করে বসলো। শম্পার হাত থেকে পাঁচ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিলটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিলে। আর তারপর বাণ্ডিলটা জ্বলন্ত উনুনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

· এ কী করলে ? এ কী করলে ?

কেদার বলে উঠলো—বেশ করেছি নোটগুলো পুড়িয়ে দিয়েছি। ও তো সব পাপের টাকা। ও-টাকা ছোঁয়াও পাপ—

সোহমের মুখ দিয়ে শুধু বেরোল—পাপের টাকা '

কেদার বলে উঠলো—পাপের টাকা নয় তো কী ? ভেবেছেন আমি কিছু জানি না ? আপনি ইব্রাহিম্ সাহেবকে নিজের বউএর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে দিয়ে

ওয়েলফেয়ার অফিসারের পোস্টে প্রোমোশন পাননি ? নিজের বউকে আপনি ক্লাবে নিয়ে গিয়ে জোর করে মদ খাওয়া শিখিয়ে দেননি ? আর শুধু তাই-ই নয়, আপনি ভানুভাই প্যাটেলকে বাড়িতে রেখে বউএর সঙ্গে মদ খেতে দিয়ে একলা নিজে হোটেলে গিয়ে রাত কাটাননি ? আর সেই বউএর কাছে ভানুভাই প্যাটেলকে বাড়িতে রেখে এক বছরের জন্যে লোক-দেখানো মার্কেট সার্ভে করতে ইরাকে গিয়ে কোম্পানির কোটি কোটি টাকা প্রফিট করিয়ে দেওয়ার ফলে নিজে কোম্পানির ডিরেক্টার হননি ? বলুন, সব সত্যি কিনা, বলুন বলুন ?

সমস্ত বৈষ্ণবঘাটা অঞ্চলটা যেন তখন কেদার সান্যালের কথার প্রতিধ্বনি করে উঠলো—বলুন ? বলুন সত্যি কিনা, বলুন ?

কেদার সান্যাল তখনও বলতে লাগলো—আর মিস্টার কোঠারি এখন আপনার সেই বউকে নার্সিং-হোম থেকে নিয়ে পালিয়ে যায়নি ? আপনার মেয়ে শম্পাকে আপনার বাড়ি থেকে নিয়ে চলে যায়নি ? বলুন, বলুন, সত্যি কিনা বলুন, বলুন ? এখন আপনি এসেছেন আমার শম্পাকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে ! ও তো পাপের টাকা, ও টাকা তো ছোঁয়াও পাপ—

সোহম্‌ বলতে গেল—শোন কেদার, শোনো—

কেদার সান্যাল নিজেই তখন পাঁচ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিলটার মতো জ্বলেপুড়ে মরছে। চিৎকার করে বলে উঠলো—যান, বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে, নইলে জুতো পেটা করে আপনাকে এখখুনি বাড়ির বার করে দেব যান বেরিয়ে যান—

আর সেই চিৎকারে সোহমের ঘুম ভেঙে গেছে। এ কোথায় সে শুয়ে আছে ? কোথায় বৈষ্ণবঘাটা ? কোথায় সেই কেদার সান্যাল ? কোথায় সেই কেদারের দিদি ? কোথায় সেই শম্পা ! আর কোথায় বা সেই জ্বলন্ত উনুন !

আশ্চর্য, এমন স্বপ্নই বা সে দেখতে গেল কেন ? আশেপাশে চেয়ে দেখলে। পাশে বরাবর শম্পা শুয়ে থাকতো। সেও আজ নেই। সুমিত্রাও বাড়িতে নেই। সমস্ত বাড়িটাই যেন জ্বলন্ত উনুন হয়ে উঠেছে। আর সেই জ্বলন্ত উনুনের ওপর সেই পাঁচ হাজার টাকার নোটের বাণ্ডিলের মতো সে নিজেই তখন দাউ দাউ করে পুড়ছে—

মানুষ যখন জন্মায়, তখন থেকেই তার যাত্রা শুরু হয়। যখন কেউ যাত্রা করতে শুরু করে তখন তার একটা গন্তব্যস্থলও নির্দিষ্ট করা থাকে। কেউ চায় কলকাতায় যেতে, কেউ চায় বোম্বাই যেতে, কেউ চায় ইংলণ্ড আমেরিকা জার্মানী যেতে। অনেকে আবার বিশ্বও ভ্রমণ করতে বেরোয়।

কিন্তু সকলে কি তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারে ? বেশির ভাগ লোকই

তো মাঝপথে থেমে যায়। নানা প্রলোভন এসে তাকে পথভ্রষ্ট করে। তখন যে টাকা চায় সাধারণতঃ সে টাকার গোলকধাঁধায় জড়িয়ে পড়ে টাকাও হারায় আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও হারায়। যে খ্যাতি চায় সে বেশির ভাগ সময়ে মিথ্যে সম্মানের আকর্ষণে কাঙালপনাতেই গন্তব্যস্থলে পেঁছতে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়।

আর কর্ম?

ক্ষেত্রবাবুর কথাই এখন মনে পড়ছে। কতকাল আগের সেই ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলো এখন এই রাত বারোটার সময় মনে পড়ছে।

একজন ছেলে জিজ্ঞেস করেছিল—যদি টাকা না চাই, খ্যাতিও না চাই, তাহলে কোনটা চাইবো স্যার?

ক্ষেত্রবাবু বলেছিলেন—চাইবে কাজ। যাকে আমাদের ঋষিরা বলেছেন কর্ম। কর্মই মুক্তি। এই কর্ম বা কাজকে আদর্শ করতে হলে নিয়মকে মানতে হবে। এই নিয়ম না মানলে তোমরা আনন্দও পাবে না। নিয়ম না মেনে যারা আনন্দ পেতে চায় তারা মদ খেয়ে মাতলামিকেই চরম আনন্দ বলে মনে করে। তোমরা নিশ্চয়ই মাতালদের মদ খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে দেখেছ—কিন্তু সেটা কি আনন্দ? সে-রকম আনন্দতে অবসাদ আছে, স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা আছে। কিন্তু নিয়ম মেনে যে আনন্দ মানুষ পায় তা-ই শুভ—নিয়ম শৃঙ্খল নয়, নিয়মই হল মুক্তি—আমাদের জীবনই শুধু নয়, আমাদের এই পৃথিবীটাও তো নিয়ম মেনে চলছে বলেই এখনও এটা ধ্বংস হয় নি।

তখন কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর এ-সব কথার মানে বোঝেনি সোহম্। এখনও যে বুঝেছে তা নয়। এখনও কি কেউ এ-কথার মানে বোঝে? ইব্রাহিম তো এখন লেবার-লীডারি করে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছে। সে তো বেশ সুখেই আছে এখনও। ভানুভাই প্যাটেলও এ-সব না মেনেই কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পেরেছিল। সেও তো সারাজীবন সুখেই কাটিয়েছিল। কিন্তু আজ তাহলে সোহমের একলারই বা এ দুর্দশা হলো কেন?

বদ্যিনাথের পায়ের আওয়াজ পেয়ে সোহম্ উঠে বসলো। বদ্যিনাথ গরম চায়ের পেয়ালা এনে হাজির করেছে। কিন্তু সেই একই চা যেন তখন তার জিভে বিস্বাদ লাগলো।

—তবে যদি কিছু চাইতেই হয় তো তোমরা চাইবে একটা জিনিস, সেটার নাম হচ্ছে বৈরাগ্য। ইংরিজী ভাষায় যাকে বলা হয় ডিট্যাচমেন্ট্। জীবনে ভোগ করতে নিষেধ নেই, কিন্তু নিরাসক্ত হয়ে ভোগ করবে।

—হ্যাঁ রে বদ্যিনাথ, চা'তে চিনি দিসনি নাকি? এত তেতো লাগছে কেন?

বদ্যিনাথ বললে—চিনি দিয়েছি তো! দু'চামচে চিনি দিয়েছি। আর চিনি দেব?

তাহলে শম্পা নেই বলেই বোধ হয় তার জিভটা তেতো হয়ে গেছে। শম্পাই বোধ হয় তার এই অশান্তির প্রধান কারণ। আসলে সুমিত্রার চেয়ে শম্পাই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

সোহম্ চা'টায় আর চুমুক দিলে না। চারিদিকে চেয়ে দেখে নিলে আর

একবার। দেওয়ালে টাঙানো শম্পার ছবিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগলো। অন্য বাড়িতে গিয়ে শম্পা কি তাকে একেবারে ভুলে যাবে? অথচ এ-বাড়িতে যতদিন সে ছিল ততদিন সোহম্‌কে না দেখতে পেলে তো সব সময়ে ছট্‌ফট করতো। অনেক দিন অফিসে যেতেই দিত না। বলতো—কোথায় যাচ্ছো তুমি পাপ্পা?

সোহম্‌ বলতো—আমি এখন অফিসে যাবো—

শম্পা বলতো—না, তোমাকে অফিসে যেতে হবে না—

সোহম্‌ তাকে ভোলাবার চেষ্টা করতো। তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতো, চুমু খেতো, স্তোকবাক্য শোনাতো। বলতো—ছিঃ, ও-রকম কোরো না। ও-রকম করতে নেই। আমি অফিসে না গেলে টাকা কোত্থেকে আসবে?

শম্পা বলতো—আমি টাকা চাই না, আমি তোমাকে চাই। তুমি বাড়িতে থাকো—

সোহম্‌ বলতো—কিন্তু টাকা না হলে তোমার খেল্‌না কী দিয়ে কিনবো?

শম্পা বলতো—আমার খেল্‌নার দরকার নেই, আমি খেল্‌না চাই না। আমি তোমাকে চাই—

সে যে কী বিড়ম্বনা ছিল তখন সোহমের! শেষকালে মিথ্যে কথা বলতে হতো মেয়েকে। বলতে হতো—আজকে আমাকে যেতে দাও লক্ষ্মীটি, কাল থেকে আর আমি অফিসে যাবো না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—

শেষকালে কিছুটা শান্ত হতো শম্পা। বলতো—ঠিক আছে, তাহলে আজ তুমি যাও, কালকে কিন্তু আর তোমাকে অফিসে যেতে দেব না—

—না না, কাল আমি আর অফিসে যাবোই না। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—

কিন্তু তার পরের দিন আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেদিনও সোহম্‌ বলতো—আজ আমি অফিসে যাই, কাল থেকে আমি আর অফিসে যাবো না—

শম্পা বলতো—না, তুমি রোজ রোজ আমাকে ঠকাও, রোজ রোজ তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলো। তুমি আজ অফিসে যেতে পারবে না—

শেষকালে বাসন্তিয়া শম্পাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্য দিকে নিয়ে যেতো। আর সেই ফাঁকে সোহম্‌ তাড়াতাড়ি অফিসের পোশাক পরে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো। আর তারপর সারাদিন ধরে যতক্ষণ পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে না পড়তো ততক্ষণ তাকে আর শান্ত রাখা যেতো না। বাসন্তিয়া তাকে কতভাবে ভোলাবার চেষ্টা করতো, তবু তার বাবার অনুপস্থিতি সে ভুলতে পারতো না। কেঁদে কেঁদে বাড়ি মাত্‌ করে দিত। তার কান্নার চোটে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠতো। অথচ সুমিত্রার জন্যে তার কখনও কোনও অভাব-বোধ ছিল না। সুমিত্রা যখন তার নিজের ঘরে কুলকার্নি বা কোঠারির সঙ্গে মদের আড্ডায় মশগুল থাকতো, শম্পা সেখানে গিয়ে তাদের বিরক্ত করতো না। সোহম্‌ই ছিল একাধারে তার বাবা আর মা দুই-ই।

সুমিত্রা যখন এ-বাড়ি ছেড়ে গেল, তখনও শম্পার কোনও বিকার নেই, কোনও

প্রশ্ন বা অভাব-বোধ নেই। একবারও সে জিজ্ঞেস করতো না—মাম্মি কোথায় রে বাসন্তী ?

এখন যেন বেশি করে শম্পার কথা মনে পড়তে লাগলো। কিন্তু কারো অভাবে পৃথিবী তো থেমে থাকবে না। সে ঠিক তার নিয়ম মেনেই ঠিক এগিয়ে যাবে। এতদিন কত বড় বড় মহাপুরুষ সব সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু পৃথিবী তো থেমে যায়নি। সে তার নিয়ম মেনে তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে। সুমিত্রার চলে যাওয়াতে যেমন সংসার আটকে থাকেনি, শম্পা চলে যাওয়াতেও তেমনি পৃথিবী আটকে থাকছে না।

অফিসে যেতেই একবার মিস্টার সেন ডেকে পাঠালেন।

সোহম্ যেতেই মিস্টার সেন জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মিসেস কেমন আছেন, রায় ?

সোহম্ বললে—ভালো—

—'ফ্লাওয়ার-বোকে' পেয়ে কী বললেন তিনি ? খুশী হলেন ?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ—

—আর তোমার বেবি ? সে এতদিন পরে মা'কে পেয়ে খুশী তো ?

—হ্যাঁ—

সব প্রশ্নগুলোই সোহমের বুকে গিয়ে বিষের তীরের মত বিঁধছিল। মিস্টার সেন তো জানেন না যে সোহম্ তার চাকরির উন্নতির জন্যে, কোম্পানির প্রফিট বাড়াবার জন্যে কত রক্ত আহুতি দিয়েছে ! সে-কথা তো মুখ-ফুটে বলা যায় না, বাইরের লোকদের সে-কথা না জানানোই তো নিয়ম।

মিস্টার সেন হঠাৎ বললেন—এখন তো ইয়ার-ক্লোজিং হয়ে গেছে। তুমি কি কিছুদিন ফ্যামিলি নিয়ে কোথাও চেঞ্জে যেতে চাও ? আমাদের তো সব জায়গায় 'হলিডে-হোম' রয়েছে। যাও না, কিছুদিন রেস্ট্ নিয়ে এসো না।

ছুটি ! সোহমের শরীরের কাটা ঘায়ের ওপর যেন নুনের ছিটে পড়লো।

বললে - তার দরকার হবে না স্যার এখন—

মিস্টার সেন বললেন বোম্বে অফিসের মিস্টার আয়েঙ্গার আমাকে সেই কথাই লিখেছেন। লিখেছেন—মিস্টার রায় যদি কোথাও ছুটি নিয়ে বেড়াতে যেতে চান তো তাঁকে যেন ছুটি গ্র্যাণ্ট্ করা হয়। তার সব খরচ কোম্পানির—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আমি তোমার সম্বন্ধে খুব হাইলি সার্টিফাই করে তাঁকে লিখেছিলুম। সেই চিঠির উত্তরেই তিনি এই কথা লিখেছেন। আর আরো একটা কথা, তুমি যদি চাও তাহলে ইণ্ডিয়ার বাইরেও কোথাও যেতে পারো—যেমন ধরো নিউ-ইয়র্ক, লণ্ডন, বার্লিন কিম্বা প্যারিস। যে-কোনও জায়গায়। গিয়ে এক মাস দু' মাস ছুটি কাটিয়ে আসতে পারো তোমার ফ্যামিলি নিয়ে। কোম্পানি উইল্ বেয়ার অল্ দ্য কস্ট্। কোম্পানি তোমার সমস্ত খরচ দেবে—

সোহমের শরীরের কাটা ঘায়ের ওপর যেন আরো নুন ছিটিয়ে দিলেন মিস্টার সেন।

সোহম্ ভেতরে ভেতরে আগুনে পুড়লেও, বাইরে মিস্টার সেন তা কিছুই জানতে পারলেন না।

এককালে এই 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাকসন্ কোম্পানি'র মালিক ছিল ইংরেজ। ইংরেজরা তখন আরাম করবার জন্যে বছরে এক মাস কি দু' মাস ছুটি নিয়ে 'হোমে' ঘুরে আসতো। সেটা ছিল কোম্পানির 'সার্ভিস-কোডে'র মতো। এখন কোম্পানির দিশী-মালিকানা হয়েছে। তাই বোধ হয় পুরনো 'কোড্' বিশেষ কারণে সোহমের ওপরে চালানো হচ্ছে। এটা তার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ 'ফেবার' দেখাবার মত।

সোহমের মুখে একটা কুটিল ব্যঙ্গের হাসি ফুটে বেরোতে যাচ্ছিল, কিন্তু অনেক কষ্টে সে সেটাকে চেপে রেখে দিলে। মুখে বললে—না স্যার, আমার এখন ছুটির দরকার নেই—

মিস্টার সেন বললেন—কেন ? তুমি আপত্তি করছো কেন ? তোমার বিশ্রামের দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার ফ্যামিলি ? তোমার ফ্যামিলিরও তো একটু আরাম দরকার। তাদের সবাইকে নিয়ে তুমি কোথাও ঘুরে এসো না কয়েক মাস—

মিস্টার সেন বার-বার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। যেন সোহমের ফ্যামিলির জন্যে মিস্টার সেনেরই বেশি গরজ। সোহম্ কোম্পানির জন্যে যা হারিয়েছে কোম্পানি যেন তার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে ! কিন্তু কিছু টাকা খরচ করেই কি তার ক্ষতিপূরণ হয় ?

সে-কথা কে বুঝবে আর কে বোঝাবে ! তা যদি বোঝাতে পারা যেতো তো তাহলে পৃথিবীর চেহারাটা তো অন্য রকম হয়ে যেতো।

সেই ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলোই যেন তখন আকাশে-বাতাসে আবার গুঞ্জন করে উঠলো—চাইতে হলে চাইবে ডিট্যাচমেণ্ট্—চাইবে নিরাসক্তি। পৃথিবী তোমার টাকা চুরি করে নিতে পারে, তোমার খ্যাতি কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু তোমার নিরাসক্তির যে আনন্দ, সেই আনন্দ কি কেউ কেড়ে নিতে পারে ? কিন্তু তুমি তো তা চাওনি।

সোহমেরও মনে হলো, সত্যিই তো, সে তো তা চায়নি।

শেষ পর্যন্ত সোহমকে জোর করে ছুটি নেওয়ালেন মিস্টার সেন। ছুটি অবশ্য নিলে সোহম্। কিন্তু ছুটি নিয়ে কোথায় সে যাবে ?

তখন সোহমের টাকারও অভাব নেই, সময়েরও অভাব নেই।

তারপর একদিন সোহম্ ট্রেনের টিকিট কেটে বসলো। সোজা গিয়ে উঠলো মধ্যপ্রদেশের ভুপালে। ভুপালের পাহাড়ের ওপর রেস্ট্-হাউস। একটু বাইরে বেরোলেই ভুপাল-তাল। সেখানকার সেক্রেটারিয়েটেই চাকরি করতো তার পিসতুতো দাদা—কথাটা মনে ছিল না। কথাটা মনে পড়তেই ভুপাল ছেড়ে চলে গেল উজ্জয়িনী। তারপর উজ্জয়িনী ছেড়ে ইন্দোর। ইন্দোর থেকে রাজস্থান। আজমীরের সারকিট্ হাউসেও বেশ কিছুদিন কাটলো। তারপর আর সেখানে থাকতে ভালো লাগলো না। সেখান থেকে আবার দিল্লী। দিল্লী থেকে

মাদ্রাজ। মাদ্রাজ থেকে ব্যাঙ্গালোর, মাইসোর আর তারপর হায়দ্রাবাদ।

তারপরে আর মনে নেই। যেখানেই সোহম্ যায় সেখানেই পেছু নেয় শম্পা। শম্পা যেন তাকে নিশ্চিন্তে কোথাও থাকতে দেবে না কখনও।

কোথা দিয়ে যে সময় ফুরিয়ে গেল তা ঠিক বোঝা গেল না।

তারপর আবার একদিন কলকাতা। কলকাতা মানে হাওড়া স্টেশন।

সেই হাওড়া স্টেশনেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। ভীষণ একটা দুর্ঘটনা।

হাওড়া স্টেশনে এসে মেল্-ট্রেনটা পৌঁছতেই সমস্ত শ্রেণীর যাত্রীরা প্ল্যাট ফরমের ওপর নেমে যার-যার মালপত্র ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে চলতে লাগলো। চারদিকে চলমান মানুষের ভিড়।

হঠাৎ একটা ছোট্ট মেয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো—পাম্পা, তুমি কোথায় ছিলে এ্যাত দিন, পাম্পা।

প্রথমে তো সোহমের বিশ্বাসই হয়নি। এ যে শম্পা! শম্পা এখানে কী করে এল? কোথায় ছিল সে? এই হাওড়া স্টেশনে সে কার সঙ্গে এল হঠাৎ?

—পাম্পা, তুমি কোথায় ছিলে এ্যাত দিন···

হঠাৎ আর এক কাণ্ড ঘটলো। দূর থেকে একজন মহিলার গলা শোনা গেল—

—শম্পা, চলে এসো, চলে এসো, কুইক্—

সোহম্ সেই দিকে চেয়ে দেখলে দূরে সুমিত্রা দাঁড়িয়ে। আর তার পাশেই আর একজন অবাঙালী ভদ্রলোক।

—চলে এসো শম্পা, চলে এসো—

শম্পা তখন সোহম্‌কে জড়িয়ে ধরেছে। বললে—না, আমি পাম্পার সঙ্গে থাকবো। পাম্পা, তুমি আমাকে যেতে দিও না, আমি তোমার কাছে থাকবো—

এবার সুমিত্রা নিজেই সোহমের দিকে জোরে জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে এলো। তারপর শম্পার একটা হাত ধরে এক টান দিলে। সেই টানে শম্পা ছিটকে গিয়ে মুখ-থুবড়ে পড়লো প্ল্যাটফরমের ওপর। কিন্তু পড়বার আগেই তাকে আর একজন প্যাসেঞ্জার ধরে ফেলেছে।

সুমিত্রা সেই অবস্থাতেই তাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলতে লাগলো।

শম্পা তখনও চেষ্টা করতে লাগলো, মাথা ঘুরিয়ে সোহম্‌কে দেখবার জন্যে। আর একভাবে কাঁদতে লাগলো—আমি পাম্পার কাছে যাবো—পাম্পা, ও পাম্পা, আমি তোমার কাছে যাবো, ও পাম্পা···

আর তারপর একসময়ে তারা সবাই যাত্রীদের স্রোতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু তখনও সমস্ত ব্যস্ততা সমস্ত কলরব ছাপিয়ে শম্পার সেই কান্নার শব্দ সোহমের কানে ভেসে আসতে লাগলো—পাম্পা, আমি তোমার কাছে থাকবো, পাম্পা আমি তোমার কাছে থাকবো, পাম্পা···

তখনই যেন ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলো আবার কানে বাজতে লাগলো—চাইতে হলে কেবল চাইবে ডিট্যাচ্‌মেণ্ট্, চাইবে নিরাসক্তি। তোমার টাকা চোরে চুরি করে নিতে পারবে, তোমার খ্যাতিও চুরি করে নিতে পারবে চোরে কিন্তু নিরাসক্তি··

নিরাসক্তির যে আনন্দ…সে আনন্দ…

—মশাই, এই বইটা আপনার মেয়ের…?

কার গলার আওয়াজে যেন সোহমের ঘুম ভাঙলো। সে যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। দেখতে পেলে সামনে এক অচেনা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে তার দিকে একটা ছোট ছবির বই এগিয়ে দিচ্ছে—

ভদ্রলোক আবার বললেন—আমরা একই প্লেনে এসেছি দমদম থেকে, আপনার মেয়ে এই ছবির বইটা ভুলে ফেলে গিয়েছিল। নিন্—

সোহম্ বললে—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ—

বলে বইটা নিতেই ভদ্রলোক নিজের পরিবার আর মালপত্র সামলাতে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

সোহম্ও চলতে চলতে বইটা দেখলে। একটা বড় ছবির বই। বইটার নাম 'ড্রিমল্যাণ্ড', ইংরিজী ভাষায় লেখা ছবির বই।

বইটার ভেতরের প্রথম পাতায় লেখা—শম্পার জন্মদিনের উপহার—

নিচেয় উপহার-দাতার নাম ঠিকানা লেখা রয়েছে—সুমিত্রা কোঠারি। ২০৫এ, জি ব্লক। নিউ আলিপুর। কলকাতা।

সোহম্ তখন জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে। শম্পার জন্মদিনের উপহার। সুমিত্রা কোঠারি। ২০৫এ, জি ব্লক। নিউ আলিপুর। কলকাতা।

ড্রিমল্যাণ্ড্! ড্রিমল্যাণ্ড! সোহমের মনে হলো—পৃথিবীটা সত্যিই একটা ড্রিমল্যাণ্ড। ড্রিমল্যাণ্ডই বটে সোহমের এই পৃথিবীটা।

তেতাল্লিশ হাজার সাতশো একান্ন টাকার শাস্তির খড়্গ যেন তখন তার মাথার ওপর ঝুলতে লাগলো। এ-বইটা দিয়ে এখন সে কী করবে?

সেই ছোট্ট ছবির বইটা নিয়ে সোহম্ আবার চলতে চলতে পড়তে লাগলো। বাইরের কার ওয়েতে তার ড্রাইভার গোবিন্দ গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গোবিন্দ সব জানে। গাড়ি কেনার সময় থেকেই সে সোহমের কাছে আছে। কিন্তু গোবিন্দরাও তো মানুষ। তাদেরও তো বউ ছেলে মেয়ে নিশ্চয়ই আছে। তারা জানতে পেরেছে যে তাদের সাহেবের এক বন্ধু সাহেবের বউ আর তার মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। তবু গোবিন্দদের মুখে-চোখে কোনও বিকার থাকতে নেই। তারা সংসারে নির্জীব প্রাণী। সাহেব যেমন হুকুম করবে তেমনি তারা তা তামিল করবে। তার বেশি কৌতূহল তাদের থাকতে নেই। এই গাড়িতে করেই সে কত রাতে সাহেব আর মেমসাহেবকে মাতাল অবস্থায় বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তার জন্যে তারা কখনও সেদিকে কানও দেয়নি। তাদের সঙ্গে সাহেবের মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক। মনিবের

জীবন বা চরিত্র নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কোন ভৃত্যেরই নেই। ড্রাইভারদের মানুষ হতে নেই, হতে হয় রোবোট।

গোবিন্দ নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছে। কিন্তু সোহমের কোনও দিকে খেয়াল নেই। সে জানে গোবিন্দ প্রভুভক্ত চাকর। সে ঠিক ভিড় এড়িয়ে দুর্ঘটনা বাঁচিয়ে গাড়ি নিয়ে তাকে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেবে। সে তার কর্তব্য ঠিকমতো পালন করে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

কিন্তু সোহমের নিজেরও কি কোনও কর্তব্য নেই? সোহম্ কি জীবনে কখনও তার নিজের কোনও কর্তব্য পালন করেছে? সে নিজেও তো একজন ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যেমন একজন ভৃত্য, তেমনি তার মনিব মিস্টার সেনও তো একজন ভৃত্য। শুধু মিস্টার সেনই যে একজন ভৃত্য তাও তো নয়, মিস্টার সেনের যিনি প্রভু সেই মিস্টার আয়েঙ্গারও তো একজন ভৃত্য বই আর কিছু নয়।

তাহলে প্রভু কে?

বহুদিন বহুকাল আগে বাদশাহ্ আকবর শুনতে পেলেন যে তাঁরই সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন একজন প্রজা আছে যাকে সবাই খুব শ্রদ্ধা করে ভক্তি করে। কিন্তু লোকটা নাকি খুবই গরীব। দু'বেলা ভালো করে নাকি খেতেও পায় না। অত গরীব লোককে লোকে কেন ভক্তি করে? কারণটা কী?

কারণটা হচ্ছে লোকটার নাকি কোনও লোভ নেই। টাকার লোভও নেই, খাওয়ার লোভও নেই। পৃথিবীর কোনও জিনিসের ওপরেই নাকি তার লোভ নেই।

কথাটা বাদশার কাছে ভালো লাগলো না। এমন মানুষ তাঁর দেশে থাকা তো ভালো কথা নয়। তিনি ঠিক করলেন তাকে তিনি পয়সা দিয়ে কিনে নেবেন। পয়সা দিয়ে কীই বা না কেনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেয়াদা পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে। লিখে দিলেন—তোমাকে আমি মনসবদারি দেব, তুমি আমার কাছে এসো—

পেয়াদা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এল।

বাদশা জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? লোকটা এল না?

পেয়াদা বললে—না জাঁহাপনা—

—কেন? আমার পরোয়ানা পেয়েও সে এল না? তুই আমার চিঠিটা তাকে দিয়েছিলি?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা—

—তবু এল না? এত বড় বেয়াদপ্? আমার চিঠি পেয়ে পড়েছে?

—হ্যাঁ জাঁহাপনা। পড়ে এই চিঠিটা আমার হাতে দিলে।

—দেখি কী লিখেছে?

বাদশা আবার চিঠিটা পড়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে:

ম্যায় চাকর রঘুনাথকে, পটো লিখো দরবার।
তুলসী অব কা হইঙ্গে নর কি মনসবদার॥

চিঠিটার ভাবার্থ হলো—আমি রামের কাছে দাসত্বের পাট্টা লিখে দিয়েছি, আমি রামের কাছে চাকরি করছি। এখন কি আর আমি মানুষের চাকর হতে পারি ?

চিঠিটার নিচে নাম সই করে দিয়েছে লোকটা—তুলসীদাস।

সোহমের মনে হলো তুলসীদাস ছাড়া পৃথিবীর আর সবাই চাকর। আমি চাকর, মিস্টার সেন চাকর, মিস্টার আয়েঙ্গার চাকর। আমার বদ্যিনাথ, আমার বাসন্তিয়া, আমার গোবিন্দ, সবাই চাকর। দেশের মানুষ সবাই চাকর। এমন কি দেশের প্রাইম মিনিস্টার, দেশের প্রেসিডেণ্ট, তারাও সবাই চাকর। তা সবাই-ই যদি চাকর হয় তাহলে প্রভু কে ?

সোহমের এতদিন পরে মনে হলো একমাত্র রামই বোধহয় বিশ্ব-সংসারে সকলেরই প্রভু। একমাত্র রামই বোধহয় জগদীশ্বর ! অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে ধারণা করেছিল টাকাই হচ্ছে সকলের একমাত্র প্রভু।

সেদিন বাড়িতে গিয়ে সোহম্ তার আলমারিটা খুললে। ব্যাঙ্কের কাগজ-পত্র-টত্র যা-কিছু সব সেই আলমারির ভেতরেই থাকে। সেই আলমারির ভেতরেই থাকে তার যথাসর্বস্ব। যথাসর্বস্ব মানে যাকে সংসারী লোক সব চেয়ে মূল্যবান বলে তাই। এতকাল শম্পাই ছিল তার কাছে যথাসর্বস্ব। এখন সেও আর তার নয়। এখন সোহম্ একেবারে নিঃস্ব। শম্পা নেই, সুতরাং আজ আর কেউ নেই তার, আজ কিছু নেই সোহমের। আছে শুধু টাকা। মানুষের জীবনের সবচেয়ে দরকারী আর সবচেয়ে তুচ্ছ জিনিস !

কাগজ-পত্রগুলো সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। জমার খাতায় তার কত টাকা আছে ? কত টাকার সম্পত্তির সে মালিক ?

সোহম্ একটা কাগজে অঙ্ক কষতে লাগলো। কত যোগ, কত বিয়োগ, কত গুণ, কত ভাগ। কত ডেবিট কত ক্রেডিট। কত শেয়ার, কত ডিবেঞ্চার, কত বণ্ড্। কত ইণ্টারেস্ট, কত ডিভিডেণ্ড। রাত বাড়তে লাগলো হু-হু করে। রাত আস্তে আস্তে আরো গভীর হতে লাগলো, অন্ধকার আরো গাঢ় হতে লাগলো ধীরে ধীরে। তারপর অন্ধকার পাতলা হতে লাগলো ক্রমে ক্রমে। তখনও সোহমের অঙ্ক কষা শেষ হলো না। তখনও হিসেব শেষ হয়নি। নতুন চাকর ভুষণ আগের রাতে খাবার দিয়ে গিয়েছিল। সাহেব বলেছিল—'তুই খাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখে যা, আমি পরে খাবো'খন।' কিন্তু সকালবেলা সে যখন আবার ঘুম থেকে উঠে সাহেবের ঘরে এল তখন দেখলে খাবার যেমন ভাবে সে ঢেকে রেখে দিয়ে গিয়েছিল তেমনি ভাবেই ঢাকা পড়ে আছে। সাহেব খায়নি। সাহেব আগের রাত্রে সেই যে কাগজ-পত্র নিয়ে লেখা-পড়া করতে শুরু করেছিল তেমনি করেই লেখা-পড়া করে চলেছে।

ভুষণ একবার জিজ্ঞেস করলে—খাবার খান্‌নি হুজুর ?

তখন যেন সাহেবের হুঁশ হলো। বললে—আমি খেতে ভুলে গিয়েছি, ওটা তুই খেয়ে নিগে যা, আর নয়তো রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আয়—

বলে সাহেব আবার নিজের হিসেব-পত্রের কাজে ডুবে গেল। এত জরুরী কাজ

সাহেবের কোথা থেকে এসে ঘাড়ে চাপলো কে জানে! এমন তো আগে কখনও হয়নি!

সোহম্ তখনও যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে চলেছে। অংকের সংখ্যা তখন কেবল উর্ধ্বগতির দিকেই এগিয়ে চলেছে। এক লাখ, দু'লাখ থেকে আরম্ভ করে দশ লাখ কুড়ি লাখে গিয়ে পৌঁছিয়েছে। তারপর তিরিশ লাখ। তারপর চল্লিশ লাখ। তারপর পঞ্চাশ লাখ। তারপর ষাট সত্তোর আশীলাখ। তারপর নব্বই······

টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাকসন্ কোম্পানির অফিসে মিস্টার এন্. বি সেন প্রতিদিনকার মতো তাঁর নিজের কামরায় বসে ফাইলগুলো পরীক্ষা করছিলেন। হেড্ অফিসের চিঠিগুলোই বরাবর আগে দেখেন তিনি। সেখান থেকে জরুরী চিঠি থাকলে সেইগুলোই তিনি প্রথম দেখেন। ডেস্‌প্যাচ্ সেকশান থেকেই চিঠিগুলো ফাইল-নম্বর মিলিয়ে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁর কাছে।

হঠাৎ একটা 'কন্‌ফিডেনশিয়াল্' মার্কা চিঠি হাতে এল। এসেছে বোম্বাই-এর হেড্ অফিস থেকে। ডেস্‌প্যাচ্-সেকশান তাই চিঠিটা খোলেনি।

মিস্টার সেন চিঠিটা নিজের হাতে খুললেন। তারপর চিঠিতে যা লেখা আছে তা পড়েই খুব খুশী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রায়কে টেলিফোন করলেন পাশের ঘরে। কেউ কোনও উত্তর দিলে না। ফোন্‌টা অনেকক্ষণ ধরে শুধু বেজেই গেল। তবে কি ফোন্‌টা খারাপ হয়ে গেছে?

বার বার ফোন্ করেও যখন জবাব পাওয়া গেল না তখন ঘণ্টা বাজিয়ে চাপরাসীকে ডাকলেন। চাপরাসী আসতেই বললেন—রায় সাহেবকো সেলাম দেও—

খানিক পরেই চাপরাসী ফিরে এসে বলল—রায় সাহেব আসেননি এখনও হুজুর—

কী হলো? কালকেই তো রায়ের কলকাতায় আসার কথা। তবে কি রায় বিশেষ কাজে বাইরে আটকে গেছে?

এক ঘণ্টা পরে আবার রায়ের ঘরে ফোন করলেন। তখনও রায়ের ঘর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

মিস্টার সেন বুঝলেন যে তাহলে তার ডিউটি সেরে রায় কাল কলকাতায় ফিরতে পারে নি।

বিকেলের দিকে হঠাৎ চাপরাসীর কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল মিস্টার রায় অফিসে এসেছেন।

—সাহাবকো সেলাম দেও—

সোহম্ তখনই এল মিস্টার সেনের ঘরে। রায়ের চেহারার দিকে চেয়ে মিস্টার সেন চমকে উঠেছেন।

—হোয়াটস্ আপ রায় ? কী হলো, তোমার শরীর খারাপ নাকি ? মিসেসের শরীর আবার খারাপ হলো নাকি ?

সোহমের মাথায় তখনও যন্ত্রণা হচ্ছিল। সে ভেবেছিল সেদিন সে অফিসে আসবে না। মাথার মধ্যে তখনও কেবল সেই ইণ্টারেস্ট ডিভিডেণ্ড্ শেয়ার বণ্ড আর ইন্‌ভেস্টমেণ্টের অংক ঘুরপাক খাচ্ছিল। এত টাকা এত সম্পত্তি নিয়ে সে যেন হিমসিম্ খাচ্ছিল তখনও। অংকের ডিজিটগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে কেবল উঁচুর দিকে উঠছে। সত্তোর লাখ···আশি লাখ···নব্বুই লাখ······

—কিন্তু তোমার চোখ-মুখ ও-রকম ফুলো ফুলো লাগছে কেন ? মিসেসের কি অসুখ ?

সোহম্ বললে—না, কোয়ায়েট অল্‌রাইট্ নাউ।

—সেই ফ্লাওয়ার বোকেটা দিয়েছিলে মিসেসকে ?

—হ্যাঁ—সেইদিনই দিয়েছি।

—কী বললেন তিনি ?

—বললেন ভেরি নাইস্। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সো গ্রেটফুল টু ইউ······

—আর বেবি ? তোমার সেই বেবি ?

—সেও খুব গ্লাড্ !

—কার মতো দেখতে হয়েছে সে ? তোমার মতন, না মিসেসের মতন ?

সোহম্ বললে—মিসেসের মতো—

তুরুপের তাসটা তখন চিৎ করলেন মিস্টার সেন। বললেন—হিয়ার ইজ্ এ ভেরি গুড্ নিউজ ফর ইউ। একটা ভালো খবর আছে তোমার জন্যে। খুব ভালো খবর। নাও, হেড অফিসের এই চিঠিটা পড়ে দেখ—

সোহম্ চিঠিটা আদ্যোপান্ত পড়লে। হেড অফিস থেকে মিস্টার আয়েঙ্গার লিখেছেন তাঁদের 'বোর্ড' অব্ ডিরেক্টর্সে''র মিটিং-এ একটা রেজোলিউশন পাস করা হয়েছে যে এখন থেকে মিস্টার সোহম্ রায়কে একজন অন্যতম ডিরেক্টর হিসেবে নির্বাচিত করা হলো। কারণটা কী, না এই সালে কোম্পানির যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে তার পেছনে মিস্টার সোহম্ রায়ের উদ্যম, পরিশ্রম এবং ত্যাগ। এই উদ্যম পরিশ্রম আর ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁকে এই সম্মান জানিয়ে কোম্পানি কৃতার্থ হলো। তার জন্যে মাসে মাসে তাকে স্যালারি হিসেবে আরো দু হাজার টাকা করে দেওয়া হবে—আর তার সঙ্গে দেওয়া হবে প্রফিটের কোয়ার্টার পারসেণ্ট কমিশন।

তখনও মিস্টার রায় মাথা নিচু করে আছে দেখে মিস্টার সেন জিজ্ঞেস করলেন —আর ইউ গ্ল্যাড্ রায় ? তুমি খুশী তো ?

তবু রায়ের মুখ নিচু হয়ে রয়েছে দেখে মিস্টার সেন বললেন—কী ? কথা বলছো না যে ? খুব আনন্দ হয়েছে তো ?

মিস্টার সেন দেখলেন রায়ের চোখ থেকে এক ফোঁটা জল টপ্ করে চিঠিটার ওপর পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার সেন হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন

—আর তোমাকে আমার কোশ্চেনের রিপ্লাই দিতে হবে না। আর তোমাকে আমার কথার জবাব দিতে হবে না। আনন্দ হলেও অনেক সময়ে চোখ দিয়ে জল পড়ে। বি স্টেডী। অত সেণ্টিমেণ্টাল হতে হবে না তোমাকে। আমি আর তোমাকে এম্‌ব্যারাস্‌ করতে চাই না। যাও যাও, গো টু ইয়োর রুম। তুমি তোমার ঘরে যাও—

মিস্টার সেনের কথা শুনে সোহমের মনে হলো সবাই মিলে যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে। তাই সোহম্‌ সেদিন রুমাল দিয়ে তাড়াতাড়ি তার মুখ চোখ মুছে সোজা নিজের কামরায় চলে গিয়েছিল। তখন তার মনে পড়ছিল বহুদিন আগের মুখস্থ করা সেই কবিতার কয়েকটা লাইন—

শুনিয়াছি, তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতি পরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণ নেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা। তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ···

রাত তখন এগারোটা। আলিপুর পুলিস স্টেশনের ও-সি মানে বড়বাবু তখনও বিশেষ এক কারণে তাঁর চেয়ারে আসীন। বাইরের কম্পাউণ্ডে একটা গাড়ি থামার শব্দ হলো।

হঠাৎ দুজন মানুষ তাঁর ঘরে ঢুকলো।

—কী চাই বলুন?

—আমরা খুব বিপদে পড়েছি—

—বসুন। কী বিপদ আপনাদের?

—আমরা নিউ আলিপুরে থাকি। আমার নাম শ্রীধর কোঠারি। ইনি আমার মিসেস, মিসেস সুমিত্রা কোঠারি। আমাদের ঠিকানা দুশো পাঁচের-এ, জি ব্লক, নিউ আলিপুর। আমাদের বাড়ির চাবি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদের বাড়ির দরজাটা আপনাদের মাস্টার-কী দিয়ে খুলে দেন তো আমরা খুব গ্রেট্‌ফুল হবো।

পুলিস অফিসার জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা এখন কোথা থেকে আসছেন?

কোঠারি বললে—আমরা আমাদের বাড়ি থেকেই আসছি। সেখানে দরজার

তালা ভাঙবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পাড়ার লোকেরা শব্দ পেয়ে খুব গালাগালি দিচ্ছিল। পাশের বাড়ির লোকরা খুব বিরক্ত হচ্ছিল শব্দ শুনে। তাই থানায় এলুম যদি আপনি এর কোনও প্রতিকার করতে পারেন—

—আপনারা বাড়ির দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় ?

—সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।

পুলিশ অফিসার বললেন—তা সিনেমা তো রাত ন'টার সময়েই ভেঙে গিয়েছে। এখন তো রাত এগারোটা। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?

—একটা রেস্টুরেণ্টে খেতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বাড়িতে গিয়ে পকেটের চাবিটা কোথাও খুঁজে পেলাম না। তখন তালাটা ভাঙতে চেষ্টা করতে গিয়েই পাড়ার লোক সবাই গালাগালি দিতে লাগলো।

পুলিস অফিসার এতক্ষণ যা সন্দেহ করেছিলেন ঠিক তাই-ই। দেখলেন দু'-জনেই জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছেন। বোধহয় কোনও 'বার' থেকে মদ-টদ খেয়ে এসেছেন। মদের গন্ধও তাঁর নাকে এল।

এ ও-পাড়ায় এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। তাঁর কাছে মাস্টার-কী আছে, তা দিয়ে তিনি সব রকমের চাবিই খুলতে পারেন। এর আগেও এ-রকম ঘটনা আরো অনেকবার ঘটেছে। তিনি এ রকম কেসে সাধারণতঃ তাঁর এস-আই কেই পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এবারের ঘটনাটা যেন কেমন রহস্যজনক বলে মনে হলো। আজকালকার যুগে বাড়ি ছেড়ে যদি কোথাও বেরোতেই হয় তো বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তো কারো ওপর দিয়ে যেতে হয়। তাহলে কি বাড়িতে কোনও বিশ্বাসযোগ্য রিলেটিভ বা সার্ভেণ্ট নেই ? এত টাকা যাদের আছে তারা কি কোনও বিশ্বাসযোগ্য লোক পায় না ? এটাও কি বিশ্বাস করতে হবে ?

—আপনাদের কি নিজের বাড়ি, না আপনারা টেনেণ্ট ?

কোঠারি বললে—আমরা টেনেণ্ট—

—আচ্ছা চলুন—

বলে পুলিস অফিসার জিপে উঠে পড়লেন। মিস্টার কোঠারির গাড়িটা আগে আগে চলতে লাগলো নিউ আলিপুর লক্ষ্য করে। আর তাঁর জিপটা চলতে লাগলো তাঁদের পেছন পেছন।

গাড়ি চালাতে চালাতে আজ কত কথাই মনে পড়ছে। সামান্য নিউ আলিপুর থেকে ট্রিভোলি পার্ক পর্যন্ত এইটুকু রাস্তা আসতে এত সময়ই বা কেন লাগছে তার আজ ? এত কথাই বা তার কেন মনে পড়ছে ? কেন সে এত কথা ভাবছে ? অতীতের কথা ভাবতে কেনই বা তার আজ এত ভালো লাগছে ?

সত্যি, এ বড় আশ্চর্য ঘটনা! হাতের কাছেই তার অনেক কাগজপত্রের বাণ্ডিল রয়েছে। অনেক ব্যাঙ্কের পাসবই, অনেক শেয়ারের সার্টিফিকেট। এ সব সে জমিয়ে রেখেছিল কার জন্যে? কে এখন এ-সব টাকা খাবে? এ-টাকার মালিক কে হবে?

মেহের আলি বলেছিল—এ সব আপনার কাছে রেখে দিন রায় সাহেব, সব রুপেয়া আপকা কামমে আয়ে গা। আপনার বিবি আছে, আপনার লেড়কী আছে; উন্ লোগো কে লিয়ে আপকে পাশ রাখ দিজিয়ে—

মেহের আলি জীবনে স্টক্-এক্সচেঞ্জে ব্রোকারি করে সারাজীবনে যা-কিছু টাকা কামিয়েছিল সমস্ত এই রকম করে নামে-বেনামে কাগজপত্রে জমা রেখে দিয়েছিল। ভেবেছিল সে-সব টাকা ভবিষ্যতে তার বিবি আর তার লেড়কীর উপকারে আসবে। রায় সাহেবকেও সে সেই উপদেশ দিয়েছিল। সে বলেছিল—রায় সাহাব, দুনিয়াতে সব চেয়ে কিমতি চিজ্ হচ্ছে রুপাইয়া। ইস্ যুগমে রুপাইয়া হি হ্যায় ভগবান।

কিন্তু তারপর? তারপর সেই মেহের আলিরই বা কী করুণ পরিণতি হলো! তখন সে কেবল বলে বেড়াতো—সব ঝুট্ হ্যায়—সব ঝুট্…

আর একজনের কথাও মনে পড়লো সোহমের। তার সেই ইনকাম-ট্যাক্সের অ্যাড্ভাইসার। সোহম্ বরাবর টাকা কামাতে চাইতো জীবনে। টাকা কামাতে চাইলে ভালো করে অঙ্ক জানা থাকা চাই। সোহম্ ছাত্র-জীবনে সব বিষয়েই কাঁচা ছিল। কিন্তু সবচাইতে কাঁচা ছিল অঙ্কের ব্যাপারে। অঙ্কটা কিছুতেই মাথায় ঢুকতো না তার। তাই টাকার ব্যাপারে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতো শশীবাবুকে। এস বি বিশ্বাস। শশীভূষণ বিশ্বাস। অফিসের কাজের ব্যাপারে প্রায়ই সোহম্‌কে মিস্টার বিশ্বাসের বাড়িতে যেতে হতো।

সোহম্ কথায় কথায় একদিন মিস্টার বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করেছিল—আচ্ছা মিস্টার বিশ্বাস, হাতে টাকা এলে তা রাখা যায় কী করে? ব্যাঙ্কে?

মিস্টার বিশ্বাস বলেছিলেন—ব্যাঙ্কে কখনও রাখবেন না—

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—কেন?

মিস্টার বিশ্বাস বলেছিলেন—ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে তো টাকা বাচ্চা পাড়বে না—

—ব্যাঙ্কও তো সুদ্ দেয় মিস্টার বিশ্বাস!

—সে নামমাত্র। সে কিছুই না। তাতে চিঁড়ে ভেজে না। যারা টাকাওয়ালা লোক তারা ব্যাঙ্ককে বিশ্বাস করে না মিস্টার রায়।

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে তারা কাকে বিশ্বাস করে?

মিস্টার বিশ্বাস বলেছিলেন—কাউকে তারা বিশ্বাস করে না। তাই তারা টাকা ইন্‌ভেস্ট্ করে।

—কোথায়, কীসে ইন্‌ভেস্ট করে?

মিস্টার বিশ্বাস বলেছিলেন—জমি, বাড়ি, গোল্ড-বণ্ড—এই সমস্ত জিনিসে বিশ্বাস করে।

—কিন্তু তাতেও তো ভয় আছে!

—কীসের ভয়?

সোহম্ বলেছিল—ইন্‌কাম্ ট্যাক্সের ভয়, ওয়েলথ্ ট্যাক্সের ভয়, এস্টেট্ ডিউটির ভয়

মিস্টার বিশ্বাস বলেছিলেন—তার চেয়ে আপনি এক কাজ করুন না, ছেলে মেয়ে বউ, তাদের নামে টাকা বেনামী করে রাখুন—

মিস্টার বিশ্বাসের কথা শুনে সোহম্ কী জবাব দেবে তা ভেবে উঠতে পারেনি। তারপর বলেছিল—মিস্টার বিশ্বাস, আমার আয়-ব্যয় সম্বন্ধে আপনার অজানা কিছু নেই। আপনাকে বলতে আমার কিছু বাধা নেই। আমার ছেলে মেয়ে জামাই বউ কিছু নেই, কেউ নেই। পৃথিবীতে আমি আজ একেবারে একলা—

কথাটা শুনে মিস্টার বিশ্বাস হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন।

বলেছিলেন—সে কী? কেন? মিসেস্ রায়ের কী হলো?

সোহম্ বলেছিল—মিসেস রায় এখন আর আমার সঙ্গে থাকে না মিস্টার বিশ্বাস। সে এখন মিসেস কোঠারি হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে তার—বাইরের কেউ তা জানে না—

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে মিস্টার বিশ্বাস সোহমের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ আর কোনও কথাই বেরোল না।

সোহম্ বলেছিল—আপনি চুপ হয়ে গেলেন কেন মিস্টার বিশ্বাস? পৃথিবীতে কি কারো ডিভোর্স হয় না? স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে কি চলে যায় না? স্বামীও কি স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায় না? তা যদি না হতো তো এত উকিল ব্যারিস্টার অ্যাটর্নিদের পেট কী করে চলতো?

মিস্টার বিশ্বাস এর জবাবে অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলেন—কার দোষে এটা হলো মিস্টার রায়? আপনার দোষে না আপনার স্ত্রীর দোষে?

সোহম্ বললে—আমার স্ত্রীর দোষে নয় মিস্টার বিশ্বাস। দোষটা আমারই।

—আপনার দোষে? আপনি স্বীকার করছেন?

সোহম্ বললে—যা সত্যি তা স্বীকার করতে লজ্জা কী?

—কী দোষ আপনি করেছিলেন?

সোহম্ বললে—আমি কী দোষ করিনি তাই বলুন! আমি স্বার্থপরের মতন অফিসের চাকরিতে উন্নতি করতে চেয়েছিলুম। সামান্য একজন ক্লার্ক থেকে একেবারে ডিরেক্টার হয়ে গিয়েছি আমাদের টার্নবুল অ্যান্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানিতে। আপনি তো তা জানেনই। এর জন্যে কিছু মূল্য দিতে হবে না? তাতে আমাদের কোম্পানি কয়েক কোটি টাকা প্রফিট করেছে, কিন্তু আমার জীবনের ব্যালেন্স-শীটে ক্রেডিটের পাতাটা একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে। আমার ব্যাংকের পাসবইতে ডিভিডেন্ডে, ডিবেঞ্চারে, শেয়ারের সার্টিফিকেটে, সেভিংস্-এ, ফিকস্‌ড্-ডিপোজিটে,ব্যাকে আমি সম্রাট হয়েছি কিন্তু জীবনের দিক থেকে আমি একেবারে ফতুর হয়ে গিয়েছি মিস্টার বিশ্বাস—

বলতে বলতে সোহমের গলাটা একটু কেঁপে উঠেছিল।

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—তা এত রাত্তিরে আমার কাছে হঠাৎ এসেছেন কেন? এত রাত্রে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? কোথা থেকে আসছেন এখন?

সোহম্ বললে—নিউ আলিপুর থেকে—

—নিউ আলিপুরে গিয়েছিলেন কী করতে এত রাত্তিরে?

সে-কথার উত্তর সরাসরি না দিয়ে সোহম্ বললে—এত রাত্তিরে এলুম এই জন্যে যে আমি জানতুম আপনি রাত একটা দু'টো পর্যন্ত কাজ করেন, আপনার স্টেনোটাইপিস্ট্‌ও আপনার সঙ্গে থাকে। আমি একটা ডীড্-এর জন্যে এসেছি—

—ডীড্? কীসের ডীড্?

সোহম্ বললে—ডীড্ অব্ গিফ্‌ট্। মানে দানপত্র তৈরি করতে চাই। আপনার কাছে স্ট্যাম্প্-পেপার তো আছেই নিশ্চয়!

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—হ্যাঁ, স্ট্যাম্প-পেপার তো রাখতেই হয় বাড়িতে।

—আমি খালি স্ট্যাম্প-পেপারে সই করে দিচ্ছি। আর আপনাকে পাওয়ার অব-অ্যাটর্নি'ও দিয়ে দিচ্ছি। কাল সকালে রেজিস্ট্রি-অফিসে গিয়ে আপনি সব কাজ শেষ করে ফেলবেন—

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—কেন, আপনিও তো কাল রেজিস্ট্রি অফিসে আসতে পারেন। কাল একবার ঘণ্টা-খানেকের জন্যেও আসতে পারবেন না?

সোহম্ বললে—কাল আমি কোথায় থাকি, কী করে বলবো? কালকের কথা কি আজ বলা যায়?

—ডীড্ অব্ গিফ্‌ট্ কার নামে করবেন? দানপত্র কার নামে হবে?

সোহম্ বললে—শম্পার নামে—

—আপনার মেয়ের নামে? আপনার মেয়ের নামই তো শম্পা?

সোহম্ বললে—হ্যাঁ—

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—কিন্তু সে-মেয়ে তো এখন তা'র মা'র কেয়ারে আছে—

সোহম্ বললে—তা হোক, আমি তার নামেই আমার নব্বুই লক্ষ টাকার সমস্ত প্রপার্টি দানপত্র করে দিয়ে যাবো—আমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, আমার ফ্ল্যাটের ওনারশিপ, সব মিলিয়ে প্রায় দেড় কোটি টাকার মতো প্রপার্টি। আপনি আপনার স্টেনো-টাইপিস্টকে ডাকুন, আমি স্ট্যাম্প-পেপারে সইটা করে দিয়ে যাই এখনই—

সমস্ত ঘটনাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শেষের কথা আগে, আগের কথা শেষে বললে কি কেউ কিছু বুঝতে পারবে? কিন্তু তখন সোহমের মানসিক যা অবস্থা তাতে ভাবনার পারম্পর্য বজায় রাখাই তো শক্ত। সঙ্গে আছে সমস্ত

কাগজপত্র, সমস্ত ব্যাংকের পাসবই, সমস্ত শেয়ারের সার্টিফিকেট, সমস্ত সেভিংস আর ফিক্সড্-ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট-বই। জীবনে যা-কিছু সোহম্ উপার্জন করেছিল, সমস্ত।

কিন্তু ওরা যদি তাকে তাড়িয়ে দেয়?

তাড়িয়ে দেয় দেবে। শম্পার সঙ্গে যদি ওরা কথা বলতে না দেয় তো না দেবে। শুধু এই সমস্ত টাকা-পয়সা-প্রপার্টির সম্পত্তি সে তার নিজের মেয়েকে দিয়ে দেবে। শুধু সে বলবে—এই আমার সর্বস্ব আমি আমার মেয়েকে দিয়ে গেলুম। সে যেন এই সব কিছুর মালিক হয়, এই সমস্ত সম্পত্তি সে যেন ভোগদখল করে—

মনে পড়ছিল সেই সেদিনের কোর্টের কথা। অনেক চেষ্টা করে গোপন রাখা হয়েছিল ডিভোর্সের কথাটা। বলতে গেলে কোর্টের বাইরে সে-কথা কেউই জানতে পারেনি। তবু বাড়ি থেকে কোর্টে যাওয়ার পথে বার-বার ভয় হয়েছে তার। যদি কেউ দেখে ফেলে? যদি কেউ জেনে ফেলে? যেন কাউকে খুন করেছে সে! যেন কাউকে সে জেনেশুনে বিষ খাইয়েছে! তার উকিল ভূপতি-বাবু আগে থেকেই বলে দিয়েছিল—আপনি অত ভাবছেন কেন? আপনি সোজা বলবেন যে আপনি অন্যায় করেছেন। তাহলে আর কোনও গণ্ডগোল হবে না।

সোহম্ জিজ্ঞেস করেছিল—তারপর? তারপর কী হবে?

—তারপর আর কিছুই হবে না। জজ রায় দিয়ে দেবে যে পিটিশন্ গ্র্যান্টেড। অর্থাৎ আবেদন স্বীকৃত। মানে Plaintiff's petition granted. এক মিনিটের মধ্যেই আপনার ঝামেলা মিটে যাবে—

সত্যিই তাই হয়েছিল।

জজ জিজ্ঞেস করেছিল—প্লেনটিফ্ যা অভিযোগ করেছেন তা সত্যি?

সোহম্ বলেছিল—সত্যি।

—আপনার মেয়ে শম্পা রায় তার মা সুমিত্রা কোঠারির হেফাজতেই থাকবে, তাতে আপনি রাজি?

—রাজি।

তখন সোহমের এতই মানসিক অস্বস্তি চলছে যে কোনও রকমে সেই কোর্ট থেকে নিষ্কৃতি পেলেই যেন সে বাঁচে।

তারপর আর কী হয়েছে তা তার আজ মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, সেই অবস্থাতেই কোর্টের বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে সোহম্ যেন একটু মুক্তি পেয়েছিল। তারপর সোজা চলে গিয়েছিল তার অফিসে। সেই অফিসের চেম্বারের ভেতরেই সে কান পেতে থেকেছিল অনেকক্ষণ। তার সম্বন্ধে কেউ কিছু আলোচনা করছে কিনা, কেউ চাপা হাসি হাসছে কিনা জানতে চেষ্টা করেছিল। না, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কান পেতেও যখন সে জানতে পেরেছিল যে, না, কেউ কিছু বলছে না, তখন সে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিল। যে-পাপ সে গোপনে করেছিল সে-পাপ যে চিরকালই চাপা থাকবে এইটেই সে আশা করেছিল। আর সে-আশা, বলতে গেলে, তার ফলবতীও হয়েছিল। কারণ শুধু জজ আর দু'পক্ষের উকিল

ছাড়া আর কেউই জানতে পারেনি সে-কথা। তার গোপন পাপ গোপনেই থেকে গিয়েছিল বরাবর। তার চরিত্রে বা অফিসের পার্সোন্যাল ফাইলে একটা কালির আঁচড়ও লাগেনি তার জন্যে। মানুষের সমাজে সে নিষ্পাপ বলেই ঘোষিত হয়েছিল।

কিন্তু বিধাতারও তো একটা কোর্ট আছে! সেই বিধাতা পুরুষের যে কোর্ট আছে তারও তো একজন বিচারক আছেন। সেই বিচারক তাঁর কোর্টে কী রায় দিলেন সেই রায় কি কেউ জানতে পেরেছিল? শুনতে পেয়েছিল?

তা নইলে সেদিন হঠাৎ 'ড্রিমল্যাণ্ড' বইটা তার হাতে এলোই বা কেন? আর অতদিন অত বছর পরে শম্পার সঙ্গে তার দেখাই বা হলো কেন? আর শম্পাই বা অমন করে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল কেন? কেন শম্পা তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—পাম্পা, তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? কোথায় ছিলে?

তাই সেদিন সোহম্ নিজেই গাড়ি নিয়ে ড্রাইভ করে গিয়েছিল সেই দু'শো পাঁচ-এর এ, জি-ব্লক, নিউ আলিপুরের ঠিকানাতে। গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে সোহম্ নিজের মনে মনেই ভেবে নিয়েছিল দেখা হলে সুমিত্রাকে সে কি বলবে! হঠাৎ তার এইভাবে যাওয়াতে হয়তো চমকে উঠবে সুমিত্রা। শম্পাও এতদিন পরে তার পাম্পাকে দেখতে পেয়ে হয়তো আনন্দে খুব লাফিয়ে উঠবে। তার কোলে উঠতে চাইবে। তার বাড়িতে পাম্পার সঙ্গে চলে আসতে চাইবে। সেদিনকার মতোই তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলবে—এতদিন তুমি কোথায় ছিলে পাম্পা? কোথায় ছিলে তুমি?

আর তারপর?

তারপর কী হবে সেটা আর কল্পনা করে নিতে পারলে না সোহম্। 'টিভোলি পার্ক' থেকে নিউ আলিপুর যেতে কতটুকু আর সময় লাগবার কথা। কিন্তু সোহমের মনে হলো নিউ আলিপুরে পেঁছতে যেন তার অনন্তকাল অতিক্রম করতে হচ্ছে, এ যাত্রা যেন আর শেষ হবে না।

তারপর বাড়িটা খুঁজে বার করতেও অনেক সময় লাগলো। তখন রাতও অনেক হয়ে গেছে। যদি সুমিত্রারা ঘুমিয়ে পড়ে? যদি শম্পা ঘুমিয়ে পড়ে? যদি শম্পা ঘুমিয়ে পড়ে তো ক্ষতি নেই। সদর দরজার কড়া নাড়লে সুমিত্রা নিশ্চয় জেগে উঠবে। সুমিত্রা হয়তো ভেতর থেকেই জিজ্ঞেস করবে—কে?

উত্তরে সোহম্ বলবে—আমি—

—আমি কে?

সোহম্ বলবে—আমি সোহম্—

তারপর? সোহমের নাম শুনে সুমিত্রার বদলে হয়তো মিস্টার কোঠারি বেরিয়ে আসবে। মিস্টার কোঠারি তাকে দেখে নিশ্চয়ই রেগে যাবে খুব। বলবে—এত রাত্তিরে কেন এসেছেন আপনি?

সোহম্ বলবে—আমি একবার আমার শম্পাকে দেখতে এসেছি, এক মিনিটের জন্যে। এক মিনিট তাকে দেখেই আমি চলে যাবো—

মিস্টার কোঠারি কথাটা শুনে হয়তো খুব রেগে উঠবে। বলবে—এখন দেখা

হবে না, কাল সকালে আসবেন, এখন যান। সে এখন ঘুমোচ্ছে—

সোহম্ অনুনয় করে বলবে—একবারটি মিস্টার কোঠারি, একবারটি শুধু তাকে একটু দেখবো। আমি আমার সমস্ত প্রপার্টি তার হাতে তুলে দেব। আমার যা কিছু আছে, সমস্ত। প্রায় নব্বুই লাখ টাকার প্রপার্টি আমার, সমস্ত তাকে দিয়ে যাবো, একবারটি তাকে জাগিয়ে তুলুন। যা-কিছু আমার আছে সমস্ত আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ব্যাঙ্কের পাস-বুক, ফিকস্ড্-ডিপোজিটের পাস-বুক, শেয়ার সার্টিফিকেট, ডিবেঞ্চার, গোল্ড বণ্ড—সমস্ত কিছু আমার গাড়িতে রয়েছে, একবারটি শুধু তাকে জাগিয়ে তুলুন, একবারটি···

মিস্টার কোঠারি কথাগুলো শুনে হয়তো আরো রেগে উঠবে। বলবে—কোর্ট থেকেই তো ডিসাইড্ হয়ে গেছে শম্পা আমার মেয়ে, তাহলে আবার কেন বিরক্ত করতে এসেছেন এত রাত্তিরে ? সে এখন ঘুমোচ্ছে। যান—বেরিয়ে যান···

মিস্টার কোঠারি হয়তো কথাগুলো বলেই সোহমের মুখের ওপর সদর দরজাটা বন্ধ করে দেবে ভেতর থেকে। কিম্বা

কিন্তু না, সোহম্ যা ভেবেছিল তা হলো না। যখন গাড়ি থেকে নেমে সোহম্ ঠিক নম্বরের বাড়িটা খুঁজে বার করলো তখন দেখলে সদর দরজাটায় তালা-চাবি লাগানো রয়েছে। আর ভেতর থেকে কার কান্নার শব্দ আসছে—

সোহমের মনে হলো যেন শম্পাই ভেতর থেকে কাঁদছে। ঠিক যেন শম্পার মতোই গলা !

সোহম্ বাইরে থেকেই ডাকলে—শম্পা · শম্পা···

সঙ্গে সঙ্গে শম্পার কান্না থেমে গেল।

সোহম্ আবার ডাকলে—শম্পা, ও শম্পা···

ডাকবার সঙ্গে সঙ্গেই শম্পা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। সে যেন অন্ধকারে সোহম্‌কে ঠিকমতো ঠাহর করতে পারলে না।

সোহম্ বলে উঠলো—আমাকে তুমি চিনতে পারছো না শম্পা ? আমি তোমার পাপ্পা—

সঙ্গে সঙ্গে শম্পা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো—পাপ্পা, পাপ্পা তুমি ? তুমি এসেছ ? এতদিন তুমি আসোনি কেন পাপ্পা ? আমি যে কেবল তোমার জন্যে কাঁদি। তোমার কাছে নিয়ে যেতে বলি···কিন্তু কেউ আমাকে নিয়ে যায় না তোমার কাছে। তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও পাপ্পা···তোমার কাছে নিয়ে যাও।···আমি আর এখানে থাকবো না পাপ্পা,··আমি তোমার কাছে থাকবো···

সোহম্ বললে—কী করে নিয়ে যাবো আমি তোমাকে শম্পা ? দরজায় যে তালা-চাবি লাগানো রয়েছে···

শম্পা বললে—তুমি তালা-চাবিটা খুলে নাও না পাপ্পা ··

সোহম্ বললে—আমি আর কী করে খুলবো শম্পা ? তোমার ড্যাডি মাম্মি —তারা সব কোথায় গেল—

শম্পা বললে—তারা সবাই রোজ আমাকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে

চলে যায় পাপ্পা, কেউ আমাকে বেড়াতে নিয়ে যায় না, তারা রোজ রাত্তিরে বাইরে বেড়াতে যায়…তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও পাপ্পা · আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও…আমি আর এখানে থাকবো না পাপ্পা…তোমার কাছে আমাকে নিয়ে যাও পাপ্পা…নিয়ে যাও…

সোহম্ বললে—আমি তোমাকে কেমন করে নিয়ে যাবো বলো ? তোমার ঘরের দরজা যে তালা-চাবি দিয়ে বন্ধ করা—

শম্পা বললে তুমি তালা-চাবিটা ভেঙে ফেল না পাপ্পা। তুমি তো বড়ো, তোমার গায়ে জোর নেই ?

সোহম্ বললে—তা যদি হতো তো তাহলে আমি এখুনি তোমার দরজার তালা-চাবি ভেঙে ফেলতুম—কিন্তু আমার গায়ে তো অত জোর নেই—

শম্পা নিজের হাতটা গ্রীলের ফাঁক দিয়ে বাইরে বার করে দিলে। বললে—তাহলে আমি কী করবো পাপ্পা, আমি তোমার কাছে কী করে যাবো ?

সোহম্ ততক্ষণে শম্পার হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে আদর করতে লাগলো। বললে—জানো শম্পা, আমি তোমার জন্যে অনেক জিনিস এনেছি—

—কী জিনিস পাপ্পা ? কী জিনিস ?

সোহম্ বললে—অনেক টাকা। অনেক টাকা এনেছি তোমার জন্যে…

শম্পা বললে—টাকা নিয়ে আমি কী করবো পাপ্পা, টাকা আমার দরকার নেই। আমি শুধু তোমার কাছে যাবো, আর কিছু চাই না আমি, আমি আর কিছু চাই না—

বলে শম্পা গ্রীলের ওপারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো…

সোহম্ তাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই বাড়ির সামনের রাস্তায় দুটো গাড়ি এসে থামলো। একটা জিপ, তা থেকে একজন পুলিস অফিসার নামলো। আর একটা গাড়ি থেকে নামলো দুজন। একজন পুরুষ আর একজন…

আর একজন সুমিত্রা।

সুমিত্রাকে দেখেই সোহম্ যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এত রাত্রে পুলিসের সঙ্গে ওরা দুজন কোথা থেকে এল ? এত রাত পর্যন্ত শম্পাকে বাড়িতে রেখে ওরা কোথায় গিয়েছিল ? কোথায় ?

সুমিত্রা প্রথমে অন্ধকারের মধ্যে সোহম্কে দেখতে পায়নি। পুলিস অফিসারের দিকে চেয়ে বললে—এই যে স্যার, এইটেই আমাদের বাড়ি…

মদ খেলে মানুষের মুখের কথা যেমন জড়িয়ে যায় সুমিত্রার কথাগুলোও যেন সোহমের কাছে তেমনি জড়ানো-জড়ানো মনে হলো। তারপর সামনের দিকে কাছাকাছি এসেই সুমিত্রা থমকে দাঁড়িয়ে গেল সোহম্কে দেখে।

বললে—তুমি ?

সোহমের মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিলে।

—কথা বলছো না যে ?

সুমিত্রার শারীরিক অবস্থা যে প্রকৃতিস্থ নয় তা তার কথা বলার ভঙ্গিতেই সোহমের বুঝতে অসুবিধে হলো না। আর তার মুখ থেকে যে গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছিল সেটাও তার অচেনা নয়। এতদিন পরে দেখা, তবু কেন জানি না সোহমের মনে হলো সুমিত্রার মনের অলি-গলির বাঁক্‌গুলো পর্যন্তও সে যেন দেখতে পাচ্ছে।

সুমিত্রার পেছনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল সে এতক্ষণে সামনে এসে দাঁড়ালো।

—আপনি ? হঠাৎ ?

সোহম্‌ বললে—হঠাৎ নয়, আমি ভেবেচিন্তেই আজ এসেছি—

কথার মাঝখানেই সুমিত্রা বলে উঠলো—ভেবেচিন্তে এসেছ ? তার মানে ?

হঠাৎ জানালার ভেতর থেকে শম্পা বলে উঠলো—মাম্মি, পাম্পা এসেছে। আমি পাম্পার কাছে যাবো—

সুমিত্রা ধমকের সুরে তাকে বললে—তুমি চুপ করো, কীপ সাইলেন্স্‌—

তারপর সোহমের দিকে চেয়ে বললে—তুমি কেন এসেছ আবার ? আবার কি মতলব তোমার ?

সোহম্‌ বললে—আমি আমার মেয়েকে দেখতে এসেছি—

—হোয়াট !

এবার জোরে প্রতিবাদ করে উঠলো কোঠারি। তারও গলার আওয়াজে এ্যালকোহলের জড়ানো সুর।

—আপনার মেয়ে ?

সোহম্‌ বললে—হ্যাঁ, আমার মেয়ে নয় তো কার মেয়ে শম্পা ?

ওদের পেছনে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিলেন। শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু পারিবারিক গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়া যে তাঁর ডিউটি নয় সে-সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই এতক্ষণ তিনি কিছু কথা বলছিলেন না।

সুমিত্রা এবার চিৎকার করে উঠলো—কে বললে তোমার মেয়ে ? শম্পা তোমার কেউ নয়। তুমি যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—

শম্পা কাঁদতে লাগলো—না পাম্পা, তুমি যেও না, তোমার সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যাও পাম্পা, আমাকেও নিয়ে যাও—

সুমিত্রা মেয়েকে এক ধমকে থামিয়ে দিলে—থাম্‌ তুই, থাম্‌—

তারপর পুলিসের অফিসার ভদ্রলোককে বললে—কই স্যার, আপনার চাবি

আনুন, দরজা খুলে দিন—

পুলিসের অফিসার এবার সামনে এগিয়ে এলেন। তিনি সোহম্‌কে বললেন—একটু রাস্তা দিন স্যার, আমি দরজার চাবি খুলবো—

সোহম্‌ সরে দাঁড়ালো একটু।

সুমিত্রা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—কই, এখনও দাঁড়িয়ে আছো কেন? চলে যাও—

সোহম্‌ বললে—আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি—

—কী, কাজ শেষ হয়নি? তোমার অডাসিটি তো কম নয়। তোমার সঙ্গে শম্পার কোনও কাজ নেই আর—এবার যাও—

সোহম্‌ বললে—আমি আমার শম্পার সঙ্গে কথা বলবো, তাতে তুমি বাধা দেবার কে? মাতাল হলে কি কাণ্ডজ্ঞানও থাকতে নেই? ছিঃ—

কোঠারি এবার গর্জে উঠলো—স্টপ্‌ ইট্‌, ব্যাস্টার্ড···

পুলিস অফিসার ভদ্রলোক বললেন—অত চেঁচাচ্ছেন কেন?

কোঠারি বলে উঠলো—আপনি আপনার কাজ করুন না। আমি তো আপনার সঙ্গে কথা বলছি না, আমি এই ব্যাস্টার্ডকে বলছি···

সোহম্‌ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—এও দেখছি আর একটা মাতাল!

—কী? আর একবার কথাটা উচ্চারণ করো!

সোহম্‌ বললে—মাতালকে মাতাল বলবো না তো কী বলবো?

পুলিস অফিসার ভদ্রলোক নিজের 'মাস্টার-কী' দিয়ে এতক্ষণ চাবিটা খোলবার চেষ্টা করছিলেন। এবার চেঁচিয়ে তাঁর জিপের ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে ডাকলেন—শিউশরণ, টর্চ্‌ ঠো লে আও—

তারপর যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন—অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না—মহা মুশকিল হলো—

চিৎকার করে আবার ডাকলেন—শিউশরণ···

জানালার ভেতর দিয়ে শম্পা তখনও সোহমের একটা হাত জোরে ধরে আছে। কিছুতেই হাতটা ছাড়বে না। বলছে—পাপ্পা, তুমি যেও না পাপ্পা। আমি তোমার সঙ্গে যাবো, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও তুমি—

সুমিত্রার নজরে পড়তেই সে সোহমের হাত থেকে শম্পার হাতটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে তার হাতটায় এক ঝট্‌কা মারলে। আর সঙ্গে সঙ্গে শম্পা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে চেঁচাতে লাগলো—মাম্মি আমাকে মারলে, আমাকে মারলে মাম্মি—

সোহম্‌ সুমিত্রাকে বললে—তুমি মারলে আমার মেয়েকে? মারলে তুমি শম্পাকে? তুমি মা না ডাইনী? কী তুমি?

সুমিত্রা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে—বেশ করেছি আমি মেরেছি—বেশ করেছি। আমার মেয়েকে আমি মেরেছি, তাতে তুমি বলবার কে?

সোহম্‌ বললে—তোমার যেমন নিজের মেয়ে, তেমনি তো আমারও মেয়ে···

শম্পার কষ্ট হলে আমার কষ্ট হবে না ?

এবার কোঠারি এগিয়ে এল সোহমের দিকে। বললে—কে বললে শম্পা আপনার মেয়ে ?

সোহম্ বললে—আমি বলছি শম্পা আমার···

কিন্তু সোহমের কথা শেষ হওয়ার আগেই পাশের দোতলা বাড়ির জানলা থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে উঠলো—এই রাসকেল, চেঁচাচ্ছিস কেন ? থাম্—

আর এক পাশের বাড়ি থেকে কে যেন বলে উঠলো—এদের জ্বালায় তো আর একটু আরামে ঘুমোতে পারা যাবে না দেখছি, রোজ রোজ মদ গিলে এসে এই রাত বারোটার সময়ে এই রকম হল্লা করবে বেটারা—

ওদিকের জানালা থেকে কে একজন মেয়েলি গলায় বলে উঠলো—ভদ্রলোক-দের পাড়া থেকে ওদের মেরে তাড়ায় না কেন পুলিস ? পুলিস কি শুধু ঘুষ খাবে আর নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে ? আমরা কোন্ রাজত্বে বাস করছি কলকাতায়—

কিন্তু পাশের বাড়িগুলো থেকে আরো কিছু লোক একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে কোঠারির বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে। তারা এসে কোঠারিকে সামনে পেয়েই যাচ্ছেতাই ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো—কী, পেয়েছেন কী আপনারা ? এটা কি মগের মুলুক পেয়েছেন নাকি ? না সোনাগাছি ? ভেবেছেন যা খুশি তাই করবেন ? মনে রাখবেন এটা নিউ আলিপুর—আমাদেরও আইন জানা আছে মশাই—

আর একজন ভদ্রলোক গেঞ্জি পরা অবস্থাতেই এসে কোঠারির হাত ধরে ফেলেছেন—বেরোন এ-পাড়া থেকে, বেরিয়ে যান। নইলে জয়েণ্ট পিটিশন্ করবো পুলিস কমিশনারের কাছে। বেরিয়ে যান। কাল সকালে বাড়ি ফিরে আসবেন—যান, বেরোন—

সুমিত্রা বলে উঠলো—আমরা কী করছি না-করছি তা নিয়ে আপনাদের কীসের এত মাথা-ব্যথা ? আমরা বেরোব না—কী করতে পারেন করুন—

এক ভদ্রলোক রেগে গিয়ে বললেন—তা বলে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবার কোনও অধিকার নেই আপনার। একদিকে ব্রীচ্ অব্ পীস্ করবেন, তার ওপর আবার চোখও রাঙাবেন—

এতক্ষণে বোধহয় তাঁদের নজরে পড়লো পুলিস অফিসারের দিকে। তিনি তখনও টর্চ দিয়ে স্টীলের তালাটা খোলবার চেষ্টা করে চলেছেন।

এবার সবাই তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন—এই যে স্যার, আপনি এখানে রয়েছেন ? আপনি তো সবই শুনলেন। এই কোঠারিদের জ্বালায় তো আমরা পাড়ায় আর বাস করতে পারছি না—

ও-সি জিজ্ঞেস করলেন—কী হয়েছে ?

তাঁরা বললেন—এই দেখুন না, রোজ এই রকম সন্ধ্যেবেলা এঁরা বাড়িতে ওই ছোট্ট মেয়েটাকে ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দরজায় তালা-চাবি বন্ধ করে কোথায় মদ খেতে যান, আর রাত্তির বারোটার সময় বাড়ি ফিরে হল্লা

করতে শুরু করেন। ওঁদের হল্লার জ্বালায় আমরা তো আশ-পাশের বাড়িতে কেউ ঘুমোতে পারি না—

ও-সি জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা থানায় কম্‌প্লেন করেছেন ?

—থানায় কম্‌প্লেন করে কী হবে ? তাতে তো আজকাল আপনারা কোনও এ্যাকশান নেবেন না। তাই তো এখন আপনাকে পেয়ে আপনার কাছে কম্‌প্লেন করছি—

ও-সি বললেন—কালকে থানায় যাবেন এক সময়ে, তখন দেখা যাবে—

ভদ্রলোকরা বললেন—আপনারের খাতায় অবশ্য আমাদের কেস্‌ রেকর্ড করা হবে, তা আমরা জানি। কিন্তু কোনও এ্যাকশন্‌ যে নেওয়া হবে না, তাও জানি আমরা—

—কেন ? ও-কথা বলছেন কেন ?

ভদ্রলোকরা বললেন—আমরা তো কোনও পার্টির মেম্বার নই, আজকাল যে-কোনও একটা পার্টিতে না-থাকলে কি কোনও কাজ হয় ? পার্টিতে থাকলে আমাদের কমপ্লেনটা আপনারা নিশ্চয় শুনতেন, তবে…

কিন্তু এ-কথার উত্তর দিতে গিয়েও আর দেওয়া হলো না। কারণ ততক্ষণে 'মাস্টার-কী' দিয়ে সদর-দরজার তালাটা খুলে গেছে, আর ভেতর থেকে শম্পা এক নাগাড়ে কেঁদেই চলেছে। শম্পার গলায় তখন একটাই কথা—পাপ্পা, আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে, তুমি আমাকে নিয়ে যাও পাপ্পা—

এক পাশের বাড়ির লোক বলে উঠলো—কী রাস্‌কেল বাপ-মা রে বাবা, তোদের যদি এতই মদ খাবার নেশা রে, তাহলে মেয়ের জন্ম দিয়েছিলি কেন— ?

আর একজন পাশের বাড়ির লোক বললে—সে ওদের যা ইচ্ছে করুক মশাই, তাতে আমাদের বয়ে গেছে, কিন্তু রাত্তির বেলা হল্লা করবে কোন্‌ রাইটে ?

কোঠারি আর থাকতে পারলে না। হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো—রাস্‌কেল আমরা না তোরা ?

পাশের বাড়ির ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো—আমাদের রাস্‌কেল বলা ? আর একবার রাস্‌কেল বল্‌, তাহলে ঘুষি মেরে তোর নাক ভেঙে দেব—

সুমিত্রা কোঠারিকে বললে—তুমি কেন কথা বলছো ওই ছোটলোকদের সঙ্গে ?

—কী, আমাদের ছোটলোক বলা ?

ও-সি সদর দরজাটা খুলে দিতেই শম্পা বাইরে এসে সোহম্‌কে জড়িয়ে ধরেছে আর সোহম্‌ও কোলে তুলে নিয়েছে তাকে। কোলে তুলে নিয়ে…

ও-সি হঠাৎ টর্চের আলোয় শম্পার হাতটা দেখেই চম্‌কে উঠেছেন। বললেন—এ কি, এত রক্ত এল কোথা থেকে ? দেখি দেখি…

ও-সি দেখলেন। পাড়ার সব লোকরাও দেখলে। সুমিত্রা আর কোঠারি, তারাও দেখে চমকে উঠলো। সত্যি, এত রক্ত এলো কোথা থেকে ? সোহম্‌ও এবার দেখতে পেলে। তার সাদা শার্টটা রক্তে একেবারে ভেসে গেছে যে!

শম্পা সোহমের কোলে উঠে তখনও এক নাগাড়ে বলে চলেছে—পাপ্পা, আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও পাপ্পা- প্লীজ, আমি আর ড্যাডির কাছে

থাকবো না···আমি থাকবো না এখানে—

ও-সি ভদ্রলোকের কাজ তখন শেষ হয়ে গেছে। তিনি চলে যাচ্ছিলেন তাঁর জিপের দিকে। পাড়ার ভদ্রলোকরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলেন। বলতে লাগলেন—স্যার, দেখলেন তো, কী রকম ফাদার আর মাদার, প্রত্যেক দিন মাঝ-রাত্তিরে মদ খেয়ে ফিরে পাড়ায় এই রকম চেঁচামেচি হল্লা মুখ-খিস্তি করবে, এতে আমাদের কী কষ্ট আপনি নিজের চোখেই তো তা দেখে গেলেন···

আর একজন বললে—স্যার, আমার বুড়ো বাবা হার্টের পেশেন্ট, তাঁর কী কষ্ট আপনি পুলিস হয়ে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, আপনাকে আর কী বোঝাবো···

আর একজন বললেন—স্যার, আপনি এর কিছু একটা বিহিত করুন—আমরা তো আর পারছি না···জ্বলে পুড়ে মরছি। একদিকে লোড্-শেডিং-এর জ্বালা, তার ওপর আবার···

ও-সি বললেন—দেখুন আপনাদের আমি খুলেই বলি। আমার আণ্ডারে তো অনেক বস্তিও আছে আবার এই নিউ আলিপুরের মত এন্‌লাইটেণ্ড্ এরিয়াও আছে। ওই তো চেতলা রয়েছে, ওখানে তো অনেক বস্তি রয়েছে, চোর গুণ্ডা ওয়াগন-ব্রেকাররা রয়েছে। কিন্তু কই, তাদের নিয়ে তো আমাদের কোনও প্রবলেম্ নেই। যত প্রবলেম্ সব এই এন্‌লাইটেণ্ড্ এরিয়া নিউ আলিপুর নিয়ে। কলকাতায় যারা শিক্ষিত বলে পরিচিত তারাই হচ্ছে ক্রিমিন্যাল, অশিক্ষিতদের নিয়ে আমাদের তেমন কোনও সমস্যা নেই। তারা আমাদের দেখে ভয় পায়, খবরের কাগজে তাদের ক্রাইমের খবরই বেরোয়, কিন্তু দু'একজন ছাড়া শিক্ষিতদের ক্রাইমের খবর কখনও কি আপনারা নিউজ-পেপারে ছাপা হতে দেখেছেন ?

ও-সি থামলেন। শ্রোতারা এর জবাবে কী বলবেন বুঝতে পারলেন না।

জিপের ইঞ্জিনে তখন শিউশরণ স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। ও-সি আবার বললেন—বেশির ভাগ শিক্ষিতদের ক্রাইমের খবরই কোনও নিউজ্-পেপারে বেরোয় না, কারণ তাঁরা সবাই নিউজ-পেপারের পেট্রন, জার্নালিস্টদের সঙ্গে সেই সব ভদ্রলোক ক্রিমিন্যালরা একই ক্লাবে একই টেবিলে বসে মদ খান···। এই মিস্টার কোঠারি আর মিসেস কোঠারিদের এই ক্রাইমের খবরও কোনও দিন নিউজ-পেপারে বেরোবে না, তার কারণ এঁরা রোজ ক্লাবে গিয়ে জার্নালিস্টদের সঙ্গে মদ খেয়ে বাড়িতে ফেরেন, আমি জানি আজও এঁরা সেই খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে মদ খেয়েই বাড়িতে ফিরছেন। এঁদের বিরুদ্ধে আমি যদি কিছু স্টেপ্ নিই তাহলে আমার নিজের চাকরিও যাবে। আর শুধু আমি নই, আমার কর্তার কর্তা, খোদ আই-জিও যদি এঁদের ঘাঁটান তো তাঁরও চাকরি যাবে, কিম্বা তাঁকে ট্রানস্‌ফার করে দেওয়া হবে অন্য একটা বাজে পোস্ট-এ—

তারপর একটু থেমে বললেন—ওই শুনুন, ওখানে এখন কী-রকম হল্লা শুরু করেছে কোঠারিরা—

উপস্থিত সকলের কানেই সেই গালাগালি আর ঝগড়া-ঝাঁটির শব্দ আসতে লাগলো। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন—ও-লোকটি কে স্যার ? আপনি জানেন কিছু ?

ও-সি বললেন—আরে, সেটাও বুঝতে পারলেন না? ও লোকটা হচ্ছে, মিসেস কোঠারির ডিভোর্সড্ হাজব্যান্ড, কলকাতার একটা মালটি-ন্যাশনাল কোম্পানির ডাইরেক্টার⋯ কলকাতার সব ক্লাবের মেম্বার উনি। ওঁদের গায়ে কেউ আঁচড়টুকুও কাটতে পারবে না। যে-যে ক্লাবে কলকাতার সব জার্নালিস্টরা মদ খেতে যায় উনিও সেই সবগুলো ক্লাবের মেম্বার। চিফ্ মিনিস্টাররাও ওঁর সঙ্গে এক টেবিলে বসে মদ খান⋯চলি⋯

শিউশরণ জিপ্ নিয়ে হু-হু করে ধোঁওয়া উড়িয়ে এয়ার-পলিউশন করতে করতে চলে গেল থানার উদ্দেশে। ভদ্রলোকেরা পুলিস-অফিসারের কথাগুলো শুনতে শুনতে তখন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই ফুটপাতের ওপর।

যাবার সময়ে সোহম্ মনের ভেতরে কত আশা নিয়ে কত স্বপ্ন নিয়ে গিয়েছিল তা সে নিজে ছাড়া আর কেউ তা জানতো না। এত দিন পরে আবার সে শম্পাকে দেখতে পাবে, শম্পাকে কোলে তুলে আদর করতে পাবে, সেটা কি কম সৌভাগ্য, কম সুখ?

মনে আছে ছোটবেলায় শম্পা মাম্মির কাছে একেবারেই যেতে চাইতো না। লোকের ধারণা যে শিশুরা বুঝি কিছু বোঝে না। কে তাদের ভালোবাসে আর কে তাদের ভালোবাসে না তা তারা বুঝতেও পারে না।

কিন্তু আসলে? আসলে সত্যিই কি তাই?

কেন যে শম্পা তার মাম্মির কাছে যেতে চাইতো না তা অবশ্য স্পষ্ট। মাম্মিকে একলা পেলে তবে তো সে তার কাছে যাবে! জন্মাবার পর থেকেই তো সে দেখে আসতো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব সময়ে মাতালরা মা'কে ঘিরে মাতলামি করছে। আর মাম্মিও সব সময় মাতাল হয়ে রয়েছে। প্রকৃতিস্থ আর সুস্থ মাম্মিকে দেখবার সৌভাগ্য তো তার কখনও হয়নি। আর বেশির ভাগ সময়ে তো বাসন্তিয়ার কাছেই থাকতো সে। প্রথম-প্রথম তো সে বাসন্তিয়াকেই তার নিজের মা বলে ভাবতো। তারপর যখন একটু বয়েস হলো তখনই লোক চিনতে শিখলো। তখনই চিনলো তার পাপ্পাকে। তখন থেকে সে বুঝতে শিখলো যে পাপ্পাই তাকে সব চেয়ে বেশি ভালোবাসে। তার পর থেকে সে আর পাপ্পাকে কাছছাড়া করতে চাইতো না—অফিসে যাওয়ার সময়ও তার পাপ্পাকে সে বাড়ি থেকে বাইরে যেতে দেবে না, অফিস থেকে ফিরে আসতে দেরি করলেও তার অভিযোগ অনুযোগের শেষ থাকবে না—

আর তার পরের কথা তো আলাদা। তার পর তো শম্পা চিরকালের মতোই পর হয়ে গেল।

আর যদি সেদিন হঠাৎ শম্পার সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা না হয়ে যেতো তো

আজ এই নিউ-আলিপুরে এসে তাকে এমন নাটকের মধ্যেও জড়িয়ে পড়তে হতো না।

রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে তার সব কথা আবার মনে পড়তে লাগলো। এমন করে নিজের বাচ্চাকে যে কেউ ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দরজায় তালা-চাবি বন্ধ করে বাইরে মদ খেতে যেতে পারে এ-কথা কে কল্পনা করতে পারবে ?

মনে আছে সেই গোলমালের মধ্যেই সোহম্‌ চিৎকার করে বলে উঠেছিল—তুমি মা, না ডাইনী ? লজ্জা করে না তোমার মদ খেতে ?

—চোপ্‌রাও—

কোঠারিও সমান জোরে চিৎকার করে উঠেছে।

সুমিত্রাও গলা চড়িয়ে বলে উঠলো—তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছো ? লোকটাকে জুতো মেরে তাড়িয়ে দিতে পারছো না ?

সোহম্‌ও বললে—জুতো আমারও আছে, দেখি আমাকে জুতো মারবার সাহস কার কতো আছে !

—দেখতে চাও ?

সোহম্‌ বললে—মাতালের কতো মুরোদ তা আমার দেখা আছে—ছোটলোকের সঙ্গে থেকে থেকে ভদ্রভাবে কথা বলতেও কি ভুলে গেছ ?

এবার সুমিত্রা বলে উঠলো—শাট্‌ আপ্‌—

সোহম্‌ বলে উঠলো—ভয় দেখাচ্ছ কাকে ? ভেবেছ আমি তোমার কথায় ভয় পাবো ? বাড়িতে মেয়েকে সামলাবার জন্যে যাদের একটা ঝি-চাকর পর্যন্ত রাখবার ক্ষমতা নেই, তাদের আবার গলা-বাজি।

পাশের কোন্‌ একটা দোতলা বাড়ির জানালা থেকে কে চিৎকার করে উঠলো—এই হারামজাদারা, চুপ কর্‌ না—

সোহম্‌ বললে—খুব ভদ্রলোকের পাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়েছ তো। দেখছি রতনে রতন চেনে—

সুমিত্রা এবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে গিয়ে শম্পার হাত ধরে টান দিলে। বললে—ভেতরে চলে আয়, ও-লোকটার সঙ্গে কথা বলিসনি—চলে আয়—দরজা বন্ধ করে দেব—

সোহম্‌ও সঙ্গে সঙ্গে শম্পার অন্য হাতটা ধরে ফেলেছে।

বললে—না, শম্পার হাত ছাড়ো—ও যাবে না—

—হ্যাঁ যাবে, তুমি শম্পার হাত ছাড়ো—

কোঠারি সামনে এগিয়ে এলো এবার। বললে—এই স্কাউণ্ড্রেল, হাত ছাড়ো—

সোহম্‌ বললে না, ছাড়বো না, এ আমার মেয়ে, আমি অনেক জিনিস এনেছি ওকে দেবার জন্যে—

কোঠারি প্রতিবাদ করে উঠলো—না, ও আমার মেয়ে। কোর্ট থেকে ডিসাইড্‌ হয়ে গিয়েছে

সোহম্ বললে—হ্যাং ইওর কোর্ট, ওকে কিছু প্রেজেন্ট্ দেবারও কি অধিকার নেই আমার ? তুমি ওর লিগ্যাল ফাদার হতে পারো, কিন্তু ওর এ্যাকচুয়াল্ ফাদার তো আমিই—

সুমিত্রা হঠাৎ প্রতিবাদ করে উঠলো—না, তুমি ওর এ্যাক্‌চুয়াল ফাদার নও।

সোহম্ আকাশ থেকে পড়লো—তার মানে ?

সুমিত্রা বলে উঠলো—তার মানে ও কোঠারির মেয়ে—

—কী তুমি যা-তা সব বলছো ?

সুমিত্রা বললে—আমি যা-তা বলি না। ও যে কোঠারির মেয়ে তার প্রমাণ আমার কাছে আছে—

সোহম্ বললে—জানি না কী প্রমাণ তোমার কাছে আছে, আমি তা দেখতেও চাই না, কিন্তু আমি তো আমার মেয়েকে ক্লেম্ করতে আসিনি, তাকে আমি আমার নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেও আসিনি। এসেছি এই 'ড্রিমল্যাণ্ড্' বইটা যা'র তাকে সেটা ফিরিয়ে দিতে…আর…

—আর কী ?

সোহম্ বললে—আর আমি আমার জীবনে যা-কিছু টাকা-কড়ি-সম্পত্তি তোমাকে ভাঁড়িয়ে লেবার-ইউনিয়নকে ঠকিয়ে আজ পর্যন্ত জমিয়েছি, সব কিছুই আমার শম্পাকে দিয়ে যেতে এসেছি—

সুমিত্রা বললে—তুমি আমার মেয়েকে টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে কিনে নিতে চাইছো ? তুমি আজ আমাকে টাকা দেখাচ্ছো ?

সোহম্ বললে—তুমি ভুল করছো, আমি তোমাকে টাকা দেখাচ্ছিও না, টাকা দিয়ে শম্পাকে কিনে নিতেও চাইছি না, আমি শুধু আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছি—

—তুমি যে-অন্যায় করেছ, টাকা দিয়ে তার কি প্রায়শ্চিত্ত হয় বলে মনে করো ?

সোহম্ বললে—তুমি এখন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে রয়েছ তাই আমার কথাগুলোর মানে হয়তো ঠিক বুঝতে পারছো না। যদি বলো তো কাল সকালবেলা যখন তুমি সুস্থ থাকবে তখন আবার এসে না-হয় আমি সব কিছু তোমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে পারি—

সুমিত্রা বললে—না, তোমার কাল এখানে আসারও দরকার নেই, আর আমারও কিছু বোঝার দরকার নেই—তোমার সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক চুকে-বুকে গেছে—

সোহম্ বললে—এই-ই কি তোমার শেষ কথা ?

সুমিত্রা হাসতে লাগলো। তারপর বললে—তোমার কথাগুলো ঠিক নাটকের মতোই শোনাচ্ছে। আশ্চর্য, আগেকার মতো এখনও তুমি এমন নিখুঁত অভিনয় করতে পারছো দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে যেন তুমি সত্যি কথা বলছো—

সোহম্ গলাটা এবার একটু চড়িয়ে দিলে। বললে—কে বললে আমি মিথ্যে

কথা বলছি ?

সুমিত্রাও তার গলা চড়িয়ে বললে—তোমার মুখ, তোমার মুখ বলছে তুমি মিথ্যে কথা বলছো—আবার কে বলবে ?

সোহম্ বললে—তুমি আমার বাইরের মুখটাই কেবল দেখলে ? এতদিন আমরা একসঙ্গে এক বাড়িতে এক ঘরে থেকেছি, তখন আমার মনটাকেও তো তুমি দেখেছ, তবু বলবে এটা আমার মুখের কথা ?

পাশের বাড়ির দোতলা থেকে আবার সেই মন্তব্যটা ছুটে এলো—এই হারাম-জাদারা, চুপ কর্ না—

সুমিত্রা সে-চিৎকারে কান না দিয়ে বললে—মুখের কথা না তো কী ? মনের কথা ? টাকা ছাড়া আর কারো কথা কখনও কি তুমি ভেবেছ ? শুধু ভাবা নয়, তুমি যদি কখনও কাউকে স্বপ্নও দেখে থাকো তো সে কেবল টাকারই স্বপ্ন দেখেছ, তুমি যদি কাউকে চুমুও খেয়ে থাকো তো তাও কেবল তুমি টাকাকেই চুমু খেয়েছো, যখন তুমি স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কখনও মদও খেয়েছো, তখনও তুমি কেবল মদকেই টাকা খাচ্ছো বলে মনে করেছ। তবু বলবে আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারিনি ? তবু বলবে আমি তোমাকে চিনতে পারিনি ?

সোহম্ কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে সুমিত্রা বলতে লাগলো—তোমার টাকা যোগাতে কা'র কা'র সঙ্গে না আমাকে শুতে হয়েছে! কখনও ভানুভাই প্যাটেল, কখনও ইব্রাহিম···কত লোকের নাম করবো ? কত লোকের মন যোগাবার জন্যে কত ছলা-কলা-অভিনয় আমাকে করতে হয়েছে শুধু তোমার টাকার নেশা মেটাবার জন্যে, তার কি কোনও হিসেব আছে, না হিসেব রাখা সম্ভব! এখন বলতে এসেছ আমার মেয়েকে তোমার সব কিছু টাকাকড়ি সম্পত্তি দিয়ে তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে—

সোহম্ বললে—শম্পা কি শুধু তোমারই মেয়ে, আমার মেয়ে নয় ?

সুমিত্রা বললে—না, শম্পা তোমার মেয়ে নয়—

—সে কী ? শম্পা আমার মেয়ে নয় ?

—না - না—না—আমি প্রমাণ করতে পারি শম্পা তোমার মেয়ে নয়—

পাশের আর একটা দোতলা বাড়ি থেকে অন্য কে একজন এক বালতি ময়লা জল সকলের মাথার ওপর হুড় হুড় করে ছুঁড়ে ফেললে।

—এই হারামজাদারা, চুপ কর না—

আর সেই ময়লা কাদা জল সোহম্ শম্পা সুমিত্রা কোঠারির মাথার ওপর পড়ে সকলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাদায় জলে কলঙ্কিত কর্দমাক্ত হয়ে গেল।

মিস্টার বিশ্বাস তখন কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। নব্বুই লক্ষ টাকার 'ডীড্-অব্-গিফ্ট্' স্ট্যাম্প-পেপারের ওপর টাইপ্ করা হয়ে গেছে। এত রাত্রে টাইপিস্ট্কে ঘুম থেকে জাগিয়ে মিস্টার বিশ্বাস সোহম্ রায়ের জন্যে অনেক কষ্ট করেছেন।

সোহম্ যখন নিজের সইটা করে দিলে তখন ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে বারোটা।

তারপর সোহম্ তার হাতের কাগজ-পত্র ভরা ব্যাগটাও এগিয়ে দিলে মিস্টার বিশ্বাসের দিকে। শেয়ার ডিবেঞ্চার, ব্যাঙ্কের পাস-বই, ক্যাশ্ টাকা, সমস্ত কিছু ওর মধ্যে আছে। মিস্টার বিশ্বাস তার বহুকালের চেনা সলিসিটার। তিনি হিসেব করে সব দেখে শুনে গুনে নিয়েছেন।

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন—আপনি সবই তো দিয়ে দিলেন, এখন আপনার নিজের বলতে কী রইল ?

সোহম্ বললে—রইল ওই চাকরিটা, আর আমার ওই ফ্ল্যাটটা। চাকরিটা যতদিন চালাতে পারি চালাবো –

—তারপর ? তারপর কী হবে ? আপনাদের তো পেন্শনও নেই। শুধু প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড্—

সোহম্ বললে—অত দূরের কথা এখন আর ভাবতে পারছি না—আজ তো আমি বেঁচে আছি, কিন্তু কাল বেঁচে থাকবো কিনা তা আজকালকার যুগে কেউ কি বলতে পারে ? জানেন মিস্টার বিশ্বাস···

একটু থেমে সোহম্ আবার বললে—জানেন মিস্টার বিশ্বাস, এই সব শেয়ার সার্টিফিকেট, যা-কিছু আপনি দেখছেন এ-গুলো কিনিয়ে দিয়েছিল একজন ব্রোকার। তার নাম মেহের-আলি। সে আমাকে কেবল বলতো—'ইণ্ডিয়ান আয়রন কভি ঝুট্ নেহি হো স্যাক্তা হ্যায়'। এই-ই কেবল ছিল তার বুলি। কিন্তু সেই মেহের আলিই আবার একদিন বলতে লাগলো—সব ঝুট্ হ্যায়—সব ঝুট্ হ্যায়--

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—কেন ?

—তার কারণ একদিন তার মেয়ে টাকার লোভে চলে গেল আরব কাণ্ট্রিতে। আমিও আগে মনে করতাম যতক্ষণ টাকা আছে আমার কাছে, ততক্ষণ সব ঠিক আছে। কিন্তু আজ আমিও মেহের আলি হয়ে গিয়েছি মিস্টার বিশ্বাস। আমিও তাই কেবল বলছি—সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়—

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—তাহলে কাল আপনি রেজিস্ট্রি অফিসে আসছেন তো ?

সোহম্ বললে—আমি তো বললাম, কাল আমি আছি কি নেই তারই কি ঠিক আছে ? আপনিই সব করিয়ে দেবেন। আমি তো ডীড্-অব্-গিফ্টের সব

কাগজে সই করে দিয়েছি। সেখানে আর আমার থাকার কি খুব দরকার আছে?

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—না, আপনি যদি একটা পাওয়ার-অব্-এ্যাটর্নীতে সই দিয়ে দেন তো তাতেই কাজ হয়ে যাবে—

সোহম্ বললে—তাহলে তাই-ই করুন—

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—আমি এতদিন প্র্যাক্‌টিস করছি, কিন্তু এ-রকম কেস আমি আগে আর কখনও দেখিনি—

সোহম্ বললে—দেখেননি, কারণ আমার আগে পৃথিবীর আর কোনও লোক আমার মতো এমন করে ঠকেনি।

—কিন্তু কেন এমন হলো মিস্টার রায়?

সোহম্ বললে—হলো এইজন্যে যে আমি ধরেই নিয়েছিলাম পৃথিবীতে টাকাটাই বুঝি সব—

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—কিন্তু কেন আপনি এ-রকম ধরে নিয়েছিলেন?

সোহম্ বললে—সে-সব কথা এখন আর বলে লাভ কী? টাকার জন্যে আমি আমার স্ত্রীকে সব রকম অধিকার দিয়েছিলাম। একেবারে অবাধ অধিকার। এত অবাধ অধিকার কেউ কারো স্ত্রীকে কখনও দেয় না। কারণ সারা পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যতো রকমের বিরোধ-বিচ্ছেদ হয়, দেখা গেছে তার প্রধান কারণ হলো স্বামী বা স্ত্রীর মনে এই অধিকার-বোধের চেতনা। আমি তার এই অধিকার-বোধের চেতনার ওপর কখনও কোনও রকম আঘাত করিনি। বরং উল্টোটাই করেছিলাম—

—উল্টোটা কী?

সোহম্ বললে—আমার অফিস থেকে আমাকে এক বছরের জন্যে ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। মিডল্ ইস্টে আমাদের কোনও ব্র্যাঞ্চ খোলা যায় কি না তা পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল আলাদা—

—তার মানে?

সোহম্ বললে—এ-রকম অনেক মাল্‌টি-ন্যাশনাল ফার্মেই করা হয়ে থাকে। আমাকে ইরাকে পাঠানো হয়েছিল আমার স্ত্রীর কাছ থেকে আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে। যাতে ভানুভাই প্যাটেল কলকাতায় আমার মিসেসের সঙ্গে খোলাখুলি মিশতে পারেন।

মিস্টার বিশ্বাস এ-সব খবর জানতেন না। তিনি অবাক হয়ে মিস্টার রায়ের কথাগুলো শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তাই নাকি? তারপর?

—তারপর আর কী? তারপর যা হওয়ার তাই হলো। আমাদের কোম্পানি তার ফলে মিস্টার প্যাটেলের কাছ থেকে কয়েক পার্সেন্ট অর্ডারের শেয়ার পেলে। ব্যালেন্স-শীটে অনেক কোটি টাকা নীট্ প্রফিট করলে আমাদের ফার্ম, আর আমাকে করে দেওয়া হলো কোম্পানির একজন ডিরেক্টার। তার ফলে আমার অনেক টাকা মাইনে বাড়লো, আর তার সঙ্গে বাড়লো আমার ইজ্জৎ। কিন্তু…

—কিন্তু কী?

—কিন্তু, এই তো আজ দেখছেন আমাকে। এই ময়লা জল কাদা মাখা জামা-

কাপড় নিয়ে এই রাত সাড়ে বারোটার সময়ে আপনার কাছে নব্বুই লাখ টাকার প্রপার্টি কার নামে আমি ডীড্-অব্-গিফট্ করছি। সে আমার কে? কেউ-ই না। আজ প্রমাণ হলো যাকে আমি নিজের বলে মনে করেছিলুম সে কিনা পরের। এর চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি মানুষের জীবনে আর কী হতে পারে?

ততক্ষণে পাওয়ার-অব্-এ্যাটর্নীর ফর্মে সই করে দিয়ে সোহম্ দাঁড়িয়ে উঠলো।

মিস্টার বিশ্বাসও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বাড়িতে গিয়েই যত শিগগির পারেন আগে এই ভিজে জল-কাদা মাখা জামা-প্যাণ্ট সব বদলে ফেলবেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব ভিজে একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছে। নইলে অসুখ করতে পারে—

সোহম্ বাইরে যেতে যেতে বললে—বাইরে থেকে আমার আর কতটুকু অসুখ আপনি দেখতে পাচ্ছেন মিস্টার বিশ্বাস। আমার ভেতরটা যদি কেউ দেখতে পেতো·· সেখানে আরো কতো ময়লা জল-কাদা···আরো কত কলঙ্ক লেগে আছে, তা যদি কেউ দেখতে পেতো···

সোহম্ গিয়ে গাড়িতে উঠলো। মিস্টার বিশ্বাস সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। বললেন—আপনি কিছু ভাববেন না মিস্টার রায়, আমি কাল সব ঠিক করে দেব'খন। তারপরে কী হলো আপনাকে তা টেলিফোনে সব জানিয়ে দেব—

সোহম্ তার গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতেই সেটা গর্জন করে উঠলো। তারপর পা দিয়ে এ্যাক্সিলেটারে চাপ দিতেই আস্তে আস্তে গাড়িটা সামনের বড়ো রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

মিস্টার বিশ্বাস তখনও সেইখানে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। চারদিক নিস্তব্ধ। রাস্তায় লোকজনের চলাচলও কমে এসেছে। মিস্টার রায়ের কথাটা ভেবে মিস্টার বিশ্বাসের মনে কষ্ট হলো। অনেক দিন পরে মিস্টার বিশ্বাস একটা সত্যিকারের দুঃখী মানুষের দেখা পেলেন। নইলে পৃথিবীতে দুঃখী লোকের তো শেষ নেই। কিন্তু সব থেকেও কিছু-না-থাকার মতো দুঃখী মানুষ ক'টা আছে এ-সংসারে!

সামনের দিকে গাড়িটা দৌড়ে চলেছে। শুধু পেছনে দু'টো লাল আলোর বিন্দু। আর গাড়ির নম্বর প্লেটটা তখনও দেখা যাচ্ছে: ডবলউি-বি-এ—টু-থ্রি-ফাইভ-এইট ··

একসময়ে সেটাও কখন অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল—

প্রতিদিনই মিস্টার বিশ্বাসের ঘুমোতে যেতে অনেক রাত হয়। এটাই তাঁদের পেশা। তারপর পরের দিন সকাল সাড়ে সাতটার সময় ঘুম ভাঙে। তার আগে নয়।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ স্ত্রীর ডাকা-ডাকিতে তাঁর একটু সকাল-সকালই ঘুম ভেঙে গেল।

—ওগো, ওঠো—ওঠো—

মিস্টার বিশ্বাস চোখ মেলে বললেন—কী? কী ব্যাপার?

—এই দেখ, আজকের খবরের কাগজে কী খবর বেরিয়েছে!

মিস্টার বিশ্বাস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কী খবর?

স্ত্রী বললেন—ওই যে তুমি কাল রাত্তিরে বলছিলে মিস্টার রায়ের কথা, সেই তাঁর খবরটা বেরিয়েছে। সেই গাড়িটা আগুনে পুড়ে গেছে কাল রাত্তিরে—

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—সে কী? কীসে বুঝলে মিস্টার রায়ের গাড়ি?

—ওই যে তুমি বলছিলে গাড়ির নম্বরটা—ডবলিউ-বি-এ—টু-থ্রী-ফাইভ-এইট্—

মিস্টার বিশ্বাস তাড়াতাড়ি চশমাটা চোখে লাগিয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। খবরটা খুব ছোট। লোয়ার সার্কুলার রোডের পূর্ব প্রান্তে রাত সাড়ে বারোটার সময় একটি গাড়িতে চলন্ত অবস্থায় আগুন লেগে সেটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। পুলিস-সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে দমকল বাহিনী এসে আগুন নিভিয়ে দেয়। গাড়ির নম্বর প্লেটের ওপর অর্ধ-দগ্ধ অবস্থায় নিম্নলিখিত নম্বর লেখা ছিল—ডব্লিউ-বি-এ—টু-থ্রী-ফাইভ্-এইট। গাড়িতে কোন আরোহী বা চালক ছিল না। পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গাড়ির মালিকের অনুসন্ধান চলছে ··

মিস্টার বিশ্বাস তাঁর ডায়েরীর পাতা খুঁজে মিস্টার রায়ের বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা বার করে ডায়াল করতে লাগলেন। রিং হয়েই যেতে লাগলো, হয়েই যেতে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোনটা শুধু বেজেই যেতে লাগলো। কেউই সাড়া দিলে না।

তাঁর মনে হলো তাহলে হয়তো টেলিফোনটা আউট্-অব্-অর্ডার। মানে টেলিফোনটা বিগড়ে গেছে।

স্ত্রী বললেন—কী হলো? মিস্টার রায়কে পেলে?

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—না, পেলুম না··—টেলিফোনটা কেউ ধরছে না। কিম্বা হয়তো আউট-অব্-অর্ডার—

স্ত্রী বললেন—কালকে রাত্তিরে তুমি ঘরে এসে বললে না মিস্টার রায়ের

কথা ? মিস্টার রায় নাকি তাঁর স্ত্রীর কাছে ধাক্কা খেয়ে মেয়ের নামে নব্বুই লক্ষ টাকা দানপত্র করে দিতে এসেছেন—তোমাকে পাওয়ার-অব্-এ্যাটর্নী দিয়ে গেছেন ?

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—হ্যাঁ, আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল মিস্টার রায়ের জন্যে। সারা গায়ে তখনও জল-কাদা মাখা। তাই তিনি চলে যাওয়ার পর আমি তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে ভাবছিলুম তাঁর কতো কষ্ট! তখন দেখেছিলুম গাড়িটার পেছনে দু'পাশে দু'টো লাল আলো জ্বলছে আর মাঝখানটায় নম্বর-প্লেটের ওপরে লেখা রয়েছে W B. A 2358…

স্ত্রী বললেন—সেইটে তুমি আমাকে বলেছিলে বলেই আমার মনে আছে। তারপর আজ সকালে খবরের কাগজটা খুলে এই নম্বরটা খবরে দেখেই আমার কেমন খট্‌কা লাগলো, সব মনে পড়ে গেল, তাই তোমাকে ডাকলুম…

তারপর মিস্টার বিশ্বাস অফিসের কিছু জরুরী কাজ সারলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিসে যাওয়ার আগে মিস্টার সোহম্ রায়ের কাগজ-পত্র নিজের ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখলেন। তখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন এগারোটা বেজেছে।

হঠাৎ মনে পড়লো মিস্টার রায়ের কথা। মিস্টার রায়ের বাড়ির টেলিফোনটা হয়তো খারাপ হতেও পারে। সেটা কলকাতার মতো শহরে কিছু অবাস্তব ঘটনা নয়। কিন্তু টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্‌সন্ কোম্পানির অফিস ? সে-অফিসের তো অনেকগুলো টেলিফোন-নম্বর। সেখানে টেলিফোন করলে কেমন হয়!

তিনি সেখানে টেলিফোন করতেই অপারেটার ধরলে।

মিস্টার বিশ্বাস জিজ্ঞেস করলেন—মিস্টার সোহম্ রায়কে একবার লাইনটা দিন তো ?

অপারেটার কানেকশান দিলে। সেখানেও কেউ টেলিফোন ধরলে না। অন্য একটা লাইনে কে একজন লোক বললে—মিস্টার রায়কে খুঁজছেন ?

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—হ্যাঁ, তিনি কি অফিসে এসেছেন ?

ভদ্রলোক বললেন—না, অন্য দিন এতক্ষণের মধ্যে তিনি অফিসে এসে যান, কিন্তু আজ এখনও আসেননি। আপনি কে বলছেন ?

মিস্টার বিশ্বাস বললেন—তিনি এলে বলে দেবেন আমি তাঁর সলিসিটার এস-বি-বিশ্বাস টেলিফোন করেছিলাম। আচ্ছা, ছাড়ছি…

এতদিন ধরে যে কাহিনী বলে গেলাম এ কিন্তু আমার জানা ঘটনা নয়। সবই আমার শোনা কথা, আমি এ ব্যাপারে আগে বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না। কয়েক বছর আগে আমার এক রাজস্থানী বন্ধু আমাকে তাঁর রাজস্থানের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য বেড়ানো। অর্থাৎ ছুটি কাটানো। সাধারণতঃ ছুটি তো আমি পাই না। ছুটি আমার কপালে নেই। হাতের কলম জোর করে কেউ কেড়ে না নিলে আমার ছুটি নেই। যখন যে-কাজই আমি করেছি তা পুরো মন-প্রাণ-ধ্যান দিয়েই করেছি। সেই কতো কাল আগে একদিন হাতে আমি আমার কলম তুলে নিয়েছিলুম, তখন থেকে এই প্রায় ষাট বছর ধরে এই রকমই চলেছে। কখনও যে একেবারে ছুটি নিইনি তা নয়, ছুটি নিয়েছি। কিন্তু তখন সেই ক'দিন কলম দিয়ে না লিখলেও মাথা দিয়ে মনের পাতায় লিখে লিখে মন ভরিয়েছি।

কলকাতা থেকে বিকেল পাঁচটায় রাজধানী এক্সপ্রেস ধরে পরের দিন বলা এগারোটায় দিল্লী পৌঁছিয়েছি। আর সেই দিনই রাত ন'টায় আর একটা ট্রেন ধরে পরের দিন সকাল ছ'টায় এসে পৌঁছিয়েছি এই চৌবোঁড়িয়াতে।

গ্রাম বলতে যা বোঝায় এই চৌবোঁড়িয়াও তাই। স্টেশন থেকে দেড় ঘণ্টার রাস্তা অতিক্রম করে এই গ্রাম। আমার বন্ধু শ্রীনিবাস ভোরা, আমার বহুকালের পরিচিত। শ্রীনিবাসরা কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজস্থানের বসবাস বা জন্মভিটে সে ত্যাগ করেনি।

ক'দিন পরিপূর্ণ কর্ম-বিরতিই ছিল দু'জনের মূল উদ্দেশ্য। তবু কলকাতায় ফেলে-আসা লেখাগুলো বা সেই সব অসমাপ্ত চরিত্রগুলো একলা হলেই তখনও পেছু-তাড়া করছিল। সকালে বিকেলে হেঁটে হেঁটে বেড়াবার সময়ে দু'জনে গল্প করি। এ অঞ্চলে আগে দু'বার এসেছি কিন্তু এই গ্রামের আবহাওয়ায় কখনও আসার সুযোগ ঘটেনি। আমার ধারণা ছিল রাজস্থান মানেই হলো মরু-অঞ্চল, কিন্তু দেখলাম, না, এখানে প্রকৃতির অকৃপণ দানের কোনও কামাই-ই নেই।

একদিন চলতে চলতে বন্ধু বললে—ওই দেখ 'মাতৃ-মন্দির'—

দেখলাম। দেবনাগরী অক্ষরে বড়ো বড়ো করে গেটের ওপর লেখা রয়েছে নামটা।

শ্রীনিবাস বললে—ওই দেখ একজন বাঙালী মহিলা এখানে এসে ওই 'মাতৃ-মন্দির'টা তৈরি করেছে—

জিজ্ঞেস করলাম—বাঙালী মহিলা ?

—হ্যাঁ—

—ওখানে কী হয় ?

শ্রীনিবাস বললে—কুষ্ঠরোগীদের জন্যে ওখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। হাতে-কলমে কাজ শেখাবার ব্যবস্থাও আছে। সব রকম ব্যবস্থা করেছেন ওই বাঙালী মহিলাটি—

বাঙালী মহিলা শুনে আমার খুব কৌতুহল হলো। জিজ্ঞেস করলাম—বাঙালী মহিলা হয়ে বাঙলাদেশ ছেড়ে এখানে তিনি 'মাতৃ মন্দির' প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন কেন ?

শ্রীনিবাস বললে—শুধু তো এখানে নয়, আরো দু'জায়গায় উনি কুষ্ঠাশ্রম করেছেন। একটা মহারাষ্ট্রের নাগপুরে, আর একটা হৃষিকেশের ব্রহ্মপুরীতে, পাহাড়ের ওপর—

অবাক হওয়ারই কথা। যে কেউই শুনবে তারই কৌতুহল হবে।

শ্রীনিবাসই বললে—আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে মাতাজী এখানে এসে ওই 'মাতৃ-মন্দির'টা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে যা হয় তাই হয়েছিল—

—তার মানে ?

শ্রীনিবাস বললে—প্রত্যেক শুভ কাজেই তো প্রথমে বাধা থাকে। পৃথিবীতে এমন কোনও মহাপুরুষ নেই বা এমন কোনও শুভ প্রতিষ্ঠান নেই যা প্রথমে বাধা পায়নি। আমাদের গীতাতেও তা লেখা আছে 'সর্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নি যথাবৃতা'। মানে সমস্ত কিছুর আরম্ভতে দোষ থাকে, আগুনের শুরুতে যেমন থাকে ধোঁওয়া। আরও একটা কথা—দু'টো শুভ জিনিস একসঙ্গে মিশলে কখনও শুভ ফল হয় না। যেমন ঘি আর মধু—ও দু'টোই অমৃত, কিন্তু সমান মাপে মেশালেই ওটা বিষ হয়ে যাবে—

শ্রীনিবাসের মুখে কথাগুলো শুনে জিজ্ঞেস করলাম—এ সব কথা তোমাকে কে বললে ?

শ্রীনিবাস বললে—মাতাজী—

বলে একটু থেমে আবার বললে—দেখ, সুখ দুঃখ মঙ্গল কল্যাণ, এসব কথাগুলোর প্রতিপক্ষ আছে কিন্তু আনন্দের কোনও প্রতিপক্ষ নেই।

জিজ্ঞেস করলাম—এ-সব কথাও কি মাতাজীর ?

শ্রীনিবাস বললে—হ্যাঁ—

আমার কৌতুহল আরো বাড়ালো। মাতাজীকে দেখবার ইচ্ছে হতে লাগলো।

শ্রীনিবাস আমাকে নিয়ে গেল সদর গেটের কাছে। সেখানে একটা কালো বোর্ডের মাথায় দেবনাগরী ভাষায় লেখা আছে "মাতৃ-মন্দির"। আর তার নিচেই দেবনাগরী অক্ষরে একটা লম্বা শ্লোক লেখা রয়েছে।

আমি শ্লোকটা পড়তে লাগলাম :

ভোগে রোগভয়ম
কুলে চ্যুতিভয়ম্
বিত্তে নৃপালাদ্ ভয়ম্
শাস্ত্রে বাদিভয়ম্
গুণে খলভয়ম্
কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ম্
সর্বংবস্তু ভয়াম্বিতং ভুবি
নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্

শ্লোকটার নিচেয় ইংরেজীতে অনুবাদ আছে :

'In enjoyment there is the fear of disease; in social position, the fear of falling-off; in wealth, the fear of (hostile) kings; in honour, the fear of humiliation; in power, the fear of enemies; in beauty, the fear of old age; in scriptural erudition, the fear of opponents; in virtue, the fear of traducers; in body, the fear of death. All the things of the world pertaining to man are attended with fear; renunciation alone stands for fearlessness.'

এর নিচেয় লেখা রয়েছে : ভর্তৃহরিকৃত 'বৈরাগ্যশতক'

শ্রীনিবাস ভর্তৃহরির নাম শোনেনি। এই উনিশশো সাতাশী সাল থেকে দু' হাজার বছর আগেকার এক মহারাজার নাম যে ভর্তৃহরি সে-খবর শ্রীনিবাসের না শোনাই স্বাভাবিক।

শুধু শ্রীনিবাসকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী? কে-ই বা ভর্তৃহরির নাম শুনেছে? ইণ্ডিয়া যখন ভাগ হয়নি, বর্মা সিংহল যখন ইণ্ডিয়ার সংলগ্ন ছিল তখনকার ভারতবর্ষের কথা জানতে কার আগ্রহ আছে? কারোরই নেই।

'বৈরাগ্যশতকে' তো আরো শ্লোক আছে। কই, সেগুলোর মধ্যেকার কোনও শ্লোক তো এখানে নেই। কেন বেছে বেছে ওই শ্লোকটাই বা ওখানে উদ্ধৃত করা হলো?

শ্রীনিবাসকে জিজ্ঞেস করলাম—মাতাজীর সঙ্গে কি একবার দেখা করা যায়?

সে ভেতরে গিয়ে খবর নিয়ে এসে বললে—মাতাজী এখন হৃষিকেশে আছেন, পরের বুধবারে চৌবেড়িয়াতে আসবেন।

তখনও হাতে কয়েক দিন সময় ছিল। তাই 'মাতৃ-মন্দির' সম্বন্ধে খবর নেওয়ার ইচ্ছে হলো। মনে মনে ভাবলাম এ কেমন বাঙালী মহিলা যে বাংলা দেশ ছেড়ে নাগপুরে, বৃন্দাবনে আর এই রাজস্থানের চৌবেড়িয়াতে কুষ্ঠাশ্রম চালাবার জন্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন? এত টাকাই বা আসে কোথা থেকে? এর খরচ নির্বাহই বা হয় কী করে? এ তো হাজার-হাজার টাকার ব্যাপার নয়, লক্ষ-লক্ষ টাকার আয় না থাকলে এ-রকম প্রতিষ্ঠান তো চালানো সম্ভব নয়।

আর তা ছাড়া কৌতূহলের আরো একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে মাতাজীর ব্যক্তিগত জীবনের প্রশ্ন। মাতাজীর এই প্রচেষ্টার পেছনে কীসের প্রেরণা আছে? সাধারণতঃ অন্য বাঙালী মহিলাদের তো সকলেরই আকাঙ্ক্ষা যথাসময়ে একটা বিয়ে করে সংসার করবার পরিকল্পনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এ-রকম অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা কেনই বা হলো এই মাতাজীর?

জিজ্ঞেস করলাম—এই সব আশ্রমের অভিশপ্ত প্রাণীদের কাজকর্ম ... মন্তব্য বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টার মধ্যেই শেষ? এরা কি বিবাহিত না ... এদেরও কি ফ্যামিলি-লাইফ বলে কিছু আছে? না কি শুধুই ... নিঃস্ব, নিঃসঙ্গ জীবন, আর কিছুই নয়? ... এর জন্যে প্রথমে

শ্রীনিবাস বললে—দাঁড়াও, আমি ভেতরে গিয়ে মিস্টার মারোয়াঁর সঙ্গে একবার কথা বলে আসি—

—মিস্টার মারোয়াঁ ? তিনি কে ?

শ্রীনিবাস বললে—মিস্টার মারোয়াঁই তো এখানকার সব। ফ্রান্সের লোক তিনি, এখানকার কাজ-কর্ম সব কিছু তিনিই দেখাশোনা করেন—

ফ্রান্সের কথা মনে পড়লেই আমার জ্যাঁ-জ্যাক-রুশোর কথা মনে পড়ে। সেই রুশো, যিনি টলস্টয়ের গুরু, টলস্টয়ের গলার হারের লকেটে বরাবর যাঁর ছবি আঁটা থাকতো। শুধু তাই নয়। 'Remembrance of Things Past'-এর লেখক প্রুস্ত্-এর দেশ ফ্রান্স, ভিক্টর হুগোর দেশ ফ্রান্স, বিপ্লবের দেশ ফ্রান্স, রোমাঁ রোলাঁর দেশ ফ্রান্স, সাহিত্যের দেশ ফ্রান্স, গানের দেশ ফ্রান্স, সুরের দেশ ফ্রান্স। সেই দেশের লোক এ-দেশে কেন ? এই দারিদ্র্যের দেশে ?

খানিক পরে শ্রীনিবাস ফিরে এসে বললে—চলো দাদা, মিস্টার মারোয়াঁ আমাদের ভেতরে ডাকছেন—

আমার মাথার মধ্যে তখনও ভর্তৃহরির শ্লোকগুলো গজ-গজ করছে। 'বৈরাগ্য-মেবাভয়ম্'। ভোগ থাকলেই রোগের ভয় আছে, প্রতিষ্ঠা থাকলেই পতনের ভয় আছে, টাকা থাকলেই ইনকাম ট্যাক্সের ভয় আছে, সম্মান থাকলেই অপমানের ভয় আছে, ক্ষমতা থাকলেই শত্রুতার ভয় আছে, রূপ থাকলেই জরার ভয় আছে, শাস্ত্রজ্ঞান থাকলেই বিরোধিতার ভয় আছে, গুণ থাকলেই নিন্দুকদের ভয় আছে, শরীর থাকলেই যমের ভয় আছে। একমাত্র বৈরাগ্যের মধ্যেই অভয় আছে। বৈরাগ্য ছাড়া আর সব জিনিসই ভয়াবহ।

কিন্তু এই ভর্তৃহরির কথায় সুদূর ফ্রান্সের একজন লোক কী করে আকৃষ্ট হলো ? তারা তো বিলাস-বৈভবের মধ্যেই চরম তৃপ্তির সন্ধান করে। তাহলে তাদের দেশের লোকদের মধ্যেই কি ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার আগ্রহ আছে ?

আর ভর্তৃহরি তো ভারতবর্ষের একজন সম্রাট ছিলেন। মহাপ্রতাপশালী সম্রাট। উজ্জয়িনী ছিল তাঁর রাজধানী ! সেই ভর্তৃহরি কেন রাজ-সিংহাসন ছেড়ে বনে চলে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন ?

আমি শ্রীনিবাসের সঙ্গে মাতৃ-মন্দিরের ভেতর দিয়ে চলেছি। মাতৃ-মন্দির অতিক্রম করে বাইরের বিরাট চত্বরে পৌঁছোলাম। সেখানে একদিকে একটা ছাপাখানা চলছে। মাতৃ-মন্দিরের যা-কিছু পত্র-পত্রিকা বুকলেট্ সমস্তই নাকি সেই প্রেসে ছাপা হয়। কুষ্ঠগ্রস্ত রোগীরাই সেই ছাপাখানা চালাচ্ছে।

প্রেসটা পাশে রেখে বাঁদিকে বরাবর সব আশ্রমবাসীদের বসবাসের ঘর। সেখানে অনেক শিশুরা খেলা করছে। ডানদিক বরাবর বাগান। বাগানের [illegible]কিও করছে আশ্রমবাসীরা। নানা রকম শাক-সব্জীর চারাগাছের পরিচর্যা [illegible]ই কাজ। তারাই তাদের খাবার সংস্থান করছে। এটাও নাকি তাদের [illegible]-কর্মের তালিকাভুক্ত।

[illegible] খানিকটা এগিয়ে তাঁতঘর।

[illegible]াট। অনেকগুলো 'পাওয়ার-লুম্'।

সেখানেই দেখা হলো মিস্টার মারোয়াঁর সঙ্গে। বয়েস বেশি নয়। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হবে বড় জোর। আমাদের দেখেই তিনি এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা করতে।

তাঁর কাজে বাধা পড়লো বলে আমরা ক্ষোভ করতেই তিনিই বললেন—তাতে কি, আপনারা যে অতিথি—

জিজ্ঞেস করলাম—এসব কী তৈরি হচ্ছে এখানে ?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—কার্পেট।

—শুধু কার্পেট ?

—এখন শুধু কার্পেট তৈরি হচ্ছে।

—আর কী কী তৈরি হয় এখানে ?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—কার্পেট ছাড়া শতরঞ্জি হয়, বেড্-শীট্ হয়, পাপোষ হয়, টাওয়েল্ হয়—সব এখানকার মানুষরাই তৈরি করে।

—এগুলো কারা কেনে ?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—ইউরোপে, আমেরিকায় সবাই কেনে। বেশির ভাগ জিনিসই বিদেশে এক্সপোর্ট হয়। সেই টাকাতেই এখানকার ইনমেট্সদের খাওয়া-দাওয়া থাকা-পরা-চিকিৎসা সব কিছুই চলে! আসল উদ্দেশ্য এই ইনমেটস্‌দের বুঝতে দেওয়া যে তারা সোসাইটিতে অপ্রয়োজনীয় নয়। তারাও মানুষের সমাজকে কিছু দিতে পারে। সে ক্ষমতা অন্য লোকদের মতো তাদেরও আছে! দে আর নট্ এ বার্ডেন টু হিউম্যান সোসাইটি। তার মানে তারা মানুষের সমাজের বোঝা নয়।

কথাটা জিজ্ঞেস করা অসঙ্গত হবে কিনা না ভেবেই বললাম—আপনি তো ডেভেলপড্ কানট্রির লোক, আপনি কেন এই ডেভেলপিং কানট্রিতে এলেন ? কীসের টানে ?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—সে তো এক লম্বা কাহিনী। এক কথায় মাতাজীর জন্যেই আমি এখানে এসেছি—মাতাজীই আমাকে এখানে এনেছেন বলতে পারেন।

—কী রকম ?

—মাতাজী একদিন বলেছিলেন যে বিধাতা-পুরুষ প্রত্যেকটি মানুষের জন্মের আগে জিজ্ঞেস করেন—তোমাকে যে আমি পৃথিবীতে মানুষ করে পাঠাচ্ছি, তা তুমি কী চাও ? মৃত্যু চাও, না অমৃত চাও ? তুমি যদি মৃত্যু চাও তো তুমি সব পাবে। সুখ-শান্তি গাড়ি-বাড়ি টাকা-পয়সা সব পাবে। আর তুমি যদি 'অমৃত' চাও তো সুখ-শান্তি গাড়ি-বাড়ি টাকা-পয়সা ওসব কিছুই পাবে না। এখন ভেবে দেখ তুমি কোনটা চাও ? মৃত্যু না অমৃত ?

আমরা মারোয়াঁ সাহেবের কথাগুলো মন দিয়ে শুনলাম, কিন্তু মন্তব্য কিছু করলাম না।

—তারপর ?

মারোয়াঁ সাহেব আবার বলতে লাগলেন—আমি দু' বছরের জন্যে প্রথমে

এসেছিলাম। কিন্তু এখন তো আমার এই আঠারো বছর হয়ে গেল ইণ্ডিয়াতে রয়েছি—

জিজ্ঞেস করলাম—এত বছর কেন রয়ে গেলেন? তার প্রধান কারণটা কী?

—কারণটা ··

বলতে গিয়েও মারোয়াঁ সাহেব কী ভেবে একটু থেমে গেলেন।

তারপর বললেন—একদিন মাতাজীকে এমনি জিজ্ঞেস করেছিলাম—What is the greatest treasure of a man's life?

মাতাজী বলেছিলেন—দুঃখ। দুঃখই মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ!

আমরা কথাটা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি দেখে মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—আমিও কথাটা শুনে প্রথমে আপনাদের মতোই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম যে অতো বড় সত্যি কথা পৃথিবীতে আর একটাও নেই। নিজে আমি কোটিপতির ছেলে। পৃথিবীতে যা কিছু মানুষ চায়, তা সমস্ত আমার আছে। আছে এবং ছিলও। কিন্তু সেই টাকা থাকবার জন্যেই হয়তো যতো লোক আমাকে ভালোবেসেছে, যতো লোক আমার কাছে এসেছে সবাই আমার শত্রুতা করেছে। তখন বুঝলাম তাদের ভালবাসার, তাদের কাছে আসার একমাত্র আকর্ষণ হলো আমার টাকা। একবার আমার কঠিন এক অসুখ হলো, সবাই মিলে দিন-রাত আমার সেবা করলে। ডাক্তাররাও অনেক কষ্ট করে আমার ট্রিটমেণ্ট করতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সবাই বুঝতে পারলো যে আমি নির্ঘাত মারা যাবো। সব চিকিৎসাই আমার ব্যর্থ হলো।

মিস্টার মারোয়াঁ কথা বলতে বলতে একটু থামলেন।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

—কিন্তু আমার সেই অসুখটা না হলে আমি পৃথিবীটাকে ভালো করে চিনতেই পারতুম না। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে তারা সবাই কেবল আমার কাছে নিতে এসেছে। যতো দিন আমার দেবার ক্ষমতা থাকবে ততদিন তারা আমার বন্ধু থাকবে। যেদিন আমি তাদের দেওয়া বন্ধ করবো সেই দিনই তারা আমাকে ত্যাগ করবে। আমার বাবা আগেই মারা গিয়েছিলেন, তারপর আমার সেই অসুখের সময় মা'ও মারা গেল। এখন পৃথিবীতে আমার আপন বলতে আর কেউই রইল না। সেই অসুখের সময়েই আমার হাতে এসে পড়লো একখানা বই। আঁদ্রে জিদের অনুবাদ করা পোয়েট টেগোরের একটা কবিতার বই—'গীতাঞ্জলি'। সেই বই থেকেই আমি একটা নতুন কথা শিখলুম। শিখলুম যে দুঃখ আর আঘাত ন্যায্য হোক আর অন্যায্য হোক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চলবার অতিচেষ্টায় আমাদের ভেতরকার মনুষ্যত্বকে তা কেবল দুর্বল আর ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে। আরো শিখলুম যে যে-দেওয়ার মধ্যে কোনও কিছু নেওয়ার সম্পর্ক নেই সেইটেই হলো আসল দেওয়া। কথাটা উপলব্ধির পরই আমার সব অসুখ ভালো হয়ে গেল। কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না, আর নিজেকে দিতে পারলেই সার্থক হয় সেই দেওয়া। আর তার

পরেই আমি একবার ইণ্ডিয়ায় এল্ম। আর ইণ্ডিয়াতে এসেই দেখা পেলাম মাতাজীর—

জিজ্ঞেস করলাম—মাতাজী কি বাঙালী লেডী?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—হ্যাঁ, ও'র বায়োগ্রাফিও আমি জানি। উনিই আমাকে শেখালেন যে দুঃখই মানুষের জীবনের গ্রেটেস্ট্ ট্রেজার—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—এই দেখুন না আমার চেহারা। আমাকে দেখে কি বোঝা যায়, এই আমিই একদিন রোগে ভোগে মরতে বসেছিলুম?

আমরাও মারোয়াঁ সাহেবের দিকে চেয়ে দেখলাম অটুট স্বাস্থ্য তাঁর। শুধু যে শারীরিক অটুট স্বাস্থ্য, তাই-ই নয়। মানসিক স্বাস্থ্যও খুব অটুট মনে হলো। মনের প্রসন্নতা না থাকলে কোনও শুভ কাজে এমনভাবে আত্মসমর্পণ করা যায় না, কিম্বা অন্যভাবে বলা যায় কোনও শুভ কাজে এমনভাবে আত্মসমর্পণ না করলে মনের এমন প্রসন্নতা থাকে না।

বললাম—'মাতাজী' সম্বন্ধে কিছু বলুন. শুনি—

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—আজ সন্ধ্যেবেলা যদি আসেন তখন হাতে অনেক সময় থাকবে, সে-সময়ে যদি আপনাদের হাতে সময় থাকে তাহলে আমারও সুবিধে হবে। 'মাতাজী'র গল্প বলতে তো অল্প সময় লাগবে না। অনেক মানুষই তো দীর্ঘ জীবন পায়, নব্বুই বছর বয়েস পর্যন্ত বেঁচে আছে এমন মানুষও দেখেছি। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না যে মানুষটার দাম বেড়েছে। প্রজ্ঞা বা উইজ্ডম্ বয়েস-নির্ভর নয়। ইণ্ডিয়ার প্রফেট শঙ্করাচার্য বা সোয়ামী বিবেকানন্দ কতো-দিন আর বেঁচেছিলেন, কিন্তু…

এমন সময়ে কে একজন কর্মী কী একটা কাজে তাঁর কাছে এসে কী একটা কথা বলতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আমরা বললাম—ঠিক আছে আমরা আজ সন্ধ্যে ছ'টার সময়েই আসবো—

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—নো, মেক্ ইট ফাইভ পি এম। আপনাদের ওই সময়ে অসুবিধে হবে না তো?

তা তাই-ই গেলাম। তখন সবে ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়েছে। শোনা যায় বিশ্ব-বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার নাকি বলেছিলেন যে পৃথিবীটা বড়ো ছোট। আর একটা পৃথিবী থাকলে ভালো হতো, তাহলে তিনি সেটাকেও জয় করার আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ পেতেন। কিন্তু পৃথিবী তো দূরের কথা, নিজেকেই বা জয় করতে পারে ক'জন? নিজের বাসনা-কামনা-লোভ-মায়া-মমতা-ক্ষুধা এ-সব জয় করতেই তো জীবন ফুরিয়ে যায়। এ-সব যে জয় করতে পারে কেবলমাত্র তার পক্ষেই একটা পৃথিবী কেন এই রকম হাজারটা পৃথিবী জয় করা সহজ! এ-কথা কাকে বোঝাবো, এই কথাটাই বা কে বুঝবে?

সেই সন্ধ্যেবেলাই মিস্টার মারোয়া মাতাজীর জীবন সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। একদিন সোহম্‌ রায় বলে এক ভদ্রলোক কতো গরীব অবস্থা থেকে পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে একটা চাকরি করতে আরম্ভ করেছিলেন। যদিও তাঁরা তাঁর পরম কাছের মানুষ তবু তিনি তাঁদের কাছ থেকে বড়ো খারাপ ব্যবহার পেতে লাগলেন। পেট ভরে তিনি সেখানে খেতেও পেতেন না। তখন তিনি মনে-মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তিনি ভাবলেন তিনি যদি কোনও দিন অনেক টাকার মালিক হন তাহলে তিনি তাঁর ওপর এই অন্যায়ের আর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবেন।

মানুষের সমাজ এই রকম করে একটা নির্দোষ নির্লোভ মানুষকে সমাজ-বিরোধী করে তোলে।

মিস্টার মারোয়া বলতে লাগলেন—আসলে সমাজবিরোধীদের সমাজই সৃষ্টি করে, আর সমাজবিরোধী হলে আবার সমাজই তাকে শাস্তি দেওয়ার ভান করে।

একবার মাতাজী আমাদের একটা প্রশ্ন করলেন—পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ দুঃখী কে?

আমরা অনেকেই ছিলাম সেখানে। একজন জার্মান, একজন রাশিয়ান, এক-জন ব্রিটিশও ছিলেন সেখানে। আরো অনেক ইণ্ডিয়ানও ছিলেন। তারা সবাই এক-একজন এক-এক রকম জবাব দিলে। কেউ বললে—যার টাকা নেই সে-ই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ দুঃখী। কেউ বললে—যার থাকবার বাড়ি নেই, সে-ই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ দুঃখী। কেউ বললে—যার সংসারে শান্তি নেই সে-ই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ দুঃখী। একজন বললে—যার স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয় না, সে-ই পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো দুঃখী।

মাতাজী সকলের শেষে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আর তুমি কিছু বলছো না যে?

আমি বললাম—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় আমিই সব চেয়ে বেশি দুঃখী।

—কেন?

আমি বললাম—তা জানি না। অথচ লোকে যাকে কিছু থাকা বলে তার সবই তো আমার আছে। আমার নিজের অগাধ টাকা আছে, আমার ভোগ করবার মতো স্বাস্থ্যও আছে। আমি এখনও বিয়ে করিনি। কিন্তু পৃথিবীতে যে কোনও আন্‌ম্যারেড্‌ মহিলা আমাকে বিয়ে করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। কারণ আমার টাকা স্বাস্থ্য যৌবন সমস্তই আছে যা সমস্ত মেয়েই মনে-প্রাণে কামনা করে। কিন্তু তবু আমার মনে হয় আমার মতো দুঃখী মানুষ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। ছোটবেলায় যেদিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, সেই দিন থেকেই আমার এই রকম মানসিক যন্ত্রণা—

মাতাজী জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন তোমার এ-রকম মনে হয়?

আমি তাঁর কথার উত্তরে বলেছিলাম—তা আমি বলতে পারবো না মাতাজী। বলতে পারলে তো আমি আপনার কাছে আসতুম না—

শ্রীনিবাস আর আমি মিস্টার মারোয়ার কথা শুনছিলাম। মিস্টার মারোয়া আবার বলতে লাগলেন—দেখুন, আমার এইটুকু জীবনে অনেক কিছু দেখা এবং

শেখার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথমে এমার্সন্-এর বই পড়ে অনেক কিছু শিখেছিলুম। র‍্যালফ্ ওয়ালডো এমার্সন। তারপর পড়লুম হেনরি ডেভিড্ থোরোর লেখা বই 'ওয়ালডেন'। তারপরে পড়লাম শোপেনহাওয়ারের লেখা। তারপরে আপনাদের দেশের মহাত্মা গান্ধীর লেখা পড়লাম। তাঁর লেখার এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম। অদ্ভুত কথা। এর আগে মানুষের সম্বন্ধে, পৃথিবীর সম্বন্ধে আমার হতাশা এসেছিল, কিন্তু গান্ধীর কথায় আমার আশা হলো। তিনি লিখে গেছেন—'You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.' তার মানে—'মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে নেই। মানুষ হচ্ছে সমুদ্রের মতন। সমুদ্রের কয়েক ফোঁটা জল যদি ময়লা হয় তাতে সমুদ্র অপবিত্র হয় না।' মাতাজীর কাছে এসেও সেই একই কথা শুনলাম। মাতাজী এই যে ব্রহ্মপুরীতে, নাগপুরে আর এই চৌবেড়িয়াতে কুষ্ঠ রোগীদের আশ্রম করেছেন, এর সব টাকাই তো মাতাজীর বাবার ঘুষের টাকা, চুরির টাকা। মাতাজীর বাবা সারা জীবন অন্যায়ের পথে যতো টাকা উপার্জন করেছিলেন, সমস্ত টাকা এই আশ্রমে লাগিয়েছেন। মাতাজী বলেন—মানুষের ওপর, হিউম্যানিটির ওপর বিশ্বাস হারাতে নেই! সেই অসৎ-পথে উপায় করা টাকাও এখানকার কতো অন্ধ-আতুর-অসুস্থ লোকের উপকারে আসছে তা তো আপনারা আজ সকালবেলাই দেখেছেন। তার ওপর আমার আর আরো অনেকের টাকাই এখানে ইনভেস্ট করা হয়েছে। অথচ মিস্টার সোহম্ রায় তো এই টাকাগুলো নিজের ভোগের জন্যেই রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন এই টাকাই তাঁর ভবিষ্যতের বিপদের দিনে তাঁকে বাঁচাবে। কিন্তু তা কি তাঁকে বাঁচাতে পারলো? শেষকালে এই টাকাই তো তাঁর অপঘাত মৃত্যুর সব চেয়ে বড় কারণ হয়ে উঠলো।

জিজ্ঞেস করলাম—কী রকম?

—তবে শুনুন!

বলে তিনি মাতাজীর বাবার শেষের দিনটির ঘটনাটা বিশদ করে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। বললেন—জল যখন ভারি থাকে তখন সে সমতল ভূমিতেই নদী হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। কিন্তু সমুদ্রও তো অশেষ নয়। সমুদ্র যদি ভাবে যে সে অশেষ তাহলে সে খুব ভুল করে। মিস্টার সোহম্ রায়ও তাই ভেবেছিলেন। তিনি ভুল করেছিলেন এই ভেবে যে পৃথিবীর যতো টাকা গড়িয়ে গড়িয়ে তাঁর পকেটে আসবে আর তা সবই তাঁর ভোগের উপকরণ যোগাবে। কিন্তু সেই জল তাপের সঙ্গে মিশে যেই হাল্কা হবে তখনই সে বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে সূর্যের আলোকেও ঢেকে দেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই বাষ্পকে কেউই বিশ্বাস করে না। কারণ সবাই জানে সেই জলের স্বধর্মই হচ্ছে সে তার সমতলতাকেই চাইবে। জলের সেই সমতলতাকে চাওয়ার মধ্যেই তার নমস্কারের প্রার্থনা। সেই নমস্কারের দ্বারাই সে রসধারায় সকল দিকে প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর মাটিকে সফলতায় অভিষিক্ত করে দেয়। তার সেই প্রণত সাষ্টাঙ্গ নমস্কারই সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ—

আমি বললাম—এ তো আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা—

মিস্টার মারোয়া বললেন—হ্যাঁ, আমি তো সেই পোয়েট টেগোরের বই পড়েই কথাগুলো বলছি। আমাদের দেশের রাইটার আন্দ্রে জিদ্‌ টেগোরের 'অফারিং অব্‌ সংস্‌' ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। আমি সে-বই পড়েছি—

তারপর মিস্টার সোহম্‌ রায় একদিন বাড়িতে বসে তাঁর আয়রন-সেফ্‌ খুলে তাঁর ব্যাঙ্কের পাস-বই, তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকার শেয়ার সার্টিফিকেট, ডিবেঞ্চার আর অগাধ ব্ল্যাক টাকা যখন জড়ো করছিলেন তখন তাঁর নতুন সারভেন্ট ভূষণ এসে তাঁকে এক কাপ চা দিয়ে গেল। তিনি তখনও ক্যাশ টাকা গুনছিলেন, চায়ের দিকে তাঁর নজরও পড়েনি। হঠাৎ ভূষণ বললে—হুজুর, চা দিয়ে গেলাম—

আগেকার বদ্যিনাথ তখন ছিল না। তার জায়গায় নতুন চাকর ভূষণ তাঁর বাড়িতে কাজ করতে এসেছিল।

টাকা গুনতে গুনতে হঠাৎ ভূষণের গলা শুনে মিস্টার সোহম্‌ যেন বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে এলেন। তিনি ফিরে চেয়ে দেখতে গিয়ে দেখলেন চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে ভূষণ তার আগেই চলে গিয়েছে। কিন্তু তাঁর সন্দেহ হলো ভূষণ টাকাগুলো সব দেখতে পেয়েছে নাকি? কে জানে!

মিস্টার সোহম্‌ রায় তাঁর এতদিনকার জমানো সমস্ত সম্পত্তি তাঁর পোর্ট-ফোলিও ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পোশাক-আশাক তাঁর আগেই বদলানো হয়ে গিয়েছিল। তিনি এক হাতে ব্যাগটা নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ডাকলেন—ভূষণ—

ভূষণ ভেতরে তার নিজের কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিল। সাহেবের ডাক পেয়ে সে ভেতর থেকেই জবাব দিলে—হুজুর—

তারপর সাহেবের সামনে এসে দাঁড়াতেই সাহেব বললেন—আমি এখন একটু বাইরে যাচ্ছি রে—

ভূষণ বললে খাবার তো তৈরি হুজুর, আপনি খেয়ে যাবেন না?

মিস্টার রায় বললেন—না রে, আমি একটা জরুরী কাজে বেরিয়ে যাচ্ছি—

—কখন ফিরবেন?

সাহেব বললেন—আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। তুই খেয়ে নিস। আর একটু সাবধানে থাকবি, পাড়ায় খুব চুরি-চামারি হচ্ছে। খুব সাবধানে থাকবি। যে-সে কলিং-বেল বাজালেই দরজা খুলে দিস নি—আমি চললুম—

বলে সোহম্‌ রায় গাড়ি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। ভূষণও আর দেরি করলে না। সঙ্গে সঙ্গে সে একতলায় নেমে তাড়াতাড়ি পাড়ার কানাইকে গিয়ে ডাকলে—কানাই—কানাই—

কানাই রোজই তৈরি থাকে। ভূষণের সঙ্গে তার ষড়্‌ আছে। সেদিনও কানাই তার ট্যাক্সি নিয়ে তৈরি ছিল। গ্যারাজ থেকে ট্যাক্সিটা বার করে ট্যাক্সির সামনের আর পেছনের নাম্বার প্লেটের ওপর ফল্‌স্‌ নাম্বার প্লেটটা ঝুলিয়ে দিলে। আসল নাম্বার প্লেটটা ঢাকা পড়ে গেল। তারপর ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে সে।

—সাহেবের গাড়ির নম্বরটা মনে আছে তো তোর?

কানাই বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, দুই-তিন-পাঁচ-আট—

—ঠিক মনে আছে তো তোর!

কানাই বললে—মনে থাকবে না? রোজই তো প্ল্যান আঁটছি।

ভূষণ বললে—আজ সাহেব অনেক টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি—

—কত টাকা?

ভূষণ বললে—তা কি আমি গুনেছি? এক লাখ টাকাও হতে পারে, দশ লাখও হতে পারে।

অনেক দূরে গাড়ির পেছনে পাশাপাশি দুটো লাল বিন্দু দেখা গেল। ট্যাক্সিতে চলতে চলতে ভূষণ আর কানাই দু'জনেরই নজরে পড়লো সেই সাহেবের গাড়ির নম্বরটা—দুই-তিন-পাঁচ-আট।

ভূষণ বললে—ওই গাড়িটার পেছনে পেছনে চল্। ওটা যেখানে যাবে তুইও সেখানে যাবি। আমি নিজের চোখে দেখেছি সাহেবের কাছে অনেক টাকা আছে—

তারপর একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলে—সেটা নিয়েছিস তো?

—কোন্‌টা?

ভূষণ বললে—সেই পাউডারটা?

কানাই বললে—হ্যাঁ! বাবা, সেটা কখনও নিতে ভুলি?

ভূষণ বললে—দেশলাই আমার কাছে আছে—

—দেশলাই তো আমার কাছেও আছে—

ভূষণের সঙ্গে কানাই-এর বহুদিন থেকেই গলাগলি ভাব। ভূষণ কতদিন সাহেবের বোতল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে মাল চুরি করে খেয়েছে। কানাইকেও খাইয়েছে। দিশী মদ খেতে খেতে তাদের পেটে চড়া পড়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে হঠাৎ এক-একদিন বিলিতি-মালের স্বাদ পেলে কে না খুশী হয়? কানাইও তাই ভূষণের ওপর খুব কৃতজ্ঞ ছিল।

কিন্তু খুব বেশি আশা যেখানে সেখানে এত অল্পতে কে খুশী থাকবে? যখন সাহেব বাড়ি থাকতো না, অফিসে চলে যেত, তখন ভূষণ মাঝে মাঝে কানাইকে তার ঘরে ডেকে আনতো। কানাই সেই কাক-ভোরে ট্যাক্সি নিয়ে টাকার ধান্ধায় বেরোত। আর মাঝখানে শুধু খেতে আসতো তার ডেরায়। ডেরা অবশ্য ঠিক তাকে বলা যায় না। বস্তির একচিল্‌তে একটা মাথা-ঢাকা জায়গাকে যদি ডেরা বলা যায় তো ডেরা। আর ভদ্রভাষায় তাকে বলা যায় বাড়ি।

অবশ্য কানাই কতক্ষণই বা থাকতো তার ডেরায়। ট্যাক্সি চালানো শেষ করে তার বাড়িতে ফিরতে ফিরতে প্রায় ভোর তিনটে বেজে যেতো। তখন সে রাস্তার ফুটপাথের কোনও ছাউনি ঢাকা হোটেলে দু'টাকা খরচ করে পেট-ভরা ডাল-ভাত সব্‌জি খেয়ে নিয়েছে। শুধু ওই ট্যাক্সিটা রাখবার জন্যেই যা-কিছু খরচা করতে হতো। নিজে রোদ্দুরে পুড়ুক আর শীতের কনকনে ঠাণ্ডাতে জমে বরফ হয়ে যাক বা বর্ষার জলে ভিজে জব্‌জবেই হয়ে উঠুক, তাতে কোনও হরজা নেই, ট্যাক্সিটা যাতে মজবুত থাকে সেই জন্যেই তার যত মাথাব্যথা। তার জন্যে তাকে

নিজের ডেরার চেয়ে মাসে মাসে বেশি টাকা গুনতে হয়। সেটা অবশ্য তার নিজস্ব গ্যারাজ নয়, পাইকিরি গ্যারাজ। সেখানে তার ট্যাক্সি ছাড়া আরো অনেকের ট্যাক্সিই থাকে। সেই সূত্রেই ভূষণের সঙ্গে একদিন কী করে একটু সামান্য পরিচয় হয়। সেই সামান্য পরিচয়ই একদিন মাল খাওয়ার সূত্রে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। আর তারপরেই একদিন সাহেবের অনুপস্থিতিতে ভূষণের কাছে নিভৃতে তাদের শলা-পরামর্শ হয়। কানাই ভূষণের কাছ থেকেই জানতে পারে সাহেবের বউ নাকি অন্য কোন্ একটা লোকের সঙ্গে বেটিকে নিয়ে কোথায় ভেগে গেছে। আরও জানতে পারে যে ভূষণের সাহেব নাকি কোন্ এক বড় অফিসে নোকরি করে। মাসে সাত-আট হাজার টাকা মাইনে পায়।

আর তখনই কানাই-এর মাথায় মতলোবটা আসে।

তাই শুনে সে একদিন ভূষণকে জিজ্ঞেস করেছিল—তাহলে সাহেবের যখন তিন কুলে কেউ নেই তখন অত টাকা কে খাবে? ভূতে খাবে?

এর উত্তরে ভূষণ কী বলবে? শুধু বলেছিল—কে জানে কে খাবে, কে জানে সাহেব কার জন্যে এত গাধার খাটুনি খাটছে!

তখন কানাই বলেছিল—আমি জানি সাহেব কার জন্যে গাধার খাটুনি খাটছে!

ভূষণ তবু কিছু বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করছিল—কার জন্যে?

কানাই বলেছিল—তুই একটা বেওকুফ্। আরে, তোর সাহেব খাটছে তোর জন্যে আর আমার জন্যে!

—সে কী?

কানাই বলেছিল—হ্যাঁ, আমি যা বলছি, ঠিকই বলছি। সাহেব তোর আর আমার জন্যেই এই গাধার খাটুনি খাটছে।

—কী রকম?

কানাই বললে—তুই আমার মুখের কাছে তোর মুখ আন্, তুই আমার কাছে আরো একটু সরে আয়, তোকে আমি চুপি চুপি বলবো—

ভূষণ কানাই-এর কাছে সরে এসে বসলো। তারপরে দু'জনে কী গোপন কথা হলো তা কেউ জানতে পারলে না। অবশ্য ঘরের দেওয়ালগুলোর যদি কান থাকে তো তারা নিশ্চয়ই তা শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু দেওয়ালগুলোর কান থাকলেও তাদের তো মুখ নেই, তাই কথাটা এক কান থেকে আর দশ কান হলো না।

তখন থেকেই ভূষণ আর কানাই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাই সেদিন সাহেবকে চায়ের কাপ দিতে গিয়ে সামনে অতগুলো নোটের তাড়া দেখেই ভূষণের চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যি ভালো যে কানাই ঠিক সেই সময়ে বাড়ি ফিরেছে। নইলে মুশ্‌কিল হতো। সাহেব বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই ভূষণ কানাইকে গিয়ে খবরটা দিয়েছে।

কানাই জিজ্ঞেস করলে—সাহেব কখন ফিরবে?

ভূষণ বললে—সাহেব বলে গেল বাড়ি ফিরতে দেরি হবে।

কানাই বললে—তাহলে চল্, কাজ হাসিল করিগে—

ভুষণ বললে—না, বাড়িতে লোহার সিন্দুকে কোনও টাকা-কড়ি কিছু নেই। সাহেব সব নগদ টাকা-কড়ি ব্যাঙ্কের বই-টই সব কিছু হাত-ব্যাগে পুরে নিয়ে বাইরে চলে গেল—

সেই কথা শুনে কানাই বললে—কতক্ষণ আগে গেছে? কোন্ দিকে গেছে?

ভুষণ বললে—ওই তো সাহেব যাচ্ছে গাড়ি চালিয়ে। নম্বর দেখে চিনতে পারছিস না? সাহেবের সঙ্গে লক্ষ-লক্ষ টাকা আছে—

আর কথা নেই। কানাই-এরও তখন আর কিছু ভাবনার সময় নেই। নকল নম্বর প্লেট দু'টো সামনে পেছনে লাগাতে যেটুকু সময় লাগলো আর শুধু সেই পাউডারটা সঙ্গে থাকা দরকার, সেটাও তাড়াতাড়ি পাশে রেখে স্টিয়ারিং ধরে কানাই গাড়ি ছুটিয়ে দিলে। সামনে লাল দু'টো বিন্দু। আর মাঝখানে নম্বরটা টু-থ্রী-ফাইভ্-এইট্…

অনেক দূর চলতে চলতে গাড়িটা বাঁদিকের বড় রাস্তায় ঢুকে পড়লো।

কানাই বললে—ওদিকে কোথায় যাচ্ছে রে তোর সাহেব?

ভুষণ বললে—কে জানে!

সামনের গাড়িটা সোজা চলতে লাগলো জু-গার্ডেনের পাশ দিয়ে। তারপর ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীটা বাঁদিকে রেখে আরো সোজা চলতে লাগলো সামনের দিকে। তারপর আবার বাঁদিকে ঘুরে সোজা আলিপুর রোড দিয়ে চলতে লাগলো ঝড়ের গতিতে।

কানাইও পেছন পেছন চলেছে। বললে—আরে, তোর সাহেব কোথায় যাচ্ছে রে এত রাত্তিরে? কোনও মেয়েছেলের কাছে যাচ্ছে নাকি রে?

ভুষণ বললে—কে জানে—

সামনের গাড়িটা তখন আলিপুর রোড ধরে দুর্গাপুরের ব্রীজের উপর দিয়ে চলেছে।

কানাই বললে— তোর সাহেব তো দেখছি নিউ-আলিপুরের দিকে চলেছে রে। ওদিকে তোর সাহেবের কে আছে?

ভুষণ বললে— আর দেরি করিস নি রে কানাই, এবার সাবাড় করে দে। আর কত দূর যাবি এমনি করে? এখানটা বেশ নিরিবিলি দেখছি। রাত হয়েছে, আর দেরি করিস নি, দে সাবাড় করে—

কানাই বললে—দেখি তোর সাহেব এখানে কোথায় যায়—

এবার সামনের গাড়িটার গতি একটু কমে এলো। একটা বাড়ির সামনে এসে থামলো। আর ভুষণের সাহেব গাড়িটা থামিয়ে সেখানেই নেমে পড়লো।

কানাইও অনেক দূরে ট্যাক্সিটা সাইড্ করে রেখে হেড্-লাইট ব্যাক-লাইট দু'টোই নিভিয়ে দিয়ে দাঁড়ালো। বললে—ওটা কার বাড়িতে ঢুকলো রে তোর সাহেব? সাহেবের কে থাকে বল্ তো ও-বাড়িতে?

ভুষণ বললে—কে জানে। আমি তো নতুন কাজে ঢুকেছি। ঠিক বুঝতে পারছি না ওটা কার বাড়ি—

হঠাৎ ভুষণ কানাই দু'জনেই দেখলে একটা পুলিসের গাড়ি এসে সেই বাড়ি-

টার সামনে দাঁড়ালো। আর তার পেছন-পেছনই এসে দাঁড়ালো আর একটা প্রাইভেট কার—

মিস্টার মারোয়াঁ একটু থেমে আবার কোথায় কোন্ কাজে চলে গেলেন। তারপর অনেক পরে আবার এলেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—তারপর? তারপর কী হলো?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—দেখুন, এর আগে কেবল আমি পেতেই চেয়েছি। কেবল দিন-রাত ভেবেছি কী করলে আরো বেশি পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যত দেশ আছে, যত মানুষ আছে, যত প্রতিষ্ঠান আছে, সকলের একটাই মাত্র বুলি—দাও দাও, আরো দাও। আমার দু হাতের অঞ্জলি ভরে দাও। আরো টাকা দাও, আরো ডলার দাও, আরো ফ্রাংক দাও, আরো লীরা দাও, আরো পাউন্ড দাও—। এই 'দাও'-'দাও' শব্দই সমস্ত পৃথিবীকে মুখর করে রেখেছে। কিন্তু এই 'মাতৃ-মন্দিরে' মাতাজীর কাছে এসে প্রথম শুনলাম একটা শব্দ—'নাও'। ভাবলাম এতদিন যারা আমাকে ঘিরে রেখেছিল তারা তো কখনো একথা বলেনি যে 'নাও'। এ এক নতুন কথা শুনলাম ইণ্ডিয়াতে এসে। সমস্ত ইণ্ডিয়া বললে ভুল হবে, শুনলাম এই মাতাজীর কাছে এসে। ভাবলাম—মাতাজী একথা কোথা থেকে শিখলেন? কোথা থেকে এর প্রেরণা পেলেন?

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—সত্যিই, মাতাজী কোথা থেকে এর প্রেরণা পেলেন?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—আমিও একদিন মাতাজীকে সে-কথা জিজ্ঞেস করলাম।

—কী উত্তর তিনি দিলেন?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—সে অনেক লম্বা গল্প! একদিনে সে-কথা বলা যাবে না তার উত্তর পেতে গেলে আমার মতো সমস্ত জীবন ডেডিকেট্ করতে হবে। আদর্শ যতো বড় হবে সে-আদর্শে সিদ্ধিলাভ করতে গেলে ততো বেশি সময় দিতে হবে। আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট নাকি শেষ জীবনে বলেছিলেন যে একটা পৃথিবী জয় করে তাঁর প্রাণ ভরেনি, আর একটা পৃথিবী থাকলে সেটা জয় করে তবে তাঁর প্রাণ ভরতো। আমারও তাই হয়েছে। মনে হচ্ছে আরও একটা জীবন পেলে বোধহয় ভালো হতো। তাহলে আদর্শটাতে পুরোপুরি সিদ্ধিলাভ করতে পারতাম। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। জীবনের অর্ধেকটা একেবারে বাজে কাজে নষ্ট হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম—সে-আদর্শটা কী?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—দেওয়ার আদর্শ। এতদিন কেবল পাওয়ার সাধনা

করেই সময় নষ্ট করেছি, তার মধ্যে দেওয়ার দিকটা একেবারে এড়িয়ে গিয়েছি। মাতাজী অবশ্য বলেন—না। একেবারে নষ্ট হয়নি। গৃহস্থাশ্রম বলে ইণ্ডিয়ায় একটা কথা আছে। মাতাজী অনেক স্টাডি করেছেন। তিনি বলেন যাত্রা করবার সময়ে পাওয়ার সাধনা করতে হয়, কিন্তু ফেরবার সময়ে করতে হয় দেওয়ার সাধনা। এখন আমার নাকি দেওয়ার সাধনা করবার সময় হয়েছে! কী জানি! কাকে বলে 'দেওয়া' সেটাই তো আমার এখনও শেখা হয়ে ওঠেনি—

শ্রীনিবাস জিজ্ঞেস করলে—আপনি মাতাজীর সম্বন্ধে কিছু বলুন। শুনেছি তিনি বাঙালী মহিলা। তাঁর আসল পরিচয়টা কী?

—আসল পরিচয়? আসল পরিচয় কি আমিই পুরোপুরি জানি? তবু যেটুকু সামান্য জেনেছি তা আপনাদের বলতে পারি—

—বলুন!

মিস্টার মারোয়াঁর সঙ্গে যে নিরবচ্ছিন্ন কথা বলবো তারও উপায় নেই। মিস্টার মারোয়াঁর অসংখ্য কাজ। কথা বলতে বলতে হাজার বার বাধা পড়ছিল। ওখানকার নানা লোক নানা কর্মী এসে নানা কথা বলছিল; নানা নির্দেশ চাইছিল। মাঝে মাঝে কাজ-কর্মের তাগিদে তাঁকে কথার মধ্যিখানে বার বার উঠেও যেতে হচ্ছিল। আমাদের আলোচনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কাজ সেরে আবার খানিকক্ষণের জন্যে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এসে কথা শুরু করছিলেন।

আমরা বিব্রত বোধ করছিলাম। বললাম—অন্য দিন আমরা আসবো, আজকে আপনার কাজের ক্ষতি করে দিচ্ছি—

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—ঠিক আছে, কাল আপনারা আবার একবার আসুন, বাকিটা কাল বলবো—

সত্যিই সে বড়ো বিচিত্র কাহিনী। পরের দিন গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সোহম্ রায়ের গল্পটাই বলে গেলেন মিস্টার মারোয়াঁ। সেই সোহম্ রায়, সেই পাগলা মেহের আলি, সেই ভানুভাই প্যাটেল, সেই সুমিত্রা, সেই কোঠারি, সেই শম্পা। সেই শশীভূষণ বিশ্বাস, সলিসিটার

খবরের কাগজে মিস্টার রায়ের গাড়িটা আগুনে পুড়ে যাওয়ার খবরটা পড়ার পর থেকেই মিস্টার বিশ্বাস কেমন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন সমস্ত দিন। কে তাঁর গাড়িটা পোড়ালো? কারা পোড়ালো? কেন পোড়ালো?

তাঁর কেবল আগের রাত্রের কথাগুলো মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল সেই জল-কাদামাখা মিস্টার রায়ের চেহারাটা। মিস্টার রায়ের বলা কথাগুলোও মনে পড়ছিল। মিস্টার রায় তাঁর সামনের চেয়ারটার ওপরে বসে বলেছিলেন—বাইরে

থেকে আর কতটুকু অসুখ আপনি দেখতে পাচ্ছেন মিস্টার বিশ্বাস! আমার ভেতরটা যদি কেউ দেখতে পেতো···সেখানে আরো কত ময়লা জল-কাদা···আরো কত কলঙ্কের দাগ লেগে আছে তা যদি কেউ দেখতে পেতো···

পৃথিবীতে দুঃখী লোকের তো শেষ নেই। কিন্তু সব কিছু থেকেও কিছু-না-থাকার মতো দুঃখী মানুষ ক'টা আছে এ-সংসারে! সত্যিই, তাঁর মনে হয়েছিল মিস্টার রায় চরম দুঃখী মানুষ।

পরদিন যথারীতি মিস্টার বিশ্বাস রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে মিস্টার রায়ের ডীড্-অফ্ গিফ্ট্টা রেজিস্ট্রি করে নিয়েছিলেন। নব্বুই লক্ষ টাকার গিফ্ট্। সমস্ত টাকাটা "শম্পা" পাবে। নিজের ভবিষ্যতের জন্যে আর কিছুই রাখেননি মিস্টার রায়। তিনি মিস্টার রায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন তারপর?

মিস্টার রায় বলেছিলেন—তারপর আর কী, তারপর যা হওয়ার তাই হলো। আমাদের কোম্পানি তার ফলে মিস্টার প্যাটেলের কাছ থেকে অর্ডারের কয়েক পার্সেন্ট্ সাব্-কনট্র্যাক্ট পেলে। ব্যালেন্স শীটে কয়েক হাজার কোটি টাকা নীট প্রফিট করলে আমাদের ফার্ম, আর আমাকে করে দেওয়া হলো কোম্পানির একজন ডিরেক্টার। তার ফলে আমার আরো অনেক টাকা মাইনে বাড়লো, আর তার সঙ্গে বাড়লো ইজ্জৎ, কিন্তু···

মানুষের জীবনে ওই ছোট একটি শব্দ 'কিন্তু···'। ওই 'কিন্তু' শব্দটাই সমস্ত মানুষের জীবনের সব ফাঁকটা ভরাট করে রাখে। যেখানে যা কিছু ফাঁক থাকে তা বাইরের লোকের নজরে পড়ে না বটে কিন্তু যিনি অন্তর্যামী তাঁর ব্যালেন্স-শীটে সেটা স্পষ্টাক্ষরে এন্ট্রি করা থাকে। সেখানে হিসেবের ভুল একেবারেই হয় না।

নইলে ভূষণ কোথা থেকে এলো তাঁর জীবনে? ভূষণ কে?

ভূষণই হলো মিস্টার রায়ের বাস্তব জীবনের অন্তর্যামী। সে একদিন অন্তর্যামী হয়েই এসে ঢুকেছিল সোহম্ রায়ের সংসারে। যারা আগে তাঁর বাড়িতে ছিল তারা সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম করেছে। তারা মাইনে নিয়েছে, চাকরি করেছে। চুরি-চামারি বেশি করেনি। করলেও তা খুবই কম। কিন্তু সেই বদ্যিনাথরা চলে যাওয়ার পরই এলো ভূষণ। এর কাজ-কর্ম হুকুম তামিল করার বহর দেখবার মতো। চাল-চলনে ব্যবহারে কথা-বার্তায় একেবারে সেন্ট্-পারসেন্ট্ ওস্তাদ। কোথাও কোনও ত্রুটি পাওয়া যাবে না ভূষণের হাব-ভাবে। একবার শুধু ইশারা করলেই হলো। সঙ্গে সঙ্গে ভূষণের জবাব আসবে—হুজুর—

মিস্টার রায় ভূষণের কাজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট। রান্নাতেও সে ওস্তাদ। মিস্টার রায়ের জিভটা যেন সে মুখস্থ করে নিয়েছে। ঠিক যেমন রান্না মিস্টার রায়ের জিভ পছন্দ করে তেমনিই ঠিক তার হাতের রান্না।

আর টাকা-কড়ির হিসেব?

সে-ব্যাপারে সে সব দিক দিয়ে নিখুঁত। বাজার থেকে পয়সা চুরি করে হাত নোংরা করবার লোক নয় ভূষণ। বাজার থেকে ফেরার পরই মনিবের কাছে এসে

বলে—হিসেবটা নিন হুজুর—

মিস্টার রায় বলেন—অত তাড়া কীসের ? পরেই হিসেব দিস—

—না হুজুর, আমি গরীব লোক, খুচরো হিসেব মনে থাকবে না, ভুলে যাবো—

ভূষণের আগেও তো কত লোক মিস্টার রায়ের বাড়িতে কাজ করেছে, কিন্তু এমন ওবিডিয়েন্ট্ এমন অনেস্ট্ লোক আর হয়নি। সুমিত্রা চলে যাওয়ার পর তাঁর সংসার তো জাহান্নমেই চলে যেত, কিন্তু তা যে যায়নি তার একমাত্র কারণ ওই ভূষণ। সেদিন মিস্টার রায় অফিস থেকে এসে তাঁর ঘরে যখন ঢুকলেন তখন ওই ভূষণই অন্য দিনের মতো চা করে নিয়ে ঢুকলো।

বললে—হুজুর, চা নিন—

গল্পটার মাঝ-পথে হঠাৎ একজন কর্মী এসে মিস্টার মারোয়াঁর হাতে একগাদা চিঠি দিয়ে গেল। ওগুলো সমস্তই বিকেলের ডাকের চিঠি। সাহেব এক-এক করে সবগুলো চিঠি দেখে নিয়ে পাশের দিকে সরিয়ে রাখলেন। তারপর আবার আমাদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—আমি কোন্ পর্যন্ত বলেছিলুম ?

আমি মনে করিয়ে দিলাম—সেই যে ভূষণ আর কানাই নিউ আলিপুরে গিয়ে সাহেবের পেছন-পেছন গিয়ে দাঁড়ালো···

সাহেব বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পরে পুলিসের রিপোর্টে এ-সব ঘটনা জানা গেছে। যা হোক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর মিস্টার রায়ের গাড়িটা আবার সেই রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে ফিরতে লাগলো। তখনও সাহেবের হাতে সেই বাণ্ডিলটা রয়েছে।

কানাই আবার মিস্টার রায়ের পেছন-পেছন তার ট্যাক্সিটা চালিয়ে নিয়ে আসতে লাগলো। স্থির লক্ষ্য রইল সেই সামনের গাড়ির পেছনকার নম্বরটার ওপর। ডবলিউ-বি-এ—টু-থ্রী-ফাইভ-এইট্···

মিস্টার রায়ের গাড়িটা আগে আগে চলেছে আর পেছনে কানাইয়ের ট্যাক্সিটা, তাতে বসে আছে ভূষণ আর ট্যাক্সি চালাচ্ছে কানাই।

ভূষণের তখন আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। বললে—কী রে, আর দেরি করছিস কেন ? সাহেব যে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে—বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাকে না দেখতে পেলে কী হবে ?

কানাই কোন জবাব দিলে না।

ভূষণ আবার তাড়া দিলে। বললে—ওরে, আর কতো দেরি করবি ?

কানাই তখনও ধৈর্য ধরে প্ল্যানিং করছে। সে জীবনে যা-কিছু করে সমস্ত-কিছু চারদিক দেখে ভেবে-চিন্তেই করে। তার ধারণা তাড়াহুড়ো করে কোনও

মহৎ কাজ হয় না। তার মতে ভালো কাজ করতে গেলে সব সময়ে ধৈর্য ধরতে হবে। নইলে শেষকালে সবাইকে পস্তাতে হয়।

—তারপর?

মিস্টার মারোয়া বলতে লাগলেন—আজকে এমন একটা যুগ পড়েছে যখন চুরি বাটপাড়ি-ডাকাতি-ঘুষখোরিটাকেও একটা কাল্চার বলে গণ্য করা হচ্ছে। এটাকে এখন শুধু প্রোফেশন্ই নয়, এখন এটা একটা কালচারাল অ্যাক্টিভিটি হিসেবে মানুষ ভাবতে শিখেছে। যেমন সাহিত্য লেখা, ছবি আঁকা, গান গাওয়া, শিক্ষকতা একটা প্রোফেশন্, তেমনি মানুষকে খুন করাটাকেও এখন কাল্চারাল্ অ্যাক্টিভিটি বলে ধরা হচ্ছে।

আমরা গল্পটা শোনবার জন্যে তখন উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছি। বললাম—তারপর কী হলো তাই বলুন—আসল গল্পটা বলুন—

মিস্টার মারোয়া বলতে লাগলেন – না, আজকের যুগটাকে না জানতে পারলে আপনারা মাতাজীকেও বুঝতে পারবেন না, তেমনি আমি কেন ফ্রান্স ছেড়ে এখানে এলুম তাও বুঝতে পারবেন না। সেই জন্যেই তো এই সব কথাগুলো বলছি। আপনারা নিশ্চয়ই একটা নতুন কথা শুনেছেন। সেই কথাটা হচ্ছে Consumerist Culture। মাতাজী বলেছেন কথাটার দেশী মানে হচ্ছে 'উপভোক্তা সংস্কৃতি'। যে কালচার শুধু ভোগ করতেই শেখায়, তারই নাম হচ্ছে 'কন্জিউমারিস্ট কালচার'। এই কালচারই আমাদের শেখায় টেলিফোন, ফ্রিজ, রেডিও, টেলিভিশন্ দেখতে, দামী মদ খেতে, ভি-ডি-ও, ভি-সি-আর, ভি-সি-পি দেখতে। জামা-কাপড় কাচবার জন্যে ওয়াশিং-মেশিন্ কিনতে। আর এই সব আবিষ্কার আমাদের জীবনের কাজ কমাবার বদলে কেবল অশান্তিই বাড়িয়েছে। যার বাড়িতে এ-সব জিনিস নেই তারা ভাবছে কেমন করে এই সব জিনিস কিনতে পারা যাবে। আর ও-সব জিনিস যাদের আছে তাদের ওপর তাদের রাগ হচ্ছে, হিংসে হচ্ছে। আর এই সব কারণের জন্যেই পৃথিবীতে দু'-দুটো যুদ্ধ হয়ে গেছে, আরো একটা যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টাও চলছে। এই সব কিছুর জন্যেই দায়ী এই কন্জিউমারিস্ট কালচার, এই উপভোক্তা সংস্কৃতি—। আমার মাতাজী এই যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যেই এই মাতৃমন্দির গড়ে তুলেছে—আমিও তাই এখানে আঠারো বছর ধরে রয়ে গিয়েছি—

আমরা তখন অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। এ-সব তত্ত্ব-কথা শুনতে আমাদের ভালো লাগছিল না।

বললাম—তারপর কী হলো আপনি তা-ই বলুন?…তারপরে?

মিস্টার মারোয়া বলতে লাগলেন—কিন্তু কানাইয়ের হিসেবে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। সে তখন একটা নিরিবিলি জায়গার অপেক্ষায় ছিল। এমন একটা নিরিবিলি জায়গা হওয়া চাই যেখানে সাহেবের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিলে কেউ টের পাবে না। কিন্তু সে সুযোগ আর তার হলো না—কারণ…

—কারণটা কী?

—কারণ ঠিক সেই সময়েই মিস্টার রায় ডানদিকের একটা গলির ভেতরে

গাড়িটা ঢুকিয়ে দিলেন। মিস্টার এস বি. বিশ্বাস সলিসিটার অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে দরকারী কথা-বার্তা বলেন। তখন তাঁর স্টেনোগ্রাফারও সেখানে হাজির থাকে। রাত একটার আগে কখনও তাঁর কাজ শেষ হয় না।

ভুষণ ভয় পেয়ে গেল। বললে—দেখলি তো? এখন কী হবে? এত দেরি করলি কেন কাজ ফতে করতে? তোর জন্যে সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। কী হবে এখন?

কানাই অভয় দিয়ে বললে—কিছু ঘাবড়াসনি—দ্যাখ না কী করি আমি—

বলে তার ট্যাক্সিটা অনেক দূরে একটা অন্ধকার জায়গায় পার্ক করে রাখলে। সেখান থেকে নজর রাখতে লাগল মিস্টার বিশ্বাসের বাড়ির দিকে। সেখানে অতো রাত্রেও তখন আলো জ্বলছে। তার মানে ওখানে কাজ চলছে তখনও।

কিন্তু সাহেবের এত কথা-বার্তা কিসের? কী জন্যে? কার জন্যে? সাহেব টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে ও বাড়িতে বসে বসে কী করছে এতক্ষণ?

একজন ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ট্যাক্সি দেখে থেমে গেল।

বললে—যাবে ভাই শ্যামবাজারে?

কানাই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—না, আমার পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে, যেতে পারবো না—

ভদ্রলোক আর কিছু না বলে যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকেই হাঁটা দিলে।

কিন্তু ভুষণের সাহেব তখনও বেরোচ্ছে না। এত রাত পর্যন্ত তার সাহেবের যে কী কথা থাকে তা কে জানে! তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় না বাপু। আশ্চর্য, ও-বাড়িতে ঢুকে তার সাহেব এত কী কাজ করছে?

কত রাত হয়েছে কে জানে! এক সময়ে সমস্ত পাড়াটা নিঝুম হয়ে গেল। রাস্তাতেও একটা গাড়ি-টাড়ি কিছু নেই। স্টীয়ারিং-এর ওপর হাত রেখে কানাই চুপ করে একদৃষ্টে সেই গাড়িটার দিকে চোখ চেয়ে বসে রইল। তার পাশে ভুষণেরও সেই একই অবস্থা। তার নিজের চোখের সামনে তখনও সেই গাদা-গাদা নোটের পাহাড়ের দৃশ্যটা ভাসছে। সেই টাকার সিকি ভাগটাও যদি সে পেতো তাহলে তার জীবনটার ধারা একেবারে বদলে যেতো। সঙ্গে সঙ্গে সে কলকাতা শহরে একটা পাকা বাড়ি তৈরি করে ফেলে একটা ভালো সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেলতো। কানাইও তখন সেই একই স্বপ্ন দেখেছে জেগে জেগে। তখন আর তাকে রাস্তার ঝুপড়ির মধ্যে বাস করতে হতো না। তার প্রথম কাজ তখন হতো একটা পাকা বাড়ি তৈরি করা। তারপরে একটা সুন্দর মেয়ে দেখে বিয়ে করা। আর তারপর একটা গাড়ি। কলকাতার সব শালারা কেমন বাড়ি করে বিয়ে-থা করে আরামসে থাকে। আর তার কপালেই কেবল ট্যাক্সি চালানো আর ফুটপাথের হোটেলে ভাত খেয়ে পেট ভরানো।

হঠাৎ বাড়িটার সদর দরজাটা খুলে গেল।

ভুষণ দেখলে ঘরের ভেতর থেকে তার সাহেব বেরিয়ে এসে তার গাড়িতে গিয়ে উঠে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলো।

ভূষণ বললে—কানাই, এইবার স্টার্ট দে গাড়িতে—সাহেব গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে—

কানাই অতো বোকা নয়। বললে—দাঁড়া, অতো তাড়াহুড়ো করিস নে, আমি দেখতে পেয়েছি···আগে খানিকটা সামনে এগিয়ে যাক্···

এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গাড়িটার পেছনে দু'টো লাল বিন্দু। আর তার মাঝখানে সেই চেনা নম্বর—ডব্লিউ-বি-এ—টু-থ্রী-ফাইভ-এইট্···

কানাই তার ট্যাক্সিটায় স্টার্ট দিয়ে অ্যাকসিলারেটারে পায়ের পাতার চাপ দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিটার মাইল-মিটারের কাঁটাটা ষাট নম্বরে গিয়ে ঠেকলো···

মিস্টার মারোয়াঁ আবার বলতে লাগলেন—আমি ফ্রান্সের লোক, ফ্রান্স থেকে সোজা ইণ্ডিয়াতে এসেছি। শুধু নাগপুর, হৃষিকেশ আর এই চৌবেড়িয়া, এই তিনটে জায়গা ছাড়া আর কোথাওই যাইনি। না গিয়েও আমি ইণ্ডিয়াকে চিনে নিয়েছি। মাতাজীর দেশ কলকাতাও দেখিনি। অথচ কলকাতায় না গিয়েও আমার কলকাতা দেখা হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় ইণ্ডিয়ার মধ্যে কলকাতা এমনই একটা জায়গা যেখানে সবাই পরকে আপন করে নেয়। এককালে যখন কলকাতা ইংরেজদের কবলে ছিল তখনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে কেউ তেমন হাত তোলেনি। তারা ইংরেজদের আপন করে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। শুনেছি যখন সেপাই বিদ্রোহ হয়েছিল তখন বাঙালীরা নাকি তাতে তেমন করে যোগ দেয়নি। এর কারণ কী? কারণটা বোধহয় এই যে বাঙালীরা বড়ো কস্‌মোপলিটান্ জাত। ইণ্ডিয়ার মারাঠী, গুজরাতী, রাজস্থানী, ওড়িয়া, অসমীয়া সকলেই কলকাতায় গিয়ে একবারও বুঝতে পারে না যে তারা বাঙালীদের দেশে আছে। বাঙালীদের কাছে বাঙালীরাও যা ওই ভানুভাই প্যাটেল, ইব্রাহিম, কোঠারি, মেহের আলিরাও তাই। একদিন সোহম্ রায়ই ওদের নিজের বাড়িতে ডেকে এনেছিল, আবার ওদিকে তারাও কেউ কখনও সোহম্ রায়কে পর বলে মনে করেনি।

সেই রাত সাড়ে বারোটায় নিউ আলিপুরের শম্পাদের বাড়িতে যে-কাণ্ডটা ঘটেছিল তার পরে আর সেখানে নতুন কিছু ঘটেনি। শম্পা কিছুক্ষণ একটানা কেঁদেছিল। তার কান্নায় সুমিত্রা শম্পাকে ধমক দিয়েছিল।

বলেছিল—থাম্, থাম্ তুই···থাম্—

কিন্তু ছোট মেয়ে সে। সবে তখন ঘুমিয়ে উঠেছে। বাবাকে সামনে পেয়েও বাবার সঙ্গে যেতে পারলে না। এ দুঃখ কি সহজে সে ভুলতে পারে!

সে মা'র কাছে ধমক খেয়েও কাঁদতে লাগলো। বলতে লাগলো—আমি বাবার কাছে যাবো—

কোঠারিও রেগে গেল। বললে—তোমার মেয়েকে একটু থামাও না, একটু আরাম করে যে ঘুমোব তারও উপায় নেই—

সত্যিই তো, দু'জনের চোখেই তখন ঘুম নেমে এসেছে। এত পয়সা খরচ ক'রে নেশা করে এসেছে, তারপর যদি ঘুম না হয় তো মেজাজ কারো ঠাণ্ডা থাকে! কোঠারি রেগে চেঁচিয়ে উঠলো—একটু থামাও না ওকে—

—এই থাম্ থাম্ বলছি—

সুমিত্রার নিজেরও তখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে।

—থাম্ শীগ্গির—

শম্পার মুখে তখনও এক কথা—আমি বাবার কাছে যাবো—আমি বাবার কাছে যাবো—

—তবে রে···

বলে সুমিত্রা শম্পার গালে কষে এক চড় লাগালে। আর তখন শম্পাকে আর কে থামায়! শম্পা তখন গলা ফাটিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। শম্পা যতো কাঁদে মা তাকে ততো মারে!

কোঠারি তখন আরো চেঁচিয়ে উঠেছে।

—ওকে থামাতে পারো না? আর কতো কাঁদাবে?

ভাগ্যিস পাশের প্রতিবেশীদের কানে সে-কান্নার আর সে-শাসানির শব্দ পেঁছোয়নি, তাই সেদিক থেকে কোনও প্রতিবাদ এলো না। নতুন পাড়ায় নতুন বাড়িভাড়া নিয়েছিল কোঠারি। কিন্তু নতুন পাড়ায় আসার পরদিন থেকেই পাড়ার লোক অশান্তি শুরু করে দিয়েছিল। কোঠারিদের জীবনযাত্রা, কোঠারিদের চাল-চলন দেখে তারা বুঝতে পেরেছিল যে এরা ঠিক সংসারী লোক বলতে যা বোঝায় তা নয়। তারা দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে, রাত্রে দেরি করে বাড়ি ফেরে। তারা যখন বাইরে বেরোয়, তখন মেয়েটাকে ঘুমের বড়ি খাইয়ে অজ্ঞান করে রেখে নিজেরা বাইরে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়িতে ফেরে। তাদের এই অসামাজিক জীবনযাত্রা পাড়ার লোকেরা ভালো চোখে দেখেনি। যেদিন থেকে তারা পাড়ায় এসেছে, তার কিছুদিন পর থেকেই তারা বুঝে গেছে যে বউটা বাঙালী। সে তার নিজের স্বামীকে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে এই অ-বাঙালী লোকটাকে বিয়ে করে এখানে এসে ঘর-ভাড়া নিয়েছে। আর সেই বোঝার পর থেকেই তাদের অত্যাচার বেড়ে গেছে। তার ফলে তার বাড়ির কাজের জন্যে কোনও চাকর বা ঝি কাজ করতে চায় না। অনেক টাকা মাইনের লোভ দেখালেও তারা এ-বাড়িতে কাজ করতে রাজি হয় না।

একবার পাড়ার সবাই মিলে বাড়ির মালিকের কাছে দরবার করতেও গিয়েছিল। তাদের আপত্তি বাড়িভাড়া দেওয়ার জন্যে নয়। আপত্তি ছিল এই রকম অভদ্র লোককে বাড়িভাড়া দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু তাতেও কোনও সুরাহা হয়নি। বাড়িওয়ালা বলেছিল—আমি কী করবো মশাই বলুন, ভাড়া দেওয়ার আগে তো আমি বুঝতেও পারিনি যে এ-রকম লোক মিস্টার কোঠারি! আর, তা ছাড়া আর একটা কথা—তারা বাড়ির

মধ্যে কী করছে না-করছে তাতে আপনারাই বা অমন বিরক্ত হচ্ছেন কেন ? আপনাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে তো আর তিনি কোনও গোলমাল করছেন না ! আর মদ বিক্রী করতেও যেমন কোনও বাধা নেই, মদ খেতেও তো তেমনি কোনও বাধা নেই। যে মদ বিক্রী করছে সে তো গভর্মেণ্টের কাছ থেকে লাইসেন্স নিয়েই তার মদ বিক্রী করছে, আর যে মদ খাচ্ছে সেও তো নিজের পকেটের টাকা খরচ করেই তা কিনে খাচ্ছে। তাতে কারো কিছু বলবার থাকতে পারে না। ওরা যত ইচ্ছে মদ খাক না, আপনাদের অতো আপত্তি কেন ?

ভদ্রলোকরা বললেন—আপনি বলছেন মদ খাক্ ?

বাড়িওয়ালা বললেন—হ্যাঁ, আমি তো বলছি সে নিজের পয়সায় যত ইচ্ছে মদ খাক্...

ভদ্রলোকরা বললেন—মদ খাচ্ছে খাক্, কিন্তু তা বলে আমাদের সকলের ঘুম নষ্ট করে হট্টগোল করবে ?

একদিকে একদল লোকের অভিযোগ, আর অন্যদিকে একদল লোকের প্রশ্রয়, এই দুই-এর সমন্বয়ের নামই তো ইতিহাস। এমনি করেই তো একদিন কোন্ দূর দেশ থেকে ইণ্ডিয়ায় এসে ঢুকেছিল মাহ্‌মুদ গজনবী, ঢুকে সোমনাথের মন্দির লুঠ করেছিল। বাদশা আকবর এসে আমাদের ওপর জিজিয়া ট্যাক্স বসিয়েছিল। বাদশা আওরংজেব এসেও একদিন আমাদের মাথায় চড়ে বসেছিল, বাদশা বাবর এসেও এক ফাঁকে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্ মজবুত করে গেড়ে দিয়েছিল। নাদির শাহ্‌ও একদিন মানুষ খুন করে রক্তের রঙ-এ ইণ্ডিয়ার মাটি লাল করে দিয়েছিল। তাদের মতো ইংরেজরাও ভিখিরির ছদ্মবেশ পরে একদিন এখানে এসে বাঙালী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, আফ্‌গান, রাজপুতদের সকলকে হটিয়ে সকলের মাথার ওপরে চড়ে বসেছিল। আমরা সবাই মিলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলাম, আবার ক্ষমতা পাওয়ার লোভে কেউ-কেউ তাদের প্রশ্রয়ও দিয়েছিলাম। আর তার ফলে আমরা সবাই একাকার হয়ে গিয়েছিলাম। আর এখনও সেই একাকার হওয়ার গুণোগার দিয়েই চলেছি আমাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে আমরা সব ভুলে যাই। ঘুমিয়ে পড়লেই আমরা সব ভুলে যাই। ঘুম ভেঙে যখন জেগে উঠি তখন আবার টাকা রোজগারের ধান্ধায় ছুটে বেড়াই। তারপর সন্ধ্যেবেলা আমরা নেশা করে বাড়িতে এসে আবার সব ভুলে যাবার জন্যে অঘোরে ঘুমোই। আসলে আমরা বড়োর দিকে তাকাই না, বা আমাদের চেয়ে যা বড়ো তার খোঁজ-খবরও রাখি না। ছা-পোষা মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে পারলেই আমরা বেঁচে যাই। তাই আমরা চাকরিটাকে বা পেন্‌শনটাকে আঁকড়ে ধরে থাকি। ব্যবসাটাকে হাতের মুঠোয় রাখতে চাই ; আমরা ধুলো-ময়লা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু জীবনের পরেও যে আর একটা জীবন আছে তা মনে রাখি না। সত্য বাঁচিয়ে চলি না। ধর্ম বাঁচিয়ে চলার কথা চিন্তা করি না। জীবন দিলেই যে জীবন পাওয়া যায় সে-কথাটাও আমরা বিশ্বাস করি না।

তারপর ডান দিকে গাড়ি ঘোরবার কথা।

কানাইও আর দেরি করলে না। সেও তার ট্যাক্সিটা নিয়ে একেবারে সাহেবের গাড়ির ওপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো—একেবারে সাহেবের গাড়ির সামনে গিয়ে সামনের দিকে যাওয়ার পথ আটকে দাঁড়ালো—

হঠাৎ সাহেবের গাড়ির ভেতরে একটা কাণ্ড ঘটলো।

যখন হয় তখন বোধ হয় এমনি করেই হয়।

এ-উপন্যাসের গোড়ায় সোহম্ ভেবেছিল যে তার যাত্রা শেষ হবে 'ত্রিবলী পার্কে'র ফ্ল্যাট-বাড়িতে গিয়ে। কিন্তু ভূষণ আর কানাই তা সব বানচাল করে দিলে মাঝ-পথে।

মাঝরাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত শম্পাদের বাড়িতেও বেশ শান্তি নেমে এসো। প্রথম রাতের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা সবাই-ই তখন ভুলে গেছে। শুধু শম্পাদের বাড়িতেই নয়, পাড়া-প্রতিবেশীদের জীবনেও বেশ শান্তি নেমে এসেছে তখন।

কিন্তু ভোরবেলা থেকেই আবার যুদ্ধ। জীবন-যুদ্ধ। জীবন-যুদ্ধ শুরু হলেই আবার সেই আগের দিনের পুনরাবৃত্তি।

শম্পার আবার সব মনে পড়ে গেছে। সেই পাম্পা, সেই 'ড্রিমল্যাণ্ড্'। সেই কলহ, সেই অনুরোধ, সেই অভিযোগ, সেই মার সঙ্গে পাম্পার ঝগড়া। সেই পাড়ার লোকদের চেঁচামেচি। সমস্ত সমস্ত। আবার ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে সে বলে উঠলো—মা, আমি পাম্পার কাছে যাবো…মা—

সুমিত্রা বলে উঠলো—আবার? আবার সেই দুষ্টুমি?

শম্পা বললে—পাম্পাকে তাড়িয়ে দিলে কেন তোমরা? পাম্পা কখন আসবে, বলো না মা, বলো না কখন আসবে?

এবার মিস্টার কোঠারি বিরক্ত হয়ে উঠলো। এতক্ষণ একমনে সকালবেলার খবরের কাগজটা পড়ছিল মন দিয়ে। খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়বার সময়ে কোন রকম শব্দ পছন্দ করে না কোঠারি। টোস্ট্ আর চায়ের সঙ্গে গতকালের খবরগুলোও সে গেলে। সে-সময়ে সে কারোর নয়। তখন সে একেবারে একলা। প্রথমেই সে মন দিয়ে পড়ে শেয়ার মার্কেটের টাট্কা খবরগুলো। কোন্ শেয়ারটা উঠলো, কোন্ শেয়ারটা ক'পয়সা নামলো। সেই শেয়ারের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে কোঠারির জীবনটাও ওঠে আর নামে। টাকার বাজার-দর তার কাছে জীবনের বাজার-দরের দামের চেয়ে বেশি। তার মানে হলো আগে টাকা, তার পরে জীবন। তাই রোজ ঘুম থেকে উঠে সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তুটার ওঠা-নামার গ্র্যাফ্‌টা হিসেব কষে দেখে নেয়। তারপরে সে তার দৈনন্দিন কাজ শুরু করে। সেই দৈনন্দিন কাজটাও হলো টাকা উপায়। একদিন মানুষের প্রয়োজনের জন্যেই টাকার সৃষ্টি হয়েছিল, আর এখন সেই টাকার জন্যেই যেন সৃষ্টি হয়েছে

এই কোঠারিদের।

তখনও সুমিত্রার মুখে চায়ের গরম আস্বাদ মিলিয়ে যায়নি। তখনও মনে হচ্ছে আরো এক কাপ চা হলে তার ভালো হতো···

হঠাৎ কোঠারির গলার আওয়াজে তার নেশা কেটে গেল।

—শুনেছ সুমিত্রা, শুনেছ?

সুমিত্রা বুঝতে পারলে না কোঠারির কী এমন জরুরী কথা আছে তাকে শোনাবার।

বললে—কী?

কোঠারি খবরের কাগজটা হাতে করে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। বললে—এই দেখ, মিস্টার রায়ের খবর বেরিয়েছে কাগজে—

—মিস্টার রায়ের খবর?

—হ্যাঁ। এখান থেকে চলে যাবার পরই মিস্টার রায়ের গাড়িতে একটা এ্যাক্সিডেন্ট···

—এ্যাক্সিডেন্ট? সে কী? কী এ্যাক্সিডেন্ট?

কোঠারি বললে—এইটে পড়ে দেখ না—

বলে খবরের কাগজটা সুমিত্রার দিকে এগিয়ে দিলে।

খবরটা পড়েই সুমিত্রা বিছানার ওপর উঠে বসলো। বললে—এ কি, সোহম্ পুড়ে মরেছে নাকি?

কোঠারি বললে—কী জানি, তা তো কিছু লেখেনি! তাহলে তার সঙ্গে যে টাকাগুলো ছিল তা কোথায় গেল?

দু'জনের কথার শব্দে শম্পারও ঘুম ভেঙে গেছে। সেও জিজ্ঞেস করলে—কে পুড়ে গেছে মা? পাম্পা?

সুমিত্রা হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলো—তুমি আমাদের কথার মধ্যে কথা বলছো কেন? ওঠো, ওঠো, তোমার স্কুলের বাস আসবার সময় হয়ে গেছে, গেট্ রেডি—গেট্ রেডি—

কথা বলতে বলতে মিস্টার মারোয়াী আবার থামলেন।

কত রকম কাজ তাঁর, তাঁর কাছে কতো লোকের কতো রকম দাবি। তার ওপর আমরা তাঁর মাতাজীর জীবনের কথা জিজ্ঞেস করে তাঁর কতো সময় নষ্ট করছি। কথাটা ভাবতে গিয়েও আমাদের খুব লজ্জা হচ্ছিল। কিন্তু মনের কৌতূহলের সঙ্গে লড়াই করে যদি লজ্জা পরাজয় স্বীকার করে নেয় তো তার জন্যে কাকে দোষ দেব! তাঁর কথা শুনতে আমাদের ভালো লাগছিল, আমরাও তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করার অপরাধে মনে মনে অপরাধী বোধ করছিলাম। আশ্রমের কেউ এসে তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ চাইছিল, কেউ চাইছিল প্রয়োজনীয়

নির্দেশ, কেউ চাইছিল উপদেশ। এত বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সমস্ত ভার তাঁর একলার ওপর ন্যস্ত হওয়াতে আমরা বুঝতে পারছিলাম তিনি আমাদের অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে বিব্রত বোধ করছেন। তবু অসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল কোনও ক্লান্তি যেন তাঁকে স্পর্শ করতেও ব্যর্থ হচ্ছে—

শ্রীনিবাস বললে—আমরা এখন উঠি, আপনার কাজের ক্ষতি হচ্ছে—

মিস্টার মারোয়াঁ উত্তরে বললেন—সে কী? কী বলছেন আপনি? কাজই তো জীবন। যতো দিন কাজ থাকবে, মনে করবো বেঁচে আছি। আমার মাতাজী বলেন—কাজই হচ্ছে মুক্তি। ভারতবর্ষের শাস্ত্রেও নাকি আছে যে কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যা দ্বারা জীব অমৃত লাভ করে—

একজন ফরাসী ভদ্রলোকের মুখ থেকে ভারতীয় শাস্ত্রের উল্লেখ শুনে আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকছিল না।

এতক্ষণে আমি বললাম—আমি একজন লেখক। আমার ইচ্ছে যে আমি আপনার মাতাজীকে নিয়ে একটা বই লিখি। তাতে যদি এ-দেশের মানুষ কিছু অনুপ্রাণিত হয়, কেউ আশা পায়, কেউ সাহস পায়, কেউ বিশ্বাস পায়—কিছু মানুষ যদি তাতে মানুষ হয়—

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—সেটা তো খুব ভালো কথা। আমি দেখেছি যে-সব ইণ্ডিয়ান ইয়োরোপে গেছেন তাঁরা সবাই সেখানে গেছেন 'আমেরিকান' হতে। আমেরিকার বিখ্যাত লেখক ইমার্সন বলেছেন—'We go to Europe to be Americanised.' কিন্তু আমি এখানে এসেছি ইণ্ডিয়ান হতে। অবশ্য এখনও পুরোপুরি ইণ্ডিয়ান হতে পারিনি। তবু চেষ্টা করে চলেছি—। সোহম্ রায় তো টাকাগুলো উপার্জন করতে চেয়েছিলেন নিজের ভোগেরই জন্যে, কিন্তু সেই টাকা এখন খরচ হচ্ছে কাদের জন্যে? পৃথিবীতে যাদের কেউ নেই তাদের যোগের জন্যে··

—যোগ? তার মানে?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—আমার মাতাজী বলেন জন্মের পর পৃথিবীতে এসে মানুষ যা কিছু ভোগ করে সে-সব কিছুর জন্যে তাকে ট্যাক্স্ দিতে হয়। যেমন জমি, বাড়ি, গয়না, সম্পত্তি, সমস্ত কিছুর জন্যে মানুষ ট্যাক্স দেয়। বেশির ভাগ মানুষই চেষ্টা করে ইনকাম-ট্যাক্স বা ওয়েল্থ্-ট্যাক্স ফাঁকি দিতে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আমরা ভোগ করি যার জন্যে কাউকে কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না। যেমন সূর্যের তাপ আর আলো, বাতাস আর বৃষ্টির জল। যে তার জন্যে ট্যাক্স দেয়, তাকেই বলা হয় যোগ—

হঠাৎ ঠিক এই সময়ে একজন কর্মী এসে মিস্টার মারোয়াঁর হাতে একটা টেলিগ্রাম দিলে। মিস্টার মারোয়াঁ রসিদটাতে সই দিয়ে টেলিগ্রামটা পড়তে লাগলেন। তারপর পড়া শেষ করেই আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—যাক্, মাতাজীর টেলিগ্রাম এসেছে। তিনি জানিয়েছেন তিনি কাল এসে পৌঁছোচ্ছেন—

জিজ্ঞেস করলাম—কাল কি আমরা আসবো?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—না, আপনারা বরং পরশু আসুন। মাতাজী কাল প্রথম এসে অনেক ব্যস্ত থাকবেন। পরশু এলে তাঁর সঙ্গে মন খুলে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারবেন—

মন্দির থেকে বেরোতে বেরোতে তিনি তখনও আমাদের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন।

তিনি বলে যাচ্ছিলেন আর আমরা শুনছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন—মানুষের প্রয়োজনটাকে সহজলভ্য করবার জন্যেই তো একদিন এক মহাজন সৃষ্টি করেছিল টাকা, কিন্তু এখন সেই টাকার প্রয়োজনটাকে সহজলভ্য করবার জন্যেই সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। এককালে মানুষ মহাজনদের কাছে গিয়ে বলতো আমাকে টাকা দাও, আর এখন টাকা মহাজনদের কাছে গিয়ে বলছে আমাকে মানুষ দাও। আগে ব্যাংকে যখন সুদের হার ছিল কম, তখন মানুষ ছিল বেশি, আর ব্যাংকে যখন থেকে সুদের হার বাড়লো, তখন থেকে মানুষ হয়ে গেল কম। সত্যিকারের মানুষের সংখ্যা কমে গেল।

পৃথিবীর স্টক্ এক্সচেঞ্জের মার্কেটে যখন মনুষত্বের শেয়ারের দর বাড়ে তখন মেহের আলি সাহেবেরা বলে 'সব ঠিক হ্যায়', আর যখন মনুষ্যত্বের শেয়ারের দর কমে তখন মেহের আলি সাহেবেরা বলে 'সব ঝুট্ হ্যায়'।

বহুকাল ধরেই এই নিয়ম চলে আসছে। তবু তারই নেশায় সোহম্ রায়দের সংখ্যা কেবল বেড়েই চলেছে, আর কমে চলেছে ক্ষেত্রবাবুদের সংখ্যাই। মেহের আলি সাহেবরা যতোই পাগল হোক, তার মতো পাগল হওয়ার জন্যে প্রতিদিন আরো লক্ষ লক্ষ মেহের আলি সাহেবদের জন্ম হচ্ছে। আর তারা এখন বাজারে নেমেই সেই আগের আমলের মেহের আলি সাহেবের মতোই বলতে শুরু করেছে—সব ঠিক হ্যায়—

তাই কানাই আর ভূষণ যখন সোহম্ রায়ের গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো তখন সোহম্ রায় একবার তার শেষ চেষ্টা করে দেখলে। দু'জনে মিলে তার চোখ মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। চেঁচাবার পথ বন্ধ। কাউকে ডাকবার উপায়টাও নেই। সেই অবস্থায় সে একবার তার ডান হাতটা প্যান্টের ডান দিকের পকেটে ঢোকাবার চেষ্টা করলে--

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে নজরে পড়ে গেছে ভূষণের।

সে সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরেছে সেই হাতটাকে। বললে—ওরে ডান দিকের পকেটে রিভলবার আছে রে···হুঁশিয়ার···

মানুষের কানে বহুবার বহু মহাত্মা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, বহু মহাপুরুষ বহুবার সাবধান-বাণী শুনিয়েছে, তবু তাতে কেউই কান দেয়নি। সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি কেউ-ই। কিন্তু যে মানুষরা বিকৃতির স্বীকার হয়েছে তারা তা শুনতে পেয়েছে। তারা সময়মতো সোহম্ রায়দের কাবু করে নিজেদের স্বার্থ-

পার্তি করেছে। বলেছে—চেঁচাসনি রে, সবাই টের পেয়ে যাবে!

সত্যিই সেই মাঝরাত্রে যে-রাহাজানিটা ঘটে গেল তার সাক্ষী কেউই রইল না। কারণ তখন তারা দু'জনে মিলে মানুষটাকে নিশ্চল নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে।

ভুষণ জিজ্ঞেস করলে—সেই টাকার থলিটা কোথায় গেল রে? সেই যেটা নিয়ে সাহেব বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল—সেটা কোথায়?

সত্যিই যেটার জন্যে ভুষণ আর কানাই এত ঝুঁকি নিলে, যেটার জন্যে এতক্ষণ পর্যন্ত রাত জাগলে, এত তোড়জোড় করলে, এত ষড়যন্ত্র করলে, সেটা কোথায় গেল? তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেটা কোথাও পাওয়া গেল না!

—তাহলে কী করবি?

—কী আর করবো, এবার এর লাশটা ফেলে দেব—

মিস্টার মারোয়াঁ আবার বলতে লাগলেন—আপনাদের ইণ্ডিয়ার ফিলজফি থেকেই শিখেছি যে বহুকাল আগে এখানে পিঙ্গলা নামে একজন বেশ্যা ছিল। তার মানে—প্রস্টিটিউট। আপনাদের এ এক অদ্ভুত দেশ মিস্টার বোহরা। এখানে বেশ্যার জীবন থেকেও আপনাদের এডুকেশনের উপকরণ নেওয়া হয়। যারা রূপ আর যৌবন নিয়ে বেসাতি করে, তাদের জীবন থেকে আবার শেখবার কী আছে? এটা কোনও দেশ কল্পনা করতে পারে?

একদিন সেই পিঙ্গলা খদ্দের ধরবার জন্যে সেজেগুজে বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। রাস্তা দিয়ে অনেক লোক যাচ্ছে। তাদের চেহারা দেখে বোঝা যায় কে তাদের মধ্যে বড়লোক, কার পকেটে অনেক টাকা আছে। অনেকের দিকেই সে কটাক্ষপাত করে তাদের আকর্ষণ করতে চাইলে। সে ভাবলে তাদের একজন কাউকেও যদি সে তার ঘরে এনে ঢোকাতে পারে তাহলে সে কৃতার্থ হয়ে যাবে, তাহলে তার আরো অনেক টাকা হবে, তার আরো অনেক সুখ হবে—তার নিজের বাড়ি হবে, তার নিজের গাড়ি হবে, মানুষের সংসারে যে যা চায় তার সবই তার হবে।

আসলে, মিস্টার মিত্র, আমরা সবাই-ই সেই বিদেহ নগরের এক-একজন বেশ্যা। আমরা সবাই-ই সেই এক-একজন পিঙ্গলা। আমরা সবাই পিঙ্গলার প্রথম জীবনের লালসা পেয়েছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার শেষ জীবনের বৈরাগ্য পাইনি।

—তারপর?

—আমি তো ফ্রান্সের একজন লোক। আমি জাতিতে একজন ফরাসী। আর আপনারা হলেন ইণ্ডিয়ান। আমি ফ্রান্স থেকে আপনাদের দেশে এসেছি শিখতে। আপনারা আপনাদের দেশের 'মহাভারত' নিশ্চয় পড়েছেন। সেখানে একটা চ্যাপটার আছে, তার নাম 'পিস্ এপিসোড'। তাকে ইণ্ডিয়ানরা বলে 'শান্তি পর্ব'। সেখানে মিথিলা সিটির যিনি কিং, সেই কিং জনকের একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছে। তিনি বলছেন—আমার টাকাকড়ির শেষ নেই, আমার ধন-সম্পত্তিরও শেষ নেই। অথচ আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। তাই আমার এই কিংডম্, আমার এই মিথিলা নগর আগুন লেগে যদি পুড়েও যায় তা হলেও আমার কিছুই নষ্ট হয় না—

—এ-সব কথা কোথা থেকে আপনি শিখেছেন ?

—সমস্তই মাতাজীর কাছ থেকে শিখেছি— । আমার নিজের দেশের লোকদের কথা ভেবে আমার খুব দুঃখ হয় । ফ্রান্সের প্যারি নগরে যদি আপনারা যান তো দেখবেন চারিদিকে পৃথিবীর সমস্ত ভোগের জিনিস সেখানে থরে থরে সাজানো রয়েছে । সেখানে আপনি যা চাইবেন পয়সা দিয়ে তাই কিনতে পারবেন । কিন্তু তা হলে সেখানে তাদের মনে শান্তি নেই কেন ? তাহলে আমিই বা সে-দেশ ছেড়ে এই ইণ্ডিয়ায় এলুম কেন ? আমাদের তো টাকার অভাব নেই, সায়েন্স মানুষকে যা-কিছু দিতে পারে তার সবই তো আমরা ভোগ করতে পাই ! ওয়াইন, উওম্যান থেকে আরম্ভ করে কিছু ভোগ করতে তো আমাদের বাকি নেই ! তবু কেন আমরা পিঙ্গলার মতো দুঃখী ? অথচ তারই পাশাপাশি আপনাদের দেশের একজন রাজার ছেলে সব ছেড়ে কী করে পথের ধুলোয় নেমে আসতে পারলো তা ভাবলেও আমার গায়ে কাঁটা দেয় । এরকম ঘটনা এক ইণ্ডিয়াতে ঘটাই বোধহয় সম্ভব । আর একজন মানুষ অবধূত ব্রাহ্মণ হয়ে কী করে বেশ্যা পিঙ্গলাকে তার গুরুর আসনে বসাতে পারলো ? তার কথা পড়লে একজন ফরেনার হয়েও আমি চমকে উঠি । মনে মনে ভাবি এটা কী করে সম্ভব ?

তাঁর কথাগুলো শুনতে শুনতে তখনও মনে পড়ছিল সেই সোহম্ রায়ের কথা । যার টাকা দিয়েই এই হৃষিকেশের ব্রহ্মপুরী, মহারাষ্ট্রের নাগপুর আর রাজস্থানের চৌবেড়িয়ার তিনটে আশ্রম চলছে । কোথায় সেই সোহম্ রায়, 'টার্নবুল এ্যাণ্ড জ্যাক্সন্ কোম্পানি'র একজন ডাইরেক্টর, আর কোথায় সেই সুমিত্রা আর কোথায় এই মাতাজী শম্পা । সেই শম্পার মধ্যে এই প্রজ্ঞা কোথা থেকে এলো ? কে সেই শম্পাকে এমন করে পিঙ্গলাতে রূপান্তরিত করে দিলে ?

তার পরদিনই মাতাজী এসে হাজির হলেন ।

আমরা পরদিনই মাতাজীর আবির্ভাব দেখতে চৌবেড়িয়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম । সেদিন আশ্রমের সমস্ত লোকলস্কর সেখানে হাজির ।

—এই কানাই, গাড়িটাতে আগুন লাগিয়ে দে আগে । নইলে ওতে আমাদের হাত-পায়ের ছাপ দেখে পুলিস ধরে ফেলবে যে আমাদের—

—না রে, চল্ লাশটা আগে ফেলে দিয়ে আসি—

—কোথায় ফেলবি ?

—আগে লাশটা ট্যাক্সিতে তোল, তারপর তা ঠিক করা যাবে ।

যেমন পরিকল্পনা, সেইমতোই কাজ হলো ।

আগে কতো কাজের লোক ছিল সোহম্ রায়ের বাড়িতে । কারো নাম রাম, কারো নাম বদ্রি বা বদ্রিনাথ । শেষের দিকে কোথা থেকে এসে পোঁছুলো এই

ভূষণ। মানুষের জীবনের উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে তার চারদিকের সঙ্গী-সহযাত্রীদেরও বোধহয় অদল-বদল হয়ে যায়। তার সুসময়ে যেমন ভালো বন্ধু-বান্ধব জোটে, তেমনি আবার অসময়ে জোটে স্তাবক আর হঠকারীদের দল। কিন্তু যারা স্থিতধী পুরুষ তাতে তাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। মানুষের জীবনে টাকার আমদানির সঙ্গে সঙ্গে যেমন টাকাবাজদের আমদানি হয়, আবার বৈরাগ্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি মানুষের পাশে এসে জড়ো হয় নিরাসক্তরাও। সেই জন্যেই সোহম্ রায়ের উত্থানের দিনে এসে হাজির হয়েছিল মেহের আলি সাহেব, আর পতনের দিনে এসে হাজির হয়েছিল ভূষণ। টাকার প্রতি যদি সোহম্ রায়ের বিতৃষ্ণা আসতো তাহলে আর শেষ জীবনে ভূষণের মতো কাজের লোক এসে তার পাশে জুটতো না।

—এই আপনাদের দেশে একদিন জনকের মতো মহারাজাও ছিলেন আবার তারই পাশাপাশি এখন আপনাদের দেশের মন্ত্রীরাও আছে এখন। এখন মন্ত্রীরাই তো সে-যুগের মহারাজার মতো। তারাই তো আপনাদের দেশ শাসন করে। অথচ আমাকে অনেকে বলেছে যখন কোথাও ক্রিকেট খেলা হয় তখন সেই রাজা-মহারাজারা নাকি রাজ্যপাট ছেড়ে সপরিবারে ক্রিকেট খেলা দেখতে যান আর ওদিকে সব ব্যাংক-ব্যাংক কর্মচারীরা সবাই মিলে টেলিভিশনে ক্রিকেট খেলা দেখেন। সদর গেটে যে মাইনে করা দারোয়ানের বন্দুক নিয়ে পাহারা দেওয়ার ডিউটি সে সদর গেট ছেড়ে দিয়ে অন্যদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা দেখে। আর সেই সুযোগে গুন্ডারা এসে কোটি কোটি টাকা ডাকাতি করে নিয়ে যায়। আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে—While Rome was burning Nero was fiddling. যখন রোম সাম্রাজ্য আগুনে পুড়ছিল তখন দেশের রাজা নিজের মনে বেহালা বাজাচ্ছিল। এখন পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই একই অবস্থা। এর প্রতিকার কী? এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যেই মাতাজী এই আশ্রমে কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। মাতাজীর প্রচেষ্টা যতো সামান্যই হোক, আমিও একে আমার নিজের জীবনের ব্রত করে নিয়েছি। তাই এখানে বৈরাগ্যের সঙ্গে কর্মের মেলবন্ধন করা হয়েছে। এখানে অন্য কোনও ঠাকুর পুজো হয় না। কারণ এখানে কর্মই আমাদের ঠাকুর।

মিস্টার মারোয়াঁর কথাগুলো তখনও মনের ভেতর গুঞ্জন তুলছে। যেদিন মহাত্মা গান্ধীকে গুলি করে খুন করা হলো সেদিন সোহম্ রায়ের ভোলাদা সকলকে নাকি রসগোল্লা খাইয়েছিল।

—কেন?

মাতাজী বলেছিলেন যে তিনি লোকের কাছে শুনেছিলেন মহাত্মাজী নাকি পাকিস্তানের পাঁচশো পঞ্চান্ন কোটি টাকা ধার শোধ দেবার জন্যে জহরলাল নেহরুকে চাপ দিতে উপোস করেছিলেন। আর টাকাটা যখন শোধ দেওয়া হলো তখনই তাঁকে খুন করা হয়েছিল। গান্ধীর মৃত্যু-সংবাদ শুনে সেদিন দেশের বহু জ্ঞানী-গুণী লোকই নাকি মনের আনন্দ প্রকাশ করতে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবকে

বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে রসগোল্লা খাইয়েছিলেন।

কথা চলছিল, এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল মাতাজীর ট্রেন স্টেশনে এসে পেঁছুলো। "মাতৃ-মন্দিরে"র যতো সদস্য ছিল তারা সবাই তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল।

তারা চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিতে লাগলো—জয় হো, মাতাজী কি জয় হো!

ট্রেনের একটা সাধারণ শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে এলেন মাতাজী। মাতাজীকে সেই-ই প্রথম চোখে দেখলাম আমরা। আমরা ভেবেছিলাম গেরুয়া-বসনধারিণী এক মহিলাকে দেখবো। তার বদলে দেখলাম অন্য এক মূর্তি। আগাগোড়া সাধারণ পাড়হীন এক সাদা কাপড় পরা মহিলা। হাসি মুখে হাত জোড় করে সকলকে অভিবাদন করলেন। আর তারপর দু'হাত তুলে ইঙ্গিতে তাদের চুপ করতে বললেন। তাঁর একটু ইঙ্গিতেই জনতা শান্ত হয়ে গেল। তারপর তিনি হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে দরজার কাছে এসে টিকেট-কালেক্টরকে নিজের টিকেটটা দেখালেন।

টিকেট-চেকার ভদ্রলোক টিকেট নেওয়ার বদলে দু'হাত তুলে মাতাজীকে প্রণাম জানালেন। বাইরের জনতা তখন শান্ত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাচ্ছে, আর তিনি দুই হাত উঁচুতে তুলে আশীর্বাদের মুদ্রায় জনতাকে শান্ত থাকতে ইঙ্গিত করছেন।

মিস্টার মারায়োঁ তাঁর সঙ্গে আসছিলেন। একজোড়া খালি সাইকেল রিক্শা মজুত রাখা হয়েছিল। প্রয়োজন হলে মাতাজী তা ব্যবহার করতে পারেন।

কিন্তু না, মাতাজী তাতে না উঠে হাঁটতে হাঁটতে পথ চলতে লাগলেন।

খোলা আকাশের নীচেয় শত শত লোকের স্বতঃস্ফূর্ত চলমান ভিড় আর সামনে পথ দেখিয়ে পদযাত্রায় চলেছেন মাতাজী। রাস্তার দুপাশে গ্রামের বউ-ঝি-পুরুষরা দর্শনার্থীর ভূমিকায় অপেক্ষমাণ।

সেদিনকার সে দৃশ্য আমাদের চিরকাল স্মরণীয় হয়ে রইল।

তারপরে একসময়ে পদযাত্রা গন্তব্যস্থলে এসে পেঁছলো। আমরা মিস্টার মারোয়াঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

আসবার সময়ে মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—তাহলে কাল বিকেল চারটের সময় আপনারা মন্দিরে আসবেন, তখন মাতাজীর সঙ্গে আমি আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব—

খবরটা খবরের কাগজের কল্যাণে সারা দেশে সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়লো।

আর খবরের কাগজের মালিকরাও চান প্রত্যেক দিন তাদের কাগজে এমন সব খবর ছাপানো হোক যাতে ভোরবেলা কাগজ পড়ে মানুষের মাথা গরম হয়ে যায়।

আর পাঠকদের মাথা যতো গরম হবে ততো তাদের আয় বাড়বে। আসল উদ্দেশ্য সেই একই—টাকা।

দেশের কোথাও যদি কোনও বাড়ির সধবা বউ গলায় দড়ি দিয়ে বা কেরোসিন তেল গায়ে মেখে আত্মহত্যা না করে, তাহলে পাঠকরা কেন সে-খবরের কাগজ কিনবে? কিম্বা কোথাও কোনও গণ্যমান্য লোক যদি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফ্‌তার না হয়, তাহলে পাঠকরা কেন সে খবরের কাগজ কিনবে?

এইসব গরম-গরম মুখরোচক খবর যতো ছাপা হবে ততোই কাগজের মালিক-দের আয় এবং প্রতিপত্তি বাড়বে। আসল উদ্দেশ্য সেই একই—টাকা।

আর ছোট-বড় মাঝারি সব শ্রেণীর মানুষের তো একটাই চাহিদা। সেই চাহিদাটা হলো—টাকা।

তাই যখন সোহম্‌ রায়ের গাড়ি-দুর্ঘটনার খবরটা খবরের কাগজের পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা হলো তখন চেনাশোনা মহলে শোরগোল পড়ে গেল।

ভোপালে খবরটা পড়ে কাশী দত্ত লাফিয়ে উঠলো। অফিস থেকে দৌড়ে এসে বাড়িতে ঢুকলো। সোজা সদর-দরজা থেকেই ডাকতে লাগলো—মা, ও মা—মা—সব্বোনাশ হয়েছে—

মা ভেতর বাড়িতে তখন নিজের কাপড়টা সেলাই করছিল। সময়মতো সেলাই না করলে আবার নতুন কাপড়ের দরকার হবে। তখন আবার টাকার জন্যে ছেলের কাছেই হাত পাততে হবে।

বললে—কী রে, কী সব্বোনাশ? কার সব্বোনাশ?

কাশী তখন খবরের কাগজের পাতাটা নিয়ে মা'র কাছে এল।

—এই দেখ, তোমার ভাইপো'র কাণ্ডটা দেখ···

মা বাংলাই পড়তে পারে না, তার ওপরে আবার হিন্দী লেখা।

—বল্‌ না, কী খবর বেরিয়েছে?

—তোমার সোহম্‌ খুন হয়ে গেছে।

—বলিস কী? খুন হয়েছে মানে?

—খুন হয়েছে মানে খুন হয়েছে। যেমন রাত্তির করে মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল, তেমনি জব্দ। গুণ্ডারা তাকে খুন করে গাড়িটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

—সে কী রে?

মা যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লো। এই তো ক'বছর আগে মা-ছেলে মিলে সোহমের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। তাদের ঐশ্বর্য দেখে মা-ছেলের চোখ তখন কপালে উঠে গিয়েছিল। এত টাকা সোহমের? এত টাকা কখনও মানুষের হয়? সেই বাপ-মা-মরা ভাইপো'র এত টাকা হলো? ভগবান কি কানা?

—তা গুণ্ডারা ধরা পড়েছে?

মা তো জানতো না যে ভগবান কানা নয়। মানুষই কানা। ভগবান কেন মানুষকে দেখবে? মানুষ তো কখনও ভগবানকে চায়নি, চেয়েছে তো শুধু টাকাকে। সে যদি টাকাই চেয়ে থাকে, তবে টাকাই তাকে এখন রক্ষে করুক!

টাকাই এখন তাকে বাঁচাক !

কাশী দত্ত মা'কে বললে—মা, আবার কলকাতায় চলো, আমি ছুটি নিয়ে নেব।

—কেন রে, আবার কলকাতায় গিয়ে কী হবে ?

কাশী বললে—বা রে, সোহম্ মারা গেল আর আমরা এখানে হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকবো ? সেখানে তার বিধবা বউ একলা কী করে দিন কাটাচ্ছে তা দেখতে হবে না ? তার তো শুনেছি তিনকুলে কেউ নেই—

মা বললে—তার তিনকুলে কেউ না-ই বা থাকলো। তাতে আমাদের কী ?

কাশী বললে—আরে তুমি বুঝলে না, সোহমের মারা যাওয়ার পর তার বউ তো অনেক টাকার মালিক হয়ে গেল। এত টাকার মালিক হয়ে এখন কোথায় সে থাকবে, কার কাছে আশ্রয় নেবে, তা তো আমাদেরই ভাবতে হবে। দেশের চারদিকে এত ধান্ধাবাজ লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা টাকার গন্ধে তাকে একলা মেয়েমানুষ পেয়ে তো সবাই মিলে টাকার লোভে খুন করে ফেলবে ! এই অবস্থায় আমরা ছাড়া তাকে কে আর বাঁচাবে বলো ?

মা খানিকক্ষণ ভাবলে, তারপর কিছু বলতেও যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কাশী বললে—না না, তুমি আর 'কিন্তু' কোর না মা। আমি আজকেই টিকিট কেটে আনছি, আজই সন্ধ্যের ট্রেনেই কলকাতায় রওনা দেব—

তা তাই ই হলো। সেই দিনই কাশী বউ আর বাচ্ছাদের বাড়িতে রেখে মা'কে নিয়ে কলকাতায় রওনা দিলে। আর তারপর সকালবেলা যখন কলকাতায় এসে পেঁছলো, তখন সঙ্গে মাল-পত্র কিছু ছিল না বলে ঝামেলা পোয়াতে হলো না বেশী। সোজা বাসে-ট্রামেই চলে আসতে পারে, কিন্তু না, দেরি হলে অনেক ক্ষতি। অনেক টাকার ক্ষতি। টাকার ব্যাপার তো সহজ ব্যাপার নয়। সবাই-ই তো জানে সোহমের অনেক টাকা ছিল। টাকার পাহাড় ছিল তার কাছে। সেই টাকার লোভে কলকাতার ফন্দীবাজ লোকেরা এসে সোহমের বিধবা বউকে ফুস্-মন্তর দিয়ে টাকাগুলো লোপাট করে নিতে পারে। কলকাতার লোকদের বিশ্বাস নেই, টাকার জন্যে তারা সব কিছু করতে পারে।

তাই একটা ট্যাক্সি ডাকতেই মা বললে—আবার ট্যাক্সি করছিস তুই কেন রে ? মিছিমিছি কিছু টাকা গচ্চা যাবে—

কাশী বললে—না মা, তুমি জানো না, বাসে গেলে দেরি হয়ে যাবে, আর তারপর গিয়ে দেখবো বিধবার সব টাকা কেউ ভুজুং-ভাজুং দিয়ে হাত-সাফাই করে নিয়ে নিয়েছে, কলকাতার লোকদের তুমি চেনোনি এখনও, তারা সব পারে !

ট্যাক্সি-ড্রাইভার তখন গাড়ি চালাতে আরম্ভ করেছে।

কাশী দত্ত বললে—ড্রাইভারজী, জেরা জোরসে চালাইয়ে—

তারপর এ-রাস্তা ও-রাস্তা পেরিয়ে যখন তারা 'ত্রিবলী-পার্কে'র বাড়িতে পেঁছলো তখন কাশী ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মা'কে বললে—এসো মা—

বাড়ির গেট খোলা পড়েছিল।

আগে যখন কাশী দত্ত এ-বাড়িতে এসেছিল তখন দারোয়ান গেটের সামনে

বসে পাহারা দিত। এখন থাকে না কেন? সোহম্ মারা গেছে বলে কি কেউ নিয়ম-মাফিক কাজ-কর্ম'ও করবে না?

ভেতরে ঢুকতে যেতেই পেছন থেকে কে যেন বলে উঠলো—কৌন্ হ্যায়?

কাশী দত্ত পেছন ফিরে দেখলে দারোয়ান তার ছোট ঘরখানার মধ্যে বসে কী একটা কাজ করতে করতে জিজ্ঞেস করছে—আপ লোগ কৌন্ হ্যায়?

কাশী বললে—আরে দরোয়ানজী, আমি, আমি! আমার নাম কাশী দত্ত। ভুপাল থেকে আমার সঙ্গে আমার এই মা'কে নিয়ে এসেছি। তোমাদের সাহেব সোহম্ সাহেবের পিসতুতো দাদা আমি। আমাকে চিনতে পারছো না?

দারোয়ান তখন যেন একটু নরম হলো। বললে—সাহেব তো মারা গেছে হুজুর—

কাশী বললে—আরে সেই খবর পেয়েই তো আমি এসেছি। সাহেব মারা গেছে তো যাক। কিন্তু তার বউ তো আছে। বিধবা বউ—

—নেহি হুজুর, সাহেবের বহু ভি নেহি হ্যায়।

—বউ নেই? কোথায় গেছে?

দারোয়ান বললে—তা জানি না হুজুর—

—তা তার ঘরটা তো আছে। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। সারারাত জেগে ট্রেনে চড়ে এসেছি, ঘরটাতে গিয়ে একটু বসি। তারপরে খাওয়া-দাওয়া করবো। ওদের সেই চাকরটা কোথায় গেল? সেই বদ্রিনাথ···

দারোয়ানটা বললে—ঘরে কেউ নেই হুজুর। কেউ নেই—

—কেন? কোথায় গেল তারা?

দারোয়ান বললে—আমি জানি না হুজুর—ঘরে চাবি দেওয়া আছে—

—চাবি? চাবি দেওয়া আছে কেন?

—তা তো জানি না বাবুজী।

কাশী জিজ্ঞেস করলে—সে চাবি কার কাছে?

দারোয়ান বললে—চাবি সাহেবের লেড়কীর কাছে।

—লেড়কী? মানে মেয়ে? সোহম্ সাহেবের আবার মেয়ে আছে নাকি?

দারোয়ান—জী হুজুর, সেই লেড়কীই সাহেবের ফ্ল্যাট-এর মালকিন্—

কাশী দত্ত সোহমের মেয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। এই তো কয়েক বছর আগে তারা সোহমের বাড়িতে এসেছিল। তখন তো তারা সোহমের মেয়েকে দেখেনি। এরই মধ্যে তার মেয়ে হয়ে গেল! আবার সে এত বড়োও হয়ে গেল!

মা'র দিকে ফিরে কাশী বললে—শুনছো মা, দরোয়ানজী কী বলছে শুনছো? সোহমের নাকি মেয়ে হয়েছে! কবে আবার সোহমের মেয়ে হলো? আমরা তো কিছুই জানতে পারলুম না!

মা বললে—তা হয়তো মেয়ে হয়েছে, আমরা খবর পাইনি—মেয়ে হওয়ার খবর তো খবরের কাগজে আর বেরোয় না—

তা বটে! কথাটা কাশীর কাছেও যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হলো। দারোয়ানের দিকে চেয়ে বললে—তা সেই লেড়কীর বাড়ি কোথায়? তার বাড়ির ঠিকানা কী?

দারোয়ান বললে—কে জানে বাবু, মুঝে নেহি মালুম—

—তা কোথায় গেলে মালুম হবে ?

দারোয়ান বললে—সাহেবের আপিসে গিয়ে দেখতে পারেন।

অফিসের ঠিকানা কাশী দত্ত জানে। অনেক বছর আগে একবার কাশী সে-অফিসে গিয়েছিল। বললে—চলো মা, সোহমের অফিসেই যাই—

আর হাঁটতে পারছিল না মা। বাসে বা ট্রামে যাওয়া মা'র পক্ষে সম্ভব নয়। সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, তাকেই থামিয়ে তাতে উঠে পড়লো দু'জনে। বললে—চলো সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ—

অফিসে পৌঁছিয়ে মা'কে অফিসের সামনের গেটে দাঁড় করিয়ে রাখলে কাশী। বললে—তুমি এখানে একটু দাঁড়াও মা, আমি ভেতরে গিয়ে খবর নিয়ে আসি সোহমের বউ-এর ঠিকানা।

বলে অফিসের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

অফিসের ভেতরে যাকে প্রথম দেখলে, তাকেই জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ মশাই, আপনাদের আপিসে মিস্টার এস রায়ের বউ-এর ঠিকানা কোথায় বলতে পারেন ?

ভদ্রলোক বললে—তার বউ-এর ঠিকানা কেউ জানে না, আপনি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন—

আরো অনেককে জিজ্ঞেস করেও কোন লাভ হলো না। সবাই তার বাড়ির ঠিকানা জানে, কিন্তু কেউ তার বউ কিম্বা তার মেয়ের ঠিকানা জানে না।

শেষকালে হতাশ হয়ে বাইরে এলো।

মা তখনও এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। সারারাত ট্রেনে রাত জেগে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা-দুটো ব্যথায় টন্-টন্ করেছিল। ছেলেকে ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করলে—কী রে, সোহমের মেয়ের ঠিকানা পেলি ?

কাশী বললে—না মা, কেউ তাদের ঠিকানা জানে না—

—তাহলে কী করবি ? এখন কোথায় যাবো আমরা ?

কাশী বললে—ভেবে দেখি—

রাস্তায় তখন মানুষের আর বাস-ট্রাম-গাড়ির অস্বাভাবিক ভিড়। অফিস-টাইম। ভিড় তো হবেই। হঠাৎ একজন একমুখ-দাড়িওয়ালা লোক চিৎকার করতে করতে সামনের দিকে আসছিল। অফিসটার সামনে এসেই সে-লোকটা চিৎকার করতে লাগলো—সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়—

গেটের সামনে একজন দারোয়ান দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে থাকাই তার কাজ। লোকটা অফিসের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু দারোয়ানটা তাকে দেখেই রুখে দাঁড়ালো।

বললে—ভাগ্, ভাগ্, যা ইঁহাসে—ভাগ্ যা—

লোকটা হাজার বার চেষ্টা করলে ভেতরে ঢোকবার। কিন্তু দারোয়ানটা কিছুতেই তাকে ঢুকতে দিলে না। তখন লোকটা আরো জোরে চিৎকার করতে লাগলো—সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুট্ হ্যায়—

বলতে বলতে লোকটা আবার উল্টোদিকে চলতে লাগলো।

মা কাশীকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁরে, ও লোকটা কাকে কী বলছে রে ?

কাশী বললে—পাগল একটা—

—তা বলছে ও কী ?

কাশী বললে—বলছে সব ঝুট্ হ্যায়—

—তার মানে ?

—তার মানে সব মিথ্যে !

মা তবু বুঝতে পারলে না। বললে—সব মিথ্যে কেন ?

কাশী বললে—পাগলে কী-ই না বলে আর ছাগলে কী-ই না খায়। চলো, দেখি এখন কোথায় যাওয়া যায়—

বলে আবার বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে চলতে লাগলো।

ওদিকে কলকাতায় তখন 'ওয়ার্ল্ড্ ব্যাঙ্কে'র টাকায় "সি-এম-ডি-এ"র অফিস চালু হয়েছে। কলকাতাকে নতুন করে সাজানো হবে। ইংরেজ আমলে যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে। বস্তির ভেতরে পাকা রাস্তা হচ্ছে। ইলেকট্রিকের আলোর খুঁটি বসানো হচ্ছে। কত বেকার ছেলে সেই অফিসে চাকরি পেয়েছে। অনেক আগে ১৯১১ সালে কলকাতার উন্নতির জন্যে 'কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট' হয়েছিল। তখনও অনেক ছেলে সেই অফিসে চাকরি পেয়েছিল। এবারও তেমনি সি-এম-ডি-এ। তারা শুধু রাস্তাঘাটের উন্নতিই করছে না, আদি গঙ্গার দু'টো পাড়ই কেটে গঙ্গাকে আরো চওড়া করা হচ্ছে। তাতে অনেক লোক চাকরি পেয়েছে। যারা মজুর শ্রেণীর লোক তাদের কেউ এসেছে বেহার থেকে, কেউ এসেছে অন্ধ্র থেকে, কেউ কেউ বা এসেছে মধ্যপ্রদেশ থেকে।

চেয়ারম্যান ভদ্রলোক খুব কাজের লোক। সকাল থেকেই নানা লোক আসে কাজের তাগিদে। কেউ নানা অঞ্চলের নক্সা এনে হাজির করে, তারা ড্রাফট্স-ম্যান। কেউ বা আবার ঠিকেদার। তারা এসে কাজের বিল্-এর টাকার জন্যে তাগাদা করে। চেয়ারম্যানের আবার হাজারটা ডেপুটি আর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট আছে। তারা সব কাজই করে। শুধু বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে চেয়ারম্যানের ঘরে পরামর্শ করবার জন্যে আসে। মাঝে মাঝে আবার কন্ফারেন্সও হয়। তাতে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র বা ডেপুটি মেয়রও আসে। বিশেষ কাজে কর্পোরেশনের মিনিস্টার নিজে চেয়ারম্যানকে ডেকেও পাঠান। তখন চেয়ারম্যানকে নিজের দফ্তর ছেড়ে তাঁর কাছে রাইটার্স বিল্ডিং-এ যেতেও হয়। কারণ 'সি-এম-ডি-এ'র টাকা খরচের ব্যাপারে ওয়ার্ল্ড্-ব্যাঙ্ককে তো হিসেবও দিতে হবে।

সেদিন তাঁর ঘরে মিস্টার দাশগুপ্ত ঢুকলেন। মিস্টার দাশগুপ্ত তাঁর ডেপুটি।

চেয়ারম্যান কাজ করতে করতে মাথা তুলে জিজ্ঞেস করলেন—কী ?

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—স্যার, বেলগাছিয়ার খাল কাটতে কাটতে আমাদের

স্টাফ এই রিভলবারটা পেয়েছে—

—রিভলবার ?

—হ্যাঁ স্যার, একটা কংকালের সঙ্গে এটা লেগে ছিল। মাটি খ‍ুঁড়তে খ‍ুঁড়তে এটা পাওয়া গেছে।

—কার স্কেলিটন ?

—তা কেউ জানে না স্যার। এটা কী করবো ?

চেয়ারম্যান বললেন—এটা ভালো করে আমাদের স্টীল-সেফের মধ্যে রেখে দিন। ওটার নম্বর কতো ?

মিস্টার দাশগ‍ুপ্ত বললেন—এই তো এর গায়ের ওপরেই নম্বর লেখা রয়েছে Webley Scot 593—

চেয়ারম্যান বললেন—ওটা খাতায় এণ্ট্রি করে রেখে দিন। আর ওখানকার লোক্যাল থানার ও-সি'কে চিঠি লিখ‍ুন—ওই নম্বরের রিভলবারের মালিক কে ? ওদের কাছে মালিকের নেম-অ্যাড্রেস সব আছে—

মিস্টার দাশগ‍ুপ্ত নির্দেশ শ‍ুনে আবার ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চেয়ারম্যান আবার তাঁকে ডাকলেন। বললেন—আর একটা কথা, ওই চিঠির একটা কপি লালবাজারের প‍ুলিস হেড্-কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবেন, ওরা ঠিক ওটার মালিকের ট্রেস্ করতে পারবে—

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনের রিসিভারটা বেজে উঠলো। তিনি সেটা তুলে নিয়ে বললেন—চেয়ারম্যান স্পিকিং—

মিস্টার দাশগ‍ুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে রিভলবারটা স্টীল-সেফের মধ্যে রেখে দিয়ে স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে ওখানকার থানার অফিসার-ইন্-চার্জকে একটা চিঠি ডিক্টেশন দিলেন। বললেন—ওর একটা কপি পাঠাবেন লালবাজারের প‍ুলিস-কমিশনারের কাছে, যান—

স্টেনোগ্রাফার চলে গেল।

কলকাতার উন্নতির জন্যে ওয়ার্লড্-ব্যাংক ঋণ হিসেবে টাকা না দিলে বেল-গাছিয়ার সেই খাল পরিষ্কারও হতো না, আর মাতাজীও এই 'মাতৃ-মন্দির'ও প্রতিষ্ঠা করতেন না—

কেন ?

সেই 'কেন'র উত্তর পাওয়া গেল পরের দিন বিকেল চারটের সময়ে।

আগেকার প্রস্তাবমতো আমরা ঠিক বেলা চারটের সময়ে আবার সেই 'মাতৃ-মন্দিরে' গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

মিস্টার মারোয়াঁ তৈরি ছিলেন। আমাদের দেখে বললেন—আপনারা এই-খানে একটু বস‍ুন, আমি দেখে আসি মাতাজী কী করছেন।

বলে মিস্টার মারোয়াঁ চলে গেলেন, আর তার একটু পরেই এসে বললেন—আমি মাতাজীকে আপনাদের কথা বলে এসেছি। তিনি একটা কাজ করছেন। হাত খালি হলেই তিনি আপনাদের ডেকে পাঠাবেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা মিস্টার মারোয়াঁ, আপনি যে কাল বলেছিলেন

ভূষণ আর কানাইয়ের কথা, তাদের কী হলো ?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—অনেক পরে নাকি তাদের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় ?

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—আমাদের এখানে তো সারা পৃথিবীর অনেক লোকই আসে। তাদের কাছ থেকেই খবরটা পাওয়া গেছে, তারা নাকি কোর্টে গিয়ে নিজেদের নাম পদবী অ্যাফিডেবিট করে সব বদলে নিয়েছে। তারপর অনেক দিন পরে খবর পাওয়া গেল তারা কোন্ একটা পলিটিক্যাল পার্টির মেম্বার হয়ে ইলেকশানে দাঁড়িয়ে নাকি কোথাকার কোন্ স্টেটের মিনিস্টারও হয়েছে—

আমাদের কেমন বিশ্বাস হলো না কথাটা। তবু ভাবলাম—হতেও পারে। ডেমোক্রেসিতে তো লোকে কারো গুণ দেখে ভোট দেয় না।

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—পলিটিকস্-এ অবশ্য সব কিছুই হতে পারে। আমাদের দেশেও ও-রকম কতো হয়েছে অনেকবার। এ এমন কিছু নতুন ঘটনা নয়। আর রাজনীতিতে এ হওয়া অসম্ভবও নয়।

জিজ্ঞেস করলাম—আর সেই সোহম্ রায়ের মেয়ে ? সেই শম্পা ?

মিস্টার মারোয়াঁ প্রশ্নটার জবাব দেওয়ার আগেই মাতাজীর কাছ থেকে আহ্বান নিয়ে এলো একজন লোক।

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—চলুন চলুন, মাতাজীর কাছ থেকে ডাক এসেছে—আর দেরি করা নয়—

আমরা তিনজনেই উঠে মাতাজীর ঘরের দিকে চলতে লাগলাম।

চেয়ারম্যানের চাপরাসী মিস্টার দাশগুপ্তকে গিয়ে খবর দিলে। বললে—বড় সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়েছেন হুজুর—

সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার দাশগুপ্ত চেয়ার ছেড়ে চেয়ারম্যানের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। গিয়ে দেখেন একজন অচেনা ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

চেয়ারম্যান মিস্টার চৌধুরী আলাপ করিয়ে দিলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে।

মিস্টার চৌধুরী বললেন—এই এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই মিস্টার দাশগুপ্ত, ইনি হচ্ছেন কাশীনাথ দত্ত, ইনি এর ভাই-এর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে এসেছেন। আপনি এঁকে নিয়ে গিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে দিন—

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—আপনি আমার টেবিলে আসুন মিস্টার দত্ত, আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি—আসুন—

বলে নিজের ঘরের দিকে চলতে লাগলেন। মিস্টার দাশগুপ্ত আগে অন্য এক কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সি-এম-ডি-এ—তার মানে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান-ডেভেলপ্মেন্ট্-অথরিটি—সৃষ্টি হওয়ার পর এই অফিসে বেশি মাইনেতে চাকরি নিয়ে এসেছেন।

মিস্টার দাশগুপ্ত নিজের ঘরে বসবার পর কাশী দত্তও তাঁর সামনের চেয়ারে বসলো।

মিস্টার দাশগুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন—এবার বলুন, আপনি কী চান?

কাশী দত্ত বললে—দেখুন, আমি ভুপালে চাকরি করি। একদিন সেখানে খবরের কাগজে পড়লুম যে কলকাতায় আমার মামাতো ভাই গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল, তখন গুণ্ডারা তাকে খুন করে ফেলেছে। তাতে তার গাড়িটাও নাকি পুড়ে গেছে। পুলিস তদন্ত করছে—। সে প্রায় অনেক মাস আগের ঘটনা—অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আসতে আমার খুব দেরি হয়ে গেল।

—আপনার মামাতো ভাই-এর নাম কী?

—সোহম্ রায়।

—তিনি কী করতেন?

কাশী দত্ত বললে—এখানে কলকাতায় 'টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাক্সন্' নামে একটা মাল্টি-ন্যাশন্যাল কোম্পানি আছে, তিনি ছিলেন তার ডাইরেক্টার। আমি সেখানেও গিয়েছিলুম। তাঁরা তার মেয়ের ঠিকানা দিতে পারলেন না, শুধু আপনাদের ঠিকানাটা দিলেন। বললেন, আপনাদের অফিসে এলে আপনারা নাকি বলতে পারবেন কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—আমাদের ডিপার্টমেণ্ট্ বেলগাছিয়ার ক্যানেলটা খুঁড়তে গিয়ে একটা কঙ্কাল পায়। কঙ্কালটা দেখে কিছুই চেনা যায় না। বুঝতে পারা যায় না ওটা কার কঙ্কাল। তবে তার সঙ্গে একটা রিভলবার পাওয়া যায়। সেটা আমরা লোক্যাল থানায় পাঠিয়েছি, আবার একটা কপি পাঠিয়েছি লাল-বাজার পুলিস-হেড্কোয়ার্টারেও। তারা রিভলবারের নম্বরটা দেখে যাতে বলে দিতে পারে ওর মালিকের নামটা কী।

তারপর ফাইলটা খুলে মিস্টার দাশগুপ্ত বললেন—এই যে, নম্বরটা এখানে লেখা আছে। Webley Scot 593। এর লাইসেন্স-হোল্ডারের নামটা যখন ওরা বলবে তখন আমরা জানতে পারবো ওটা আপনার মামাতো ভাই সোহম্ রায়ের কি না—। আমরা এখনও পুলিসের চিঠির অপেক্ষা করছি। আপনি আর কিছুদিন পরে আর একবার আসবেন, তখন আমরা আপনাকে বলতে পারবো ওই লাইসেন্স-হোলডারের নামটা—

কাশী দত্ত বললে—আমি তো অফিস থেকে মাত্র পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি, তার মধ্যে দশ-বারোটা দিন তো চারদিকে ঘোরাঘুরি করেই কেটে গেল, আর কতো দিন কলকাতায় পড়ে থাকবো?

—আপনি কোথায় উঠেছেন?

কাশী দত্ত বললে—কলকাতায় তো আমার নিজের বলতে কেউ নেই, তাই বড়বাজারের একটা ধর্মশালায় বুড়ো মা'কে নিয়ে উঠেছি। পকেট থেকে আমার টাকাপয়সা কেবল জলের মতো খরচই হয়ে যাচ্ছে, অথচ আমার মামাতো ভাই-এর কত টাকা যে ছিল, আর সে যে কোথায় গেল, তার কোন খোঁজ পাচ্ছি না—

নিজের মনের দুঃখের আর ক্ষোভের কথাগুলোই কাশী দত্ত মিস্টার

দাশগুপ্তের কাছে অকপটে বলে গেল। নইলে তার দুঃখের কথা শোনবার তো আর কোনও লোক নেই কলকাতায়।

তারপর কাশী দত্ত আবার ফিরে গেল তার ধর্মশালায়। এ ক'দিন শুধু দোকানের কচুরি আর আলুর তরকারি খেয়ে-খেয়েই দুজনের কেটেছে। সঙ্গে আনা টাকা তো দিনে-দিনে নিঃশেষ হয়ে আসছে। অনেক আশা নিয়ে কাশী দত্ত কলকাতায় এসেছিল, কিন্তু তার মনের কোনও সাধই মিটলো না। সোহমের মেয়ের ঠিকানাও সে কারো কাছ থেকে যোগাড় করতে পারলো না।

কাশীকে দেখে মা বলে উঠলো—কী রে, কিছু হদিস্ পেলি?

কাশী দত্ত বললে—না মা, সোহমের মেয়ে-বউ-এরও কোনও হদিস্ করতে পারলুম না, তার টাকারও কোনও হদিস্ করতে পারলুম না। আসলে সবাই টাকা চায়, টাকা ফেললেই সব হাঁসিল হয়ে যায়। কলকাতার সব শালা টাকার কাঙাল। কিন্তু আমি কোথায় অতো টাকা পাবো?

মা বললে—তা তাদের কী দোষ! তুইও তো টাকা চাস্। তুই একদিন বেশি ভাত খেতো বলে সোহম্‌কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি। এখন সে অনেক টাকা রেখে মারা গেছে বলে তুই এখন এসেছিস তার টাকার লোভে!

কাশী দত্ত মা'র কথায় রেগে গেল। বললে—তা আমার কী দোষ? আমি কি তখন জানতুম যে পরে সোহমের অতো টাকা হবে? তা জানলে কি আর সেদিন তাকে অমন করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতুম?

মা বললে—এখন আর তা নিয়ে ভেবে কী লাভ, চল্ আমরা ভুপালেই আবার ফিরে যাই—এখানে এসে কোনও কাজই হলো না, মিছিমিছি গুচ্ছের টাকা নষ্ট হলো শুধু—

কাশী দত্ত বললে—কোথাও তার টাকার হদিস্ না পেয়ে শেষকালে সোহমের সলিসিটার মিস্টার এস-বি-বিশ্বাসের অফিসে আর তার গড়চা লেনের বাড়িতেও গিয়েছিলুম, কিন্তু গিয়ে শুনলুম এখন কোর্টে দেড় মাসের ছুটি চলছে, তাই তিনি কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছেন, ফিরবেন এক মাস পরে। কেউ তাঁর ঠিকানাও বলতে পারলে না। এখন কী করি বলো তো?

মা বললে—তাকে আর টাকার পেছনে দৌড়তে হবে না, চল্ আমরা নিজের বাড়ি চলে যাই—

তা তাই-ই হলো। কাশী দত্ত মা'কে নিয়ে সেইদিনই ভুপালে চলে গেল।

মিস্টার মারোয়ার্রি পাশাপাশি আমরা তখন মাতাজীর দর্শনলাভের জন্যে হেঁটে চলেছি। প্রায় পাঁচ মিনিটের পথ। মিস্টার মারোয়া কথা বলতে বলতে চলেছেন।

তিনি বললেন—দেখুন আপনারা রাশিয়ান লেখক ডস্টয়েভ্স্কি'র লেখা

নিশ্চয়ই পড়েছেন। পৃথিবীর সবাই-ই তা পড়েছে। আইনস্টাইন বলেছেন যে তিনি 'ফিজিক্স'-এর কুটতত্ত্ব বুঝতে পেরেছেন ডস্টয়েভ্স্কির লেখা উপন্যাস পড়ে। বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ গুস্তাফ্ মেহ্লার তাঁর ছাত্রদের বলতেন—যদি তোমরা সঙ্গীত বুঝতে চাও তো ডস্টয়েভ্স্কির উপন্যাস পড়ো। সেই ডস্টয়েভ্স্কি তাঁর 'ক্রাইম্ অ্যান্ড পানিশমেণ্ট' বইতে লিখে গেছেন যে মহৎ লক্ষ্যে পেঁছিতে গেলে পেঁছিবার পথটাও মহৎ হতে হবে। তিনি সেই বইতে লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 'Good could not be achieved through evil', পৃথিবীর সব দর্শন-শাস্ত্রেরই এই একই কথা। কিন্তু একমাত্র আপনাদের এই ইণ্ডিয়ার ঋষিরাই উল্টো কথা বলে গেছেন। আপনাদের শাস্ত্রেই লেখা আছে—"সর্বারম্ভাহি দোষেন ধুমেনাগ্নি যথাবৃতা...।" প্রত্যেক শুভ কাজের আরম্ভে অশুভ কারণ লুকিয়ে থাকে, যেমন আগুনের আলোর আরম্ভে থাকে ধোঁওয়া। বাল্মীকির আরম্ভে থাকে দস্যু রত্নাকর, তথাগত বুদ্ধদেবের আরম্ভে থাকে বিলাসী রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। ইণ্ডিয়ানরাই একমাত্র বেশ্যা পিঙ্গলার মধ্যেও দেবীত্বের সন্ধান পায়।

আমরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা শেষ পর্যন্ত সেই রিভলবারটা কার, তার কি সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল?

ঠিক সেই সময়েই মাতাজীর ঘর এসে গেল। আমাদের প্রশ্নটার উত্তর আর পাওয়া হলো না।

আমরা মাতাজীর ঘরে ঢুকলাম। একেবারে সাদাসিধে ঘর। চারদিকের দেওয়ালে কোনও ঠাকুর বা দেবতার মূর্তির ছবি পর্যন্ত নেই, যা থাকবে বলে আশা করেছিলাম। মেঝের ওপর একটা কম্বলের ওপর সাদা চাদর পাতা ছিল।

মিস্টার মারোয়াঁ আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর মাতাজী আমাদের প্রণাম করলেন দুটো হাত জোড় করে। আমরাও আমাদের দুই হাত জোড় করে তাঁকে প্রতি-নমস্কার করলাম।

মিস্টার মারোয়াঁ বললেন—ইনি একজন লেখক, মিস্টার সোহম্ রায়ের জীবনী নিয়ে ইনি একটা বই লিখতে চান। আমি যা জানি তা এঁদের বলেছি। এখন আপনার কাছ থেকে তাঁর সম্বন্ধে এঁরা কিছু শুনতে চান—

মাতাজী জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন?

বললাম—হ্যাঁ, এখানে আমার এই বন্ধু শ্রীনিবাস বোহরার বাড়িতে এসে আমি উঠেছি। তারপর 'মাতৃ-মন্দিরে'র সামনে ভর্তৃহরির লেখা আমার প্রিয় কবিতা 'বৈরাগ্য শতকে'র শ্লোকটা দেখতে পেয়ে আমার খুব কৌতূহল হলো। আপনি তখন ছিলেন না, তাই মিস্টার মারোয়াঁর কাছ থেকে অনেক কথা শুনলাম। তিনি বললেন, বাকিটা মাতাজীর কাছ থেকে শুনে নিতে—

—কতোটুকু শুনেছেন আপনারা?

—সবই শুনেছি। সেই রিভলবারের নম্বরটাই শুধু জানা হয়নি। বেল গাছিয়ার খাল কাটতে কাটতে যে রিভলবারটা পাওয়া গিয়েছিল।

মাতাজী বললেন—সে রিভলবারটার নাম্বার হলো—পয়েণ্ট থার্টি এইট ক্যালিবারের, Webley Scot 593। পুলিসের ফাইলে ওই নাম্বারটা পাওয়

গিয়েছিল—

জিজ্ঞেস করলাম—রিভলবারটার লাইসেন্স-হোল্ডারের নামটা কী ?

মাতাজী বললেন - সোহম্ রায়—

—আপনার বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আপনার নামে যে উইল করে গেলেন, তা দিয়ে আপনি অন্য কিছু না করে এই 'মাতৃ-মন্দির' আশ্রমটা প্রতিষ্ঠা করলেন কেন ?

—আমার বাবা ? তার মানে ? আমার বাবা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে উইল করে গেলেন, এ-কথা আপনাদের কে বললে ? আমার বাবা তো গরীব কেরানী ছিলেন। তাঁর অতো সম্পত্তি থাকবে কোথা থেকে ?

আমরা মাতাজীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—মিস্টার মারোয়াঁ যে বললেন আপনার বাবার নাম সোহম্ রায়, তাঁর রেখে যাওয়া টাকা দিয়ে আপনি এই 'মাতৃ-মন্দির' আশ্রমটা করেছেন !

মাতাজী বললেন—মারোয়াঁ ভুল বুঝেছে, কিম্বা শুনতে ভুল করেছে। ও তো সবটা জানে না—

বলে তিনি আবার বলতে লাগলেন—আমার বাবা 'টার্নবুল অ্যাণ্ড জ্যাকসন্ কোম্পানি'তে ক্লার্ক ছিলেন, সেখানে চাকরি চলে যাওয়ার পর আমার মা বিনা-চিকিৎসায় মারা যায়। তারপর বাবা 'সি-এম্-ডি-এ'তে ইন্সপেকটারের চাকরি পায়। তখন আমি একটা ভালো স্কুলে পড়তে ঢুকি। সেখানে আমি স্কুলে প্রতি বছরই ফার্স্ট হতুম। সেই সময়েই হঠাৎ মিস্টার সোহম্ রায়ের সলিসিটার মিস্টার এস বি বিশ্বাস আমার নামে একটা চিঠি লেখেন। বাবার সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়ে জানতে পারি যে মিস্টার সোহম্ রায় তাঁর নব্বই লক্ষ টাকা আর তাঁর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর প্রপার্টি আমার নামে উইল্ করে দিয়ে গেছেন—সে প্রায় সব মিলিয়ে দেড় কোটি টাকার মতোন, তাঁর প্রভিডেন্ট্ ফাণ্ডের টাকা, ফ্ল্যাট্টার মালিকানা, সব কিছু মিলিয়ে।

আমরা অবাক হয়ে মাতাজীর কথা শুনছি। জিজ্ঞেস করলাম—তাহলে আপনার বাবার নাম কি···

মাতাজী বললেন—আমার বাবার নাম কেদার সান্যাল। তিনিই বেলগাছিয়ার খাল কাটবার সময়ে সোহম্ রায়ের কঙ্কালটা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তখন জানতে পারা যায়নি সেটা কার কঙ্কাল। পরে পুলিসের রিপোর্টে জানা যায় যে ওটা সোহম্ রায়েরই রিভলবার। বোম্বাই অফিসের মিস্টার আয়েঙ্গার ওঁকে ওই রিভলবারটার লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—আপনার অনেক শত্রু, আপনি এই রিভলবারটা সব সময়ে সঙ্গে রাখবেন।

—আর সেই মিস্টার সোহম্ রায়ের স্ত্রী সুমিত্রা আর তাঁর মেয়ে সেই শম্পা ? তাঁরা ?

মাতাজী বললেন—হ্যাঁ, তারও নাম শম্পা। ঘটনাচক্রে আমাদের দু'জনের নামই শম্পা। পরে আমরা তাদেরও খোঁজ করি। কিন্তু তারা সবাই তখন পাড়ার লোকের অত্যাচারে আর আরো বেশি টাকা রোজগারের লোভে ইণ্ডিয়া ছেড়ে কোথায় কোন্ আমেরিকা না কানাডায় চলে গিয়েছে—

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

মাতাজী বললেন—তারপর ঠিক সেই সময়েই আমার বাবাও মারা গেলেন। আর আমারও মনে কেমন একটা বৈরাগ্যের উদয় হলো। তখন আমি পৃথিবীতে একেবারে একলা। বাবাকে তখন শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করা হচ্ছে। শ্মশানে বাবার সেই জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমার মনে পড়লো ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্য শতকে'র কথা। মনে পড়লো মিথিলার রাজা জনকের কথা। মনে পড়লো বিদেহ নগরের পিঙ্গলার কথা। মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের কথা। মনে পড়লো তাঁর 'শান্তিনিকেতনে'র কথা। আমার মনে হলো—মঙ্গল কামনার মধ্যেও কেমন যেন একটা প্রয়োজনের ভাব উহ্য থাকে। অর্থাৎ তাতে কোনও একটা ভালো উদ্দেশ্য সাধন করার ভাব যেন জড়িত থাকে। কোনও একটা সুখ বা কোনও একটা সুযোগের ভাব। কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা। সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া ; যে-দেওয়ার মধ্যে কোনও নেওয়ার সম্বন্ধ থাকে না সেইটেই হচ্ছে একেবারে শেষ কথা। সেইটেই তো ব্রহ্মের স্বরূপ, কারণ তিনি তো কিছুই নেন না—

তারপর কতোক্ষণ ধরে যে আমাদের কতো কথা মাতাজী শোনালেন তার ঠিক নেই। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমরা যেন ইহলোক থেকে কখন ঊর্ধ্বলোকে চলে গেলাম। মনে হলো—সত্যিই তো, আমরা সবাই ইহজীবনে কার পেছনে কীসের পেছনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছি ? চিরকাল তো এখানে থাকতে কেউ-ই আসিনি, তবু কেন আমাদের এত কামনা-বাসনা ?

'মাতৃ-মন্দির' থেকে বেরিয়ে আসার পর রাস্তায় চলতে চলতে কথাগুলো যেন তখনও আমার মনের মধ্যে গুঞ্জন করছিল। মনে হচ্ছিল আমরা সবাই-ই যেন এক-একজন সোহম্ রায় হয়েই একদিন এ-সংসারে জন্মেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ মাতাজীর সমস্ত কাহিনীটা শুনে কখন যেন আমাদের উত্তরণ হয়ে গেছে, কখন যেন আমরা পবিত্র হয়ে গিয়েছি, কখন যেন আমরা পরিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছি। আমরা এই চারদিকের পৃথিবীর যা কিছু দেখছি যা কিছু শুনছি তা যেন আমরা কিছুই দেখছি না, তা যেন আমরা কিছুই শুনছি না। মনে হচ্ছে একেই যেন বলে সমাধি, একেই যেন বলে শান্তম্, একেই যেন বলে শিবম্, একেই যেন বলে অদ্বৈতম্। আমিও মনে মনে সকলের অগোচরে তাই বললাম—সর্বত্রই সকলের মাথা নত হোক, সর্বত্রই সকলের হৃদয় নম্র হোক, সর্বত্রই সকলের আত্মীয়তা প্রসারিত হোক।

অকস্মাৎ সকলের অগোচরে আমার মনও নিঃশব্দে নত হলো। তাই সেও তাঁকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো—তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।